এনায়েতুল্লাহ আলতামাস

# হেজাযের তুফান ২

# হেজাযের তুফান

{দ্বিতীয় খণ্ড}

মূল
এনায়েতুল্লাহ আলতামাস

রূপান্তর
মাওলানা মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

পাঠকবন্ধু মার্কেট (৩য় তলা) || ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ || ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ ❑ ডিসেম্বর, ২০০৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ ❑ এপ্রিল, ২০০৮
তৃতীয় মুদ্রণ ❑ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮
চতুর্থ মুদ্রণ ❑ নভেম্বর, ২০১৪

---

হেযাযের তুফান (২য় খণ্ড) ❑ এনায়েতুল্লাহ আলতামাস
মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন অনূদিত

---

প্রকাশক ❑ মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন-৭১১১৯৯৩, স্বত্ব ❑ প্রকাশক
প্রচ্ছদ শিল্পী ❑ নাজমুল হায়দার, কম্পিউটার সেটিং ❑ বাড
কম্প্রিন্ট, ৫০ বাংলাবাজার, মুদ্রণে ❑ বরাত প্রিন্টার্স
২২ ঋষিকেস দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

---

মূল্য ❑ ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

---

ISBN : 984-839-053-03

# ভূমিকা

কাহিনী নির্মাণে নিরপেক্ষ-নৈর্ব্যক্তিক থেকে, পটভূমি বিস্তরণের অমোঘতা মেনে নিয়ে, হার্দিকতা ও বৌদ্ধিকতার যুগপৎ মিশেলে বিশ্বস্ত থেকে যে উপন্যাসের চিত্র পত্র-পল্লবিত হয়, পাঠক জগতে দারুণ আলোড়ন তুলতে তার খুব বেশী সময় লাগে না। এনায়েতুল্লাহ আলতামাসের উপন্যাসগুলোও এই নিরীক্ষায় একচ্ছত্রভাবে উত্তীর্ণ। মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির চিরায়ত ধারাই তার উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য। সে হিসেবে তিনি শতভাগ ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক। উর্দু সাহিত্যে এ ক্ষেত্রে যদিও দু'একজন উল্লেখযোগ্য সফলতা পেয়েছেন, কিন্তু তার মতো কেউ ইতিহাসের প্রতি এতখানি সত্যাশ্রয়ী থাকার চেষ্টা করেননি। তাই আমরা দেখি আলতামাসের উপন্যাসীয় কলমে শুধু ইতিহাসের জীবন্ত ক্যানভাসই অনূদিত হয় বিশ্বাসের সতেজতা নিয়ে। ইতিহাসকে অবিকৃত রাখতেই যেন তার নিরন্তর সাধনা।

এ কারণেই তার উপন্যাসের গতি দুর্বার–অপ্রতিরোধ্য। পাঠককে নিমিষেই নিয়ে যায় সহস্র বছরের আকাশ পাড়ি দিয়ে বাস্তবতার শুভ্রতায় মোড়ানো এক স্বপ্নালোকে, ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ কোন রণাঙ্গনে কিংবা প্রেমের পবিত্রতায় অম্লান কোন মুহূর্তে। যেখান থেকে পাঠক তার অনিবার্যতা উপভোগ না করে ফিরতে পারে না। এসব নান্দনিক দিকই আলতামাসের প্রতি আমাকে আকৃষ্ট করেছে। 'হেজায কি আন্ধী' নামক উর্দু সাহিত্যের জনপ্রিয় উপন্যাসটি তাই বাংলায় রূপান্তর করেছি। ভাষা-ভাব ও আঙ্গিক অখণ্ডিত রেখে যে কোন রূপান্তর কর্ম মোটামুটি দুরূহ হলেও এখানে যেহেতু পাশ করার একটা উত্তেজনা আছে তাই রোমাঞ্চের ছোঁয়াও আছে। এর প্রতিটি ছত্রেই যেন আমি সেই ছোঁয়া পেয়েছি। রসিক পাঠকও সেই রোমাঞ্চ অনুভব করবেন এমন আশা করাটা নিশ্চয় দোষের কিছু নয়।

মাওলানা মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

সিদ্দীকবাজার, ঢাকা।

মা. যাইনুল আবিদীন
শব্দ থেকে শব্দান্তরের অনুজ্ঞা দিয়ে একদিন তিনি
হাতে উঠিয়ে দিয়েছিলেন রূপান্তরের বর্ণিল কলম।
প্রত্যাশার লঘু স্পর্শে সেদিন কেঁপে উঠেছিলাম।
সেই কম্পিত হাতেই গড়ে উঠেছে পাণ্ডুলিপির এই
ধূসর জঞ্জাল।

– মুজাহিদ

শিরীর শাহী কামরা থেকে চিৎকার ভেসে এলো।

ভেঙে খান খান হয়ে গেলো নিঃশব্দ রাতের স্তব্ধতা।

তখন কামরায় শিরী ও তার লোক দুটির নিথর দেহ গড়াচ্ছিলো।

একদিকে ছিলো সত্যের আলোকছটা নিয়ে দীনে ইসলামের মশালবাহী মুজাহিদদের দল। যারা অসত্যের আঁধারে নিমজ্জিত মানবজাতিকে উদ্ধারের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে ছিলো। অন্যদিকে ছিলো অসত্যের পূজারীরা। আল্লাহর এক সৃষ্টি আগুণকে যারা পূজো দিতো। দেবতা মনে করতো। আর সূর্যকে তারা খোদা বলে উপাসনা করতো।

এদিকে ছিলো সত্যের শৌর্যেবীর্যে তেজদীপ্ত এক কাফেলা। সারা দুনিয়ায় যারা আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠার অটল হিম্মত নিয়ে বেরিয়েছিলো। যে হিম্মতকে দৃঢ় রাখতে গিয়ে তাদের নিস্পাপ প্রাণগুলো বিলিয়ে যাচ্ছিলো। অকাতরে আর ঐদিকে ছিলো একচ্ছত্র ক্ষমতা আর সিংহাসনের তীব্র মোহে আক্রান্ত বস্তুবাদীরা। যে মোহ ও লোভ তাদের পরস্পরকে প্রতিনিয়তই শত্রু বানাচ্ছিলো।

একদিকে ছিলো অপ্রতিরোধ্য জযবা আর নির্মল আবেগের সর্বব্যাপী উচ্ছ্বাস। অন্যদিকে ছিলো সারা দুনিয়া তামা করে দেয়ার মতো যুদ্ধের বিশাল প্রস্তুতি। যুদ্ধ শক্তি, অহংবোধ, দানবীয় ঔদ্ধত্য এসবই ছিলো বাতিলের পূজারীদের কব্জায়। কিন্তু এর পাশে সত্যবাহকদের মনে হচ্ছিলো বিশাল মরুতে বিধ্বস্ত কোন কাফেলার মতোই ক্ষুদ্র আর জীর্ণ। পারসিকরা তখন এক লক্ষ বিশহাজার ফৌজের বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে উৎক্ষিপ্ত আগুনের মতো টগবগ করছিলো। আর মুসলিম ফৌজের সংখ্যা চল্লিশ হাজারও ছিলো না। এছাড়াও পারসিকদের ঘোড়সওয়ার ফৌজই ছিলো বেশি। আর হাতি তো ছিলোই।

রুস্তম তখন ছিলো সাবাতে।

পারস্য সম্রাট ইয়াযদগিরদ একদিন তার কামরায় বসা ছিলো। তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছিলো সে কোন বিষয়ে দারুণ উদ্বিগ্ন। তার মা পাশে বসে এক দৃষ্টিতে তার ছেলের দিকে তাকিয়েছিলো। কিন্তু ইয়াযদগিরদের সেদিকে তাকানোর কোন সময় ছিলো না।

ঃ 'বেটা ইযদী' – ইয়াযদগিরদের মা নাওরীন তাকে জিজ্ঞেস করলো– 'কি চিন্তা করছিস এত করে?'

ঃ 'তুমি তো জানো মা – ইয়াযদগিরদ বললো– 'আমি কি চিন্তা করছি তুমি তা নিশ্চয় জানো। মসনদের এই গুরু দায়িত্ব ছাড়া আর কি চিন্তাইবা করতে পারি আমি। সালতানাতে ফারেসের বিপদের কথা চিন্তা করতে করতে আমার রাতের ঘুমও হারাম হয়ে গেছে।'

ঃ 'আমাদের কাছে ফৌজ  কি কিছু কম আছেরে বেটা?' – নাওরীন বললো– 'নিজেকে এমন পেরেশানীর মধ্যে রেখে কষ্ট দিস না বেটা! আমি তো শুনেছি আরবদের ফৌজ আমাদের চেয়ে অনেক অনেক কম।'

ঃ 'বুয়ুবের যুদ্ধেও আরবদের ফৌজ আমাদের চেয়ে কম ছিলো মা'– ইয়াযদগিরদ বললো- 'শুধু কমই নয় হাতে গোনা যায় এত কম। আর আমাদের ফৌজ এত বেশি ছিলো যে, ময়দানে তাদের পা ফেলার জায়গা ছিলো না। কিন্তু দেখো মা, যে আরবদের সংখ্যা নিয়ে আমাদের ফৌজ বিদ্রূপ করছিলো তারাই আমাদের এতবড় লশকরকে এমন মার দিলো যে, শুধু ঐসব ফৌজই জীবিত রইলো যারা পালানোর সুযোগ পেয়ে ছিলো। আসলে কি জানো মা! আরবের মুসলমানরা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য লড়ে। আর আমাদের ফৌজ লড়ে নিজেদের জান বাঁচানোর জন্য'।

ঃ 'কিন্তু ইযদী!' – নাওরীন বললো– 'তুই একলা কিইবা করতে পারবি। আমি তোকে শুধু জীবিত নয়  সবসময় সুস্থ-সুখী দেখতে চাই। ফৌজ হেরে গেলে তোর কি করার আছে?'

ঃ 'মা! আমার প্রিয় মা' – ইয়াযদগিরদ বললো– 'তুমি যেমন আমাকে ভালোবাসো মা! আমার দেশকেও আমি তেমন করে ভালোবাসি'। ভুলে যেয়োনা মা! এটা আমার বাবা কিসরা পারভেজের সালতানাত। এই মাটির উত্তরাধিকার আমি, তুমি, আমরা সবাই। এর জন্যই আমার পিতাকে হত্যা করা হয়েছিলো। এটাও মনে রেখো, এদেশের জনসাধারণই আমাকে এখানে এনেছে। এর মর্যাদা আমাকে রাখতে দাও মা! কেউ যদি আমাকে এই নিশ্চয়তা দেয় যে, আমার প্রাণের বিনিময়ে সালতানাতে ফারেস চিরদিনের জন্য নিরাপদ ও বিপদমুক্ত হয়ে যাবে তাহলে এখনই আমার প্রাণটি দিয়ে দেবো।'

ঃ 'এমন কথা বলিসনা ইযদী! বেটা আমার!' – মা ছটফটে গলায় বললো- 'আমি পুরো সালতানাত তোর প্রাণের জন্য উৎসর্গ করে দেবো।'

ঃ 'আহ এমন কথা বলে না মা। আমার কথা শোন!' – ইয়াযদগিরদ বললো- আমার প্রাণের যদি এতই দাম তবে আমাকে লুকিয়েই রাখতে। আমি তোমার কোলে মুখ লুকিয়ে পড়ে থাকতাম। আমাকে যখন ময়দানে নিয়েই এসেছো ময়দানের ধুলো আমার গায়ে লেগে গেছে। আমাকে এখন বীরপুরুষের মতোই কর্তব্য করে যেতে যাও। আমি মরে গেলে এমন কি হয়ে যাবে মা! পারস্যের হাজার হাজার মানুষ আজ কেঁদে মরছে। তোমার ভালোবাসার শিকলে আমাকে বেঁধে রেখো না। আমি সিবাত যাচ্ছি। দু'একদিনের মধ্যেই রওয়ানা হয়ে যাবো।'

ঃ 'তুই সেখানে গিয়ে কি করবি বেটা' – মা বললো- 'রুস্তম আর জালিয়ুনুস ফৌজ নিয়ে চলে গেছে। খবর এসেছে মুসলমানরা তাদের বেশ কাছে চলে এসেছে। লড়াই শুরু হতে বোধ হয় আর দেরী নেই।'

ঃ 'আহা! আমি কি লড়তে যাচ্ছি নাকি'– ইয়াযদগিরদ ঝাঁঝালো গলায় বললো– 'রুস্তম আর জালিয়ুনুসদের প্রস্তুতিটা দেখতে যাচ্ছি আমি। রুস্তমের ভাবভঙ্গি আমার

ভালো ঠেকেনি। লড়াই নিয়ে সে টালবাহানা করছে। জ্যোতিষবিদ্যা তাকে বুযদিল বানিয়ে দিয়েছে। সে নাকি দাবী করে, ভবিষ্যতের সবকিছু সে দেখতে পায়। আমি তার সামনে থাকলে সে যুদ্ধের অগ্রগতিতে মন না দিয়ে পারবে না।'

মার চোখে ইয়াযদগিরদ এমন ছিলো যেন সে একুশ বাইশ বছরের যুবক নয়; বরং একুশ বাইশ মাসের কচি বাচ্চা। মার চোখ থেকে তাই সে সামান্য আড়াল হলেই মা দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতো। কিন্তু ইয়াযদগিরদের ধ্যান মন ছিলো অন্য দিকে। পারস্যের সব স্বপ্ন ছিলো তার রুস্তমের বীরত্বগাঁথাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু রুস্তমের পক্ষ থেকে এই আস্থার কোন প্রতিদান সে পাচ্ছিলো না।

ইয়াযদগিরদ আর তার মা যখন কথা বলছিলো তখন মাদায়েন থেকে কিছুটা দূরের এক এলাকায় শিরীর সামনে বসা ছিলো চারজন লোক। তাদের সামনে ছিলো ঘিয়ে ভাজা হরেক রকমের রসালো খাবারের শাহী দস্তরখানা, আর রাজকীয় মদ তো ছিলোই। দুই তরুণী এসব পরিবেশন করছিলো। ওদের গায়ের স্পর্শকাতর অংশগুলোই কেবল কাপড়ে আবৃত ছিলো। ওদের রমনীয় দেহ ও রূপের কমনীয়তায় আগন্তুক চারজন এতই মুগ্ধ ছিলো যে, তাদের হাত ছিলো খাবারের প্লেটে আর চোখ ঘুরছিলো এই দুই স্বল্পবসনা তরুণীর ওপর। তাদের এই অবস্থা দেখে শিরীর রাঙা ঠোঁট দুটি থেকে রহস্যময় হাসির দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ছিলো।

খাবারের আগেই ওদের সঙ্গে কথা শেষ হয়ে গিয়েছিলো শিরীর। শিরী তাদেরকে বলেছিলো যে করেই হোক ইয়াযদগিরদকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু এমনভাবে যাতে কোন আততায়ী ধরা না পড়ে। সফল হলে তারা কল্পনাতীত সম্পদের মালিক বনে যাবে। এ ছাড়াও পাবে এই দুই সুন্দরী তরুণীর মতো একজন করে ভুবন মোহিনী সুন্দরী।

ঃ 'তবে আর যাই বলো শাহী মহলে গিয়ে কিন্তু তাকে কোতল করা সম্ভব হবে না' – ঐ চারজনের একজন বললো –

ঃ 'শহরের মধ্যেও একাজে সুবিধা পাওয়া যাবেনা; ইয়াযদগিরদ কখনো শহরের বাইরে গেলে পথে কোথাও লুকিয়ে থেকে তাকে তীর দ্বারা মারা যেতে পারে। তখন আমরাও গা ঢাকা দিতে পারবো।'

ঃ 'আমাদের অপেক্ষা করতে হবে'– আরেকজন বললো– 'তাড়াহুড়া করে এসব কাজ হয় না।'

ঃ 'এটা তোমাদের ব্যাপার। তাড়াতাড়ি করবে না দেরীতে করবে'- শিরী বিরক্ত হয়ে বললো– 'এত কথার দরকারই বা কি। কাজ হলেই হলো। আর মনে রেখো ইয়াযদগিরদ শহরের বাইরে কোথাও গেলে সে কিন্তু একা যাবে না। সে এখন সম্রাট। তার সঙ্গে দেহরক্ষী আর মুহাফেজ বাহিনী থাকবে।'

ঃ 'যাক সেটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।'

এর দুদিন পর।

ইয়াযদগিরদ সিবাত যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। নাওরীন তাকে প্রাণপণ বাধা দিয়ে যাচ্ছিলো।

ঃ 'কিছুই হবে না মা!'– ইয়াযদগিরদ নাওরীনকে বললো– 'আমার কিছুই হবে না। আমি তো আর এখন কচি বাচ্চা নই।'

ঃ 'আজকে যাসনে'- নাওরীন কাঁদতে কাঁদতে বললো– 'দুদিন পর যা। আমি অনেক খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছি। আমি তোকে......

ঃ দুনিয়াটাতো মা স্বপ্নেরই বাজার! স্বপ্নতো দেখবেই'– ইয়াযদগিরদ বললো– 'পারস্যের এই পবিত্র মাটিও আমার মা, আমি আমার পবিত্র মায়ের আবরু-সম্ভ্রম বাঁচানোর শপথ করেছি।'

ঃ 'না ইযদী!'– নাওরীন তাকে তার দু'বাহুতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বললো- 'আজ আমি তোকে যেতে দেবো না। আমার মন বলছে আজ কিছু একটা নিশ্চয় হবে।'

যুবা পুরুষ ইয়াযদগিরদের শরীরে যৌবনের উত্তাল রক্ত বইছিলো। রক্তের এই উত্তাল প্রবাহে মাতৃস্নেহের স্নিগ্ধতা কোথায় ভেসে গেলো। ইয়াযদগিরদ এক ঝটকায় তার মার বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেলো। তাপর ঘরের পরিচারিকাকে ডেকে তার মাকে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলো। তিন চার জন পরিচারিকা এসে নাওরীনকে ভেতরে নিয়ে গেলো।

ইয়াযদগিরদ বাইরে এসে ঘোড়ায় সওয়ার হয়েও মহল থেকে মায়ের আহাজারী শুনতে পাচ্ছিলো। ইয়াযদগিরদ ইচ্ছা করলে তার মাকে সঙ্গে করে সিবাত নিয়ে যেতে পারতো, কিন্তু এ আশংকায় সঙ্গে নেইনি যে, কদমে কদমে নাওরীন তার ছেলের জন্য বাঁধা হয়ে দাঁড়াতো। ইয়াযদগিরদের আগে পিছে মুহাফিজবাহীনীর ঘোড় সওয়াররা ছিলো। এক জেনারেলও ছিলো তাদের সঙ্গে।

শহর থেকে বের হয়ে যখন সে কিছু দূর এগিয়ে গেলো তার মা তখন কাঁদতে কাঁদতে প্রায় বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছিলো।

ঃ 'আমাকে শহরের কিল্লায় পৌঁছে দাও তোমরা'– নাওরীন চিৎকার করলো– 'আমার ইযদীর চলার পথটা আমি দেখতে চাই।'

শহরের কেল্লার বুরুজে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো। নাওরীন দেখলো তার বেটার ফৌজী কাফেলা অনেক দূর চলে গিয়েছে। তার চোখ দিয়ে অশ্রু নয় যেন নদী বয়ে যাচ্ছিলো। সবাই জানতো নাওরীন তার ছেলে ছাড়া কিছুই বুঝতো না। তাকে তার চোখের আড়াল হতে দিতো না। কিন্তু সেদিন নাওরীনকে যেন অন্য কিছুতে পেয়েছিলো। তার নিজেকে সে মোটেও নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছিলো না।

সে ছিলো এক মায়ের মন। তার প্রাণ ভোমরাটাই যেন ছিলো তার পিতৃহীন পুত্রের মধ্যে। তার মনে কোন এক অজানা সংকেত বাজছিলো কয়েকদিন ধরেই। তাকে যেন কে বলছিলো তার ইযদী কোন বিপদের মুখে পড়তে যাচ্ছে। ভালোয় ভালো সে ফিরতে

পারবে না। তার এই শংকা একেবারে অবান্তরও ছিলো না। শিরীর ভাড়া করা সেই চার খুনী জানতে পেরেছিলো ইয়াযদগিরদ সিবাত যাচ্ছে। শাহীমহলে তার নিযুক্ত গুপ্তচর ছিলো। শিরীকে সেই এ খবর পৌছে দিয়ে যায়।

ভোর হতেই চার খুনী ঘোড়ায় চড়ে বসলো। সিবাতের রাস্তায় তারা এমন একটি জায়গায় উৎপেতে রইলো যেখান থেকে ইয়াযদগিরদকে তীর মেরে খুব দ্রুত পালাতে পারে। সেটি ছিলো একটি ঘন ঝোপবিশিষ্ট টিলা। ঘন ঝাড় আর পাহাড় সমান উঁচু গাছে টিলাটি প্রকৃতির মধ্যে প্রায় লুকানো ছিলো। টিলার আচলের কাছে ছিলো একটি ছোট ঝিলের মতো ঝর্ণাধারা। সিবাত যাওয়ার রাস্তাটি ছিলো ঝর্ণার প্রায় কোণাকুনি অবস্থানে। টিলার পিছনে সামান্য ব্যবধানে একটি পাহাড় ছিলো। টিলা ও পাহাড়ের মাঝখানটি দেখাতো গিরিপথের মতো, আড়াআড়িভাবে তিন চারটি ঘোড়া সেখান দিয়ে অনায়াসেই অতিক্রম করতে পারতো।

চার গুপ্তঘাতক ঘোড়া চারটি টিলার পেছনে লুকিয়ে রেখে উৎপেতে রইলো, পেতে থাকার জন্য জায়গাটি ছিলো চমৎকার। সেখান থেকে তারা সামনের সবকিছুই দেখতে পাচ্ছিলো কিন্তু তাদের সামনের রাস্তায় যাতায়াতকারী কেউ তাদেরকে দেখবে তো দূরের কথা এখানে কারো উপস্থিতি আছে তাই বিশ্বাস করা কঠিন ছিলো। ঘাতকদলের সরদার তাদেরকে আগেই বলে রাখে, ইয়াযদগিরদ তীরের আওতায় এসে গেলে সঙ্গে সঙ্গে পরপর দুটি তীরের আঘাতে তাকে এ ফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে। ধনুক থেকে তীর ছুটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই টিলার পিছনে হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত চলে আসবে, তারপর ঘোড়া চড়ে গিরিপথ দিয়ে ছুট দেবে। ইয়াযদগিরদ যখন তীর দ্বারা আক্রান্ত হবে তখন তার রক্ষীবাহিনী ও সঙ্গী-সাথীরা প্রথমে স্তম্ভিত, পরে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। আর সবার মনোযোগ থাকবে ইয়াযদগিরদের দিকে। আতায়ীকে ধাওয়া করার কথা তাদের তখনই মনে পড়বে না। এই সুযোগে তোমরা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবে।

এই চারজন ইয়াযদগিরদের অনেক আগেই তাদের গুপ্তস্থানে পৌছে গিয়েছিল। ইয়াযদগিরদের জন্য তাই তাদের দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। ওরা যখন অপেক্ষায় অপেক্ষায় অস্থির হয়ে গিয়েছিলো তখনই তারা তাদের শিকারকে আসতে দেখলো। ইয়াযদগিরদের কাফেলা ঝর্ণার ধারে পৌছলে ইয়াযদগিরদ হুকুম দিলো, কেউ পানি পান করতে চাইলে এখান থেকেই যেন পান করে নেয়। সওয়ারীদেরও পানি পান করিয়ে নিতে পারবে। মনে হয় এই ঝর্ণার পানি বড় শীতল মিষ্টি হবে।

কাফেলার সবাই সওয়ারী থেকে নেমে পড়লো।

❖ ❖ ❖

ইয়াযদগিরদের মা নাওরীন ছেলের চিন্তায় মাদায়েনে ছটফট করছিলো। তার মনে হচ্ছিলো তার কলিজার একটা তপ্ত অংশ কে যেন কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলছে। ইয়াযদগিরদ সিবাত রওয়ানা হওয়ার পর থেকে নাওরীনকে যেন সন্ন্যাস রোগে পেলো, কয়েক বেলা একাধারে খেলো না, ঘুমালো না, এমনকি কয়েক দণ্ডের জন্য কোথাও স্থির হয়ে বসলোও না, পরিচারিকারা এসে কত সান্ত্বনা দিলো । কতো প্রবোধের কথা

শোনালো। অবশেষে তারা হাল ছেড়ে দিয়ে দু'তিনজন জেনারেলের স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে এলো, তারাও নানান কথায় সান্ত্বনা দিলো, কিন্তু ছেলে হারানোর চিন্তায় বিভোর এক মার হৃদয়ে এসব কিছুই স্পর্শ করলো না।

সেই একা-এতীম ছেলে– যার জন্য তার মা চিন্তায় অস্থিরতায় বেহাল হয়ে যাচ্ছিলো। সে ছেলেটিই তখন দুই তীরন্দাযের সহজ নিশানা বনে গিয়েছিলো। কাফেলার সবাই ঘোড়া থেকে নেমে পড়লে ইয়াযদগিরদও ঘোড়া থেকে নেমে ঝর্ণার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। স্বচ্ছ টলটলে পানির মৃদু প্রবাহের মধ্য থেকে ঝিলের তলার চিকচিকে পাথরকুচি বালির ভেতরের উর্ধ্বমুখী পানির বুদবুদ দৃশ্য ইয়াযদগিরদের চোখে মুখে মুগ্ধতার ছোঁয়া লাগিয়ে দিলো।

তীরন্দাযরা ধনুকে তীর ভরে নিক্ষেপের জন্য ধনুকের ছিলা টেনে ধরলো। সে সময় ইয়াযদগিরদ আবারও প্রকৃতির এই মনোলোভা শোভার মধ্যে হারিয়ে গেলো। তাকে একথা বলে দেয়ার মতো কেউ ছিলো না যে, এই মুগ্ধতা-নৈসর্গিক শোভার মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার আরেক অর্থ জীবন থেকেও হারিয়ে যাওয়া। এই বলে কেউ সাবধান করে দেয়ারও ছিলো না যে, তোমার জীবনের আর মাত্র দু' একটি মুহূর্তই অবশিষ্ট আছে।

তখনই ঘটলো ঘটনাটি। হঠাৎ তীর নিক্ষেপের সরসর আওয়াজ ভেসে এলো। ধনুক থেকে তীর ছুটে এলো। কিন্তু সেই তীরের লক্ষ্য ইয়াযদগিরদ ছিলো না বরং সেই দুই তীরন্দাযের এক তীরন্দায এর লক্ষ্যস্থল ছিলো। তীরন্দাযটি ইয়াযদগিরদকে তার তীরের আওতায় এনে যখন তীর ছুঁড়তে যাবে তখনই ইয়াদগিরদ কি মনে সেখান থেকে সরে গেলো। ছুটে আসা তীরটি এই তীরান্দাযেরই বাহুভেদ করে তার শাহরগের অনেকখানি নিয়ে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে আচমকা থেমে গেলো। তীরন্দাযের গলা থেকে মরণ চিৎকার বেরিয়ে এলো এবং তার তীরধনুক হাত থেকে পড়ে গেলো। পর মূহূর্তে তীরন্দাযটিও তার পতিত তীরধনুকের পাশে ধপাস করে পড়ে গেলো। তার সঙ্গীটি অবস্থা বেগতিক দেখে দৌড়ে পালানোর পথে নেমে গেলো, আর অন্য দুই সঙ্গী ছিলো পাহাড়ের নিচে আত্মগোপন করে। তারা পায়ের আওয়াজ শুনে ভাবলো তাদের সঙ্গীরা ভালোয় ভালোয় কাজ শেষে করে এগিয়ে আসছে। এখন আর দেরী করা ঠিক নয়। তারা লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা পেছনের পাহাড় অতিক্রম করে নিরাপদে চলে গেলো।

ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতেই ইয়াযদগিরদ ও তার কাফেলার সকলের কান খাড়া হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা গোড়ার খুরধ্বনি দূরে মিলিয়ে যেতে শুনলো। তৃতীয় সওয়ারটিও ততক্ষণে পালিয়ে গেলো। চতুর্থজন শুধু তীরবিদ্ধ হয়ে টিলার ওপর পড়ে রইলো।

টিলার ওপর দিয়ে দুজন লোক একমানুষ সমান উঁচু ঘাস ও ঝোপ ঝাড়ের মধ্য দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তীরন্দাযের কাছে গিয়ে পৌছলো। আততায়ী তীরন্দাযটি তখনও ছটফট করছিলো। তার শাহরগ থেকে ফোয়ারার মতো রক্ত ছিটকে পড়ছিলো চার দিকে।

লোক দুটি ছটফট করতে থাকা তীরন্দাযটির পা ধরে হেচড়ে ঝর্ণার উঁচু পাড়ের দিকে নিয়ে গেলো। তারপর টিলার নিচের দিকে গড়িয়ে দিলো। তীরন্দাযটি গড়াতে গড়াতে ঝর্ণার ঢালু প্রান্তের একেবারে শেষদিকে সমতল জমিনে গিয়ে ইয়াযদগিরদকে ঘিরে সৃষ্ট জটলার কাছে পড়লো। ইয়াযদগিরদসহ কাফেলার সবাই টিলার ওপরের দিকে তাকালো। সেখানে দু'জন লোক দাঁড়ানো ছিলো। দু'জনেই নিচে নেমে এলো এবং ইয়াযদ গিরদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

ঃ 'সারান'? – ইয়াযদগিরদ তাদের একজনকে চিনতে পেরে বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করলো- 'আপনি এখানে কি ভাব?...... এসব কি? কে এই লোক'?

সারান নাওরীনকে অনেক কষ্টে। ভালো মন্দ অনেক কিছু বুঝিয়ে ইয়াযদগিরদকে তার মার নিরাপদ কোল থেকে মাদায়েনের মসনদে বসিয়েছিলো। নাওরীন কোনমতেই রাজী হচ্ছিলো না। কিন্তু প্রার্থী যে ছিলো সারান! সারানের রক্ত যে ইয়াযদ গিরদের শরীরে বইছে। নাওরীন সেটা ভুলে যায়নি। শেষ পর্যন্ত সে আর সারানকে ফেরাতে পারেনি। কিন্তু সারানকে একটি কঠিন শর্ত মেনে নিতে হয়েছিলো, সেটা হলো ইয়াযদগিরদের নিরাপত্তার সব দায়িত্ব সারানকেই বহন করতে হবে। সারান এটা শুধু দায়িত্ববোধেই নয়। তার রক্তের দাবীতেও তা যথাযথ পালন করে যাচ্ছিলো।

সেই সারানকেই এখন ইয়াযদগিরদ একটি লোকের সঙ্গে মাদায়েন থেকে বহু ক্রোশ দূরের এক ঝর্ণার ধারে দেখছিলো। আর দেখছিলো টিলা থেকে গড়িয়ে পড়া তীরবিদ্ধ এক আততায়ীকে। সারান ইয়াযদগিরদকে জটলার মধ্য থেকে আড়ালে নিয়ে গেলো। পারস্য সম্রাটের সামনে তো লোকেরা সিজদায় নুয়ে পড়তো। কিন্তু পারস্যের এই সম্রাট সারানের পিছু পিছু এমনভাবে গেলো যেন সে কোন প্রজা।

ঃ 'তোমার হয়তো মনে আছে ইয়াযদগিরদ!' সারান বললো– 'তোমার মার কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তোমার ছেলের নিরাপত্তার ভার আমার হাতে থাকবে। তুমি সিবাতে রওয়ানার সময় কারো মাধ্যমে আমার কানে পৌছলো চার ঘোড় সওয়ার তোমাদের শহর ছাড়ার আগেই শহর থেকে বের হয়েছে। যে এই সংবাদ দিয়েছে সে এদের ব্যাপারে সন্দেহ করছিলো, সে একথাও বলেছিলো সেই চার ঘোড় সওয়ারের সঙ্গে তীর তুনীরও রয়েছে .......

'সন্দেহ আমারও হয়েছিলো। আমি আমার বিশ্বস্ত এক লোক নিলাম। একটি তীর আরেকটি তুনীর নিয়ে চার ঘোড় সওয়ারের সঙ্গে বেশ দূরত্ব রেখে তাদের পেছনে বেরিয়ে পড়লাম। এই ঝর্ণনার ধারে এসে ওরা পাহাড়ের ভেতর চলে গেলো। আমি বুঝে গেলাম এদের কোন ভয়ংকর ইচ্ছে আছে। গোড়াগুলো ওরা নিচে ছেড়ে ওপরে উঠে গেলো। আমরা দু'জন তাদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে ছিলাম। আমাদের ঘোড়া দুটি অনেক দূরের এক ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ফেললামা তারপর লুকিয়ে ছাপিয়ে টিলার ওপর চড়ে হামাগুড়ি দিয়ে ওদের কাছাকাছি চলে গেলাম। ......... ঐযে ওপরে দেখো। আমাদের লুকানোর জায়গাটি কি চমৎকার ছিলো ........'

'নিশ্চিত করে জানতাম না এরা কি করতে যাচ্ছে। তবে সন্দেহ ছিলো এরা হয়তো তোমাদের ওপরেই আক্রমণ করবে। আরেকটা সন্দেহ ছিলো। তোমাদের সঙ্গে যেসব জেনারেলরা এসেছে তাদের কাউকে হয়তো এরা হত্যা করতে এসেছে। ........... তোমরাও এসে গেলে। তোমার দেহরক্ষীবাহিনী তোমাকে ঠিকই ঘিরে রেখেছিলো। কিন্তু ওপর থেকে তোমাকে সহজেই তীরের নিশানা বানানো যেতো। তুমি যখন ঝর্ণার ধারে এখানটায় এসে দাঁড়ালে তখন দুই তীরন্দায তুনীর তীর ভরে তোমাকে নিশানা বানাতে লাগলো। আমাদের কাছে একটাই তীর ছিলো। তা দিয়ে একজনকে তো আমরা ঘায়েল করতে পারতাম। কিন্তু আশংকা ছিলো একজনকে আমরা তীরবিদ্ধ করলে আরেকজন তোমার ওপর তীর চালাবে। একজনের গর্দান যখন আমাদের তীরে হেলে পড়লো দ্বিতীয়জন তখন পালানোটাই শ্রেয় মনে করলো।'

ঃ 'এরা কারা ছিলো'? – ইয়াযদগিরদ জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'যে কেউ হোক'- সারান বললো– 'আমি তাদেরকে চিনি। তুমি চুপ থেকো। ওদেরকে শাস্তি দেয়া আমার কাজ। তুমি ঘোষণা করে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিলে তোমার শত্রুর সংখ্যা বেড়ে যাবে। এতটুকু নিশ্চয়তা তোমাকে দিচ্ছি, মহলের মধ্যে তোমার কোন দুশমন নেই।

ঃ 'এর কিছু না কিছু তো আমার জানা উচিত। আমার শত্রু সম্পর্কে তো আমার অজানা থাকা উচিত নয়' – ইয়াযদগিরদ বললো।

ঃ 'আমি তো জানি' সারান বললো– 'তোমার সালতানাতের নেতৃস্থানীরা জানেন। ইয়াযদগিরদ তুমি শাহেনশাহ। আমি তোমার প্রজাসাধারণের একজন। কিন্তু তোমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছি যেন তুমি সাধারণ কোন প্রজার পরিবারের একটি বাচ্চা ছেলে। কারণ হলো তোমাকে আমি ও আমার মতো কিছু লোক মাদায়েনের সিংহাসনে বসিয়েছে। তোমাকে শাহেনশাহ বানানো আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো না। জেনারেলদের পারস্পরিক কোন্দল এবং সিংহাসনকে ঘিরে যে খুন খারাবির অবাধ ধারা চলছিলো তা বন্ধ করাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো।'

ঃ 'আমি আপনাদের উদ্দেশ্য বুঝি মহামান্য সারান! ইয়াযদগিরদ বললো- 'আমার মা আমাকে বলেছেন, সিংহাসনে আপনিই আমাকে বসিয়েছেন। কিন্তু বাদশাহ আমি আপনাকেই মনে করি। আপনি আমার আত্মার জনক। পারস্য থেকে মুসলমানদেরকে চিরতরে বিতাড়িত করা ও আরবকে সালতানাতে ফারেসের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যই আপনি আমাকে সিংহাসনে বসিয়েছেন।'

ঃ 'আর একাজ তোমার একার নয়' – সারান বললো– 'একাজ জেনারেলরা করবে। তোমার শুধু হুকুম চলবে। এটা জিজ্ঞেস করোনা যে, তোমাকে হত্যা করতে যারা গিয়েছিলো তারা কারা। আর খেয়াল রেখো এই ঘটনা যেন তোমার মা না জানেন। তুমিও তাকে বলতে যেয়ো না। না হয় তিনি তোমার পায়ের শিকল বনে যাবেন।'

❖ ❖ ❖

ইয়াযদগিরদ সিবাত পৌঁছলো। রুস্তম ইয়াযদগিরদকে দেখে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলো। ইয়াযদগিরদ এমন কোন সংবাদ তাকে দেয়নি যে, সে সিবাত আসছে। ইয়াযদগিরদ কোন খবর না দিয়ে আচমকা সিবাত হাজির হয়ে রুস্তম কি করছে না করছে তা দেখতে চাচ্ছিলো, রুস্তম তখন তার জেনারেল জালিয়ুনুসকে চল্লিশ হাজার ফৌজ দিয়ে সিবাত থেকে বিভিন্ন এলাকা মুসলমানদের দখল থেকে রক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে ছিলো।

ইয়াযদগিরদ যুদ্ধের প্রস্তুতি-কৌশল ইত্যাদি আরো কার্যকরী করার জন্য রুস্তম ও তার অধীনস্থ জেনারেলদের এবং অফিসারদের ডেকে পাঠালো।

ঃ 'আমি তো খুবই আশ্চর্য হচ্ছি যে, তোমরা মুসলমানদেরকে এত ভয় পাও কেন?' –ইয়াযদগিরদ বললো – 'আমি ঐ আরবদের প্রথমবারই দেখেছি, ওদের প্রতিনিধি দল আমার দরবারে এসেছিলো। বলেছিলো আমরা আমাদের স্ব-স্ব গোত্রের সরদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ। তারা আমাকে বললো, হয় মুসলমান হও না হয় কর আদায় করো। যদি এর কোনটাই পছন্দ না হয় তবে এই তরবারি আমাদের মধ্যে ফয়সালা করবে ...........

'আমার দৃষ্টিতে এই মুসলিম জাতি নেহায়েতই এক নিম্নমানের জাতি। তাদেরকে আমি বলেছিলাম তোমরা হতদরিদ্র অভুক্ত এক জাতি। তোমাদেরকে আমি খাবার সরবরাহ করবো, এমন এক বাদশাহ তোমাদের জন্য পাঠাবো, যে তোমাদের সঙ্গে কোমল আচরণ করবে.........তারপর মাটি ভরতি একটা টুকরি আনতে বললাম। হুকুম দিলাম এদের মধ্যে যে নিজেকে সবচেয়ে সম্মানিত লোক মনে করে তার মাথায় এই টুকরিটি রেখে এদের সব গুলোকে মাদায়েন থেকে গরুর মতো হাঁকিয়ে বের করে দাও'............

'আমি খুবই আশ্চর্য হলাম। এদের একজন সামনে এসে বললো আমি সবচেয়ে সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত। টুকরিটি আমার মাথায় রেখে দাও। আমি ভেবেছিলাম এরা রেগে যাবে বা দরবার থেকে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু আহমক আর কাকে বলবো। এদের একজন টুকরি মাথায় নিয়ে সকলকে সঙ্গে করে বেরিয়ে গেলো, সম্মান আর ব্যক্তিত্ববোধ কাকে বলে এর অনুভূতিটাই তো এই মুসলমানদের মধ্যে নেই।'

ঃ 'শাহে ফারেস!'– রুস্তম ঘাবড়ে যাওয়া গলায় বললো,– 'লোকটি কি মাটি ভরতি টুকরিটা তার সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ছিলো?'

ঃ 'সঙ্গে করেই তো নিয়ে গেলো?' – ইয়াযদগিরদ বললো– 'যে লোক ওদেরকে শহর থেকে বের করে দেয়ার জন্য গিয়েছিলো সে ফিরে এ বললো– যে টুকরি স্বেচ্ছায় নিজ মাথায় নিয়ে ছিলো সে শহর থেকে বের হয়েও টুকরিটা ফেলে দেয়নি, বরং নিজ ঘোড়ার ওপর তার সামনে যত্ন করে ধরে রেখেছিলো। শেষ পর্যন্ত ওটা নিয়েই শহর থেকে বের হলো।'

ঃ 'অনেক খারাপ কাজ হলো শাহে ফারেস!' – রুস্তম কম্পিত গলায় বললো– 'এতো বড়ই অশুভ ব্যাপার হলো। আপনি তো আপনার নিজ দেশের মাটি তার মাথায় তুলে দিয়েছেন!'

ঃ 'এতে সমস্যাটা কি হলো?' – ইয়াযদগিরদ বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'এর জবাব গণক ও জ্যোতিষবিদ্যায় রয়েছে'– রুস্তম বললো– 'আপনি আপনারই মাতৃভূমির এক টুকরো মাটি তার মাথায় তুলে দিলেন। এতে এই ইংগিতই দিয়েছেন যে, পারস্যের এই জমিন তোমাদের ....... শাহে ফারেস! মুসলমানরা যদি সেই মাটির টুকরি ফেলে দিয়ে না থাকে এবং তাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে থাকে তবে পারস্য থেকে বিতাড়িত হওয়ার প্রস্তুতি নিন।'

ওদিকে আসেম বিন আমরকে যেন কৌতুকে পেয়েছিলো। তিনি হাসতে হাসতে তার মাথায় রাখা মাটির টুকরিটি সিপাহসালার সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এর সামনে রেখে বলেছিলেন– মোবারক হো। পারস্যের সম্রাট তার দেশের মাটি নিজেই আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন!

সাদ (রাঃ) খলীফা উমর (রাঃ) এর কাছে পত্র পাঠালেন যে, পারস্য সম্রাট আমাদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এতই আপমানজনক আচরণ করেছে যে, মাটির একটি টুকরি আসেম বিন আমরের মাথায় রেখে সবাইকে মাদায়েন থেকে বের করে দিয়েছে।

মদীনা থেকে খলীফা উমর (রাঃ) এর জবাব এসে গেলো। পত্রে আমীরুল মুমিন সাদ (রাঃ)কে অনেক নির্দেশাবলি লিখে পাঠালেন। লিখলেন যে, তোমরা কাদিসিয়া চলে যাও। কাদিসিয়াকে ঘিরে আশেপাশে পুরো এলাকার মানচিত্র আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। যাতে আমি জরুরী নির্দেশাবলি পাঠাতে পারি। তিনি আরো লিখলেন, বিভিন্ন এলাকা থেকে যে রসদ সংগ্রহ করছিলে তা অব্যাহত রাখো এবং লশকরের প্রয়োজনাদি সেখান থেকে পূরণ করো।

ওদিকে সিবাতে পারস্য সেনাবাহিনীর শিবির।

ঃ 'শাহে ফারেস!' -রুস্তম ইয়াযদগিরদকে বললো– 'আপনি মাদায়েন ফিরে যান এবং আমার ওপর নিশ্চিন্তে ভরসা রাখুন।'

ঃ 'রুস্তম' – ইয়াযদগিরদ বললো– 'তোমার ওপর ভরসা থাকলে তো আমার এখানে আসার প্রয়োজন পড়তো না।'

ইয়াযদগিরদের এই কথা রুস্তমের শরীরে যেন আগুন লাগিয়ে দিলো। তার চেহারা রক্তবর্ণ ধারণ করলো। চোখ আগুনের মতো লাল হয়ে উঠলো।

ঃ 'আপনি মাদায়েন চলে যান শাহেন শাহে ফারেস!' – রুস্তম রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললো- 'আপনার পিতা কিসরা পারভেজও কখনো একথা বলেন নি যে, আমার প্রতি তার ভরসা নেই। ... আপনি চলে যান। আর যুদ্ধ বিষয়ক সব কিছু আমার ওপর ছেড়ে দিন। এমনও হতে পারে আমি বিনা লড়াইতেই আরবদের পারস্য থেকে বের করে দিবো'।

ঃ 'না রুস্তম!' – ইয়াযদগিরদ বললো– 'এই মুসলমান জাতিকে আমি এমনভাবে ধ্বংস করতে চাই যে, তারা যদি দ্বিতীয়বার কখনো পারস্যের দিকে চোখ তুলে তাকায় তবে তাদের মধ্যে যেন ধ্বংসের কম্পন শুরু হয়ে যায়। আমি বুঝতে পারছি না বিনা লড়াইয়ে তুমি ওদেরকে কি করে পারস্য থেকে তাড়াবে?'

ঃ 'শাহেন শাহে ফারেস! একটু মনদিয়ে আমার কথাগুলো শুনুন'- রুস্তম গম্ভীর গলায় বললো– 'আমি যা জানি আপনি তা জানেন না, এটা ভুলে যাবেন না।যে, আপনি এখনো প্রায় বাচ্চাই রয়ে গেছেন। আপনার কাছে আবেগ আছে অভিজ্ঞতা নেই। আমার কাজে আপনি হস্তক্ষেপ করবেন না। ... আপনি আরবদের ধ্বংস করতে চান কিন্তু আমি আমার ফৌজকে ধ্বংস থেকে বাঁচাতে চাই। এটা ভাববেন না যে, ওরা সংখ্যায় অতি স্বল্প বলে ওদের চিড়ে ফেড়ে শেষ করে দেবেন। এটা ভেবেও আত্ম প্রমাদে ভুগবেন না যে, ওরা আমাদের হাতি দেখে ভয় পেয়ে যাবে। আগের দুটি লড়াইয়ে তারা হাতির শুঁড় কেটে দিয়েছিলো। ... আমি বলছি এ বিষয়টি আমার ওপর ছেড়ে দিন এবং আপনি এখান থেকে চলে যান।'

ইয়াযদগিরদ চলে গেলো।

ইয়াযদগিরদ চলে যাওয়ার পর রুস্তম দূত মাধ্যমে ঐসব জেনারেল ও অফিসারদের কাছে পয়গাম পাঠালো যারা নিজেদের অধীনস্থ সৈন্যদের নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় দখল নেয়া মুসলমানদের বিতাড়নের জন্য গিয়েছিলো। পয়গামে লিখা হলো– মুসলমানদেরকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে সিবাতে আসো। আর তোমাদের জোয়ানদের মধ্যে এমন দেশপ্রেম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন আক্রোশ জাগিয়ে তোল মুসলমানদেরকে দেখলেই যেন তারা হিংস্র জানোয়ার বনে যায়।

সে সময় মুসলমান ফৌজের অধিকাংশই নাজাফ, ফারায এবং ইয়াফের কয়েকটি স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো।

কয়েকদিন পর ইয়াযদগিরদ মাদায়েন পৌঁছলো। ইয়াযদগিরদের মা তার ছেলের ফিরে আসার সংবাদ পেয়ে দৌড়ে শহরের রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। ইয়াযদগিরদ মাকে এভাবে দৌড়ে আসতে দেখে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো। মা দৌড়ে এসে ছেলেকে জড়িয়ে ধরলো । তাকে কেউ বললো না তার ছেলে মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এসেছে।

ইয়াযদগিরদ মহলে পৌঁছেই সারানকে ডেকে পাঠালো। সারান আগ থেকেই মহলে এসে তার জন্য অপেক্ষা করছিলো। ইয়াযদগিরদকে তার একটি সংবাদ পৌঁছানোর ছিলো।

ঃ 'আপনি কি আমায় বলবেন না আমার দুশমন কে?' – ইয়াযদগিরদ সারানকে জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'ওদের ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে– সারান বললো– 'সে ছিলো এই সিংহাসনের শেষ শত্রু ........ এবং সে কোন পুরুষ নয় মহিলা।'

ঃ 'শিরী?'

ঃ 'হ্যাঁ - শিরী-' সারান বললো- 'সেখান থেকে তুমি সিবাত চলে যাওয়ার পর আমি একটি ফাঁদ তৈরী করি। আমার এক বন্ধুর ফাঁদে ওরা পা দিয়ে ধরা পড়ে। তারা সব স্বীকার করেছে। মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে শিরী ওদেরকে তোমাকে হত্যার জন্য পাঠিয়ে ছিলো। তারপর ওদের কাছ থেকে শিরীর ঠিকানা জোগার করা হয়। শিরীর

ওখানে গিয়ে আমি দুই লোক দ্বারা ওকে হত্যা করি, তারপর বাকী তিনজনের ব্যবস্থা করা হয়। সবার লাশই গায়েব করে দেয়া হয়েছে। .... তোমার আর কোন প্রকাশ্য দুশমন জীবিত রইলো না ইয়াযদগিরদ!'

সারানের ব্যক্তিত্বে প্রবল তীক্ষ্নতা ছিলো এবং শাহী মহলে ছিলো তার যথেষ্ট প্রভাব। এজন্য পালিয়ে আসা সেই তিনজনকে কোন ধোঁকায় ফেলা তার জন্য কঠিন কিছু ছিলো না। তাদেরকে পাকড়াও করে সব কথা জানার পর সারান শিরীর ঠিকানাও উদ্ধার করে।

ঠিকানা খুঁজে খুঁজে সারান শিরীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়। শিরী সারানকে দেখার পর তার চেহারা নিমিষেই কালো হয়ে যায়।

ঃ 'আমাকে দেখে তোমার এত পেরেশান হওয়া উচিত নয় শিরী!' – সারান বিদ্রূপের সুরে বলেছিলো- সম্ভবত আমি তোমার কাছে অপরিচিত কেউ নই।'

ঃ 'পেরেশান এজন্য হচ্ছি যে, আমার ঘরের হদিস তোমায় কে দিলো?' – শিরী বলেছিলো- 'ঠিকই বলেছো। তুমি আমার জন্য অপরিচিত কেউ নও। তোমার ব্যাপার ছিলো নাওরীনের সঙ্গে। কিসরা পারভেজের তুমি ছিলে ঘনিষ্ঠদের একজন।----- তাই..... কিন্তু এখানে কেন?

ঃ 'শিরী'! – সারান গলায় রহস্যভরে বললো– 'ইয়াযদগিরদকে হত্যা করাতে চেয়েছিলে তো আমাকে কেন বললে না। তুমি যাদের ওপর নির্ভর করেছিলে ওদের পরিণাম তো দেখেছো। একজন তো সেখানেই ইয়াযদগিরদের এক দেহরক্ষীর তীরের নিশানা বনে গিয়ে মারা যায়। আর অন্য তিনজন পালিয়ে যায়।'

ঃ 'সারান!' – শিরী বিস্মিত কণ্ঠে বলেছিলো, 'কে বলেছে তোমাকে এসব যে, আমি ওদেরকে ইয়াযদগিরদের হত্যার জন্য পাঠিয়ে ছিলাম।'

ঃ 'ঐতিনজন তোমার সব কিছু ফাঁস করে দিয়েছে' – সারান বলেছিলো- 'ওরা তো ইয়াযদগিরদকেও এসব বলবে। তারপর তোমার কি অবস্থা হবে তা কি জানো?

ঃ 'আচ্ছা তুমি এখানে এসেছো কেন?-শিরী বলেছিলো– আমাকে হুমকি দিয়ে কিছু আদায় করতে চাচ্ছো?'

ঃ 'তোমার সঙ্গে আমি একটি চুক্তি করতে এসেছি'– 'সারান বলেছিলো- 'ইয়াযদ গিরদকে আমিই হত্যা করবো, এর বিনিময় কি দিবে আমাকে?'

শিরীর মুখে বিদ্রূপের হাসি ছড়িয়ে পড়লো। সারান জানতো শিরীর মতো এমন চতুর ধুরন্ধর মহিলা খুব কমই আছে। ফেরআউনের মতো একক শক্তির অধিকারী কিসরা পারভেজকে এই মহিলাই অতি কৌশলে তার হাতের মুঠোয় পুরে নিয়ে ছিলো। যখন সুযোগ পেলো তখন তার সতীনের একে একে আঠারোজন পুত্রকে হত্যা করালো। তারপর প্রিয়তম স্বামী খসরু পারভেজকেও হত্যা করালো। রূপের জাদু আর চতুর কৌশলে সব জেনারেলকে সে হাত করে নিলো।

ঃ 'ইয়াযদগিরদকে হত্যা করে আমার লাভ কি?' শিরী বলেছিলো- 'আমার একটি মাত্র ছেলে ছিলো, ওকে হত্যা করা হয়েছে.......তুমি তো জানো....... আমি কোন মায়ের একমাত্র সন্তানকে হত্যা করে তার বুক খালি করতে পারবো না। তুমি চলে যাও সারান! আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলো না। বাকী জীবনটা একটু শান্তিতে কাটিয়ে যেতে দাও।'

সারান অনেক চেষ্টা করেও শিরীর মনের কথা নিতে পারলো না। শিরী বরাবরই অস্বীকার করে গেলো। শেষমেষ সারান শিরীর গুপ্তধনের হদিস করতে উঠে পড়ে লাগলো। সারান বুঝে নিয়ে ছিলো, শিরীর কাছে এত সম্পদ লুকানো আছে যা শাহী ধন-ভান্ডারেও নেই। কিন্তু শিরী তাকে আর সুযোগ দিলো না। হঠাৎ তার হাতে তালি বাজলো, ওমনিই ঘরের ভেতরের দরজা খুলে খোলা তরবারি হাতে দু'জন কামরায় এসে ঢুকলো।

ঃ 'আমার আফসোস হচ্ছে সারান!' শিরী বলেছিলো- 'এখন তুমি আর নাওরীনের কাছে জীবিত ফিরতে পারবে না' – শিরীর ঠোঁটে বিজয়ীর হাসি খেলে গিয়েছিলো- 'তুমি তো নাওরীনের লোক। আহা কি যে আফসোস হচ্ছে!– শিরী তলোয়ারধারী লোক দুটিকে ইংগিত্ করলো এবং হাসতে হাসতে বললো– 'একে গায়েব করে দাও।'

লোকদুটি সামনে অগ্রসর হলো। একজন সারানের ডানবাহু আরেকজন সারানের বামবাহু শক্ত করে ধরলো। সারান অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। সারানের এই হাসিতে কি এক অশুভ ইংগিত যেন বহন করছিলো, হাসি থামার আগেই কামরায় আরো চার লোক হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো। ওদের দুজনের কাছে তীর-তারবারি আর দুজনের কাছে দুটি বর্শা ছিলো। ওরা তরবারি আর বর্শা উচিয়ে শিরীর লোক দুটিকে ঘিরে ফেললো। এই চারজন সারানের সঙ্গেই এসেছিলো। লুকিয়ে ছিলো বাইরে। সারানের অট্টহাসির আওয়াজ শুনেই ওরা ভেতরে ঢুকে। ওদেরকে এমনই বলা ছিলো।

শিরীর শাহী কামরা থেকে কয়েকটি চিৎকার ভেসে এলো। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেলো। কামরায় তখন গড়াচ্ছিলো শিরী ও তার লোক দুটির নিথর দেহ। সারান ও তার লোকেরা ঘরময় অনেক খুঁজে একটি বড় ধরনের ট্রাংক পেলো। ঢালা খোলার পর দেখা গেলো ট্র্যাংকের ওপরে রুপার অনেকগুলো চাক এবং নিচে হীরা জহরতের হাজার রকমের অংলকার। কাঠের একটি বাক্সও পাওয়া গেলো। এতে মূল্যবান অনেক কিছুই পাওয়া গেলো। সারান বাক্সটি উপুড় করে ফেলে দিলো। তখন বাক্সের নিচ থেকে একটি ভাজকরা কাগজ বেরিয়ে এলো, সারানের বুঝতে দেরী হলো না যে, এতে শিরীর গুপ্ত ধনভান্ডারের নকশা রয়েছে। নকশায় কয়েকটি জায়গার নাম লেখা ছিলো এবং সেই জায়গাগুলোতে পৌঁছার পথও নকশায় নির্দেশ করা ছিলো।

সারান নকশাটি ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিলো। রাতের মধ্যে শিরীর বাড়ির আঙ্গিনায় গর্ত করে শিরী ও তার দুই দেহরক্ষীর লাশ লুকিয়ে ফেলা হলো। তারপর সারান তার লোকদের একজনকে বললো সে যেন তার স্ত্রী-সন্তানকে শিরীর এই বাড়িতে নিয়ে আসে এবং এখানেই স্থায়ী হয়ে যায়।

❖ ❖ ❖

রুস্তম একদিন সিবাত থেকে কোচ করলো। তার গন্তব্য ছিলো কাদিসিয়া। তার সঙ্গে ছিলো এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্যের বিশাল বহর। এতে পদাতিক বাহিনীর চেয়ে ঘোড় সাওয়ারই বেশি ছিলো। আরো ছিলো সাত ত্রিশটি যুদ্ধাংদেহী ভয়ংকর দর্শন বিশালাকায় হাতির পাল।

রুস্তম নাজাফ পৌঁছে হুকুম দিলো এখানে কয়েকদিনের জন্য তাঁবু ফেলা হোক। নাজাফের আশে পাশে মুসলমানরা বিভিন্ন বসতি থেকে রসদ ইত্যাদি সংগ্রহ করছিলো। এসব এলাকার লোকেরা যখন জানতে পারলো রুস্তম নাজাফ পৌঁছেছে তখন এক বিরাট দল রুস্তমের কাছে এসে হাজির হলো। তারা নালিশ করলো, মুসলমানরা তাদের সবকিছু লুটে পুটে নিচ্ছে।

ঃ 'তারা কি তোমাদের নারীদেরও নিয়ে গেছে?' – রুস্তম জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'না' – জবাব এলো– 'নারীদের প্রতি ওরা চোখ তুলে পর্যন্ত তাকায় না। ওরা তরিতরকারিও গৃহপালিত পশু নিয়ে যায়।'

ঃ 'বড় বড় আমীর উমারার ঘর থেকে মূল্যবান জিনিসপত্রও নিয়ে যায়'- আরেকজন বললো- 'জায়গীরদারদের ঘর থেকে সোনারুপা আর হীরার অলংকার উঠিয়ে নিয়ে যায়।'

ঃ 'ভুখা-নাঙ্গা বদবখতের দল ওরা'-রুস্তম বললো- 'ভিক্ষুক কাপুরুষ ওরা। আরব থেকে তো ওরা লুটপাটের জন্যই এসেছে। তবে এসেছে ফৌজের বেশে। কিন্তু সঙ্গে খাবার নেই পানীয়ও নেই। একেবারে ফকীর। লুট পাট করেই পেট ভরায় ওরা। এই ভিক্ষুকরা কি আমাদের ফৌজের সামনে দাঁড়াতে পারবে? এই ক্ষুধার্ত ভেড়া বকরীদের আমাদের তলে শুধু পিষে মারবো। তোমরা ঘরে চলে যাও।'

ঃ 'রুস্তম!'-এক লোক উঁচু আওয়াজে বললো– 'আপনি সালতানাতে ফারেসের গর্ব, আপনার তরবারির শুধু এক আঘাতই পুরো আরব খন্ড বিখন্ড হয়ে যাবে। আপনিই আমাদের রক্ষক।'

ঃ 'পারস্যের আসল শাহেন শাহ তো রুস্তমই' আরবদের পিষে ফেলো।

লোকেরা রুস্তমের বাহাদুরি নিয়ে শ্লোগান দিতে লাগলো। রুস্তমের বীরত্ব, যুদ্ধ কৌশলে তার নিপুণতা এবং রণাঙ্গনে এক বিভষীকা হিসাবে কারো কোন সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু লোকদের এই শ্লোগানে তার চেহারা আনন্দে ঝলমল হওয়ার পরিবর্তে হতাশায় ছেয়ে গেলো। সে নিজের ভবিষ্যৎবাণীতে নিজেই শংকিত ছিলো। আর মুসলমানদের ক্রমাগত সাফল্য তাকে আরো চুপসে দিয়েছিলো। সে বিস্মিত হয়ে দেখছিলো সামান্য কিছু ফৌজ নিয়ে মুসলমানরা সিরিয়ায় রোমকদের একের পর এক ময়দানে পরাজিত করছে। রোমের মতো এত বড় যুদ্ধ শক্তি তা দেখে যেন বোবা বনে গেছে। জিসিরের যুদ্ধে মুসলমানদের এমনভাবে কাটা হয়েছিলো যে, সবাই নিশ্চিত ধরে নেয় মুসলমানরা দীর্ঘ দিনের জন্য পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু চোখের পলকেই যেন মুসলমানরা সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তারপর প্রথমে ইলিয়্যাস এরপর বুয়ুবে পারসিক ফৌজকে স্রেফ খুনের সাগরে ভাসিয়ে দিলো।

রুস্তম ফরিয়াদী দলকে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় করে দিলো এবং অনেকগুলো ছোট ছোট সেনাদল বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে দিলো।

❖ ❖ ❖

রুস্তম নাজাফে আসার পর আশে পাশের এলাকায় মুসলিম ফৌজের যে দলগুলো রসদ সংগ্রহ করছিলো তারা জানতে পারলো পারসিকরা বিশাল এক বাহিনী নিয়ে নাজাফ পৌঁছেছে। যার সেনাপতি রণাঙ্গনের কিংবদন্তী রুস্তম। মুসলমানরা এলাকাগুলো ছাড়তে শুরু করলো। মুসলানরা আরো জানতে পারলো বিভিন্ন বসতির লোকেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ নিয়ে রুস্তমের কাছে যাচ্ছে। এক মুজাহিদ স্থানীয় এক কৃষককে ধরে তার কাপড় খুলে নিজে সেটা গায়ে দিয়ে রুস্তমের দলের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

সে ফিরে এসে সঙ্গীদের বললো, বন্ধুরা আমাদের এখান থেকে সরে পড়ার সময় এসেছে। রুস্তম এসব এলাকায় সৈন্য প্রেরণ করে হুকুম দিয়েছে মুসলমান পেলেই খতম করে দাও।....... এখন এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে পড়াই উত্তম। ওদের ঘেরাওয়ে যদি পড়ে যাই তাহলে আমাদের একজনও জীবিত ফিরতে পারবে না।

সেই সৈন্যটি রুস্তমের ফৌজের সংখ্যা ইত্যাদি সবকিছুই মুসলিম ফৌজকে জানালো, তখন ফৌজের সবাই বললো, হ্যা এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়াই উচিত কাজ হবে। তারা সামনে অগ্রসর হলো। কিন্তু এক মুজাহিদ সেখানেই ঠাঁই দাঁড়িয়ে রইলো। সে ছিলো তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদ।

ঃ 'কি হলো তুলাইহা?'– সে দলের কমান্ডার জিজ্ঞেস করলো– 'থেমে গেলো কেন? কি যাবে না?'

ঃ 'না 'আমি যাবো না। এখানেই থাকবো।'

ঃ কি করবে এখানে থেকে?

ঃ 'রুস্তমের তাঁবুতে নৈশ হামলা চালাবো, রুস্তমকে বুঝিয়ে দেবো যে, এর চেয়ে বেশি ফৌজ নিয়ে আসতে হবে। মুসলমান একজনই যথেষ্ট। তোমরা সবগুলো বুযদিল। এখন পালাচ্ছো।

ঃ 'আল্লাহর কসম!' – অভিজ্ঞ এক মুজাহিদ বললো '-এই ছেলের মাথায় নিশ্চিত গন্ডগোল হয়েছে। সে বলে একা একা এত বড় ফৌজের বিরুদ্ধে নৈশ হামলা চালাবে। আরে আত্মহত্যাও তো এর চেয়ে ভালো।'

ঃ 'তোমরা কেন চলে যাচ্ছো না?' তুলাইহা ঝাঁঝালো গলায় বললো– 'আমার সংকল্প আর দৃঢ়তাকে তোমরা তো নষ্ট করে দিচ্ছো।'

তুলাইহার মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়লো। এ হাসি দেখে যে কেউ বলতো তুলাইহার মাথা সত্যিই বিগড়ে গেছে। বা সে রসিকতা করছে। এক মুজাহিদ তুলাইহার কথাগুলো পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে রাজী ছিলো না। সে বিদ্রূপ করলো তুলাইহাকে।

ঃ 'আসলে তোমার মন থেকে এখনো ধান্ধাবাজী দূর হয়নি' – সেই মুজাহিদ বললো- 'উক্কাশা ইবনে মিহসানকে হত্যা করার পর তুমি না কোন দিন শান্তিতে ঘুমুতে পেরেছো আর না পারবে কোন দিন।'

তুলাইহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তার জন্য যেন বিষের জ্বালা ছিলো। রাসূলুল্লাহ (স) এর ইন্তিকালের পর যখন চারদিকে ধর্মদ্রোহী তৎপরতা শুরু হয়েছিলো, এর মধ্যে তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদও ছিলো। তুলাইহা তার গোত্রের সরদার ছিলো। গোত্রটিও ছিলো বিরাট। এজন্য তার প্রভাবও ছিলো অনেক বেশি। তার কথায় তার নিজ গোত্রের লোকেরা তো মুরতাদ হলোই, সঙ্গে সঙ্গে সে আরো কয়েকটি গোত্রকে মুরতাদ বানিয়ে নিয়ে বিরাট এক ফৌজ দাঁড় করালো।

প্রথম খলীফা আবু বকর (রাঃ) এর হুকুমে মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হলো। এর মধ্যে বুযাখা নামক একটি লড়াই বেশ প্রসিদ্ধি পেয়েছিলো। এতে হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রাঃ) এর নেতৃত্বে মুসলমানরা লড়েছিলো দারুন বীরত্বে। তুলাইহা পরাজিত হয়েছিলো চরমভাবে এবং সে গ্রেফতারও হয়েছিলো। পরে অবশ্য তুলাইহা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। এই লড়াইয়ের কয়েক দিন আগে তুলাইহা সাহাবী উক্কাশা ইবনে মিহসান (রাঃ)কে হত্যা করে। এটিও বেশ প্রসিদ্ধি পেয়েছিলো।

এই খোচাটি তুলাইহার জন্য সহ্য করার মতো ছিলো না। আর মুলমানরাও মানতে পারছিলো না তুলায়হা ভালো কোন কারণে এখানে রয়ে যেতে চাচ্ছে। কারণ সে একবার মুলমান হয়ে আবার ইসলাম ত্যাগ করেছিলো। শুধু তাই নয় সে মুরতাদদের সরদার হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে পরাজিত হয়। এর পরই সে মুসলমান হয়। সুতরাং তার ব্যাপারে সুধারণা করাটা কষ্টকরই বটে।

সে তার সঙ্গীদের সঙ্গে যেতে কোন মতেই রাজী হলো না, সঙ্গীরা সব চলে গেলো এবং সিপাহসালার সাদ (রাঃ)কে তুলাইহার ফিরে না আসার বৃত্তান্ত শোনালো।

ঃ 'আল্লাহ তাকে সোজা সরল পথ দেখান যেন' – সাদ (রাঃ) বললেন এবং খুব আফসোস করলেন।

রাত ছিলো প্রায় গভীর। রুস্তমের তাঁবুতে ছিলো কবরের নির্জনতা। পারসিকেরা মুসলমানদের গুপ্ত হামলার সম্মুখীন হয়েছিলো অনেকবার। তাই তারা রীতিমতো আংশকা করছিলো আজ রাতে নিশ্চয় মুসলমানরা নৈশ হামলা চালাবে। এজন্য রুস্তম হুকুম দিয়েছিলো পাহারাদাররা যেন সজাগ ও হুশিয়ার থাকে এবং ঘোড়াগুলো যেন এক সঙ্গে না রাখা হয়। প্রত্যেক সওয়ার তার ঘোড়া নিজের সঙ্গে রাখবে এবং ঘোড়ার কাছেই ঘুমুবে।

রাতের নিশঃব্দতা চিড়ে পারসিকদের সৈন্য শিবির থেকে সান্ত্রীদের টহলের চাপ চাপ শব্দ এবং পরস্পরের ফিস ফিসিয়ে কথা বলার আওয়াজ আসতে লাগলো। চাঁদ বিহীন রাতের অন্ধকার ক্রমেই আরো নিকষ হচ্ছিলো।

ছোট একটি ক্যাম্পের সামান্য দূরের একটি গাছের আড়াল থেকে একটি ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এলো। আস্তে আস্তে ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। জায়গাটি ঘন সবুজ উঁচু উঁচু ঘাসের জঙ্গল ছিলো। রাতের গভীর অন্ধকার যেন এই সবুজের জঙ্গল আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলো। তাই এই ছায়ামূর্তি কারো নজরে পড়ার জো ছিলো না। ছোট ছোট পায়ে সে এগুচ্ছিলো।

ছায়ামূর্তিটির দিকে দুজন সান্ত্রী এগিয়ে আসার এবং তাদের কথাবার্তার আওয়াজ শোনা গেলো। মূর্তিটি ছোট একটি চারা গাছের আড়ালে বসে গেলো। সান্ত্রী দুজন তার সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলো। সে উঠে মাথা নিচু করে সামনে বাড়তে লাগলো।

অন্ধকারে তার ঘোড়ার আকৃতির মতো কিছু একটা নজরে পড়লো। সম্ভবত এই ঘোড়াটি বা এই জায়গাটি তার পছন্দ হলো না অথবা সে কোন বিশেষ শিকারের উদ্দেশে এসেছে। তাই সেখান থেকে সরে আরো ভেতরে ঢুকে পড়লো।

সামনে থেকে আরো দুজন সান্ত্রীর আসার শব্দ শোনা গেলো। সে উঁচু ঘাসের ভেতর একেবারে সেধিয়ে গেলো। সান্ত্রী দুজন চলে গেলো। সে রুকুর মতো ঝুঁকে বেশ কিছুক্ষণ হাটার পর ছোট একটি তাঁবু তার নজরে পড়লো। এধরনের তাঁবু পারসিক বা রোমী ফৌজী অফিসারের হয়ে থাকে।

এই তাঁবুর সঙ্গে দুটি ঘোড়া বাধা ছিলো। কাছেই এক লোক মাটিতে বিছানা করে শুয়েছিলো।

আবারো টহলরত সান্ত্রীর আসার আওয়াজ শুনে সে তাঁবুর এক পাশে লুকিয়ে পড়লো। সান্ত্রী চলে গেলে সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। এই তাঁবুটি সম্মিলিত সৈন্য শিবির থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন ছিলো। খাপ থেকে সে তরবারিটি বের করলো, তারপর একে একে ঘোড়া দুটির রশি খুলে দিলো। তাঁবুর কাছে শুয়ে থাকা লোকটির চোখ এমন সময় খুলে গেলো। সে দেখলো কে যেন ঘোড়ার রশি খুলে দিয়েছে। এক লাফে লোকটি উঠে দাঁড়ালো এবং তরবারি বের করে নিলো। ছায়ামূর্তিটি ঘোড়ার রশি শক্ত করে ধরে হাটতে শুরু করলো। ফারসী সৈনিকটিও আর দেরী করলো না। চিৎকার করতে করতে তার পিছু পিছু ছুটলো।

সঙ্গে সঙ্গেই তাঁবুর ভেতর থেকে আওয়াজ এলো- 'আরে হয়েছে কি? চিৎকার করো না ঘুমুতে দাও।'

ঃ 'আরে কে যেন ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে'– বাইরের সৈনিকটি বললো এবং দৌড়ে তুলাইহার কাছে গিয়ে পৌঁছলো।

তুলাইহা দৌড়াতে শুরু করলো। কিন্তু ফারসী সৈন্যটি তার পিছু লেগে রইলো। তুলাইহা ঘোড়ার রশি ছাড়লো না। তরবারি দিয়ে মোকাবেলা করলো। কয়েকবার আঘাত করেই ফারসী সৈনিকটিকে এমনভাবে ঘায়েল করলো যে, তুলাইহার তরবারি তার পেটে বর্শার মতো গিয়ে বিঁধলো।

তুলাইহা প্রথমে যাকে ঘায়েল করলো সে তো ছিলো সাধারণ একজন সৈনিক। কিন্তু তাঁবু থেকে যে বের হলো সে কোন সাধারণ সৈন্য বা অফিসার ছিলো না। সে পারসিকদের এক বিখ্যাত ফৌজী অফিসার ছিলো। তার উপাধি ছিলো 'হাজার সওয়ার' আক্ষরিক অর্থেই সে একা এক হাজার ঘোড় সওয়ারের মোকাবেলা করতে পারতো। আসল নাম ছাপিয়ে 'হাজার সওয়ার' নামেই লোকে তাকে ডাকতো।

'হাজার সওয়ারের' হাতে বর্শা ছিলো। তুলাইহা অনেক দূর চলে গিয়েছিলো, কিন্তু 'হাজার সওয়ার' তাকে ধরে ফেললো, তরবারি আর বর্শার তুমুল লড়াই শুরু হয়ে গেলো। 'হাজার সওয়ার' বর্শা দিয়ে যতগুলো আঘাতই করলো তুলাইহা এদিক ওদিক হওয়াতে সবগুলো আঘাতই বেকার হয়ে গেলো, সেখানকার মাটি ছিলো অসমতল। তুলাইহা হঠাৎ একপাশে সরতে গিয়ে চিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। 'হাজার সওয়ার' আর দেরী করলো না, ওপর থেকে শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে বর্শা মারলো। সেটি তুলাইহার পেট বা বুক দিয়ে সেধিয়ে যাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু বিদ্যুৎ গতিতে তুলাইহা আরেক দিকে সরে গেলো।

'হাজার সওয়ার' বর্শাটি এত জোরে মেরে ছিলো যে, পাথুরে জামির অনেকখানি নিয়ে বর্শাটি সেধিয়ে গেলো। তাই 'হাজার সওয়ার' তার শরীরের ভারসাম্যও ধরে রাখতে পারলো না।

বর্শা মারার পর সেও মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। তুলাইহা তাকে আর উঠার সুযোগ দিলো না। মাটিতে শুয়েই তার তরবারিটি বর্শার মতোই হাজার সওয়ারের পাঁজরে ঢুকিয়ে দিলো। তারপর তুলাইহা আহত চিতার মতো লাফিয়ে উঠলো। মাটি থেকে বর্শা তুলে নিলো, 'হাজার সওয়ার' মাটিতে লুটাচ্ছিলো। তুলাইহা হাজার সওয়ারের বুকে বর্শাটি গেঁথে দিলো। হাজার সওয়ারের দেহ কিছুক্ষণ ছটফটিয়ে নিথর হয়ে গেলো।

হাজার সওয়ার মারা যাওয়ার পর আরেকজন সৈন্য তরবারি নিয়ে দৌড়ে এলো। সে যখন তুলাইহার সামনে দুটি লাশ পড়ে থাকতে দেখলো তখন তার সাহস তাকে যেন টিপ্পনী কাটলো। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে তরবারি ফেলে দিলো।

ঃ 'তুমি কে ভাই! হাজার সওয়ারকে মেরে ফেললে?'– তার মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে বললো - 'তুমি ভাই যেই হও আমাকে তোমার বন্দী মনে করো। আমি মরতে চাই না।'

ঃ 'ঠিক আছে একটি ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে যাও- 'তুলাইহা সৈনিকটিকে বললো– ঘোড়ার জিন নেই। শক্ত করে বসো। আর তোমার ঘোড়ার লাগাম আমার হাতে থাকবে।'

ঃ তাড়াতাড়ি কারো ভাই– সৈনিকটি একটি ঘোড়ার খোলা পিঠে বসে বললো– 'আমার ভাই জেগে উঠছে'।

তুলাইহাও ঘোড়ায় চড়ে বসলো। ইতিমধ্যে আরো সৈন্য এসে পৌছলো। তারা এমন হল্লা শুরু করে দিলো যে, পুরো ক্যাম্প জেগে উঠলো।

ঃ 'ঘোড়া খুলে নিয়ে গেছে।'

ঃ 'হাজার সওয়ার' মারা গেছে।

ঃ সে চলে গেলো -- তাকে ধরো।

ঃ 'হায়! এতো নিশ্চয় কোন আরবীই হবে।'

চিল্লা হল্লায় সারা ক্যাম্প ফেটে পড়লো। কয়েকজন সৈনিক ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তরবারি ও বর্শা নিয়ে ছুটতে লাগলো। তুলাইহার ঘোড়া ও তার বন্দির ঘোড়া দুটির খুরের শব্দ অনুসরণ করে ধাওয়াকারী ফৌজ ছুটছিলো। ফারসী সৈনিকরা একবার ওদেরকে ডান ও বা দিকে থেকে ঘিরে নেয়। কিন্তু ওরা ফাঁক তৈরী করে বেরিয়ে যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই ওরা নিরাপদ দূরত্বে চলে গেলো।

রুস্তমও জেগে উঠলো, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এক মাইলের অধিক জায়গা জুড়ে স্থাপিত তার সৈন্যশিবিরের কানফাটানো চিৎকার চেচামেচি তাকে দারুণ বিচলিত করে তুললো।

ঃ 'ঐ আরবের বেওকুফরা কি গুপ্ত হামলা চালিয়েছে?' – ঘাবড়ে যাওয়া গলায় সে বললো– 'যদি এরকমই হয় তবে সান্ত্রীগুলোকে পুড়িয়ে মারো।'

ঃ 'কি হয়েছে কিছুই বুঝা যাচ্ছে না মহামান্য' – এক দেহরক্ষী বললো – 'পাহাড়ের যেদিকে নদী রয়েছে সেখান থেকে চেচামেচি শুরু হয়েছিলো।'

রুস্তমের গায়ে রাতের পোষাক ছিলো। এই পোষাকেই এক দেহরক্ষীর ঘোড়ায় চড়ে সেখানে পৌছলো যেখানে 'হাজার সওয়ারের' লাশের সঙ্গে আরেকটি সৈনিকের লাশ পড়েছিলো।

তৎক্ষণাৎ যা জানা গেলো রুস্তমকে তা জানানো হলো। সে মানতে পারছিলো না শুধু একজন লোকের মাধ্যমেই এই হামলা হয়েছে। পরে ধাওয়াকারীরা এসে বললো, না হামলাকারীরা দুজন ছিলো। তারা জানতে পারলো না, আরেকজন তাদেরই আরেক সঙ্গী ছিলো।

ঃ 'হাজার সওয়ার'কে একজন বা দুজন লোক কোতল করে যেতে পারবে না' – রুস্তম বললো– 'এই বর্শাটি তো তারই। এর আঘাতেই সে মারা গেছে। কোতলকারী যদি একজন বা দুজন হয় তবে সে মানুষ হতে পারে না। ভূত বা জ্বিন হবে।'

'হাজার সওয়ারের' সঙ্গে যে মারা গিয়েছিলো সে ছিলো 'হাজার সওয়ারের' দেহরক্ষী। এই দেহরক্ষী তার তাঁবুর বাইরে শোত। রুস্তম তার আরেক দেহরক্ষীর কথা জিজ্ঞেস করলো। খোঁজ নিয়ে জানা গেলো সে লাপাত্তা হয়ে গেছে।

রুস্তম হতভম্ব হয়ে সেখান থেকে চলে গেলো। তার মুখ দিয়ে কথা সরছিলো না তখন। তার ভেতরটা যেন জমে গিয়েছিলো।

কিছুক্ষণ পর মুসলমানদের ছাউনীতে আযানের পবিত্র সুরধ্বনির স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে পড়লো। আর পারসিকদের শিবিরের সবাইকে যেন ভয়ের কম্পন পেয়ে বসেছিলো। ভোরের নিস্তব্ধতায় দূরদূরান্ত পর্যন্ত আযানের শব্দ ছড়িয়ে পড়ছিলো।

ঃ 'সালমা!' – সাদ (রা) তার স্ত্রীকে বললেন– 'রাতভর তুলাইহা আমার মাথায় ঘুরে বেরিয়েছে। সে তো এমন ছিলো না। সে তো অনেক সাহসী ছিলো। পাহাড়ের সঙ্গে লাগতেও সে পিছপা হতো না। রাতে আমি তাকে স্বপ্নেও দেখলাম। সে আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে এটা মোটেও বিশ্বাস হচ্ছে না আমার।'

ঃ 'সে ধোঁকা না দিলেও কোন লড়াইয়ে সে তো শহীদও হতে পারতো' – সালমা বললো– 'সে নেই বলে কি আমরা মদীনা ফিরে যাবো? মুসান্না নেই বলে কি ইসলামের চলার পথ থেমে যাবে? .... কেনই বা আপনি এমন স্বপ্ন দেখেছেন। যে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তাকে স্বপ্নেও দেখা উচিত নয়। এখন নামায পড়ুন গিয়ে।'

সাদ (রা) জামাআতের সঙ্গে নামায পড়লেন। নামায ও দুআর পর এক সালার তুলাইহার কথা উঠালো। তুলাইহাকে নিয়ে তখন সবাই এটা ওটা বলতে লাগলো।

ভোরের শুনশান নিঃশব্দ চিড়ে ঘোড়ার খুরধ্বনি সবার কানে গেলো। সকলে মাথা উঠিয়ে সেদিকে তাকালো। দুটি ঘোড়া তাদের দিকেই দৌড়ে আসছিলো। উভয় ঘোড়ার ওপরেই সওয়ার ছিলো। ঘোড়ার ওপর কোন জিন চাপানো ছিলো না।

ঃ 'তুলাইহা! তুলাইহা' ... মুজাহিদরা চিৎকার করে বলতে লাগলো।

ঃ 'সিপাহসালার কোথায়?' – তুলাইহা কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো।

সাদ (রা) ভিড় ভেঙে দুই ঘোড়সওয়ারের দিকে এগিয়ে গেলেন। তুলাইহা ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামলো। পরমুহূর্তে সবাই দেখলো সে সাদ (রা) এর বাহুতে জড়ানো।

ঃ 'আমার সেই বন্ধুরা কোথায় যারা আমাকে নিয়ে সন্দিহান ছিলো?' – তুলাইহা উঁচু গলায় বললো– 'খোদার কসম! আমি মুহাম্মদ (স) এর পবিত্র আত্মাকে ধোঁকা দিতে পারি না। এই দেখো! রুস্তমের ফৌজের ভেতর ঢুকে দুটি ঘোড়া খুলে দুই সৈন্যকে হত্যা করে আরেকটাকে জীবিত ধরে নিয়ে এসেছি।'

ঃ 'আর যাকে ইনি হত্যা করেছেন সে কোন সাধারণ সিপাহী ছিলো না'– ফারসী কয়দী বললো।

এই কয়দী থেকে সবাই পুরো ঘটনা জানতে পারলো যে, তুলাইহা যাদেরকে হত্যা করেছে দুজনেই তাদের ফৌজের গর্ব ছিলো। তাদের মধ্যে তো একজনের খ্যাতি ছিলো 'হাজার সওয়ার' নামে। তুলাইহা নিজেও জানতো না সে কার সঙ্গে লড়ে এসেছে।

ঃ 'আমি তো লড়েছি পুরো লশকরের সঙ্গে। রুস্তমকে শুধু আমি এতটুকু বুঝাতে চেয়েছিলাম যে, কাদিসিয়ার ময়দানে সাবধানে থেকো'– তুলাইহা গর্বের সঙ্গে বললো। তুলাইহা বরাবরই এমন ছিলো। মনে যা আসতো অকপটে তা বলে দিতো।

ফারসী কয়দীটি আরো জানালো তুলাইহা যাদেরকে হত্যা করেছে সেই দুইজন তার চাচাত ভাই ছিলো। তারপরও সে তুলাইহার এই বেপরোয়া সাহসিকতা আর মুসলমানদের কোমল আচরণে এতই মুগ্ধ হলো যে, সে মুসলমান হয়ে গেলো। তার কাছে সবচেয়ে অবাক লাগলো মুসলমানদের মধ্যে উঁচু-নিচুর কোন ভেদাভেদ নেই। সাধারণ সিপাহী আর সিপাহসালার যেন এক কাতারেরই লোক। মুসলমান হওয়ার পর সাদ (রা) তার নাম রাখলেন 'মুসলিম'।

❖ ❖ ❖

ঃ 'মুসলিম'! – সাদ (রা) তাকে তার তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে বললেন– 'তোমাকে আমি বাধ্য করবো না, জোরও করবো না এবং কোন লোভও দেখাবো না ... তুমি কি ফারসী ফৌজ সম্পর্কে এমন কিছু জানাতে পারবে যা আমাদের কাজে আসবে?'

ঃ 'দুটি কথা আমি আমার সম্পর্কে বলবো'– মুসলিম বললো– 'আমার মনের গভীর থেকে কে যেন বলছিলো তুমি মুসলমান হয়ে যাও তোমার ভালো হবে। আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। আরেকটি কথা হলো, আমি মাদায়েনের ঐ সব খান্দানের সঙ্গে উঠাবসা করি যারা শাহী মহল ও ফৌজের অভিজাত অংশের কাছে সম্মানের পাত্র। তাই আমি শাহী মহলের অবস্থা, জেনারেলদের পারস্পরিক মনোভাব ও পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছুটা হলেও জানি..........

'আমি আপনার ফৌজের বিরুদ্ধে তিনটি লড়াইয়ে অংশ নিয়েছি। প্রতিটি ময়দানেই আপনাদের সৈন্যসংখ্যা কয়েকগুণ কম ছিলো প্রতিপক্ষের তুলনায়। তবুও আপনারাই জিতেছেন। রুস্তম এবার সোয়া লক্ষ ফৌজ নিয়ে এসেছে। আপনার ফৌজ এখনো আমি দেখিনি।'

ঃ 'পুরো চল্লিশ হাজার হবে না'– সাদ (রা) বললেন।

ঃ 'যদি আপনার ফৌজের মনোবল ধরে রাখতে পারেন তবে এই সোয়া লাখ ফৌজকেও আপনি হারাতে পারবেন'– মুসলিম বললো– 'রুস্তম নিজেকে তো বটেই অন্যান্য জেনারেলকেও এটা বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয় যে, পারস্য সাম্রাজ্য তার শেষ পরিণতি দেখার অপেক্ষায় আছে।'

ঃ 'হ্যাঁ শুনেছি সে গণকবিদ্যা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের ওপর ভরসা রাখে' – সাদ (রা) বললেন।

ঃ 'কুষ্ঠি বিচার না করে সে এক কদমও অগ্রসর হয় না'– মুসলিম বললো– 'আপনি তার মনোবল ভাঙ্গতে পারবেন। আপনার প্রভাব এবং দাপট আমাদের ফৌজ ও জনগণের ওপর ছড়িয়ে আছে। বাহ্যিকভাবে দেখলে আমি দেখি সোয়া লাখ ফৌজের সামনে চল্লিশ হাজার ফৌজ কয়েক ঘন্টাও দাঁড়াতে পারবে না। আমি আপনাকে বলবো আপনি যদি কৌশলে কাজ করেন এবং ফৌজকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ভাগ করে প্রতিটি দলের নিয়ন্ত্রণ আপনার হাতে রাখেন বিজয় আপনারই হবে।'

ঃ 'এবার হাতি কতগুলো এনেছে ওরা?'

ঃ 'চল্লিশের চেয়েও কম'– মুসলিম জবাব দিলো– 'বিরাট এক সাদা হাতিও রয়েছে। হাতি তো আগেই আপনি ধরাশায়ী করেছেন। এবার ওগুলো আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

মুসলিম সাদ (রা)কে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা জানালো। যেগুলো বিবেচনা করে সাদ (রা) কাদিসিয়ার যুদ্ধের কৌশল নির্ধারণ করলেন। মুসলিমের মন্তব্য সাদ (রা) পরামর্শ হিসাবে নিলেন, অন্যথায় কৌশল অবলম্বন ছাড়া কেউ চিন্তাও করতে পারতো না এত বড় ফৌজের বিরুদ্ধে লড়ার। মুসলিম ঠিকই বলেছিলো এ যুদ্ধে লড়তে হবে তীক্ষ্ণ মেধা আর অটুট মনোবলের মাধ্যমে।

সাদ (রা) আরেকটি কঠিন সমস্যায় পড়েছিলেন। সেটা হলো তার এক পা বাতের তীব্র ব্যথায় ক্রমেই অকেজো হয়ে পড়ছিলো। ডাক্তার চিকিৎসায় যতই যত্ন নিচ্ছিলো ব্যথা ততই বাড়ছিলো। লড়াইয়ের দিন যতই ঘনিয়ে আসছিলো তার পা তাকে ততই হাটা-চলায় অক্ষম করে দিচ্ছিলো। কিন্তু উমর (রা) এর সঙ্গে নিয়মমাফিক তিনি পত্র বিনিময় করছিলেন। এতে তিনি তার শারীরিক অক্ষমতার কথা একবারও লিখলেন না।

রুস্তম অবশেষে কাদিসিয়ায় পৌছলো। মাদায়েন থেকে কাদিসিয়ায় পৌছতে তার চার মাসের অধিক সময় লাগলো। অথচ মাদায়েন থেকে কাদিসিয়ার দূরত্ব ছিলো পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ মাইল। এতে কেউ কেউ ঠিকই বুঝে নিলো রুস্তম লড়াই এড়িয়ে যেতে চাচ্ছে। তার জেনারেলদের থেকেও সে তার সমর্থন আদায় করে নিয়েছিলো। কিন্তু তুলাইহার সেই ঘটনায় তারা এতই ভীত হয়ে পড়লো যে, রুস্তমের ওপর চাপ প্রয়োগ ছাড়া তাদের সামনে দ্বিতীয় কোন পথ খোলা ছিলো না। তারা রুস্তমকে এই বলে চাপে ফেললো যে, লড়াই বিলম্বে নিয়ে যাওয়াতে মুসলমানদের সাহস এত বেশি বেড়ে গেছে যে, তারা বিভিন্ন এলাকায় এখনো লুটপাট চালিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের ফৌজী শিবিরে এসে দু'জনকে হত্যা করে এক বন্দীসহ দুটি ঘোড়া খুলে নিয়ে যেতেও কোন কিছুর পরওয়া করছে না। তাই আপনারই এখন অগ্রসর হয়ে মুসলমানদের যুদ্ধের জন্য চ্যালেঞ্জ করা উচিত।

তাই রুস্তমকে শেষ পর্যন্ত কাদিসিয়ায় পৌছতে হলো। সাদ (রা) এর লশকরও সেখানে পৌছে গিয়েছিলো। রুস্তম তার এক লাখ বিশ হাজার ফৌজকে যুদ্ধের সাজ-বিন্যাসে সারিবদ্ধ করে রাখলো। কিন্তু তার লড়াইয়ের ইচ্ছা ছিলো না। ফৌজের সারির আগে হাতির বহর দাঁড় করানো ছিল। এর দ্বারা মুখ্যত উদ্দেশ্য ছিলো মুসলমানদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করা। রুস্তম হঠাৎ তার জেনারেলদের ডাকলো।

ঃ 'আমি জানি তোমরা আমার প্রতি কাপুরুষের অভিযোগ আনবে'– রুস্তম জেনারেলদের গম্ভীর গলায় বললো– 'আমি এটাও জানি তোমরা আমার ইচ্ছা এবং ভবিষ্যৎবাণীর অর্থও বুঝে নিয়েছো। আজ আমি স্পষ্ট করে বলবো আমি কি চিন্তা করেছি। আমার এই ভবিষ্যৎ বক্তা কখনো ভুল হতে পারে না যে, সালতানাতে ফারেসের ওপর অশুভ কোন প্রভাব পড়েছে। আমি এই প্রতীক্ষায় লড়াইয়ে যেতে বিলম্ব করছি যে, হতে পারে এই অশুভ ছায়া সরে যাবে'.....

'দ্বিতীয় কারণ এই ছিলো যে, মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানাতে আমি এজন্য চাচ্ছিনা যে, আমি আশা করছি ওদের রসদ ঘাটতির কারণে ওরা আরবে ফিরে যাবে। ওরা আমাদের গ্রামে শহরে লুটপাট চালাচ্ছিলো। কিন্তু আমি জালিয়ুনুসকে চল্লিশ হাজার ফৌজ দিয়ে বলেছিলাম এদেরকে ভাগ করে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে দাও। ওরাই এসব এলাকা নিজ হেফাজতে নিয়ে নিবে। এর দারুণ ফল হয়েছে। মুসলমানদের বিক্ষিপ্ত হামলা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন নিঃসন্দেহে ওরা খাবার ও পানীয়ের অভাব অনুভব করছে।'

'এখন আমি মুসলমানদের মধ্যে এমন বিরোধ উস্কে দেবো যে, ওরা পরস্পরের মধ্যে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে যাবে। আমি ওদেরকে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাবো। এমন লোভনীয় প্রস্তাব করবো যে, ওরা তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বে। তারপর এ নিয়ে দলাদলিও শুরু হয়ে যেতে পারে। এর ফলে লড়াইও মুলতবী হয়ে যাবে। আমাদের বসতিগুলো পুনরায় দখলে নিয়ে মুসলমানদের রসদ সংগ্রহের পথ বন্ধ করে দিয়েছি। এই বেওকুফরা ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে পারস্য ছেড়ে পালাবে। আমরা তাদেরকে জীবিতই ফিরতে দেবো এবং পিছনে থেকে ওদের ওপর হামলা চালিয়ে যাবো। ছোট ছোট দলে বিচ্ছিন্নভাবে এসব হামলা চালানো হবে। হামলা করে ওদের যতটুকু ক্ষতি করার করে সরে পড়বে। এভাবে গেরিলা হামলায় ওদেরকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বো, এখন আমি তোমাদের সাহায্য চাই।'

জেনারেলরা সবাই তাকে সহযোগিতার আশ্বাস দিলো।

একদিন সকালে সাদ (রা)কে জানানো হলো রুস্তমের পক্ষ থেকে দূত এসেছে। সাদ (রা) তাকে তার তাঁবুতে ডেকে নিলেন। সকল সালারকেও তিনি ডেকে পাঠালেন। তারপর দোভাষীকে ডাকলেন। দোভাষীর নাম ছিলো বেলাল হিজরী। বেলাল হিজরী আরব অনারব সব ভাষাতেই দক্ষ ছিলো। মদীনা থেকে ফৌজের সঙ্গে তাকে দোভাষী হিসাবেই আনা হয়েছিলো।

দূত যেভাবে তাঁবুতে প্রবেশ করলো মনে হলো সে যেন দুনিয়ার সব ঐশ্বর্যের মালিক। পোষাক ছিলো তার শাহী সাজে সুসজ্জিত। মাথায় সোনায় জড়ানো একটি টুপি ছিলো। তার থেকে আলো ঠিকরে বেরোচ্ছিলো। তার পোষাকের তুলনায় মুসলমানদেরকে তার চাকরের যোগ্যও মনে হচ্ছিলো না। সে যে দৃষ্টিতে সাদ (রা) ও তার সালারদের দিকে তাকালো তাতে স্পষ্টতই ঘৃণা ছিলো।

ঃ হে পারস্যের দূত!– সাদ (রা) নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন– 'আমরা তোমার শান শওকত যথেষ্ট দেখেছি। এখন কি তুমি তোমার আগমনের উদ্দেশ্য আমাদেরকে দয়া করে বলবে?'

ঃ 'আমি দেখছি তোমাদের কাছে কিইবা আছে'– দূত কণ্ঠে ঘৃণা ফুটিয়ে বললো– 'তোমাদের হাতিয়ারগুলোও দেখেছি। এসব টুটাফুটা হাতিয়ার দিয়ে কিভাবে আমাদের মোকাবেলা করবে? ... আর তোমাদের কি যে সৈন্যের বহর!'

ঃ 'তুমি কি পারস্যের সম্রাট বনে এসেছো নাকি?'– সাদ (রা) মুচকি হেসে বললেন।

ঃ 'না'।

ঃ 'তবে কি তুমিই রুস্তম?'

ঃ 'না'।

ঃ 'তাহলে এত কথার দরকার কি? যা বলার বলে চলে যাও।'

ঃ 'ঠিক আছে শোন'– দূত ঝাঁঝালো গলায় বললো– 'আমাদের প্রধান সেনাপতি

তোমাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করতে চাচ্ছেন। এমন কাউকে পাঠাও যে ফয়সালার কথা বলতে জানে। ... আজই কাউকে পাঠিয়ে দাও।

ঃ 'আমাদের দূত সন্ধ্যার পূর্বেই তোমাদের প্রধান সেনাপতির কাছে পৌঁছে যাবে'— সাদ (রা) বললেন।

রুস্তমের দূত চলে গেলো।

জোহরের নামাযের পর সাদ (রা) তার এক বিচক্ষণ সঙ্গী রবীআ বিন আমেরকে রুস্তমের কাছে যাওয়ার জন্য দূত নির্বাচন করলেন। তাকে কিছু উপদেশও দিলেন।

রুস্তমের দূত যখন এসেছিলো তখন রবীআও সাদ (রা) এর তাঁবুতে ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন রুস্তমের দূত মুসলমানদের হাতিয়ার নিয়ে অনেক বিদ্রুপ করেছে। তাই তিনি টিন দিয়ে হাস্যকর একটি বর্ম বানিয়ে সেটা পড়ে নিলেন। তারপর টিন দিয়েই অতিরিক্ত একটি টুপি বানিয়ে সেটি মাথায় রাখলেন। এটা ছিলো ওদের বিদ্রূপের জবাব। বর্মটি এতই ভঙ্গুর হয়েছিলো যে, সামান্য আঘাতও সইবার ক্ষমতা ছিলো না এর। রবীআর তরবারি ছিলো কোষবদ্ধ। তিনি খাপের গায়ে নোংরা একটি কালো কাপড় পেঁচিয়ে নিলেন। কোমরে একটি লম্বা রশিও বেঁধে নিলেন। হাতে একটি বর্শা ঝুলিয়ে নিলেন। যার সামনের ফলা অক্ষত থাকলেও বাট ছিলো ভাঙ্গা।

রবীআ বিন আমের যখন রুস্তমের তাঁবুর দিকে হাটা দিলেন তখন তার সঙ্গীরা অনেক চেষ্টা করেও হাসি চেপে রাখতে পারলো না। সবাই হো হো করে হেসে ফেললো।

মুসলমানদের সিপাহসালারের তাঁবু আর এক সৈনিকের তাঁবুর মধ্যে কোন ফরক ছিলো না। কিন্তু পারসিকদের সিপাহসালারের তাঁবু ছিলো যেন জঙ্গলের মধ্যে এক রাজপ্রাসাদ। এর পরও রুস্তম মুসলমানদের দূত আগমন উপলক্ষে তার তাঁবুর শান শওকত আর চাকচিক্য আরো বাড়িয়ে তুললো।

মূল্যবান এক কাপড়ের সামিয়ানা টানানো ছিলো খুব উঁচু করে। যাতে ছোট ছোট কাচের টুকরো ও মতি জড়ানো ছিলো। এজন্য তার তাঁবুর সম্মুখদিক ছাড়া অন্য তিন দিক মনে হতো পানির মাঝে কোন দ্বীপ বুঝি। তাঁবুর ভেতর পুরোটা জুড়ে বিছানো ছিলো সবুজ গালিচা। মাঝখানে ছিলো সিংহাসনের মতো একটি কুরসী। রেশমের কাপড়ে তা আবৃত ছিলো।

রবীআ ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে আসেন। তিনি যখন পারসিকদের সৈন্যশিবিরে প্রবেশ করলেন তখন উঁচু কণ্ঠে বললেন তিনি মুসলমানদের পক্ষ থেকে দূত হিসাবে এসেছেন। তাকে যেন রুস্তমের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কেউ তার কথার কোন জবাব না দিয়ে তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টায় মশগুল হয়ে গেলো।

রুস্তমকে তাদের একজন সংবাদ দিলো মুসলিম দূত আসছে। রুস্তম তাড়াতাড়ি শাহী লেবাস পরে তার কুরসীতে গিয়ে বসলো। তার সব জেনারেল ও তাদের সহকারীরা নিজ নিজ আসনে বসে গেলো। দূর থেকে রবীআকে আসতে দেখে রুস্তমের চেহারায় তাচ্ছিল্য ভরে গেলো।

ঃ 'ঐ যে দেখো আরবদের দূত'- রুস্তম বিদ্রুপাত্মক কণ্ঠে বললো- 'এক গর্দভ ভিক্ষুক হয়ে আসছে।'

রুস্তমের দরবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

রবীআ যখন রুস্তমের দরবারের দরজায় পৌঁছলো তখন দ্বাররক্ষী তার পথ আগলে দাঁড়ালো।

ঃ 'কি হলো?'- রবীআ জিজ্ঞেস করলেন- 'আটকাচ্ছো কেন? তোমাকে কি কেউ বলেনি আমি মুসলমানদের পক্ষ থেকে দূত হিসেবে এসেছি?'

ঃ 'এজন্যই তো তোমাকে আটকাচ্ছি'- প্রধান দ্বাররক্ষী বললো- 'তুমি একটি দরবারে যাচ্ছো। হাতিয়ার সঙ্গে নিয়ে দরবারে যাওয়া আদবের পরিপন্থী। তোমার বর্ষা আর তরবারিটি আমাকে দিয়ে দরবারে প্রবেশ করো। আলীজাহ রুস্তম তোমার অপেক্ষায় আছেন। ঘোড়াও আমার কাছে রেখে যাও।'

ঃ 'আমি নিজ ইচ্ছায় আসিনি' - রবীআ বললেন- 'আমাকে ডেকে আনা হয়েছে। যদি বলো এখান থেকেই চলে যাচ্ছি আমি। হাতিয়ারও দেবো না ঘোড়াও রেখে যাবো না।'

ঃ কি হচ্ছে ওখানে?' রুস্তম উঁচু আওয়াজে জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'এই লোক হাতিয়ার দিতে চাচ্ছে না আলীজাহ!'

ঃ 'ওকে আসতে দাও'।

রবীআ ঘোড়া থেকে আর নামলেন না। দরবার পর্যন্ত ঘোড়া নিয়ে গেলেন। দরবারের সামনে গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়া হাটিয়ে গালিচার ওপর নিয়ে রাখলেন। তারপর ডানে বামে তাকিয়ে একটি আসনের দিকে ঘোড়া নিয়ে হেটে গেলেন। সবাই হতভম্ব হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলো। ঘোড়ার লাগাম একটি আসনের সঙ্গে বেঁধে ঘোড়াটি সেখানেই ছেড়ে দিলেন। তারপর বুড়োরা যেভাবে লাঠির ওপর ভর দিয়ে হাটে সেভাবে বর্শাটি দিয়ে গালিচার ওর ভর করে করে রুস্তমের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। রবীআ এমনভাবে চলছিলেন যেন কোন অন্ধ লাঠির সাহায্যে হাটছে। প্রতিটি কদমেই বর্শা দিয়ে গালিচায় আঘাত করতে করতে যাচ্ছিলেন। যেখানেই বর্শা পড়ছিলো সেখানটাই ছিদ্র হয়ে যাচ্ছিলো। রুস্তম ও তার দরবারীরা তার দিকে তাকিয়েই রইলো। কেউ চিন্তা করে ভেবে পাচ্ছিলো না তাকে কি বললে তাদের মনের জ্বালা মিটবে।

রবীআ রুস্তমের সামনে গিয়ে থামলেন। বর্শাটি এত জোরে গালিচার মেঝেতে রাখলেন যে, বর্শার ফলা গালিচা ভেদ করে মাটি পর্যন্ত তুলে ফেললো। সেখানেই বর্শাটি রেখে রুস্তমের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। রুস্তম তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলো। তাকে বসতেও বললো না।

ঃ 'আমাদের দেশে কি নিতে এসেছো তোমরা?'- রুস্তম তাচ্ছিল্য ভরে তাকে জিজ্ঞেস করলো।

ঃ যাতে সৃষ্টির পরিবর্তে সৃষ্টিকর্তার গুণগান সবাই গায়, তাকেই উপাসনা করে এজন্যই আমরা এসেছি, আমাদের পয়গাম তোমাদের শাহেনশাহ পর্যন্ত পৌছে গেছে। আমরা আমাদের বক্তব্য তাকে জানিয়ে দিয়েছি।'

ঃ 'আমি আমার সভাষদদের সঙ্গে আলোচনা করে এর জবাব দেবো'– রুস্তম বললো– 'তোমাকে আরেকবার আসতে হবে।'

সন্ধির কথাবার্তা তখন এতটুকুই হলো। এক জেনারেল উঠে রবীআর গালিচার ভেতর দিয়ে মাটিতে বিদ্ধ বর্শাটি দেখলো। বর্শার বাটটি ভাঙ্গা ছিলো, তারপর সে রবীআর বর্মের ওপর হাত ছুয়ে দেখলো। কোষবদ্ধ তলোয়ারের খাপের ওপর নোংরা কাপড়টিও ছুলো। ঘৃণায় তার নাক কুচকে গেলো। তার জীবনে সে এমন যুদ্ধপোষাক দেখেনি।

ঃ 'এই আরবী!' জেনারেল ব্যঙ্গ করে বললো– 'এসব হাতিয়ার দিয়ে তোমরা ইরাক জয় করবে?'

রবীআ এমন বিদ্যুৎবেগে তরবারি বের করলেন যে, জেনারেল ছিটকে দূরে সরে গেলো। রবীআ সেখানে দাড়িয়েই চারদিকে ঘুরতে লাগলো, তার চেহারায় রণাঙ্গনের হুংকারের আভাস ছিলো।

ঃ 'কার সাধ আছে তরবারি পরীক্ষা করার?' রবীআ বললেন 'উঠে আমার মোকাবেলা করো .... কোন বাহাদুর এমন আছে, জবাব পেয়ে যাবে এই তরবারি দিয়ে আমরা ইরান জয় করতে পারবো কি না?'

সেখানে দাঁড়িয়েই ধীরে ধীরে চারদিকে চোখ বুলাতে লাগলেন। প্রত্যেক জেনারেলের চোখে চোখ রেখে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন। কিন্তু রুস্তমের অনুমতি ছাড়া কারো উঠার সাহস হলো না। রুস্তম ইংগিতে সবাইকে বারণ করে বলে দিলো তাকে যেতে দাও।

ঃ 'কেউ নেই?' – রবীআ রুস্তমকে বললেন– 'আরেকজন দূত তোমার কাছে আসবে ... চিন্তা করে জবাব দিয়ো রুস্তম!'

রবীআ তার ভাঙ্গা বর্শাটি সেখানেই রেখে যেতে মনোস্থির করলেন। তরবারিটি কোষবদ্ধ করে ঘোড়া পর্যন্ত গেলেন ধীরে ধীরে। তারপর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তাবু থেকে বের হয়ে চলে গেলেন।

রবীআ ফিরে এসে সব বিস্তারিত জানালেন সিপাহসালার সাদ (রা)কে। রুস্তম যে তার দরবার শাহী সাজে সজ্জিত করে রেখেছিলো তাও জানালেন। রবীআ এই প্রথম রুস্তমের বাহিনীকে কাছ থেকে দেখলেন। এত বড় লশকর তিনি আর কখনো দেখেননি। তার না দেখে উপায়ও ছিলো না। এই লশকরের সঙ্গেই তো তার লড়তে হবে। সাদ (রা) কে তিনি বললেন পারসিকদের লশকর কত বড়। আর তাদের হাতিয়ার কত আধুনিক ও বিচিত্র ধরনের। তিনি আরো বললেন, মনে হলো ওদের সৈন্যের চেয়ে ঘোড়াই বেশি।

আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশ মতে সাদ (রা) নিয়মিতই তাকে এখানকার কথা লিখে জানাতে লাগলেন। উমর (রা)ও তাকে বিভিন্ন নির্দেশাবলি পাঠিয়ে চললেন।

প্রতিটি পত্রেই তিনি একথা লিখে গেলেন যে, পারসিকদের রাজকীয় চাকচিক্য, ওদের বিশাল সৈন্যবহর এবং অস্ত্রশস্ত্র দেখে তোমরা বিচলিত হয়ো না। তোমাদের যে মনোবল আছে তোমাদের দুশমন তা থেকে বঞ্চিত। তাদের দুর্বলতা এটাই এবং তোমাদের শক্তিও এটাই।

ঃ 'রুস্তমের পরের প্রস্তাব আসুক'– সাদ (রা) রবীআকে বললেন– 'সন্ধির প্রয়োজন তাদের আমাদের নয়'।

দিন দিন সাদ (রা)-এর মনোবল, দৃঢ়তা আর আবেগ বেড়েই চলছিলো। কিন্তু বাতের ব্যথা তাকে তিষ্ঠোতে দিচ্ছিলো না। তার যে পায়ের ব্যথা ছিলো সে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারতেন কিন্তু আর নড়তে পারতেন না। কয়েক মন ওজন মনে হতো পা'টি। কারো সাহায্য ছাড়া চলতে পারতেন না। ঘোড়সওয়ারীও তার জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো।

কয়েকদিন পর রুস্তমের পত্রবাহক এলো। রুস্তম জানালো–

ঃ 'তোমাদের কোন প্রতিনিধি পাঠাও ...।'

ঃ 'আর প্রতিনিধি যেন বুদ্ধিমান হয়'– পত্রবাহক বললো– 'এমন বুদ্ধিমান যে আপনাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে বলতে পারে।'

ঃ 'খোদার কসম! ইরানে আর পারস্যে তো বুদ্ধির দুর্ভিক্ষ লেগেছে'– সাদ (রা) বললেন– 'আমাদের উদ্দেশ্য-দাবী সবই তোমাদের সম্রাটকে ভালো করে বলা হয়েছে। তোমাদের সবচেয়ে বড় সেনাপতি রুস্তমও জানে আমরা কি চাচ্ছি। এটা বলো রুস্তম কি চাচ্ছে এখন?'

ঃ 'এই প্রশ্নের উত্তর রুস্তমই দিতে পারবে'– পত্রবাহক বললো– 'আপনি আপনার প্রতিনিধি পাঠান'।

ঃ 'ঠিক আছে কাল সকালে আমাদের প্রতিনিধি যাবে'।

পত্রবাহক চলে গেলো। সাহাবী মুগীরা ইবনে শুবা (রা) সাদ (রা) এর কাছেই বসা ছিলেন।

ঃ 'ইবনে শুবা'– সাদ (রা) বললেন– 'এখন তুমিই যাও। খোদার কসম! রুস্তমের মাথায় শয়তান সওয়ার হয়েছে। আমাদের কথা বুঝেও বলছে কিছুই সে বুঝতে পারছে না। সে আসলে তার প্রস্তুতি শেষ করার জন্য সময় নিচ্ছে। তাকে বলো এরপর আর আমাদের কোন দূত বা প্রতিনিধি যাবে না।'

ঃ 'আমি চেষ্টা করবো'– মুগীরা (রা) বললেন– 'আমি তাকে উত্তেজিত করে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করতে চেষ্টা করবো। তারা ইসলাম গ্রহণ করবে এমন আশা আমাদের করা উচিত হবে না।'

পরদিন সকালে মুগীরা (রা) রুস্তমের সাক্ষাতে গেলেন। রুস্তম এবার তার দরবার কক্ষের চাকচিক্য আরো দ্বিগুণ করেছিলো। তার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলো দু'জন প্রহরী। দরজার সামনেও বর্শা হাতে দু'জন প্রহরী দাঁড়িয়ে ছিলো। দরবার কক্ষে

সেদিনের মতো জেনারেলরাও রাজকীয় পোষাকে আলীশান মসনদে বসা ছিলো। একজন সাদামাটা পোষাকের সাহাবীর কাছে তাদের প্রত্যেককেই এক একজন বাদশাহ বা শাহজাদা মনে হচ্ছিলো।

মুগীরা ঘোড়া থেকে নামলেন। সেদিনের মতো কেউ তাকে বললো না দরবারে হাতিয়ার নিয়ে যেতে পারবে না। তিনি সামিয়ানায় ছাওয়া দরবার কক্ষে প্রবেশ করলেন। ঝুঁকে কাউকে সালাম করলেন না। বিধর্মীদের দরবারীয় কোন প্রথার তোয়াক্কা করলেন না। উঁচু আওয়াজে সবার জন্য শুভ কামনা জ্ঞাপন করলেন এবং সোজা হেটে রুস্তমের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর রুস্তমকে কোনরূপ কুর্নিশ না করে তার পাশের একটি আসনে বসে পড়লেন।

দরবার কক্ষে পিনপতন নীরবতা নেমে এলো। দুই জেনারেল উঠে দাঁড়ালো।

ঃ 'আমাদের মহাসম্মানিত সেনাপতির এই অপমান আমরা বরদাশত করবো না'– এক জেনারেল বললো– 'আমরা আরবের এই মূর্খদের এই সম্মান দিইনি যে, তাদের কেউ পারস্যের গর্ব রুস্তমের মর্যাদার অলংকৃত আসনের পাশে বসে যাবে'।

ঃ 'ওকে ওখান থেকে উঠিয়ে দাও'– আরেক জেনারেল গর্জে উঠে বললো।

রুস্তম নিশ্চুপ ছিলো। তার চেহারায় সে নির্লিপ্তের ভাব কষ্ট করে ধরে রেখেছিলো। দরবার কক্ষে গুঞ্জনের মতো শুরু হয়ে গেলো। সবাই মুগীরা (রা) এর বিরুদ্ধে ফেটে পড়ছিলো। রুস্তমের পাশের এক প্রহরী মুগীরা (রা) এর বাহু ধরে উঠিয়ে দিলো।

ঃ 'আমি তো স্বেচ্ছায় আসিনি'– মুগীরা (রা) বললেন– 'তোমাদের প্রস্তাবেই আমি এসেছি। আমি তো আশ্চর্য হচ্ছি তোমাদের এখানে অতিথির সঙ্গে এমন নোংরা আচরণ কি করে করা হয়। আমাদের ওখানে এই রীতি নেই যে, এক লোক সবার খোদা বনে যাবে আর সবাই তার গোলাম বনে থাকবে এবং কেউ আসলে তার সামনে বসার দুঃসাহস দেখাতে পারবে না। এই অপমানের জবাব আমি দেবো। যা হোক, এখন কি আমার জন্য ফিরে যাওয়াটা উত্তম নয়? আজকের পর আমাদের কোন প্রতিনিধি আর তোমাদের কাছে আসবে না। তোমাদের সঙ্গে আমাদের পরবর্তী সাক্ষাত হবে রণাঙ্গনে।

আগেরবার যে দোভাষী ছিলো এবারও সে দোভাষীই ছিলো। নাম ছিলো তার উবুদ। সে রুস্তমকে মুগীরা (রা) এর কথা অনুবাদ করে শুনিয়ে দিলো।

ঃ 'না'– রুস্তম মরিয়া হয়ে বললো– 'তোমাকে উঠিয়ে দিতে কাউকে আমি নির্দেশ দেইনি এবং আমার এমন ইচ্ছাও ছিলো না। তুমি শান্ত হয়ে বসো এখানে।'

ঃ 'ঠিক আছে। তোমার যা বলার বলো'– মুগীরা (রা) শান্ত কণ্ঠে বললেন– 'আমরা আমাদের বক্তব্য তোমাদের সম্রাট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছি। আমাদের দূতও তোমাদের অনুরোধে একবার তোমাদের এখানে এসে গিয়েছে। আমরা কি চাই তা তোমাদেরকে ভালো করেই বুঝিয়ে বলেছে। আমরা যা বলি তা আমাদের নয়; আল্লাহর হুকুম।

ঃ 'কথাগুলো আরেকবার বলো' রুস্তম বললো– 'তারপর আমি জবাব দেবো।'

ঃ 'আর আমি সেটা তোমাদের শেষ জবাব ধরে নেবো'– মুগীরা (রা) বললেন– 'এরপর আমাদের কেউ এখানে আসবে না ... আমরা তোমাদেরকে ইসলামগ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। ইসলামে ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ। তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। তোমরা যে সূর্যের উপাসনা করো তা আল্লাহরই এক সৃষ্টি এবং সূর্য তাঁরই হুকুমের অনুগত। যে আগুনকে তোমরা পূজা করো তা মানুষই জ্বালায় মানুষই নেভায়। তোমরা আরো মেনে নাও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ রাসূল। মেনে নাও ইসলাম আল্লাহর সত্য ধর্ম।'

ঃ 'তোমাদের ধর্মকে আমরা পূর্বেই অস্বীকার করেছি'– রুস্তম বললো।

ঃ 'তাহলে কর দিয়ে এ দেশে থাকো'– মুগীরা (রা) বললেন।

ঃ 'আমার আরব বন্ধু!'– রুস্তম বললো– 'শাহেনশাহে ফারেস তোমাদেরকে দারুণ প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তোমরা আমাদের যে ক্ষতি করেছো এবং আমাদের প্রজাসাধারণের যা কিছু লুটে নিয়েছো তার সব আমরা মাফ করে দিচ্ছি। তোমরা আমাদের দেশ থেকে চলে যাও। তোমাদেরকে এত বেশি খাদ্য সাহায্য করবো যে অনেক বছরেও তা খেয়ে শেষ করতে পারবে না। তারপর পুরস্কারও দেবো।'

রাগে মুগীরা (রা) এর চেহারার শিরাগুলো ফুলে উঠলো। খাপবদ্ধ তরবারিটি তিনি তার হাতে নিলেন এবং সামান্য কোষমুক্ত করলেন।

ঃ 'রুস্তম!' – মুগীরা (রা) বললেন– 'যদি ইসলামও গ্রহণ না করো এবং করও দিতে না চাও তবে ফয়সালা করবে এই তরবারি।'

রুস্তম অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। মুগীরা (রা) এটাই চাচ্ছিলেন– রুস্তম উত্তেজিত হয়ে নিজ থেকে যুদ্ধে নেমে পড়ুক। রুস্তম রাগে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে গেলো।

ঃ 'কালই আমি সারা আরব জ্বালিয়ে দেবো'– রুস্তম সমস্ত রাগ গলায় জড়ো করে বললো।

ঃ 'হ্যাঁ – যদি আল্লাহ তালা তা চান'– মুগীরা (রা) বললেন।

ঃ 'না; আল্লাহ না চাইলেও'– রুস্তম বললো।

মুগীরা সজোরে তার তরবারি কোষবদ্ধ করলেন। তার চেহারায় ফুটে উঠলো বিদ্রুপের হাসি। রুস্তমের দরবার থেকে বিদ্যুৎবেগে তিনি বেরিয়ে এলেন।

ইতিহাসের চলিষ্ণু ধারা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

আকাশ, মাটি, পৃথিবীর চলমান গতিময়তা হারিয়ে বসেছিলো তার স্বাভাবিকত্ব।

বড় বড় যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ, পন্ডিত ও চিন্তাবিদরা বিস্ময়ে বাকহারা হয়ে গিয়েছিলো।

চল্লিশ হাজার মুসলমান কি করে এক লাখ বিশ হাজার সৈন্যের বহরকে প্ররোচিত করে ময়দানে নিয়ে এলো। অস্ত্রশস্ত্র বলতে ওদের কি আছে। ঝংধরা পুরোনো কিছু সেকেলে অস্ত্র। আর পারসিকরা তদানীন্তন বিশ্বের সেরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। সারা দুনিয়ায় তাদের খ্যাতি দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতি বলে। তাদের প্রতিটি সৈন্যের গায়েই দুর্ভেদ্য বর্ম।

তাদের গোড়সওয়ারের সংখ্যাই ছিলো চল্লিশ হাজারের চেয়ে অনেক বেশি। আর উম্মাতাল ভয়ংকর ক্ষিপ্ত হাতির বহর তো ছিলোই। যুদ্ধের প্রশিক্ষণ পেয়ে সেগুলো আরো বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিলো।

এটা ঠিক যে, মুসলমানরা কয়েকটি লড়াইয়ে পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে। কয়েকজন বড় জেনারেলকে মৃত্যুর দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রতিটি ময়দানে পারসিকদের সৈন্যসংখ্যা কয়েক গুণ বেশি ছিলো। তবুও সামান্য কিছু সৈন্য নিয়েই তারা পারসিকদের পরাজিত করেছে। কিন্তু এটাওতো ঠিক যে, কোন ময়দানেই পারসিকরা তাদের পূর্ণ শক্তি নিয়ে নামেনি। এই প্রথম পারসিকরা এত বড় সেনাবহর নিয়ে রণাঙ্গনে এসেছিলো। খোদ পারসিকরাও তা দেখেনি।

রুস্তম যদিও যুদ্ধে নামতে টালমাটাল করছিলো কিন্তু সাদ (রা) তার দূত পাঠিয়ে রুস্তমকে চরমভাবে উস্কিয়ে দেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে রাগ, ক্ষোভ আর ঘৃণার জঞ্জাল নিয়ে রুস্তম ময়দানে আসে। কিন্তু মুসলমানদের সিপাহসালারকে বাতের মরণ কামড় বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিলো। সবসময় তিনি শয্যাশায়ীই থাকতেন। সোজা হয়ে শুতে পারতেন না। উপুড় হয়ে শুতে হতো, না হয় ব্যথায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন।

সাদ (রা) ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে যাচ্ছিলেন। সুস্থ হওয়ার পর বা মদীনায় অসুস্থতার কথা জানিয়ে তার স্থলে আরেকজন সিপাহসালার আনিয়ে যুদ্ধ শুরু করা উচিত ছিলো তার। কিন্তু তিনি সে পথে না গিয়ে তার শয্যাশায়ীর কথা গোপন রেখে এত বড় শক্তিধর শত্রুপক্ষকে ময়দানে নামতে বাধ্য করেছেন।

পারস্য সম্রাট ইয়াযদগিরদ ছিলো তেজদীপ্ত নৌজোয়ান। এই বয়সে মানুষ হতাশা বা পরাজয় কখনো মেনে নিতে পারে না। পাহাড়সম উচ্চতাকেও ডিঙ্গিয়ে নিজের ভাগ্য গড়ে নিতে পছন্দ করে। ইয়াযদগিরদের এই অপ্রতিরোধ্য মনোভাব সালতানাতে ফারেসের জন্য তখন ভীষণ প্রয়োজন ছিলো। এছাড়াও সে নতুন আরেকটি শক্তির উন্মেষ ঘটিয়ে ছিলো। পারস্যের সব আমীর উমারা, বুদ্ধিজীবী এবং জেনারেলদেরকে তার পাশে একতাবদ্ধ করতে পেরেছিলো। এর পূর্বে পারস্যের কোন সম্রাটই এভাবে তাদের সবাইকে নিজের পাশে একত্রিত করতে পারেনি। দলে দলে বিভক্ত ক্ষয়িষ্ণু রাজনীতি, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, পরস্পরের প্রতি বিষোদগার অন্যসব সম্রাটদের এসব নিয়েই দেশ শাসন করতে হয়েছে। কিন্তু ইয়াযদগিরদ পুরো সাম্রাজ্যেকেই রণাঙ্গনে জড়ো করতে পেরেছিলো।

'নিজে ফৌজের কমান্ড নাও তারপর মুসলমানদেরকে এমনভাবে পরাজিত করো যাতে কোনদিন পারস্যের সীমান্তের দিকে তাকাতেও দুঃসাহস না করে'– এসব বলে ইয়াযদগিরদই রুস্তমকে রণাঙ্গন পর্যন্ত যেতে বাধ্য করেছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে– এই লড়াইয়ে পারসিকরা যদি বিজয়ী না হতে পারে তবে পারস্যের শাহেনশাহী চিরতরে খতম হয়ে যাবে। ওদিকে মুসলমানদের যদি পরাজয় ঘটে তবে মদীনার মসজিদ পর্যন্ত পারসিকদের পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে। মুসলমানদের অবস্থা যতই নাজুক হোক কোথাও থেকে তাদের কোন ধরনের সেনাসাহায্য পাওয়ার আশা নেই। কারণ সিরিয়ায় রোমকদের বিরুদ্ধে ফৌজের বড় একটা অংশ লড়ছে। সেখানকার মুসলমানদের অবস্থাও দুর্বল করলে চলবে না।

যুদ্ধক্ষেত্র নিজ দেশের মাটিতে হওয়াতে পারসিকরা ছিলো দারুণ সুবিধাজনক অবস্থায়। যুদ্ধের খবরাখবর কাদিসিয়া থেকে অল্প সময়ে মাদায়েন পর্যন্ত পৌঁছার জন্য তারা শ'গজ দূরে দূরে সংবাদবাহক চৌকি দাঁড় করিয়ে দেয়। উঁচু আওয়াজে একজন কিছু বললেও আরেকজন শুনতে পেতো। ইয়াযদগিরদের হুকুম ছিলো প্রতিটি মুহূর্তের খবরই যেন তাকে পৌঁছানো হয়।

মুসলমানদের স্পষ্টতই এই সুবিধা ছিলো না। তবুও আমীরুল মুমিনীন হুকুম দিয়ে রেখেছিলেন, খুব সামান্য ব্যাপারও তাকে জানাতে হবে। যাতে তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ সময়মতো দিতে পারেন। সংবাদ দ্রুত আদান প্রদানের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। উন্নত জাতের তেজস্বী ঘোড়া ও কাসেদের ক্লান্ত ঘোড়া বদলানোর জন্য সামান্য সামান্য ব্যবধানে ফৌজী চৌকির ব্যবস্থা করলেন।

ইয়াযদগিরদের কাছে রুস্তমের পয়গাম পৌঁছলো যে, সে রণাঙ্গনে ফৌজ নিয়ে যাচ্ছে। শিগগিরই লড়াই শুরু হচ্ছে।

'আমি নিশ্চিত পরবর্তী পয়গাম অনেক বড় সুসংবাদ বয়ে আনবে'- রুস্তমকে জবাবী পত্রে ইয়াযদগিরদ লিখেছিলো।

ওদিকে সাদ (রা) এর দূত মদীনায় পৌঁছে। তাতে লেখা ছিলো- পারসিকরা রণাঙ্গনে জড়ো হচ্ছে এবং পরবর্তী পয়গাম পৌঁছতে পৌঁছতে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে।

জবাবী পয়গামে উমর (রা) গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা লিখলেন। এর মধ্যে একটা ছিলো- দুশমনকে যতই প্ররোচিত করো না কেন তোমরা নদীর ওপারে যাবে না কখনো। পারসিকদের নদীর এপারে আনতে চেষ্টা করবে। তখন তোমাদের সামনে থাকবে নদী আর পেছনে আরবের বিশাল মরু। দুশমনকে যদি তোমরা পিছু হটাতে পারো তবে তারা নদীতে পালানোর পথ খুঁজবে এবং নদীগর্ভে হারিয়ে যাবে। দুশমন যদি তোমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে তবে মরুর বিশাল জায়গা জুড়ে তোমাদের স্থান হয়ে যেতে অসুবিধা হবে না। দুশমন মরুতে তোমাদের খুঁজতে গেলে নিশ্চিত বালুর রাজ্যে হারিয়ে যাবে।

শহীদ হওয়ার আগে মুসান্না ইবনে হারিসাও একথাগুলোই ওসিয়তস্বরূপ সাদ (রা) এর জন্য বলে গিয়েছিলেন। উমর (রা)ও সেই কথাগুলোই বললেন।

যুদ্ধের ডামাডোল মদীনা ও মাদায়েনের আবহাওয়া এমন সরগরম করে দিলো যেন কবরের মৃতও কবর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। মদীনায় তো উমর (রা) প্রত্যেক নামাযের পর মুজাহিদদের বিজয় কামনা করে দুআ করতেন। সঙ্গে সঙ্গে একথা অবশ্যই বলতেন যথাসম্ভব সেনাসাহায্য প্রস্তুত রাখো। সংখ্যায় তা যত নগণ্যই হোক।

বলতে গেলে পারস্য অভিযান মুসান্না ইবনে হারিসাই সূচনা করেছিলেন এবং এ অভিযানে থেকেই তিনি শহীদ হয়েছেন। মুসান্নার শাহাদাতে উমর (রা) অত্যন্ত মর্মাহত

হয়েছিলেন। এমন দক্ষ একজন সালার হারানোর পর যে কোন শাসকই সে অভিযান মুলতবী ঘোষণা করতেন। কিন্তু এখানে ব্যাপার ছিলো অন্য। খসরু পারভেজ রাসূলুল্লাহ (স) এর পত্র মোবারক নিয়ে যে ঘৃণ্য আচরণ করেছিলো সেকথা উমর (রা) এর মতো নবীপ্রেমিক কোন মুসলমানের পক্ষেই ভুলে যাওয়া সম্ভব ছিলো না।

রাসূলুল্লাহ (স) জবাবে কিসরা পারভেজ সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে আরো দ্বিগুণভাবে ফলে গিয়েছিলো। জীবদ্দশায় সে তার সবচেয়ে প্রিয় পুত্রের হাতে লাঞ্ছিত হয়, বন্দী হয় এবং শেষে নিহতও হয়। তার জন্য আরো বড় শাস্তি ছিলো তার প্রিয়তমা স্ত্রী তারই পদসেবী জেনারেলের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলে। কিসরা পারভেজ তার যে গভর্নরকে নির্দেশ দিয়েছিলো রাসূলুল্লাহ (স)কে গ্রেফতার করে তার কাছে পাঠাতে, সেই গভর্ণর বাযানও ইসলাম গ্রহণ করেছিলো।

কিসরা পারভেজের সেই দুঃসাহস উমর (রা) এর প্রতিটি রক্তকণাকে সততই মথিত করছিলো। তিনি যে কোন মূল্যেই হোক রাসূলুল্লাহ (স) এর ভবিষ্যদ্বাণী- 'আমার পূর্বেই ইসলাম মাদায়েন পৌঁছে যাবে'– বাস্তবায়ন দেখতে চাইছিলেন। কিসরা পারভেজ যেভাবে ইসলামের পয়গামকে টুকরো টুকরো করে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিলো পারস্য সাম্রাজ্যও যেন সেভাবে উড়ে যায় এই ছিলো তার কামনা- প্রার্থনা।

এছাড়াও পারস্য তথা ইরাকের সুবিশাল ভৌগোলিক গুরুত্বও কম ছিলো না। ওখানকার মাটি যেন সোনা ফলাতো। মুসলমানদের হাতে এই এলাকা বিজিত হলে শুধু ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিই নয়, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও তখন অর্জিত হবে।

ওদিকে মাদায়েনে ইয়াযদগিরদের অবস্থা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। রুস্তমকে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করা গেছে এই খুশী ইয়াযদগিরদের মনে ধরছিলো না। রুস্তমকে সে পয়গাম পাঠালো –

'রুস্তম! মাদায়েনে যেন আর পরাজয়ের সংবাদ না আসে। তোমাদের হাতিই এই সামান্য সংখ্যক ফৌজ পিষে মারার জন্য যথেষ্ট। যার সংখ্যা মাত্র চল্লিশ হাজার। এদের সিপাহসালার তাঁবুতে শুয়ে রীতিমতো ধুঁকছে। এক গুপ্তচর আমাকে জানিয়েছে মুসলমানদের সিপাহসালার এমন এক কঠিন রোগে আক্রান্ত যে, সে এক কদমও চলার উপযুক্ত নয়। ঘোড়ায় বসা তো দূরের কথা। এতে মুসলমানদের অবস্থা লাগামবিহীন উটের মতো হবে। মনে করবে এই দিক বিদিকশূন্য উট তোমার। এটাও মনে রেখো মুসলিম ফৌজের কিছু অংশ তাদের সিপাহসালারের প্রতি ক্ষুব্ধ।'

সাদ (রা)-এর এই শারীরিক অবস্থার কথা রস্তমের জানা ছিলো না। এই মূল্যবান সংবাদটি জানার পর রুস্তম তার জেনারেলদেরকে জানালো শত্রুপক্ষের সিপাহসালার নিজের তাঁবুতে শয্যা নিয়েছে।

ঃ 'মুসলমানদেরকে যদি তোমরা একবার এলোমেলো করে দিতে পারো তবে বিজয় আমাদের নিশ্চিত'– রুস্তম জেনারেলদেরকে বললো– 'ওদের শৃংখলা লণ্ডভণ্ড করে দেবে।'

❖ ❖ ❖

এই সংবাদ ভুল ছিলো না, বাস্তবেই কয়েকজন গোত্রীয় সরদার সাদ (রা) এর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলো না। এর কারণও ছিলো। সাদ (রা)-এর অসুস্থতার খবর ফৌজের কাছে গোপন রাখা হয়। মুজাহিদরা এই খবর তৎক্ষণাৎ জানতে পারলে তাদের মনোবল ভেঙে যাওয়ার আংশকা ছিলো।

যে ময়দান তিনি যুদ্ধের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। সে ময়দানের একেবারে কাছেই 'মহলে কুদায়েস' নামক এক পোড়া জীর্ণ মহল ছিলো। রণক্ষেত্র সংলগ্ন মহলের একটি অংশ তখনো জীর্ণ হয়নি। মহলের এ অংশটি দুই তলা বিশিষ্ট ছিলো। মহলের ওপর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত লড়াইয়ের পূর্ণ দৃশ্য দেখা যেতো। সাদ (রা) নির্দেশ দিলেন তাকে যেন সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়। রাতে পুরো লশকর যখন শুয়ে পড়লো সাদ (রা) কে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। সাধারণ চার পায়া থেকে একটু উঁচু ধরনের চারপায়ার ব্যবস্থা করা হলো। তাকে এর ওপরেই শোয়ানো হলো।

লড়াই চলাকালীন ময়দানে একজন প্রত্যক্ষ সিপাহসালারের অবশ্যই প্রয়োজন ছিলো। সাদ (রা) খালিদ ইবনে উরতুফাকে তার স্থলাভিষিক্ত করলেন। এরপর পুরো ফৌজকে এটা জানা আবশ্যক হয়ে পড়েছিলো যে, লড়াই চলাকালীন তারা কার কাছ থেকে নির্দেশনা নেবে।

ঃ 'মুজাহিদীনে ইসলাম!'– পুরো ফৌজের মধ্যে ঘোষণা করা হলো– 'সিপাহসালার সাদ ইবনে ওয়াক্কাস (রা) গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এমনকি তিনি ঘোড়ায়ও বসতে পারেন না। তাই তিনি তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে খালিদ ইবনে উরতুফাকে সিপাহসালার নিযুক্ত করেছেন।'

সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে সবসময়ই ছিলো সুদৃঢ় ঐক্য। কিন্তু গোত্রীয় সরদারদের স্বভাবে তখনো একে অপরের চেয়ে অগ্রগামী থাকার মানসিকতা রয়ে গিয়েছিলো। অবশ্য লড়াইয়ের সময় তাদের এই মানসিকতা তেমন বিঘ্ন ঘটাতো না। বরং এই মানসিকতাই তাদেরকে আরো বীরত্ব প্রদর্শনের সুযোগ করে দিতো। কিন্তু সাদ (রা) এর ব্যাপারে যে তাদের কি হলো তা এক রহস্য হয়ে দেখা দিলো। ফৌজের কোন কোন অংশে আলোচনা সমালোচনা শুরু হয়ে গেলো যে, সাদ (রা) পারসিকদের এত বড় ফৌজ দেখে ময়দান থেকে আড়ালে থাকতে চাইছেন। এজন্য তিনি অসুস্থতাকে অজুহাত হিসাবে নিয়েছেন।

মুসলমানদের এই ফৌজে ইরাকের কিছু আরবী ঘরনার লোকেরাও যোগ দিয়েছিলো। আর আরবের কিছু খ্রিষ্টান গোত্র তো পূর্বেই মুসলিম ফৌজে যোগ দিয়ে তাদের অসাধারণ যুদ্ধ-নিপুণতা দেখিয়ে দেয়। ইরাকের আরবী সৈন্য ও আরবের খ্রিষ্টান সৈন্যদের সঙ্গে কয়েকজন ইহুদীও সুযোগ বুঝে মুসলিম ফৌজ ভিড়ে যায়। তারাই ফৌজে এই অপবাদ ছড়িয়ে দেয় যে, সাদ (রা) আসলে অসুস্থ নয়। লড়াই থেকে দূরে থাকার জন্য বাহানা ধরেছেন।

ওদের প্ররোচনায় গোত্রীয় সরদাররা সাদ (রা) এর ওপর বুযদিলির অপবাদ আরোপ করে। সারা ফৌজে এমন এক আবহ তৈরী করলো যে, এক কবি সৈনিক সাদ (রা) সম্পর্কে এমন কবিঃতাও রচনা করলো যে, 'আমরা  লড়ে যাবো। আল্লাহ একদিন আমাদের বিজয় দেবেন।

কিন্তু সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস কাদিসিয়ার দরজার সঙ্গে লেপ্টে থাকবেন।

ময়দান থেকে আমরা ফিরে যাবো

তখন আমাদের কত স্ত্রী বিধবা হয়ে  যাবে।

কিন্তু সাদের স্ত্রী সধবাই থাকবেন।'

সাদ (রা) এর সেবা শুশ্রূষার জন্য সালমা তার সঙ্গেই ছিলো। অন্য সবার স্ত্রীদের অন্যত্র নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেয়া হয় তাই। অপবাদ আরোপকারীরা এই অভিযোগও করলো যে, সাদ (রা) সুখ উপভোগের জন্য তার নববধূকে সঙ্গে রেখেছেন। সালমা যেমন বুদ্ধিমতি অকুতোভয় সাহসী ছিলো এর চেয়েও অধিক সুন্দরী ছিলো।

ঃ 'সাদ!' – একদিন স্থলাভিষিক্ত সিপাহসালার খালিদ সালমার সামনে বললেন– 'আপনি কি জানেন না যে, আপনার ব্যাপারে কি অপবাদ ছড়ানো হচ্ছে? খোদার কসম! আপনার লাঞ্ছনার চেয়ে আমাদের পিছু হটার লাঞ্ছনাও সহনীয়।'

ঃ 'আরে কি অলুক্ষণে কথা মুখ থেকে উগড়ে দিলে ইবনে উরতুফা!' – সাদ (রা) উত্তেজিত হয়ে বললেন– 'খোদার কসম! তুমি তো একথাই বলতে চাচ্ছো যে, আমি তোমাকে সিহপাহসালার নিযুক্ত করে এবং এই মর্যাদা দিয়ে ভুল করেছি।'

খালিদ ইবনে উরতুফা সাদ (রা)কে জানালেন ফৌজে তার ব্যাপারে কি কি কথাবার্তা চলছে এবং তার প্রতি কি সব অপবাদ লাগানো হচ্ছে। খালিদ কয়েক জন সরদারের নামও বললেন যারা এসব উস্কানি দিচ্ছে।

ঃ 'আমাকে উঠিয়ে ফৌজের মুখোমুখি করো'– সাদ (রা) বললেন– 'আমি দরজা বা জানালায় বসে কথা বলবো। পুরো লশকর আমাকে দেখতে পাবে।'

ঃ 'না' – সালমা বললো– 'তাকে উঠিয়ে নিচে নিয়ে যাও এবং লশকরের সামনে নিয়ে যেতে সাহায্য করো।

খালিদ ইবনে উরতুফাসহ দু'জন লোক তাকে নিচে নিয়ে গেলো। ফৌজের সবাইকে আগেই একত্রিত করা হয়েছিলো। তাকে লোক দু'জনের কাঁধের ওপরে রেখে  নিয়ে যেতে দেখলো লশকরের কলেই। সবাই দেখলো সাদ (রা) এর চেহারায় বেদনার তীব্র ছাপ, তাকে কাঁধের ওপর করে নিয়ে যাওয়াতে ব্যথার গতিক আরো চরমে উঠলো। তার চেহারায় শুধু যন্ত্রণার ছাপই ছিলো না। ক্রোধের ছাপও ছিলো। এক মুজাহিদের গলা থেকে বেরিয়ে এলো।

ঃ 'সিপাহসালার তো সত্যিই মারাত্মক অসুস্থ তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

ঃ 'ইবনে ওয়াক্কাস! আমাদের কানে মিথ্যা ঢুকানো হয়েছিলো।'

ঃ 'তাঁকে মদীনায় পাঠিয়ে দাও।'

ঃ 'মুসান্না ইবনে হারিসাও রোগকে এমন চেপে রেখে শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গিয়েছেন।'

ঃ 'সাদ (রা) কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না।'

ঃ 'খোদার কসম! আমরা মেনে নিলাম, আমাদের সিপাহসালার মাযুর।'

কথা বাড়তেই লাগলো। লশকরের সবাই নিশ্চিত মনে মেনে নিলো তাদের সিপাহসালার সাদ অসুস্থতার দরুন অক্ষম হয়ে পড়েছেন। সাদ (রা) কোন সাধারণ পর্যায়ের সালার ছিলেন না। যে ময়দানেই তার কদম পড়েছে সেখানেই বিজয় তার পায়ে চুমু খেয়েছে। সাদ (রা) তার গোত্রের শীর্ষস্থানীয় সরদার ছিলেন। এই ফৌজে তিনি তার গোত্রের তিন হাজার সেনা স্বেচ্ছাসেবক দিয়েছিলেন। তারপর একহাজার তেজদীপ্ত ঘোড়সাওয়ারও দিয়েছিলেন। সাদ (রা) সবচেয়ে বড় শ্রেষ্ঠত্ব হলো। তিনি শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণের একজন ছিলেন। কেউ কখনো কল্পনাও করেনি সাদ (রা) কখনো অসুস্থতাকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে লড়াই থেকে দূরে থাকবেন।

সাদ (রা) ছিলেন বনী ওহাইব গোত্রের। লশকরে এই গোত্রেরই চার হাজার মুজাহিদ ছিলো। তারা তাদের গোত্রের সরদারের বিরুদ্ধে কোন কথা বরদাশত করতে পারতো না। কিন্তু এতদিন তারা সাদ (রা) এর রোগগ্রস্ত অবস্থা দেখেনি। তাই এ ব্যাপারে নীরব ছিলো। এখন সাদ (রা) এর এই কঠিন অবস্থা দেখে তার গোত্রের সবাই ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। উঁচু আওয়াজে তারা অপরাধীদের মুন্ডপাত করতে লাগলো। উমর (রা) মুসান্নার শাহাদাতের পর সাদ (রা)কে এই লশকরের নেতৃত্ব দিয়ে বলেছিলেন, 'সাদ! তুমি বনী ওহাইবের সাআদাত-সৌভাগ্যের প্রতীক।'

সাদ (রা) তার উভয় হাত ওপরে উঠালেন। সবাই নীরব হয়ে গেলো।

ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর উম্মতে কি তবে আজ হক ও সত্যের চেরাগ নিভে গেছে?' সাদ (রা) বললেন – 'যদি তা না হয় তবে যারা এসবে জড়িত ছিলো তারা নিজেরাই কেন সামনে আসছে না?'

দু' চারজন নতশিরে সাদ (রা) এর সামনে এসে দাঁড়ালো। তারা কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে বললো এরা এরা এই এই কথা ছড়িয়েছে। এভাবে আরো কয়েকজন অপরাধীর মতো মুখ করে সাদ (রা) এর সামনে এসে দাঁড়ালো।

কথায় কথায় আরেকটি রহস্যও বেরিয়ে এলো। কয়েকদিন আগে আরবের এক এলাকার নাম করে দু'লোক মুসলিম ফৌজে যোগ দিয়েছিলো। সাদ (রা) এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার ব্যাপারে তারাই সবসময় অগ্রগামী ছিলো। এব্যাপারে তারা দিন রাত তৎপর ছিলো। সমবেত ফৌজের মধ্য থেকে তাদের দু'জনের নাম ধরে ডাকা হলো। কোন সাড়া মিললো না। অনেক খুঁজেও তাদের হদিস পাওয়া গেলো না। শুধু তাই নয়, এরপর আর তাদেরকে কখনো ফৌজে দেখা যায়নি।

সবাই বুঝলো, ওরা দু'জন কুচক্রী ইহূদী ছিলো। মুসলিম ফৌজের সিপাহসালারের বিরুদ্ধে বিষোদঘার ও ফৌজে বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য এসেছিলো। ওরা তো ওদের কাজ করে চলে গেলো। কিন্তু সাদ (রা) জড়িত মুজাহিদদের ছাড় দিতে রাজী ছিলেন না। তাকে যে দু'জন লোক কাধের ওপর ধরে রেখেছিলো তারা প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। সাদ (রা) আরো দু'জনকে বললেন তাকে তাদের কাঁধে উঠিয়ে নিতে, নির্দেশ পালিত হলো। তারপর যারা অপবাদ ছড়ানোর ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ যুগিয়েছিলো। তাদের দিকে তিনি মনোযোগ দিলেন।

ঃ 'খোদার কসম! তোমরা সৌভাগ্যবান এই কারণে যে, তোমরা এখন রয়েছো যুদ্ধক্ষেত্রে' – সাদ (রা) গম্ভীর গলায় বললেন 'কোন দুশমনের অস্ত্রের মুখোমুখি যদি আমরা না হতাম তবে তোমাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হতো। তোমরা আমার বদনাম করেছো বলে তোমাদেরকে আমী অপরাধী করছি না, আমি তোমাদের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান নই। তোমাদের মতোই একজন সাধারণ মানুষ আমি। তোমাদের অপরাধ হলো, তোমরা এক সংগঠিত ফৌজের সিপাহসালারের ওপর ভিত্তিহীন অপবাদ আরোপ করে সৈন্যদের মাঝে অনৈক্যের জাল বিস্তার করেছো। তোমরা সৈন্যদের মনোযোগ শত্রুদের আক্রমণ থেকে অন্যদিকে সরিয়ে নিয়েছো। শুধু কি তাই? সৈন্যদের মাঝে তোমরা এমন বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়েছো যে, যে কোন সময় তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারতো। কোন অপরিচিত ব্যক্তি যদি আমার বিরুদ্ধে এসব বদনাম রটাতো তবে তোমরাই তো তাকে গ্রেফতার করে আমার কাছে নিয়ে আসতে। অথচ আজ তোমরাই সেই ঘৃণ্য পথে হেটে বেড়িয়েছো,' সাদ (রা) খালিদ ইবনে উরতুফার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এদের সবাইকে এই মহলে কয়েদী করে রাখো।'

ফৌজের সবাই স্বীকার করে নিলো তাদের অপরাধ এত জঘন্য ছিলো যে, অন্যকোন দেশের বা সেনদলের সিপাহসালার এ বিচার করলে এদের সবাইকে মৃত্যুদন্ড দিতো। সাদ (রা) তাদেরকে খুব মামুলি শাস্তি দিয়েই ক্ষ্যান্ত রইলেন।

কয়েদীদের মধ্যে আরবের এক প্রসিদ্ধ কবি আবু মাজান সাকাফীও ছিলো। সে শুধু কবিই ছিলো না। তাকে রণাঙ্গনের চিতা বলা হতো। কবির খ্যাতির চেয়ে তখন তার বীরত্বের খ্যাতিই ছিলো বেশি। সিপাহসালারের বিরুদ্ধে এই ভিত্তিহীন বিষোদগারে সেও জড়িয়ে পড়ে। আবু মাজান সাকাফীর সবচেয়ে বড় দোষ ছিলো সে ছিলো মদ্যপায়ী। মদ পান করার কারণে কয়েকবার তাকে জেলও খাটতে হয়েছে। এ অভিযানের শুরুতে সে যখন জানতে পারলো ইরাক অভিযানে পারসিকদের বিরুদ্ধে নতুন মুজাহিদদের তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে আবু মাজান অভিযানে নাম লিখিয়ে ফৌজের সঙ্গে চলে এলো। সাদ (রা)এর বিরুদ্ধ কটাক্ষ করে কবিতাটি রচনা করে ছিলো আবু মাজান সাকাফীই।

সবাইকে পায়ে শিকল দিয়ে মহলের বিভিন্ন কুঠুরীতে কয়েদীদের বন্দী করা হলো।

মুজাহিদরা যখন দেখলো দোষীদেরকে অপরাধের তুলনায় সাদ (রা) অনেক লঘু শাস্তি দিয়েছেন সবার মন তখন তার প্রতি মুগ্ধতায় ভরে উঠলো। লশকরের মধ্য থেকে অভিভূত কণ্ঠে বিভিন্ন আওয়াজ উঠলো।

ঃ 'সাদ! আমরা আপনার আনুগত্য স্বীকার করে নিলাম।'

ঃ 'আমাদের মনের ময়লা দূর হয়ে গেছে। সাদ (রা) কেই আমরা ফৌজের প্রধান হিসেবে মেনে নিলাম।'

ঃ 'লাব্বাইক সিপাহসালার!'

ঃ 'লাব্বাইক আমীরে লশকর !'

ঃ 'লাব্বাইক সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস!'

ঃ 'খোদার কসম! – এই ভিন্ন আওয়াজ ছিলো বুজায়লা গোত্রের সরদার জারীর ইবনে আবদুল্লাহর– 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বায়আত করে অঙ্গীকার করেছিলাম যাকেই আল্লাহ ইলম ও আমল দান করবেন চাই সে কোন হাবশী গোলাম হোক না– আমি তারই অনুগত হয়ে যাবো, আমি আমার পুরো গোত্রের সঙ্গে সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের আনুগত্য স্বীকার করে নিলাম।'

ঃ 'আমি খালিদ ইবনে উরতুফাকে আমার স্থলে সিপাহসালার নিযুক্ত করলাম' সাদ (রা) কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার ঘোষণা করলেন– 'মহলের ওপর থেকে আমি নির্দেশ দেবো। তোমাদের পর্যন্ত সেই নির্দেশ পৌছে দেবে খালিদ ইবনে উরতুফা।'

কথা শেষ করার পর সাদ (রা) অনুভব করলেন তার বাতগ্রস্ত পা এবং সমস্ত শরীর ব্যথায় টন টন করছে। চোখ কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। ইশারায় কোনক্রমে তিনি তাকে নিয়ে যেতে বললেন।

সাদ (রা)কে নিয়ে তার বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলো। বিছানায় তিনি নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইলেন। অনেক কষ্টে তিনি ব্যথা ভুলে থাকতে চেষ্টা করছিলেন। কখনো কখনো সবকিছু আঁধার হয়ে তাকে অচেতন করে দিচ্ছেলো। ডাক্তার সব সময় তার সঙ্গেই থাকতেন। ইনি সেই ডাক্তারই ছিলেন যিনি মুসান্না ইবনে হারিসাকে বলতে বলতে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন যে, আপনি আরাম করুন। আরাম করুন, না হয় পাঁজরের এই যখমই আপনার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু মুসান্নার শরীর-মন জুড়ে ছিলো জিহাদের উন্মাতাল আকুতি। নিজেকে তিনি কখনো স্থির হয়ে বসতে দেননি। ক্রমেই তার এই যখম তাকে মৃত্যুর দুয়ারে নিয়ে গেলো। মুসান্নার জায়গায় এখন সাদ (রা)। ডাক্তার তাকেও সব সময় বলতে লাগলেন আরাম করুন, আরাম করুন।

ঃ 'সাদ!' – বর্ষীয়ান ডাক্তার সাদ (রা)কে কোমল গলায় ডাকলেন, সাদের নাড়ীর ওপর ছিলো তার হাত। চোখ খুললেন সাদ (রা)।

ঃ 'মদীনায় চলে যান আপনি' – ডাক্তার বললেন– 'এখানে থেকে আপনি পেরেশান হওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারবেন না।'

ঃ 'মুসান্না কি যখমী হয়ে ফিরে গিয়েছিলো?' – সাদ (রা) জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ 'অনেক বলেছি তাকে' ডাক্তার জবাব দিলেন– 'কিন্তু তিনি শুনেননি।'

ঃ 'তাহলে আমি কেন শুনতে যাবো'? – সাদ (রা) জিজ্ঞেস করলেন– 'মদীনায় গেলে কি আপনি আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবেন?'

ঃ 'জীবন বা মৃত্যু মালিক তো আল্লাহ্ তাআলা সাদ!'

ঃ 'তাহলে বান্দাকে তিনি যে অধিকার দিয়েছেন তা কেন করতে দিবেন না' – সাদ (রা) বললেন– 'অগ্নি পুজারীদের সেই লশকরকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না যারা কালা পাহাড়ের মতো ধ্বংস লীলা হয়ে সারা আরবকে গ্রাস করতে ধেয়ে আসছে? ..... আমাকে পিছু হটাতে বাধ্য করবেন না।'

ঃ 'কাতেবকে ডেকে পাঠাও' – সালমার দিকে তিনি মুখ করে বললেন– 'মুজাহিদদেরকে আমি আরো কয়েকটি কথা বলতে চাই। অন্যের কাঁধের ওপর বসে বসে আমি আর কিছু বলতে চাই না। আমার কথা কাতেব দিয়ে লিখিয়ে দেই। ইবনে উরতুফা ফৌজকে পড়ে শুনাবে।'

কাতেব এসে গেলো। সাদ (রা) তার ফৌজের উদ্দেশে পয়গাম লেখালেন।

'সমস্ত প্রশংসা পরম দয়াময় আল্লাহ্র জন্য। আমার স্থলে আমি খালিদ ইবনে উরতুফাকে তোমাদের আমীর নিযুক্ত করেছি। অসুস্থতা আমাকে এতখানি অক্ষম না করে দিলে এই মহান দায়িত্ব আমিই পালন করতাম। তোমরা সবাই দেখেছো ব্যথার তীব্রতা আমার বুকের সঙ্গে মাথা লেপ্টে দিয়েছে। তোমাদের প্রথম ফরয কাজ হবে খালিদ ইবনে উরতুফার পূর্ণ আনুগত্য করা। তার প্রতিটি হুকুম আমার হুকুম মনে করবে।'......

'তারপর মনে সবসময় এই কথাটির উপস্থিতি রাখবে যে, সবার ওপরে মহান আল্লাহই সত্য। তিনি এক, তার কোন শরীক নেই, আল্লাহ্র কোন বাণীই কখনো ভুল প্রমাণিত হবে না। পবিত্র কুরআনের এই বাণীর প্রতি তোমাদের মনোযোগ নিবিড় করো– "আমি যবুর গ্রন্থে বলেছি এই পৃথিবীর উত্তরাধিকার আমার নেক বান্দারই হবে"– যদি তোমরা আল্লাহ্র নেক বান্দা হয়ে থাকো তবে এই পৃথিবীর উত্তরাধিকার তোমরাই। এটা মহান আল্লাহ্র অঙ্গীকার। গত তিন বছর ধরে মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে পারস্য তথা ইরাকের জমিনে বিচরণ করার সুযোগ দিচ্ছেন। এই জমিনের ফলিত ফসল তোমরা খাচ্ছো। এখানকার লোকদের দ্বারা তোমরা তোমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সব পূরণ করে নিচ্ছো। তোমাদের নির্দেশ এখানকার কেউ অমান্য করলে তাকে তোমরা হত্যা করতে পারো। তোমরা আরবের সম্মানিত নাগরিক। তোমাদের গোত্রের লোকেরা তোমাদেরকে নিয়ে গর্ববোধ করে। তোমরা যদি পার্থিব মোহ, লোভ আর খ্যাতিকে পায়ে ঠেলে আখেরাতকে সামনে রাখো, মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে পৃথিবীর সব কল্যাণে ভূষিত করবেন। আর যদি কাপুরুষতার পথ অবলম্বন করো এবং মনোবল ভেঙে বসে থাকো তবে তোমাদের পায়ের নিচের মাটি সরে যাবে। তখন দুনিয়ায় লাঞ্ছিত অপদস্থ তো হবেই আখেরাতেও থাকবে অনন্তকালের শাস্তি।'

ঃ 'পয়গামটি নিয়ে যাও, পুরো লশকরকে তা শুনিয়ে দাও'– সাদ (রা) নির্দেশ দিলেন।

❖ ❖ ❖

খালিদ ইবনে উরতুফা সাদ (রা) এর এই পয়গাম পুরো লশকরকে শুনিয়ে দিলেন। লশকরের প্রত্যেকেই সাদ (রা) এর বেদনাকাতর মুখ প্রত্যক্ষ্য করেছিলো। এজন্য সকলের মনেই তার ব্যাপারে দুঃখবোধ এবং তীব্র ভাবাবেগ দানা বাঁধতে সময় লাগলো না। ফলে সাদ (রা) এর এই পয়গাম মুজাহিদদের মনে এমন দাগ কাটলো যেন তাদের মধ্যে আবার নতুন প্রাণ সঞ্চার করা হয়েছে। আসেম ইবনে আমরের সহজাতই ছিলো অসাধারণ বীরত্বের। সারিবদ্ধ ফৌজের ভেতর থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে আবেগ সিক্ত গলায় তার অভিব্যক্তি ব্যক্ত করলেন।

ঃ 'আমার বন্ধুরা!'– আসেম ইবনে আমর উঁচু গলায় বললেন– 'সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসা (রা) ঠিক কথাই বলেছেন। মহান আল্লাহ এই দেশের লোকদেরকে তোমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন। তোমরা এখানে এসেছো প্রায় তিন বছর হতে চললো। এখানকার লোকদের মধ্যে তোমাদের দাপট ও গভীর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে। সম্মানের সঙ্গেই তোমরা এখানে রয়েছো। আল্লাহও তোমাদের সঙ্গে আছেন। অগ্নি পূজারীদের মোকবেলায় তোমরা যদি পরম ধৈর্য, সাহস ও দৃঢ়তা নিয়ে অটল থাকো তবে এখানকার ফলিত সম্পদ, ধন-সম্পদ এবং এই দেশের সবই তোমাদরে থাকবে। আল্লাহ তোমাদের কাপুরষতা ও ভীরুতা থেকে রক্ষা করুন। যদি তোমরা তীর তলোয়ারের ব্যবহার ভীরুতা ও আনাড়ী হাতে করো তবে লজ্জাকর পরাজয় ছাড়া এদেশের কিছুই তোমরা পাবে না। সেদিনের কথা স্মরণ করো যেদিন আমাদের কিছুই ছিলো না। আর আজ দেখো অফুরন্ত নেয়ামত আমাদের চারপাশে। তোমাদের পেছনের প্রকৃতিকে দেখো। উত্তপ্ত কংকর আর বালির টিলা ছাড়া আর কিছুই নেই। ঘন ঝাড়ের ছায়াময় আড়ালও নেই। যেখানে তোমরা আশ্রয় নিতে ছুটে যাবে........ মনে আল্লাহকে এবং আখেরাতকে সবসময় লালন করো।'

যদিও এক মুজাহিদের কণ্ঠেই এ অভিব্যক্তির উচ্চারণ ছিলো, কিন্তু প্রতিটি মুজাহিদকেই তাদের ভেতরের পুঞ্জিভূত একই উচ্চারণ আপ্লুত করছিলো। আবেগঘন শ্লোগানে তারা এর প্রকাশ ঘটাচ্ছিলো। মহলের জানালা থেকে সাধ থেকে সাদ (রা) তৃপ্তির অশ্রু নিয়ে তা দেখছিলেন।

আচমকা সবাই নীরব হয়ে গেলো। সবার দৃষ্টি নদীর কূলে গিয়ে ঠেকলো, নদী পার হয়ে দুই ঘোড়সওয়ার এদিকে আসছিলো। ওদের গায়ে ফারসী সৈনিকদের পোষাক ছিলো। মুসলিম লশকরে ফিসফিসানি শুরু হয়ে গেলো। একে অপরকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো এরা কি জন্য এসেছে। সিপাহসালার খালিদ ইবনে উরতুফা ঘোড়ার রুখ তাদের দিকে করে দিলেন, কিন্তু আর আগে বাড়লেন না। সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

ফারসী ঘোড়সওয়াররা সামান্য দূরেই থেমে গেলো।

ঃ 'আমরা বন্ধুর মতো এসেছি। এক ঘোড়সওয়ার উচুঁ আওয়াজ আরবিতে বললো– 'তোমাদের সিপাহসালারের সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ করতে চাই।'

ঃ 'এগিয়ে এসো' – খালিদ ইবনে উরতুফা বললেন– 'বন্ধু হয়ে এসেছো বন্ধুর মতোই ব্যবহার পাবে।'

দুই ফারসী এগিয়ে এলো।

ঃ 'ইবনে উরতুফা!' মহল থেকে সাদ (রা) চিৎকার করে বললেন- 'এদেরকে আমার জানালা বরাবর নিচে নিয়ে এসো।'

সাদ (রা) উঁচু খাটের ওপর একেবারে জানালা ঘেঁষে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলেন। তার বুকের নিচের বালিশটি বেশ উঁচু ছিলো। এতে তিনি বাইরের সব কিছু খুব ভালো করেই দেখতে পাচ্ছিলেন। বাহির থেকেও তার চেহারা স্পষ্ট দেখা যেত। জানালা ছিলো শিকবিহীন- উন্মুক্ত।

খালিদ ইবনে উরতুফা উভয় ফারসীকে মহলের নিচে ওপরের জানালা বরাবর নিয়ে গেলেন।

তিন-চার জন মুহাফিজ ঘোড়সওয়ারও তাদের সঙ্গে রইলো, দুই ফারসী ঘোড়সওয়ারের মধ্যে একজন ছিলো রুস্তমের দূত। আরেকজন ছিলো তার দুভাষী। আরবী ভাষায় সে বেশ দক্ষ ছিলো।

ঃ পারস্যের প্রধান সেনাপতি রুস্তমের পক্ষ থেকে আরবী সিপাহসালারকে অভিবাদন' দূত বললো, দুভাষী তার ভাষান্তর করলো।

ঃ 'তাকেও অভিবাদন' – সাদ (রা) বললেন, 'কি পয়গাম নিয়ে এসেছো?'

ঃ পারস্য সাম্রাজ্যের গর্ব রুস্তম জিজ্ঞেস করেছেন, নদী পার হয়ে আপনারা আমাদের ও দিকে আসবেন, না আমরা নদীপার হয়ে আসবো"? – দূত বললো- 'রুস্তমে আজম বলেছেন, আপনাকে সুযোগ দেয়া হচ্ছে আপনি আপনার পছন্দের ময়দানের কথা বলে দিন।'

ঃ 'আজম আর মহাসম্মানের অধিপতি একমাত্র আল্লাহ তাআলাই' সাদ (রা) বললেন- 'রুস্তমকে তো এমনিও আজম বলা যায় না। আর আমরা তোমাদের দেশে হামলাকারী হয়ে এসেছি। রুস্তমের মধ্যে যদি কোন মর্যাদা বোধ ও ব্যক্তিত্ববোধ থাকতো তবে সে তার দুশমনকে জিজ্ঞেস করতে পারতো না তোমরা এপারে আসবে না আমরা ওপারে যাবো। আমাদের সঙ্গে লড়াই তো রুস্তম এড়িয়ে যেতে চাচ্ছে। তাকে বলে দিয়ো বুযদিলি আর কাপুরুষতা ছেড়ে নদী পার হয়ে নিজ দুশমনকে নিজ দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে যায় ... আর হে দূত! আমরা তোমাদেরকে সম্মানের সাথে বিদায় দিচ্ছি। আত্মমর্যাদাবোধ যাদের আছে তারা নিজদের দুশমনকে কিছু পুঁছে না।

দুই ঘোড়সওয়ার যাওয়ার জন্য ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিলো।

ঃ 'শোন! রুস্তমকে আরেকটি কথা বলে দিয়ো'- সাদ (রা) বললেন- 'রুস্তম যদি তার লশকরকে নদীর এপারে নিয়ে আসতে চায় তাহলে যেন একটা কথা মনে রাখে। তার ফৌজ ঐ পুল দিয়ে আবার ফিরে যেতে পারবে না। এই পুল আমাদের দখলে থাকবে। তোমরা পুলের উপর আসলে আমাদের তীর-বৃষ্টির সামনে পড়বে।'

❖ ❖ ❖

দূত ফিরে গিয়ে রুস্তমকে সাদ (রা) এর জবাব শুনিয়েছিলো।

ঃ 'সে আমাকে বুযদিল কাপুরুষ বলেছে?'– রুস্তম প্রচন্ড রাগে দাঁড়িয়ে গেলো, দাঁতে দাঁতে পিষে বললো– 'সে আমাকে আত্মমর্যাদা বোধহীন লোক বলেছে। সে কি জানে না পুরো আরবকে আমি নিমিষেই পিষে ফেলার শক্তি রাখি? .......... আমরা নদী অতিক্রম করে যাবো। আর আরবদের লাশের স্তূপ নদীতে বয়ে চলবে।'

ঃ 'আরবী সালার এটাও বলেছে যে, সে আমাদেরকে পুল দিয়ে অতিক্রম করতে দেবে না' –দূত বললো 'সে বলেছে– পুল নাকি তারা লড়াই করে দখল নিয়েছে।'

ঃ 'এই বদবখত আরবের দল' – রুস্তম রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললো– 'আমার লশকর এমনভাবে নদী পার হবে যে, মরুর এই ডাকাতরা তো দেখে হয়রান হয়ে যাবে।'

রুস্তম তখন তার জেনারেলদের নির্দেশ দিলো এখনই যেন নদী পারাপারের ব্যবস্থা করা হয়। এই নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গেই এক লাখ বিশ হাজার সৈন্যের মধ্যে ছুটোছুটি পড়ে গেলো।

রুস্তমের দিকে সাদ (রা) যে তীর ছুঁড়ে দিয়েছিলেন তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না। তিনি চাচ্ছিলেন রুস্তম উত্তেজিত হয়ে তার টালমাটাল অবস্থা ছেড়ে ময়দানে যেন নেমে পড়ে। এজন্যই তিনি রুস্তমের দূতকে বলেছিলেন রুস্তমকে হুবহু একই কথাগুলোই শোনায়। রুস্তম দারুণ চটে উঠে।

সেখানে যে নদীটি ছিলো এর নাম ছিলো আতীক নদী। বেশি বড় ছিলো না নদীটি। এই নদীর ওপর নৌকার যে প্রাচীন পুলটি ছিলো তার দখলে ছিলো মুসলমানরা।

রুস্তম দেখলো নদীর ওপর পুল বানানোর জন্য চারদিকে নৌকা খোঁজা হচ্ছে।

ঃ 'আমি এত সময় নষ্ট হতে দেবো না'– রুস্তম তার জেনারেলদেরকে বললো। ক্রোধে তার শরীর দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছিলো- 'প্রথমে নৌকা খুঁজে খুঁজে একত্রিত করবে। তারপর নদীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত নৌকা বাঁধবে। জানো এতে কত দিন চলে যাবে?' ..... আরবরা আমাদের বুঝদিল আর আত্মমর্যাদাবোধহীন বলছে। কাল সন্ধ্যা নাগাদ আমি ওদেরকে পিষে ফেলতে চাই।'

ঃ 'ফৌজ কি তবে দরিয়ার ওপর দিয়ে পার হবে?' – এক জেনারেল জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'না' রুস্তম সেই জেনারেলকে একটা রাম ধমক লাগালো– 'এভাবে নদী তো শুধু মানুষ, ঘোড়া আর হাতিই পার হতে পারে। আসবাবপত্র তো আর নিজ থেকে বয়ে যাবে না। তোমাদের সঙ্গে এত বড় লশকর রয়েছে। সবাইকে নদীর পারে নিয়ে যাও। যেখানে নদীর পাট চওড়া আর পানির গভীরতা কম দেখবে সেখানে বালি মাটি ঢেলে নদীর পথ বন্ধ করে দাও। ফালতু যত আসবাপত্র আছে তা বালি মাটিতে ফেলো। এর সামান্য কিছু দূরে গিয়ে ওপর থেকে নদীর পার ভেঙে দাও যাতে বদ্ধ পানি বের হতে পারে।'

মুসলিম লশকরকে পুলের ওপর নিয়োজিত সৈন্যরা এসে জানালো পারসিকরা নদীর ওপারে কি যেন করছে। মুসলিম লশকর নদী থেকে অনেক দূরে ছিলো। কয়েকজন মুজাহিদ উচুঁ গাছের ওপর চড়ে দেখলো। নদীর মাঝখানে পারে, নদীর আশ পাশের এলাকা পর্যন্ত ফারসী ফৌজ পিপড়ার মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু একটা করে বেড়াচ্ছে।

পারসিকরা মাটি, বালি, গাছের ছোট বড় ডালপালা, আস্ত গাছ ইত্যাদি নদীতে ফেলে নদী ভরাট করে পথ করে নিচ্ছিলো। একলাখ বিশ হাজার মানুষ এমনিতেই এমন একটা নদীর প্রবাহ রুখে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো। রাতভর তারা নদীতে একাজেই কাটিয়ে দিলো। সকাল পর্যন্ত নদীর একঅংশ ভরাট হয়ে গেলো। এভাবে নদীর এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত পানির সমান্তরাল থেকে আরো উঁচুতে প্রশস্ত এক পথ তৈরি হয়ে গেলো।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগ থেকে রুস্তমের লশকর নদী পরাপার শুরু করলো। এত বড় লশকরের নদী পার হওয়ার জন্য পুরো রাতটাই প্রয়োজন ছিলো।

পরদিন সকালে পারস্যের পুরো ফৌজ নদীর এপারে চলে এলো। রুস্তমকে দেখা যাচ্ছিলো না। কিছুক্ষণ পর পারসিকরা শ্লোগান দিতে লাগলো। তখনই রুস্তমকে দেখা গেলো। রুস্তম ঘোড়ার ওপর সওয়ার ছিলো না। চাতালের মতো বিরাট এক সিংহাসনে বসা ছিলো। বারজন সৈন্য সেটি বহন করছিলো। রুস্তম পারস্যের সম্রাট ছিলো না । কিন্তু সে নিজেকে সম্রাটের মতোই জাহির করতো। আসলে মুসলিম ফৌজের মধ্যে তার শক্তির ভীতি ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছিলো সে। তার আগে আগে চলছিলো শাহপুরের সাদা হাতি। আর ডানে বায়ে ছিলো ঘোড়সওয়ার রক্ষীবাহিনী। ওদের পোষাক থেকে যেন মুক্তো ঝড়ে পড়ছিলো।

ঃ 'হে আরবের সন্তানরা' – মহলের ওপর থেকে সাদ (রা) এর মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে শোনা গেলো, অনারবীদের এই চাকচিক্য আর শানশওকত দেখে তোমরা ভীত হয়োনা। পারসিকরা আসলে তোমাদেরকেই ভয় পাচ্ছে, এটা লুকাতেই তারা এই সাজ পোষাক পরেছে।'

রুস্তমের সিংহাসন মাটিতে রাখা হলো। তারপর সে সবার সামনেই বর্ম পরিধান করলো। মাথায় শিরস্ত্রাণ চাপালো। যুদ্ধ পোষাক পরিধান শেষ হলে দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিলো। তার হাতে একটি তারবারি দেয়া হলো। এরপর একটি ঘোড়া নিয়ে আসা হলো। বলশালী দুজন সৈন্য মিলেও ঘোড়াটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলো না। রুস্তম ঘোড়ার লাগাম ধরে তার ওপর সওয়ার হয়ে গেলো। ঘোড়াটি তার সামনের এক পা উঠিয়ে পেছনের পায়ের ওপর ভর করে নেচে উঠলো।

সাদ (রা) কয়েকজনের নাম করে তাদেরকে তখনই তার কাছে পাঠিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। এদের মধ্যে অনেকে কবি, অনেকে বিখ্যাত বক্তা এবং দু'জন এমন বক্তা ছিলো যাদের বক্তৃতা শোনার পর শরীরের রক্ত উত্তাল তরঙ্গ হয়ে বেরিয়ে পড়তে চাইতো। শিমাখ, হুতিয়াআওস, আবদাক, আমর ইবনে মাদী কারাব, কায়েস ইবনে হুবায়রা, ইবনে হুযাইল, বুসার বিন আবী রহম আসেম ইবনে আমর, রবীআ ইবনে মাদী, রবীআ ইবনে আমের, মুগীরা ইবনে শুবা (রা) ও তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদ এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো।

এরা তখনই মহলের দ্বিতীয় তলায় পৌছলো। সাদ (রা) সেখানে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলেন। সালমা তার কাছে শুশ্রূষার জন্য উপস্থিত ছিলো।

ঃ 'হে আরবের বুদ্ধিজীবীরা'! সাদ (রা) বললেন- 'খোদার কসম! তোমরাই আরবের প্রাণবন্ত অন্তর, তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক। তোমাদের মুখের কোষে যে শব্দের তরঙ্গায়িত শেল আছে তা সেই উষ্ট্র চালকের তরবারির চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরী, অনেক বেশি ক্ষুরধার, যে জানে না তরবারি কখন কোষমুক্ত করতে হবে আর কখন কোষবদ্ধ করতে হবে। ....... তোমরা দেখতেই পাচ্ছো যে পর্যন্ত দৃষ্টি যায় পারসিকদের সারি সারি সৈন্য আর ঘোড়াই চোখে পড়ে। ওদের হাতিগুলোকে দেখো। যেন কালো পাহাড়ের সারি। চল্লিশ হাজার মুজাহিদদেরকে কি এমন লাগছে না যেমন হাতির সামনে কোন বেড়ালকে দাঁড় করে দেয়া হলো?'

ঃ 'বিড়াল তখন হাতির চোখ ছিড়ে নেবে' আসেম ইবনে আমর বললে- 'আমরা ঐ কালো পাহাড়ের সারি এর আগেও কেটে কুটে ভেঙে চুড়ে আমাদের রাস্তা পরিষ্কার করে নিয়েছি।

ঃ 'তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করো আল্লাহও তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করবেন'- সাদ (রা) বললেন- 'আল্লাহর সেই প্রতিশ্রুতি ভুলে যেয়ো না যে, তোমরা বিশজন ঈমানদার থাকলে কাফেরদের একশজনকে কাবু করতে পারবে। ..... সে সময় এসে গেছে। তোমরা তোমাদের ফরয কর্ম পালন করো। মুজাহিদদের মুখে আমি উৎকণ্ঠা দেখতে পাচ্ছি। যাও ওদের উৎকণ্ঠা দূর করে দাও। ওদেরকে জাগিয়ে তোল। ওদের ভেতরের জড়তা দূর করে উষ্ণ করে দাও ওদেরকে। তোমাদের কাছে এমন শক্তিধর শব্দাবলি আছে যা শীতল পানিকে আগুনের অঙ্গার বানিয়ে দিতে পারে। তাদেরকে বলে দাও এই যুদ্ধকে যেন তারা সাধারণ কোন যুদ্ধ মনে না করে। কাদিসিয়ার যুদ্ধ ... চূড়ান্ত যুদ্ধ আরব অনারব কিছুই নয়....... পারসিকদের কাছে আমাদের প্রমাণ করতে হবে, যে সূর্যের পূজা করে ওরা তা আমাদের মহান আল্লাহর সৃষ্টি। তাকে অস্তমিত করার অধিকার আল্লাহরই রয়েছে। দুনিয়াকে অন্ধকার করে দাও। তারপর যেন প্রভাতের সোনালী সূর্য হেসে উঠে। ......যাও তোমাদের স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করো।

তারা সবাই চলে গেলো।

পারস্য ফৌজ সারিবদ্ধ হয়ে গেলো। রুস্তম তাদেরকে তেরটি সারিতে সাজালো। এর মূলবাহিনী ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের। যার সামনে রুস্তম নিজে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। ঘোড়া একটু পর পরই চঞ্চল হয়ে উঠছিলো। কখনো তার সামনের খুর দিয়ে মাটিতে এত জোরে আঘাত করতো যে, মনে হতো মাটি বুঝি উপড়ে ফেলবে। কখনো ডানে বায়ে এমন টগবগিয়ে উঠতো যেন লাগাম এক ঝটকায় ছিড়ে দৌড় শুরু করে দেবে।

মূলবাহিনীর সামনে, ডানে বায়ে সুসজ্জিত হাতি দাঁড় করানো ছিলো। পারসিকদের তের সারির ডান বাহু এবং বাম বাহুও তেমনি শৌর্যবীর্যে টগবগে দেখাচ্ছিলো। এদের সামনেও হাতি দাঁড় করানো ছিলো।

হাতির হাওদায় কয়েকজন করে সৈনিক দাঁড় করানো ছিলো। তাদের হাতে ছিলো বিষমাখা তীর ও লম্বা ফলার বর্শা। বিভিন্ন তরবারীতে তার সুসজ্জিত ছিলো। হাতির শুঁড়ের ওপরের দিকে বাঁধা হয়েছিলো লোহার শিরস্ত্রাণ। আর পাঁজর থেকে ঝুলছিলো লম্বা লম্বা শিকলের রশি।

মুসলমানদের ওপর অবশ্যই এর প্রভাব পড়ার কথা ছিলো। কিন্তু তাদের কঠিন সংকল্প আর বিশ্বাসের কাছে এসবের প্রভাব একমুহূর্তও স্থায়ী হলো না। সাদ (রা) এর নির্দেশ মতোই মুজাহিদদের ভাগ ভাগ করে সারিবদ্ধ করা হলো। সৈন্যের প্রতিটি অংশের সালার পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়েছিলো। হযরত উমর (রা) নিজেই এই সালারদের নির্বাচন করেছিলেন।

ওদিকে রুস্তম তার সারিবদ্ধ সৈন্যদের ঘুরে ঘুরে দেখছিলো। প্রত্যেকের সামনে দাঁড়িয়ে সে বললো-

ঃ 'তোমরা ওদের সংখ্যা দেখো। এই গুটিকয়েক আরব তোমাদের পায়ের নিচে যখন পিষ্ট হবে তখন আর তাদেরকে দেখাই যাবে না..... আগামীকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত আরবদের আমি ছিঁড়ে ফেড়ে শেষ করে দেবো।'

রুস্তম যখন তার সৈন্যদের পরিদর্শনে বেরিয়ে ছিলো। 'তখন সৈন্যদের মনোবল চাঙা করার জন্য বড় তেজদীপ্তগলায় তাদের সামনে ছোট ছোট বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু সে অবশ্যই অনুভব করছিলো, যত আবেগপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী শব্দ তার মুখ থেকে বের হোক না তার ফৌজের মধ্যে তা এর দশ ভাগের একভাগও দেখা যাচ্ছিলো না। তার আবেগপূর্ণ বক্তৃতার জবাবে সৈন্যের কোন অংশ যদিও শ্লোগানে মুখর হয়ে উঠতো তা ছিলো প্রথাগত শ্লোগান।

এর অবশ্য কারণও ছিলো। পারসিকদের এই ফৌজে ঐসব সৈন্যরাও ছিলো যারা মুসলমানদের সঙ্গে দু'একটিতে নয়, লড়েছিলো কয়েকটি যুদ্ধে। তারা দেখেছিলো মুসলমানদের আক্রমণ কতখানি অপ্রতিরোধ্য আর ভয়ংকর হয়। বুয়ুবের যুদ্ধের দুঃসহ স্মৃতি তাদেরকে যেন হরহামেশাই মৃত্যুর দুয়ারে ঘুরিয়ে আনতো। সে যুদ্ধে মুসলমানরা পারসিকদের প্রায় পুরো সেনাদলকেই লাশের বিশাল স্তূপে পরিণত করেছিলো। সামান্য কয়েকজনই জীবিত ছিলো । সময়মতো যারা পালিয়ে গিয়েছিলো, খোদা তাদেরকে যেন এজন্যই জীবিত রেখেছিলো যে, পারসিকদের মধ্যে যেন তারা এই উপলব্ধি সঞ্চার করে দিতে পারে কোন্ জাতির সঙ্গে তারা লড়তে এসেছে।

পারসিকদের অধিকাংশ ফৌজই এ যুদ্ধে নতুন ছিলো। জায়গীরদার ও উমারারা তাদেরকে ভর্তি করে দুর্ধর্ষ যোদ্ধারূপে তৈরি করে। পুরাতন সৈনিকরা নতুন সৈনিকদের বলে দিয়েছিলো– মুসলমানদের লড়াই কেমন ভয়াবহ হয়। আর যে মুসলমান যখমী হয়ে পড়ে সে তাজাদম সৈনিকের চেয়েও অধিক ভয়ংকর হয়ে উঠে। ..... এছাড়াও সবাই তো দেখতেই পাচ্ছিলো। মুসলমানরা সারা ইরাক কেমন দাপটে চষে বেড়িয়েছে। নৈশ হামলা, চোরাগুপ্তা হামলা, প্রকাশ্যে ঝটিকা আক্রমণ এসব করে করে তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সব কিছু নিয়ে গেছে। কিন্তু পারস্যের মহাশক্তির প্রতীক শাহীমহল নীরব থাকা ছাড়া এর জবাবে কিছুই করতে পারেনি। আর রুস্তমও যুদ্ধ এড়াতে কম চেষ্টা করেনি।

পারসিকরা মনোবলের দিক দিয়ে যতই নিষ্প্রভ হোক না কেন তাদের ফৌজ এত সংখ্যক ছিলো যে, তারা সাধারণ চালে লড়াই করেও মুসলমানদের অল্প সময়ের মধ্যে কেটে কুচি কুচি করে দিতে পারতো। তাছাড়া সাদ (রা) যে সব মুজাহিদদেরা দলভুক্ত করেছিলেন তারা হাতির ব্যাপারে ছিলো একেবারেই অজ্ঞ। তারা জীবনে এই প্রথমবার হাতি দেখে। তাদের ঘোড়াগুলোও কখনো হাতির চিৎকার শুনেনি। যেসব মুজাহিদ পূর্বে হাতির বিরুদ্ধে লড়েছিলো তারা নতুন মুজাহিদদের মন থেকে হাতির ভয় দূর করার অনেক চেষ্টা করে। তাদেরকে বলে যে, দেখতে যেমন ভয়ংকর মনে হয় হাতিকে আসলে এত ভয়ংকর নয় হাতি। তবে ওদের হাওদায় দাঁড়ানো সৈনিকরাই অধিক ভয়ংকর। প্রথমে তাদেরকে ফেলতে হবে।

সাদ (রা) মুজাহিদদের মনে একথা গেঁথে দিয়েছিলেন যে, এটাই তাদের জীবন মরণ আর ইসলাম ধর্মে উত্থান পতনের লড়াই, আগুন ও ফুলের লড়াই, সত্য মিথ্যার লড়াই।

রুস্তম তার ফৌজের মনোবল ও উৎসাহ দ্বিগুণ করার সব রকম চেষ্টা করে যাচ্ছিলো। এদিকে সুকণ্ঠে কুরআন পাঠকারীরা ময়দানে এসে গেলো। যাদের কণ্ঠে জাদুকরী সুর মোহনা ছিলো। এক একজন কারী সৈন্যের এক এক অংশের সামনে দাঁড়িয়ে গেলো। জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী আয়াত পাঠ শুরু করে দিলো তারা।

পবিত্র কুরআনের ভাষা আর মুজাহিদদের ভাষা তো অভিন্নই ছিলো। প্রতিটি শব্দ তাদের হৃদয় মন তোলপাড় করে দিচ্ছিলো। আবেগে মুজাহিদরা যেন বাকহারা হয়ে পড়ছিলো। পবিত্রতা আর এমন জাদুময় দীপ্তি মুজাহিদদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিলো যে, তাদের হাতগুলো বার বার তরবারির বাট স্পর্শ করে ফিরে আসছিলো।

"কাফেরদের অন্তরে তোমাদের ভয় তাড়িত করে দিয়েছি। কারণ তারা আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে (আল-কুরআন)।"

মহল থেকে সাদ (রা) সবই দেখছিলেন এবং শুনছিলেন। এ আয়াতটি যখন ক্বারী পাঠ করলো তখন সাদ (রা) চরম আগেবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তার দেহমন শত ছিন্ন হয়ে পড়লো। সালমা তার কাছেই দাঁড়ানো ছিলো।

ঃ 'সালমা' – সাদ (রা) যে বালিশের উপর উপুড় হয়ে পড়েছিলেন, তার থেকে তার বুক উঠালেন।

ঃ 'কি হলো ইবনে ওয়াক্কাস!'– সালমা সাদ (রা) এর পাশে বসে তার বুকের নিচে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ 'আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো সালমা!'– সাদ (রা) কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন– 'দুআ করো আল্লাহ যেন আমাকে আবার চলা ফেরার শক্তি দান করেন। আল্লাহর প্রতি শিরিক সাব্যস্তকারীদের আমার নিজের সামনে দেখে কেমন করে আমি শুয়ে থাকবো? ওদের শক্তিমত্তা দেখো। ওরা শক্তি দিয়ে বুঝাতে চাচ্ছে, আল্লাহ এক ও লা-শরীক নন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল নন?

ঃ 'বুকটি বালিশের ওপর রাখুন'- সালমা আলতো করে সাদ (রা) এর বুক বালিশে রেখে আর্দ্র গলায় বললো –

ঃ 'আপনি তো লড়েই যাচ্ছেন এবং লড়িয়ে যাচ্ছেন। আপনি তো পালিয়ে যাচ্ছেন না। এ অবস্থায় রণাঙ্গনে উপস্থিত থাকা কি জিহাদের চেয়ে কম?'

সাদ (রা) সেই মুজাহিদ ছিলেন না যার মনের হাহাকার সামান্য সান্ত্বনার বাণীতে স্থির হবে। যদিও রণাঙ্গনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তার হাতেই ছিলো। কিন্তু সশরীরে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে না পারায় যে বুক ভাঙ্গা জ্বালা তা একজন অক্ষম মুজাহিদই কেবল বুঝতে পারবে। মহলের জানালা বরাবর নিচে ছয় সাতজন কাসেদ দাঁড়ানো ছিলো। আর কাতেব ছিলো সাদ (রা) এর কামরায়। সাদ (রা) কাতেবকে দিয়ে পয়গাম লেখাতেন। তারপর জানালা দিয়ে পয়গামটি নিচে ফেলে বলতেন, অমুক সালারকে তা পৌঁছে দাও।

ক্বারীদের কুরআন পাঠ শেষ হলে ময়দানে কবিরা এলো। ইবনে হুযাইল আসাদী বললেন–

'হে সাদের ফৌজ! তরবারির দুর্গ গড়ে তোলো। আহত বাঘের মতো দুশমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো

এবং চিতার মতো দুশমনের আঘাত প্রতিহত করো।

ধুলো বালির বর্ম পরে নাও। নির্ভর করো মহান আল্লাহর প্রতি।

চোখের দৃষ্টি নিচে রাখো। তরবারিগুলো যখন জবাব দিতে শুরু করবে

তখন তীর ধনুককে সক্রিয় হতে দাও। যেখানে তীর পৌঁছে তরবারি সেখানে পৌঁছে না।'

আসেম ইবনে আমর বলতে লাগলেন–

'হে আরব জাতি! আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে আরবের নেতৃত্ব দিয়েছেন। আজ তোমরা অনারব নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছো। তোমাদের মন আল্লাহর অপার সন্তুষ্টিতে স্নাত এবং জান্নাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত। তাদের মন তো দুনিয়ার ভালোবাসা আর মোহে দুর্গন্ধময়। দেখিয়ে দাও দুনিয়ার কুকুর আখেরাতের সিংহের সামনে কত অসহায়। আজ এমন কিছু করে বসো না কাল যা সমস্ত আরবের জন্য অনুতাপের কারণ হবে।'

প্রত্যেক কবি, প্রত্যেক বক্তা মুজাহিদদের জ্বালিয়ে তুলতে লাগলো। তাদের কেউ কেউ পারসকিদের দিকে মুখ করে তাদের মুখের শব্দশেল ছুঁড়ছিলো এবং তাদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলছিলো। তাদের প্রত্যেকের আওয়াজ ছিলো আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দেয়ার মতো, পারসিকদের কান পর্যন্ত তা পৌঁছাচ্ছিলো অনায়াসেই। তাদের অধিকাংশই আরবী জানতো না। তবে আরবী বংশীয় কিছু ফৌজও তাদের মধ্যে ছিলো। তারা আরবদের উৎক্ষিপ্ত শব্দশেল বুঝতে পারছিলো। যারা আরবী বুঝতে পারছিলো না তাদেরকে তারা বুঝাচ্ছিলো মুসলমানরা কি বলছে।

রুস্তমের কানে যখন আরবীয় কবি ও বক্তাদের জ্বালাময় কথার গোলাগুলো পড়লো রুস্তম দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। সে তার জেনারেলদের ডেকে বললো।

ঃ তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো না ওরা কিভাবে তাদের ফৌজকে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়ে যাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করছে?'- রুস্তম তার জেনারেলদেরকে বললো- 'তোমরাও ওদের মতো এমন বক্তা আর কবিদের জড়ো করো যারা ওদের মতো বলতে পারে। তাদেরকে বলে দাও, ফৌজকে যেন তারা বলে, পারসিকরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠজাতি। আর এরা সেই মূর্খ আরব বেদুইন যারা পারসিকদের গোলাম ছিলো। আজ ওরা ভুখা নাঙ্গার কারণে বাধ্য হয়ে ওদের মালিকদের চোখ রাঙাতে এসেছে। পারসিকদের এর চেয়ে লজ্জার আর কি হতে পারে, অভুক্ত অসভ্য আরবরা তাদের ওপর ছড়ি ঘুরাতে এসেছে?'

এদিকে চলছিলো ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের কথাবার্তা। ওদিকে চলছিলো কিসরার শ্রেষ্ঠত্ব ও শাহেনশাহীর গুণপনা। আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণকারীদের জন্য এদিকে শোনানো হচ্ছিলো জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামতরাজীর কথা। ওদিকে বীরত্বের সঙ্গে লড়াইকারীদেরকে সম্মান, পুরস্কার, পার্থিব সুখ শান্তি ও সুন্দরী নারীদের লোভ দেখানো হচ্ছিলো।

সাদ (রা) শুয়ে শুয়েই উভয় পক্ষের বারুদ তপ্ত কথার ফুলঝুরি, হুলস্থুল প্রস্তুতি ইত্যাদি দেখছিলেন ও শুনছিলেন। সাদ (রা) তার লশকরকে বলে রেখেছিলেন মহল থেকে উঁচু আওয়াজে 'নারায়ে তাকবীরের' শ্লোগান উঠবে। এটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মুজাহিদরা তৈরী হয়ে যাবে। তারপর দ্বিতীয়বার নারার শ্লোগান উঠবে। এটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হাতে অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে যাবে। তৃতীয় বার শ্লোগানের পর হামলা শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু হামলার হুকুম দেবে সিপাহসালার। সম্মিলিত হামলার পূর্বে জনে জনে পৃথক পৃথকভাবে কয়েকজনের লড়াই হবে।

***'আরে ঐ মরুর মূর্খ বেদুইন!' – সে উদ্যত তরবারি হাতে ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে বললো–'তোমরা কি মোটেও ভেবে দেখোনি, আমরা তোমাদের লাশ মাড়িয়ে 'আজীব' পর্যন্ত পৌছে যাবো- যেখানে তোমাদের রূপবতী স্ত্রীরা রয়েছে?'***

সাদ (রা) এর ইংগিতে মহলের নিচে দাঁড়ানো এক কাসেদ গলার সমস্ত জোর দিয়ে শ্লোগান তুললো- 'আল্লাহু আকবার।'

সৈন্যদের সামনে যেসব কবি, সাহিত্যিক, বক্তা ও কারীরা রক্ত ছলকে উঠা ভাষায় মুজাহিদদের মনোবলে নতুন প্রাণ সঞ্চার করছিলো, তারা খুব দ্রুত সেখান থেকে সরে নিজেদের জায়গায় ফৌজের ভেতর চলে গেলো। তারা শুধু কবি সাহিত্যিক বা বক্তাই ছিলো না, এক একজন ভয়ংকর যোদ্ধাও ছিলো।

একটু পর শ্লোগানের সুরে দ্বিতীয় নারার গগণবিদারী আওয়াজ দূরের প্রান্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো।

মুজাহিদরা তাদের হাতের অস্ত্রগুলো শক্ত করে ধরলো।

পারসিকরা একটু আগেই শুনছিলো, মুসলমানদের থেকে নানানমুখী শোরগোল চিল্লাহল্লা ভেসে আসছে। নারার আওযাজে যখন নিমেষেই পুরো ফৌজের মধ্যে

পিনপতন নীরবতা নেমে এলো তখন মুসলমানদের এই সুশৃংখল তৎপরতা দেখে পারসিকদের হয়রানির অন্ত রইলো না। ঘোড়ার ক্ষীণ কণ্ঠের হেচকির আওয়াজও এই নিস্তব্ধতায় বিকট আওয়াজ মনে হতে লাগলো। মুজাহিদরা তৃতীয় নারার প্রতীক্ষায় ছিলো। তৃতীয় নারার আওয়াজ উচ্চকিত হলো।

মুসলমানদের পক্ষ থেকে এক ঘোড়সওয়ার অগ্রসর হলেন। চক্রাকারে ঘুরে ঘোড়াকে ছুটিয়ে দিলেন ঘোড়সওয়ার। যার নাম ছিলো আমর ইবনে মাদী কারব। আরবের বিখ্যাত কবিদের একজন ছিলেন তিনি। তিনি এখনো তরবারি কোষমুক্ত করেননি।

ঃ 'যরথুস্ত্রের পূজারীরা!' আমর ইবনে মাদী কারব পারসিকদের প্ররোচিত করে বললেন- 'পারস্যের কোন মা কি এমন বীর সন্তান জন্ম দিয়েছে যে আমার মোকাবেলায় আসার সাহস রাখে?'

পারসিকদের মধ্যে আরবীতে দক্ষ দোভাষী ছিলো। সে উচুঁ আওয়াজে তার ফৌজকে এর অনুবাদ শুনিয়ে দিলো।

ফারসী ফৌজের মধ্য থেকে বিশাল দেহের একজন মাটি কাঁপিয়ে তার ঘোড়া নিয়ে অগ্রসর হলো। তার ঘোড়াটি যেন জমিন বিদীর্ণ করে দিচ্ছিলো। উভয় ফৌজের মাঝখানে ব্যবধান ছিলো বিস্তর। ফারসী ঘোড়সওয়ারের গায়ে ছিলো শাহী পোষাক। তার বর্ম থেকে রুপার আলো চমকাচ্ছিলো। তার উভয় বাহুতে ছিলো স্বর্ণের বড় বড় ভারী দুটি কড়া এবং হাতে তীর ধনুক আর তরবারি। পেছনে বাঁধা ছিলো তুনীর।

আমর ইবনে মাদী কারাবের ঘোড়ার মুখ তার দিকেই ফিরানো ছিলো। তার ধনুকে তীর ভরলো সে। উভয় সওয়ারের মধ্যে ব্যবধান ছিলো খুব সামান্য। একক লড়াইয়ে তীর চালানো নিয়মবিরুদ্ধ। এক্ষেত্রে খালি হাতে বা অন্যকোন অস্ত্রের মাধ্যমে লড়াই হতো, তীর দিয়ে তো দূর থেকেই দুশমনকে ঘায়েল করা যেতো এবং এটাকে কেউ বীরত্ব বলতে রাজী হতো না।

ফারসী সওয়ার হঠাৎ আমরকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে মারলো। আমর আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় তার ঘোড়াটি এক দিকে সরিয়ে নিলেন। তীর তার পাশ দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেলো। ফারসী আরেকটি তীর বের করছিলো।

আমর ইবনে মাদী তবুও তার তরবারি বের করলেন না। ঘোড়ার গায়ে তিনি খোঁচা দিলেন। ঘোড়া ফারসী সওয়ারের দিকে ছুটলো। ফারসী তুনীর থেকে আরেকটি তীর বের করে ধনুকে ভরতে গেলো, আমর তুফান বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে ফারসীর কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। তখনও তিনি তারবারি কোষমুক্ত করলেন না এবং ঘোড়ার গতিও কমালেন না। ডান দিকে সামান্য ঝুঁকে তার ডান বাহু ফারসীর পেট বরাবর লম্বা করে দিয়ে তাকে তার বাহুর সঙ্গে লেপ্টে নিয়ে অসম্ভব এক কৌশল প্রয়োগ করে ঘোড়ার পিঠ থেকে উঠিয়ে নিলেন। আমর তবুও তার ঘোড়ার গতি ধীর করলেন না।

ছুটন্ত ঘোড়ায় থেকেই ফারসীকে দু'হাতে একটু ওপরে উঠিয়ে মাটিতে আছড়ে ফেললেন এবং ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে এক ঝটকায় তরবারি বের করলেন। ফারসীর

মাথা থেকে তার লোহার শিরস্ত্রাণ পড়ে গিয়েছিলো। এতে তার মাথা সমেত ঘাড়ও উলঙ্গ হয়ে গেলো। বড় কষ্টে সে উঠলো। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে এভাবে আছড়ে পড়ে দারুণ চোট পেয়েছে সে।

সে উঠে নিজেকে সামলে নিচ্ছিলো। তখনো নিজের এই করুণ অবস্থার কথা তার বিশ্বাস হচ্ছিলো না। বহু কষ্টেও পা দুটি উঠাতে পারছিলো না, আমর চক্রাকারে তার চারপাশে চরকির মতো ঘোড়া নিয়ে ঘুরছিলেন। হঠাৎ ঘোড়াটি তিনি ফারসীর পেছনে নিয়ে এসে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ফারসীর ঘার লক্ষ্য করে তরবারি চালিয়ে দিলেন। মাথা সমেত ঘাড় শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফারসীর মস্তকবিহীন দেহের সামনে গিয়ে পড়লো।

আমর তারপর নিজ সৈন্যসারির দিকে তাকালেন।

ঃ 'বন্ধুরা আমার! লড়তে হবে এভাবে' – আমর উঁচু আওয়াজে বললেন।

ঃ 'যে কেউ আমর ইবনে মাদী কারব কি হতে পারবে?' – এক মুজাহিদ অভিভূত কণ্ঠে বললো।

মুজাহিদদের সারি থেকে ক্ষণে ক্ষণে শ্লোগান গর্জে উঠতে লাগলো। আমর ঘোড়া থেকে নেমে ফারসীর মুণ্ডহীন লাশের গা থেকে বর্ম এবং কোমরবন্দসহ তরবারি, তীর তুনীর এবং স্বর্ণের কড়া দুটি নিলেন। তারপর ফারসীর ঘোড়ার লাগাম ধরে তার ঘোড়ার সওয়ার হয়ে মহলের দিকে ঘোড়া ছুটালেন। মহলের খোলা জানালা দিয়ে সাদ (রা) সব দেখছিলেন। জানালার নিচে ঘোড়া রেখে ফারসীর হাতিয়ার আর সোনার কড়া দুটি মাটিতে ছুঁড়ে দিলেন।

ঃ 'সিপাহসালার!' – 'এই রইলো মালে গনীমত!'

ঃ 'খোদার কসম!'– সাদ (রা) বললেন, পুরস্কার দেয়ার অনুমতি যদি থাকতো আমার তবে তোমাকে ঠিকই পুরস্কৃত করতাম। এই হাতিয়ার, সোনার কড়া সব উঠিয়ে নাও। এই মালে গনীমতে আর কারো অংশ থাকতে পারে না।'

আমর ঘোড়া থেকে নেমে সব কিছু উঠিয়ে নিলেন। সেখানে শুধু ফারসী সওয়ারের ঘোড়াটি রেখে দিলেন। এরপর মুজাহিদদের সারিতে নিজের জায়গায় ফিরে এলেন।

পারসিকদের সারি থেকে আরেক ঘোড়সাওয়ার অগ্রসর হলো। দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো এ কোন সাধারণ সাওয়ার নয়। তার পোষাক, বর্ম অন্যদের চেয়ে ভিন্নতর এবং অধিক মূল্যবান ছিলো। তার শিরস্ত্রাণের ওপর শাহী মুকুট ঝলমল করছিলো। এটা একটা প্রতীক ছিলো যে, সে শুধু জেনারেলই নয় শাহী খান্দানেরও উচ্চ পর্যায়ের একজন।

সে ছিলো শাহী খান্দানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং রণাঙ্গনের শীর্ষ খ্যাতিমান জেনারেল হুরমুয। রণাঙ্গনে নেতৃত্বদান ও লড়াই নিপুণতায় তাকে কেউ কেউ রুস্তমের চেয়েও অধিক কুশলী মনে করতো। এক মুসলমান যখন এক ফারসীকে করুণভাবে মাটিতে আছড়ে ফেলে তার মস্তক দেহ থেকে পৃথক করে দিলো সারা ফৌজে এর অত্যন্ত

খারাপ প্রভাব পড়লো। হুরমুয এটা কোন ভাবেই মেনে নিতে পারছিলো না। এজন্য আরেক মুসলমানকে এর চেয়েও আরো নিকৃষ্টভাবে মৃত্যুর দুয়ারে পাঠিয়ে দিয়ে হুরমুয তার ফৌজের মনোবল ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছিলো। তাই সে নিজেই ময়দানে নেমে এলো। তার শক্তিশালী ঘোড়াটি মাটিতে ঝড় তুলতে তুলতে যেন এগিয়ে আসছিলো, হুরমুয নিজেও প্রচণ্ড শক্তিধারী ছিলো। তার চেহারায় ছিলো গর্বোদ্যত রাজকীয় অভিব্যক্তির গভীর ছাপ।

ঃ আর ঐ মরুর মূর্খ বেদুঈনরা!' সে উদ্যত তরবারি হাতে ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে বললো– 'তোমরা কি মোটেও ভেবে দেখোনি আমরা তোমাদের লাশ পায়ে মাড়িয়ে 'আজীব' পর্যন্ত পৌঁছে যাবো। যেখানে তোমাদের রূপবতী স্ত্রীরা রয়েছে।'

মুসলমানদের দিক থেকে গালিব ইবনে আবদুল্লাহ আসাদী এগিয়ে এলেন, যার ব্যাপারে প্রসিদ্ধি ছিলো- কাফেরদের সঙ্গে লড়াইয়ের অদম্য বাসনায় তার দিন রাত কেটে যেতো।

ঃ 'সামলে নিয়ো আগুনের পূজারী!'– গালিব বললেন– 'আমি গালিব ইবনে আবদুল্লাহ ... মাথার ওপরের আকাশ আজ প্রত্যক্ষ করবে কে পৌরুষের অধিকারী'।

ঃ 'তোমাদের স্ত্রীরাই বলবে প্রকৃত পুরুষ পারসিকরাই'– হুরমুয বিদ্রূপের এক তীর নিক্ষেপ করলো।

ঠাট্টা বিদ্রূপে আরবরা কয়েক কাঠি বাড়ন্ত ছিলো। গালিব হুরমুযের বিদ্রূপের জবাবে একটি কবিতা আবৃত্তি করলে উঁচু আওয়াজে–

'তোমার সেই চিত্রল কমনীয় দেহ পল্লব চম্পা বর্ণের হাসি

যেন রুপার ওপর সোনার ঝোল ছড়িয়ে দিয়েছে কেউ

সে জানে পুরুষ আমি। তুমি নয়– যার অঙ্গ-সজ্জার পোষাক

আমি খুলে নেবো। আমার মতো পুরুষ যখন তোমার মতো

ম্যনি পুরুষকে আছড়ে ফেলবে মনে হবে তখন ঝড় বুঝি চড় দিয়ে

গেলো.......

..... এলোকেশী, উদ্যত হৃষ্ট বক্ষের সেই সুন্দরী জানে– আকাশের বিদ্যুৎ ছিঁড়ে আনা

বীর আমি, পলকে ঝলক মেরে হামলা করা আমার কাজ। সব বিপদকে

নিজের বুকে সোপর্দ না করতে পারাই আমার লাজ।'

মহলের দুই তলা থেকে সাদ (রা) এসব দেখছিলেন। সালমাও দেখছিলেন। প্রতিটি কথাই তার কানে পৌঁছছিলো। তার চেহারা আবেগে উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠলো।

ঃ 'আব্দুল্লাহর বেটা!' – সালমা চিৎকার করে বললো– 'আল্লাহর কসম! এই পাসরীকে যদি তুমি জীবিত ধরে না আনতে পারো, আরবের নারীরা তোমার মুখ দেখতে অস্বীকার করবে।'

হুরমুয গালিবের এই কথার তীর বরদাশত করতে পারলো না। সে ঘোড়ার গায়ে চাবুক মারলো, গালিবও ঘোড়ার গায়ে খোঁচা দিলেন। গালিবের গোড়াটি যদিও তরতাজা ছিলো কিন্তু হুরমুযের ঘোড়ার সামনে সেটি ক্ষীণকায় খচ্চরের মতো দেখাচ্ছিলো। হুরমুয এক হাতে তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে আসছিলো, আর গালিব তার তলোয়ার নামিয়ে রেখেছিলেন। উভয় পক্ষের ফৌজের ওপর গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

ঘোড়া দুটি কাছাকাছি এলো, গালিব তার তলোয়ার এমন ক্ষীপ্রতায় চালালেন যে, কারো চোখ আন্দোলিত তলোয়ারের ঝলক ঠাহর করতে পারলো না, সবাই যা দেখলো তা হলো গালিবের আঘাতে হুরমুযের তলোয়ার তার হাত থেকে ছুটে গিয়ে শূন্যে কয়েকটি পাক খেয়ে দূরে গিয়ে পড়লো। এক ফারসী তার জেনারেল হুরমুযকে বর্শা দিতে এগিয়ে এলো।

গালিব তার ঘোড়া ঘোরাতেই দেখলেন হুরমুযকে বর্শা দেয়ার জন্য আরেক সওয়ার এগিয়ে আসছে। গালিব ঘোড়া নিয়ে ফারসীর দিকে এগিয়ে গেলেন। ফারসী এবার ঘোড়া থামিয়ে বর্শা মারার জন্য বাগিয়ে ধরলো। কিন্তু সে আর বর্শা মারার সুযোগ পেলো না। গালিবের তলোয়ার তার ঘাড় দ্বিখণ্ডিত করেদিলো। এক দিকে বর্শা, আরেকদিকে ধড়, আরেকদিকে তার মাথা গিয়ে পড়লো। মুণ্ডহীন ফারসীর এক পা ঘোড়ার এক রেকাব থেকে এমনিই বেরিয়ে পড়লো, কিন্তু আরেক পা রেকাবের আংটার সঙ্গে ঝুলে রইলো। ঝুলন্ত শরীরটা এক পা ঘোড়ার গায়ে রেখে মাটিতে ঘেষটাতে লাগলো। মুনীবের এ অবস্থা দেখে ঘোড়াটি দারুণ ভয় পেয়ে গেলো। উদভ্রান্তের মতো দুই ফৌজের মাঝখানের খালি জায়গায় ফারসীর লাশটি বিশ্রীভাবে মাটিতে ঘেষটাতে ঘেষটাতে দৌড়াতে লাগলো। মুসলিম ফৌজের সারি থেকে শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখর হয়ে উঠলো।

গালিব দেখলেন হুরমুয তার পড়ে যাওয়া তরবারিটি উঠানোর জন্য ঘোড়া থেকে নামতে যাচ্ছে। গালিব তার ঘোড়া ঘুড়িয়ে নিলেন। হুরমুয নেমে তরবারি উঠাতে যাচ্ছিলো। গালিবের ঘোড়া প্রায় তার কাছে পৌঁছে গেলো। পারসিকদের থেকে আওয়াজ উঠলো– সামনে থেকে সরে যাও, পেছনে ঘোড়া আসছে–' কিন্তু ঘোড়া প্রায় মাথার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলো। গালিব হুরমুযের ওপর তলোয়ার চালালেন না। ঘোড়ার খুড়ের আঘাত হানলেন। গালিব তখনই তাকে তার ঘোড়ার নিচে পিষে ফেলতে পারতেন। কিন্তু গালিব চাচ্ছিলেন হুরমুয যাতে তলোয়ার থেকে দূরে থাকে এবং মরেও না যায়। আবার লড়াইয়েরও উপযুক্ত না থাকে।

ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের বাড়ি খেয়ে হুরমুয ভারী কোন বস্তুর মতো কয়েক হাত দূর গিয়ে পড়লো। এবং কয়েকটি পল্টি খেয়ে থেমে গেলো। গালিবের ঘোড়া তার দিকে এগিয়ে গেলো। হুরমুয হাচড়ে পাচড়ে কয়েকবার উঠতে চেষ্টা করেও গড়িয়ে পড়লো। গালিব ঘোড়া থেকে নেমে তাকে উঠিয়ে বসালেন। পলানোর চেষ্টা করলে দেখো আমার তলোয়ার তোমার শাহরগ ভেদ করে যাবে।

ঃ 'তোমাকে আমি মারবো না জীবিত রাখবো'— গালিব ইবনে আবদুল্লাহ্ বললেন।

গালিব হুরমুযকে ভালো করে ধরে তাকে তার ঘোড়া পর্যন্ত নিয়ে গেলেন এবং তার হাত পেছনে নিয়ে তারই ঘোড়ার লাগাম দিয়ে বেঁধে দিলেন। তারপর তার ঘোড়ার লাগাম সামনে থেকে ধরে নিজের ঘোড়ায় গিয়ে উঠে মহল পর্যন্ত গেলেন।

ঃ 'খোদার কসম'!— গালিব বললেন— 'আমি আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করেছি।'

ঃ 'সাবাস ইবনে আবদুল্লাহ্!' — সাদ (রা) বললেন— 'প্রতিদান তো তোমাকে আল্লাহই দেবেন। এই ফারসীর বর্মটি খুলে পরে নাও এবং তার তলোয়ারটি নিজের কাছে রাখো। আজমের গায়ে যে তুমি আরবের খ্যাতির মোহর লাগিয়ে দিয়েছো।'

হুরমুযকে সেই মহলের নিচে পায়ে শিকল পরিয়ে কয়েদ করে রাখা হলো। পারসিকদের অতি মূল্যবান এক জেনারেল সম্মিলিত যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই বন্দী হয়ে গেলো।

শেষ তাকবীর ধ্বনি লাগাতে নির্দেশ দিলেন সাদ (রা)। মহলের নিচে তাকবীর ধ্বনি প্রদানকারী এই প্রতীক্ষায় ছিলো। নির্দেশ পেয়েই সে ঘোড়া ছুটালো এবং লশকরের কাছে গিয়ে উঁচু আওয়াজে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনির নারা লাগালো। এই তাকবীর ধ্বনির অর্থ ছিলো এবার হামলা শুরু করো। সাদ (রা) প্রথমেই বলে রেখেছিলেন কোন্ গোত্রের সৈন্যরা সর্বপ্রথম হামলা করবে। আর যদি পারসিকরা হামলা করে দেয় তাহলে কিভাবে প্রতিহত করা হবে।

উভয় দিক থেকে খণ্ড খণ্ড সেনাদল আগে বাড়লো এবং তীব্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লো। পারসিকদের প্রথম আঘাত বুজায়লা গোত্রের সৈন্যরা নিজেদের বুক পেতে নিলো। পারসিকদের যে খণ্ড দলটি হামলা করে ছিলো বনু বুজায়লা থেকে তাদের সংখ্যা দিগুণেরও বেশি। এর নেতৃত্বে ছিলেন জারীর ইবনে আবদুল্লাহ । তার গোত্রের সৈন্যদের ওপর তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিলো। নিজের লোকদেরকে তিনি এলোপাতাড়ি লড়তে দিচ্ছিলেন না।

পারসিকদের সওয়ারী ফৌজ বেশি ছিলো। মুজাহিদরা ঘোড়সাওয়ারকে না মেরে নীচু হয়ে ঘোড়াগুলোকে আহত করে দিতে লাগলো। এতে ঘোড়াগুলো আঘাত খেয়ে খেয়ে লাগামহীন হয়ে যেতো এবং তার সওয়ারকে ফেলে দিতো বা ঘোড়া তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বনু বুজায়লা পারসিকদের এই দলটিকে বেহাল করে দিলো। তারা মুজাহিদদের তলোয়ার ও বর্শার আঘাতে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। সাদ (রা) মহল থেকে দেখছিলেন। বনু বুজায়লার অনমনীয় ক্রোধ আর তীব্র রাগ দেখে সাদ (রা) এর রক্তকণা চঞ্চল হয়ে উঠলো। তার মুখ থেকে অজান্তেই প্রশংসাবাক্য বেরিয়ে এলো।

সাদ (রা) সৈন্যদের কোন সালার বা অন্য কাউকে পয়গাম পাঠাতে চাইলে কাতেব তার কাছেই সব সময় বসে থাকতো। সাদ তার দ্বারা পয়গাম লিখিয়ে জানালা দিয়ে নিচে ফেলে দিতেন। নিচে কাসেদ প্রস্তুত থাকতো। সে সিপাহসালার খালিদ ইবনে উরতুফা পর্যন্ত এই পয়গাম পৌঁছে দিতো।

রুস্তম যখন দেখলো প্রথম হামলাতেই মুসলমানদের এই খণ্ডদল তাদের চেয়ে দ্বিগুণের চেয়ে বেশি সেনাদলটির অর্ধেক সৈন্যই কমিয়ে দিয়েছে তখন সে খোলা ময়দানে হাতি নিয়ে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিলো।

পারসিকদের আসল নির্ভরতা ছিলো তাদের অধিক সংখ্যাক সৈন্যের ওপর। কিন্তু রুস্তম এটা ভেবেও দেখলো না যে, অধিক সংখ্যক সৈন্যের ভিড়ের মধ্যে যে সংকটটা দেখা দেয় তা হলো লড়াইকারীদের বিশেষ করে ঘোড়াকে ডানে বায়ে এবং দ্রুত স্থান বদলের জায়গা থাকে না। কখনো কখনো পদাতিক সৈন্যরা ঘোড়াগুলোর মাঝখানে পড়ে একেবারে পিষ্ট হয়ে যায়। এর বিপরীতে শত্রুর সংখ্যা যদি মোটামুটি কম হয় এবং এর কমান্ডার বুদ্ধিমান হয় তবে সে তার সেনাদলকে জটলার মধ্যে ভিড়তে দেবে না, বরং জটলার বাইরে থেকে অধিক সংখ্যক শত্রুদলকে চেপে ধরে সামনে কেটে যাবে।

পারসিকদের হমলাকারী এই দলের পদাতিক ও সওয়ার সৈন্যরাও এঅবস্থায় পড়ে গিয়েছিলো। আর মুজাহিদদের কমান্ডার জারীর ইবনে আবদুল্লাহ অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ফায়দা উঠাতে লাগলেন। প্রথম হামলায় মুসলমানদের প্রাথমিক সফলতার আরো কারণ ছিলো। পারসিকদের ওপর আরবীদের প্রভাব গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো। তাদের বিখ্যাত জেনারেল রণ সৈনিকদের প্রতীক হুরমুযকে একজন মুসলমান যে ভাবে জীবিত বন্দী করে নিয়ে গেলো পারসিকদের ওপর তার খুবই মন্দ প্রভাব পড়েছিলো।

কাদিসিয়ার প্রথম সংঘর্ষ এজন্য পারসিকদের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছিলো। তাদের এত বড় ফৌজকে এভাবে কচুকাটা হতে দেখে তারা শিউরে উঠছিলো।

রুস্তমের নির্দেশে তেরটি হাতি ময়দানের রাজত্ব দখলের জন্য এগিয়ে এলো। এগুলো যুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলো। সব সময় এগুলোকে মাতাল করে রাখা হতো। তার পরও আরো শরাব পান করিয়ে মদমত্ত উন্মাদ বানিয়ে হাতিগুলোকে রণাঙ্গনে আনা হয়েছিলো। এগুলোকে এমন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিলো যে, শত্রুর অস্তিত্ব টের পেলেই বড় ভয়ানক শব্দে এগুলো চিৎকার জুড়ে দিতো।

তেরটি হাতি বিকট চিৎকারে তীব্র বেগে দৌড়ে আসতে লাগলো। হাতিগুলোর পিঠ বেয়ে বড় বড় ঘন্টা ঝুলছিলো। সাধারণ ঘন্টার ধ্বনির মতো এগুলোর শব্দ ছিলো না। গম্ভীর ভয় ধরানো আওয়াজ ছিলো এগুলোর। হাতিগুলোর বিকট চিৎকার ভয়ংকর ঘণ্টাধ্বনি রণাঙ্গনে যেন কেয়ামত ভেঙে নিয়ে এলো। হাওদার ওপর তীরন্দায ও বর্শাধারীরা দাঁড়িয়ে ছিলো। তারা অনবরত তীর বর্শার বৃষ্টি বইয়ে যেতে লাগলো।

বনু বুজায়েলার ঘোড়াগুলো কখনো হাতি দেখেনি, না এগুলো হাতির এমন চিৎকারও বিকট ঘন্টাধ্বনি শুনেছে। এতে ঘোড়াগুলো চমকে শুধু লাফিয়েই উঠলো না, মুখ ঘুরিয়ে পালাতে লাগলো। এগুলো পদাতিক সৈন্যদের জন্য বিরাট বাঁধার সৃষ্টি করলো এবং পদাতিক সৈন্যদের পা চাপা দিয়ে পালাতে লাগলো। হাতির হাওদা থেকে তীর

বর্শার বৃষ্টি মুজাহিদদের জন্য আসমানী গজব হয়ে এলো। মুজাহিদরা পারসিকদের যে দলটির ওপর চেপে বসেছিলো তারা এবার সুযোগ পেয়ে মুজাহিদদের ওপর পাহাড়ের মতো ভেঙে পড়তে লাগলো।

কিছু কিছু সওয়ার মুজাহিদ ত্যাগ আর জানবাযীর চরম প্রকাশ দেখালো। তারা লাফিয়ে উঠে পালাতে উদ্যত ঘোড়া থেকে নেমে পদাতিক যোদ্ধাদের মতো লড়তে লাগলো। তারা যদি পিছু হটতো তবে তাদের কাছে যুক্তিসংগত অজুহাত ছিলো যে, ভয় পাওয়া লাগামহীন ঘোড়া নিয়ে পেছানো ছাড়া কোন উপায় ছিলো না। কিন্তু মুজাহিদরা পিছ পা হতে জানতো না।

ঃ 'আরবের বীর যোদ্ধারা!'– জারীর ইবনে আবদুল্লাহ গলায় প্রায় রক্ত তুলে চিৎকার করতে লাগলেন– 'আজকের দিনে পিছু হটো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতিদান দেবেন। তিনিই উত্তম প্রতিদানকারী।'

বনু বুজায়লার শৃংখলিত ব্যূহ ভেঙে গুড়িয়ে গিয়ে ছিলো। জারীর ইবনে আবদুল্লাহর নিয়ন্ত্রণ খতম হয়ে গিয়েছিলো। মুজাহিদরা হাতির হাওদায় দাঁড়িয়ে থাকা তীরন্দায ও বর্শাবাজদের সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছিলো। যুদ্ধের পালা হাতিগুলো একেবারে বদলে দিয়েছিলো।

সাদ (রা) এবং সালমা মহলের ওপর থেকে মুজাহিদদের গণহত্যার শিকার হতে দেখছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাতেব দিয়ে পয়গাম লেখাচ্ছিলেন। আর বলছিলেন 'জলদি লিখো দ্রুত লেখো'। তার স্বর দিয়ে কান্নার আওয়াজ বেরোচ্ছিলো।

পয়গাম লেখা হলে নিচে ফেলে দেয়া হলো। কাসেদ পয়গাম উঠিয়ে ঘোড়া নিয়ে ছুটে খালিদ ইবনে উরতুফার কাছে পৌছলো। খালিদ পয়গাম পড়ে ঘোড়ায় খোঁচা লাগালেন। বনু আসাদের সারির কাছে গিয়ে পৌঁলেন। বনু আসাদের সরদার তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদ ছিলো।

ঃ 'হে বনু আসাদ!' খালিদ বললেন– 'সিপাহসালার সাদ (রা) বনু বুজায়লার সাহায্যের জন্য তোমাদের নির্বাচন করেছেন। সিপাহসালার লিখেছেন। সে সময় এসে গেছে তুলাইহার গোত্রই সত্যিকার সাহায্যকারী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। এগিয়ে যাও এবং জারীর ইবনে আবদুল্লাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করো।'

তুলাইহার বীরত্বের কথা তখনো সবার মুখে মুখে ছিলো, একরাতে সে ফারসী ক্যাম্পে গিয়ে তাদের নিশ্ছিদ্র প্রহরা ভেঙে দুই সওয়ারকে হত্যা করে একটি ঘোড়া ও এক ফারসী সৈন্যকে বন্দী করে নিয়ে এসেছিলো।

খালিদের পয়গামপাঠ শুনে তুলাইহা তার গোত্রের সেনাদের উদ্দেশে বললো– 'আমার গোত্রের জানবায সৈন্যরা ! খোদার কসম! সাদ (রা) যদি বনু বুজায়েলার সাহায্যের জন্য তোমাদের চেয়ে আর কাউকে অধিক উপযুক্ত মনে করতেন তাহলে পয়গাম তাদের নামেই পাঠাতেন। আজ প্রমাণ করে দাও তোমরাই এই মর্যাদার অধিকারী। এমন জবরদস্ত হামলা চালাও পারসিকদের পা যাতে ভূমিশূন্য হয়ে পড়ে।

আহত সিংহের মতো তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো। যাতে হাতিগুলো উল্টো দিকে পালাতে থাকে। মনে রেখো- তোমাদেরকে বনু আসাদ বলা হয়– তোমরা সিংহের সন্তান। নিজেদের নামের যথার্থতা প্রমাণ করে দাও। এমনি কঠিন সংকল্প নিয়ে হামলা করো যে, মৃত্যুর মুখেও পিছু হটবে না, আল্লাহর নাম নিয়ে দুশমনের ওপর বজ্র হয়ে ভেঙে পড়ো। আল্লাহ তোমাদের সঙ্গেই আছেন।'

তুলাইহার নেতৃত্বে বনু আসাদের মুজাহিদরা বজ্রবাহিত তুফানের মতো হামলে পড়লো। তাদের হামলার অধিক চাপ ছিলো হাতিগুলোর ওপর। হাতির ওপর হামলাকারী ছিলো পদাতিক যোদ্ধারা। হাতির সামনে ঘোড়াগুলো যেতে চাইতো না। আর ঘোড়সওয়াররা ফারসী ঘোড়সাওয়ারদের ওপর হামলা করে বেহাত অবস্থা কিছুটা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করতে লাগলো।

প্রাণবাজী রেখে সবচেয়ে বেশি লড়ছিলো পদাতিক যোদ্ধারা। তারা হাতির কাছে সেগুলোকে আহত করার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু কাজটি তাদের জন্য এত সহজ ছিলো না। একে তো হাতিগুলোর হাওদার ওপর থেকে তাদের ওপর অঝোর ধারায় তীর-বর্শা আসতে লাগলো। এতে মুজাহিদরা যখমী হয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। অধিকাংশ তীর বর্শার আঘাতই মুজাহিদদেরকে মৃত্যুর দুয়ারে নিয়ে যেতে লাগলো। দ্বিতীয়ত হাতির পেট-পাঁজর পুরোটা জুড়েই লোহার শিকল ঝুলছিলো। পদাতিক মুজাহিদদের জন্য এটা আরো অধিক বিপদ হয়ে দাঁড়ালো। তলোয়ার আর তীর বর্শা দিয়ে তারা যতই হাতিগুলোর ওপর আঘাত করতে লাগলো শিকল আকৃতির লোহার বর্শা সেগুলো রুখে দিতে লাগলো। কিছু মুজাহিদ হাতির একেবারে কাছে ঘেঁষতে সফল হলো। কাছ থেকে তারা হাতিকে তলোয়ার ও বর্শা দিয়ে আঘাত করতে লাগলো। কেউ কেউ হাওদা থেকে নিক্ষিপ্ত বর্শাগুলো তুলে হাতিকে মেরে গেলো।

এতে খুব সুবিধা না হলেও বনু আসাদের হামলা এতো শক্তিশালী ছিলো যে, হাতিগুলো পিছু হটে গেলো। মুজাহিদরা ভেবেছিলো হাতিগুলো মুখ ঘুরিয়ে তাদের সৈন্যদের দিকে পালিয়ে যাবে। কিন্তু রুস্তমের চিৎকার তাদেরকে আর পিছু হটতে দিলো না।

ঃ 'হাতিগুলোকে থামাও'– ফেরআউনের গজবপূর্ণ গলায় সে বললো– 'এগিয়ে নিয়ে যাও এগুলোকে। যে হাতি এগুবে না তার মাহুত ও হাওদার প্রতিটি সিপাহীকে হত্যা করা হবে।'

হাতিগুলো আবার ধেয়ে এলো। এবার হাতির চিৎকার আরো বিকট-ভয়ংকর আকার ধারণ করলো। মনে হচ্ছিলো ওরা ওদের মাহুতের ওপর ভীষণ রেগে গেছে। কারণ তারা জোর করে ওদেরকে সামনে নিয়ে যাচ্ছিলো।

হাতির এই ক্রোধ বনু বুজায়লা ও বনু আসাদের জন্য বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। মুজাহিদরা আবার হাওদা থেকে আসা তীর ও বর্শার শিকার হতে লাগলো।

সাদ (রা) আরেকটি পয়গাম লিখে নিচে ফেললেন। কাসেদ সহকারী সিপাহসালার খালিদের কাছে তা পৌঁছে দিলো। বনু তামীমের নামে এই পয়গাম লেখা ছিলো। এই গোত্রের সরদার তুলাইহার মতো আরেক বাহাদুর ছিলো আসেম ইবনে আমর।

খালিদ ইবনে উরতুফা বনু তামীমের সারির সামনে গিয়ে ঘোড়া থামালেন।

ঃ 'আসেম ইবনে আমরের নামে সিপাহসালারের পয়গাম এসেছে'– খালিদ বললেন,– 'সিপাহসালার সাদ (রা) লিখেছেন- 'হে বনু তামীম! তোমাদের তো বন্য উট আর ঘোড়া বাগে আনার দারুণ খ্যাতি রয়েছে। হাতিকে কাবু করার কোন ব্যবস্থাকে তোমাদের জানা নেই?'

ঃ 'অবশ্যই আছে'– আসেম তার গোত্রের সৈন্যদের উদ্দেশে বললেন–' তামীম গোত্রের বাঘেরা তোমাদের পরীক্ষার সময় এসে গেছে। সাদ (রা) তোমাদের ডেকেছেন। আমার শুধু তীরন্দাযের প্রয়োজন। ঐ সব তীরন্দায চাই, যারা দাবী করতে পারে তাদের তীরের নিশানা কখনো ব্যর্থ হয় না।'

তীরন্দাযরা বীরদর্পে এগিয়ে এলো।

ঃ 'তোমরা হাতির মাহুত আর হাওদায় দাঁড়ানো পারসকিদের ওপর তীর চালাবে'– আসেম তার তীরন্দায দলকে বললেন– 'আর যদি হাতিগুলোর চোখে তীর চালাতে পারো তবে এরা দিগুণ তুফান হয়ে পারসিকদেরই উড়িয়ে নিয়ে যাবে।'

আসেম তীরন্দায ছাড়াও বর্শাধারীদেরও নিলেন। এর মধ্যে বর্শা নিক্ষেপকারী এবং লম্বা লম্বা বল্লমধারীও ছিলো।

আসেম ইবনে আমর তার তীরন্দায ও বর্শাধারীদের নিয়ে ময়দানে নামতেই হাতিগুলোর ওপর তীর চলতে লাগলো। মোটেও সহজ ছিলো না একাজ। বড় রক্তক্ষয়ী লড়াই চলছিলো, রণাঙ্গনের নিয়ন্ত্রণ পারসিকরা নিয়ে নিয়েছিলো। তাদের তলোয়ার তীর বর্শা এবং লম্বা লম্বা বল্লম বৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছিলো না। তারপরও তীরন্দায ও বর্শাধারীরা পিছু না হটে হাতির ওপর তীর বর্শা চালিয়ে গেলো। ময়দান যেখানে পূর্ণ দখল করে নিয়েছে দুশমন সেখানে দুশমনের ভেতরে গিয়ে এভাবে হামলা করা নিঃসন্দেহে আত্মহত্যার শামিল। যার জন্য অসম্ভব মনোবলের প্রয়োজন ছিলো।

অনেক্ষণ পর হাতিগুলোর হাওদায় খুনের নেশায় চূড় হয়ে থাকা তীরন্দাযরা আহত হয়ে হাতি থেকে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। কয়েকটি হাতির চোখে গিয়ে তীর বিদ্ধ হলো। চোখে তীরের যন্ত্রণা নিয়ে হাতিগুলো এবার নিজেদের সৈন্যদের দিকে ধেয়ে গেলো। এবং তাদেরকে চিরা চেপ্টা করে ময়দানে ঝড় বইয়ে দিলো। ওদের সামনে যাই পড়তো শুঁড় দিয়ে আঘাত করতো বা শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ওপরে উঠাতো। তারপর মাটিতে আছড়ে পড়তো। হাতি থেকে যে সব সৈন্য নিচে গড়িয়ে পড়লো মুজাহিদরা তাদেরকে তলোয়ার বর্শাবিদ্ধ করে মারলো।

লড়াইয়ের মোড় তো ঘুরে গেলো। কিন্তু মুসলমানদের সৈন্যবলের যে ক্ষতি হলো তা ছিলো অপূরণীয়। এতে মুসলমানদের কোমর যেকোন সময় ভেঙে যেতে পারতো। শুধু একটি গোত্র-বনু আসাদেরই শহীদ হলো পাঁচশ সৈন্য আর আহত হলো অসংখ্য।

আসেম ইবনে আমরের তীরন্দায ও বর্শাধারীরা হাতিগুলোকে আহত করে শুধু বেকারই করলো না; বরং পারসিকদের জন্য এগুলোকে এমন গজবে পরিণত করলো যে, তারা লড়াই ভুলে গিয়ে এদিক ওদিক ছিটকে পড়তে লাগলো।

বনু বুজায়লা ও বনু আসাদের মুজাহিদরা যখন গণহারে কাটা পড়ছিলো এবং হাতিগুলোও চিরাচেপ্টা করে দিচ্ছিলো তখন মহলে কুদায়েস থেকে সাদ (রা) তা দেখছিলেন।

তীব্র ব্যথার কারণে সাদ (রা) পেটের ওপর উপুড় হয়ে রণাঙ্গনের অবস্থা দেখছিলেন। মুজাহিদরা যখন মুরগীর মতো সমানে কাটা পড়তে লাগলো সাদ (রা) তখন নিজের সঙ্গীদের এ ভাবে লাশ হয়ে পড়তে দেখে ক্ষোভে দুঃখে উঠে বসলেন। সালমা তার পাশেই ছিলো, রণাঙ্গনের লড়াই দেখছিলো। তার তখন শহীদ স্বামী মুসান্নার স্মৃতি ভেসে উঠলো। মুসান্নার এর চেয়েও কম ভয়ংকর যুদ্ধে লড়াই করেনি– শুধু জয়ীও হয়েছে। সালমা তখন তার সঙ্গেই ছিলো। আজ মুজাহিদরা এভাবে গনহত্যার শিকার হচ্ছে আর সিপাহসালার মহলে মাযুর হয়ে বসে আছে!

ঃ 'হায় আফসোস!' সালমা বললো– 'আজ যে কেন মুসান্না নেই!'

সাদ (রা) আগ থেকেই মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণার তীব্রতায় উত্তেজিত হয়ে ছিলেন। সালমার কথা কয়েকশ তীর হয়ে তাকে যেন ঝাঝরা করে দিলো, হঠাৎ তিনি সালমার মুখে জোরে এক থাপ্পর মারলেন।

ঃ 'এই জানবাযদের সঙ্গে মুসান্নার কিসের তুলনা?' – সাদ (রা) রাগে ফেটে পড়ে বললেন– 'দেখছো না এরা কেমন প্রাণ বাজী রেখে লড়ছে?'

সালমা সাদ (রা) এর চোখে তীর্যক দৃষ্টি হেনে বললো– 'তাই বলে এই বুযদিলি?'

সাদ (রা) তার এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে এমন লজ্জিত হলেন যে, তার কপাল থেকে সমানে গাম ঝরতে লাগলো, সালমাকে তিনি জড়িয়ে ধরে তার কাছে বসালেন।

ঃ 'সালমা!' – সাদ (রা) অনুতপ্ত গলায় বললেন– 'তুমিও যদি আমার এই কষ্ট না বোঝ আর কে বুঝবে? তুমি কি নিজ চোখে আমার অবস্থা দেখতে পাচ্ছো না?' – সাদ (রা)-এর চোখ পানিতে ভরে গেলো।

সালমার ভেতরও কান্নাদসা হয়ে উঠলো।

সালমা এক বিশাল মনের মেয়ে ছিলো। তার স্বামীর নয়, ঐ সব মুজাহিদদের জন্য তার মন ব্যথায় ভরে উঠছিলো যারা পিছু হটার বদলে লড়তে লড়তে লাশ হয়ে গড়িয়ে পড়ছিলো। সালমার মনে মুসান্নার স্মৃতি স্বামী হিসেবে নয় একজন সিপাহসালার হিসেবে ভেসে উঠেছিলো। তখন সালমার দৃষ্টিতে সাদ (রা) স্বামী নয় সিপাহসালার হিসেবে তুলনীয় হচ্ছিলো। দুই সিপাহসালারের বীরত্ব তার চোখে তুলনার পর্দা ছড়িয়ে দিচ্ছিলো।

সূর্য দিগন্তে লালিমার ছোপ রেখে তারই মধ্যে মিশে যাচ্ছিলো। পারসিকরা পিছু হটে গেলো। লড়াই মুলতুবী করে দেয়া হলো পর দিনের জন্য। মুজাহিদদেরকেও পিছু হটিয়ে আনা হলো, এখন কাজ ছিলো লাশ আর যখমীদের উঠানো।

রণাঙ্গন লাশে ভরে গিয়েছিলো।

হঠাৎ দিগন্ত রেখার নিচ থেকে ধূলি ঝড়ের মতো কিছু একটা উঠতে দেখা গেলো এবং তা ছড়িয়ে পড়লো। প্রথমে সবাই বললো ঝড় আসছে। মরুঝড় কল্পনাতীত ভয়ংকর হয়। কিন্তু এর সামনের এলাকার সবুজতা তখনো ধূসরতায় পরিণত হয়নি। ঝড় উঠলে সব জায়গাই ধূসরতায় ছেয়ে যেতো। তারপর পরিষ্কার দেখা গেলো কোন লশকর এগিয়ে আসছে। তখন ফৌজ পাঠানোর ক্ষমতা ছিলো কেবল পারসিকদেরই।

লশকর কাছে আসতেই জানা গেলো এটা মুজাহিদদের লশকর। যা হযরত উমর (রা) নির্দেশে রোমীয়দের রণাঙ্গনে থেকে সাদ ইবনে ওয়াক্কাস (রা) এর সাহায্যার্থে আসছিলো। কিন্তু দূর থেকে এর সংখ্যা অনুমান করা যাচ্ছিলো না।

***'এগিয়ে আয় আবু উবাইদ সালীত (রা) এর হত্যাকারী!' – ক'কা চৎকার করে বললেন– 'জিসিরের এক একজন শহীদের খুনের বদলা আজ নেবো।'***

কাদিসিয়া যুদ্ধের প্রথম দিনটি সন্ধ্যার বিস্তৃত আঁধারে হারিয়ে গেলো।

এদিনের নাম দেয়া হলো 'ইয়াওমে ইরমাস।'

রণাঙ্গন থেকে সামান্য দূরেই ছিলো 'আজীব' নামক ছোট একটি এলাকা, সেখানে বড় একটি ফৌজী চৌকি ছিলো। মুসলমানদের সঙ্গে আসা মেয়েদের সেখানে রাখা হয়েছিলো। তারা ছিলো মুসলিম ফৌজের স্ত্রী, কেউ কেউ তখনো কারো স্ত্রী হয়নি। কেউ কেউ কারো বাগদত্তা ছিলো। আরেক সূত্রে কেউ কারো বোন ছিলো। কেউ কারো মা বা কারো অন্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

যুদ্ধ মুলতবী হওয়ার পর যখনই উভয় পক্ষের লশকর পিছু হটে গেলো তখনই এসব মুসলিম নারীরা– যারা ছিলো মুজাহিদদের স্ত্রী, মা, বোন, বা কন্যা ইত্যাদি- পানির মশক নিয়ে রণাঙ্গনে দৌড়ে এলো।

সন্ধ্যার আঁধার তখনো গাঢ় হয়নি। সহজেই চেহারা চেনা যাচ্ছিলো। কিন্তু সেখানকার অবস্থা ছিলো কলজে ছেড়া ভয়ংকরতর। কিছু কিছু গুরুতর আহত সৈনিক এবং কতক লাশ মৃত ঘোড়ার নিচে পড়েছিলো। কোন কোন যখমী উঠতে উঠতে হাটু গেড়ে পড়ে যাচ্ছিলো। আবার উঠতে চেষ্টা করছিলো। আহতদের কাতর আওয়াজ আর গোঙ্গানী এক হৃদয়ভাঙ্গা পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলো। আর কাদিসিয়ার মাটি রক্ত চুষতে চুষতে যেন হাহাকার করে উঠছিলো।

মুসলিম নারীরা রণাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়লো। অক্ষত অনেক মুজাহিদও তাদের সঙ্গে ময়দানে নেমে পড়লো। কোন আহত সৈনিক দেখলে প্রথমেই তারা ওকে পানি পান করাতো তারপর যখমের দিকে মনোযোগ দিতো। রণাঙ্গনে প্রবেশ করে কোন মেয়েই তার স্বামী ভাই বা অন্যকোন আত্মীয়কে খোঁজা শুরু করতো না, সেখানে তাদের কাছে সবাই এক মমতার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলো। সবাই যেন একই আত্মীয়তার নিগড়ে গ্রথিত ছিলো। যার সামনে যে যখমীই পড়তো তার যত্নে সে লেগে পড়তো। সবার শরীরে যেন

একই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিলো। সবার মনিব যে ছিলেন এক আল্লাহই, যার পথে এই রক্ত উৎসর্গিত হচ্ছিলো, সবাইকে যখন আপন শিবিরে নিয়ে তোলা হতো তখন তাদের পরিচর্যা শেষে সন্ধান চলতো কার আত্মীয় কোথায় আছে।

আহত মুজাহিদদেরকে তাদের সঙ্গী ও মেয়েরা উঠিয়ে নিরাপদ তাঁবুতে নিয়ে যাচ্ছিলো। চলে যাওয়া শহীদ সঙ্গীদের বিয়োগ-ব্যথায় সবার মন ছেয়ে গিয়েছিলো। বিষাদের কালো ছায়ায় তবুও আজকের সন্ধ্যাটা মুজাহিদদের মনে কিছুটা হলেও সজীবতার ছোয়া দিয়ে গিয়েছিলো। এর কারণ সাহায্যকারী নতুন সেনাদল। প্রথম তো দিগন্তের নিচ থেকে ধূলিঝড় দেখা গেলো। যা সামনের দিকে ধেয়ে আসছিলো। তাকে মরুর ভয়ংকর ঝর ভাবা হয়েছিলো। তারপর যখন ধুলোর আচ্ছাদন কাটলো তখন ঘোড়ার আবয়ব স্পষ্ট হলো। সবাই নিশ্চিত ধরে নিলো এটা পারসিকদের সেনাসাহায্য। মুসলিম ফৌজের কেউ কল্পনাও করেনি তাদের কোথাও থেকে সাহায্য মিলবে। ঘোড়া কাছিয়ে আসতেই 'আল্লাহু আকবার' শ্লোগান শোনা যেতে লাগলো।

এক হাজার ঘোড়সাওয়ারের দল ছিলো এটা। এর সালার সবার আগে আগে আসছিলেন। যার নাম ছিলো ক'কা ইবনে আমর তামীমী।

ঃ 'সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) কোথায়?' – কা'কা মুজাহিদদের উৎসুক ভীড়ের দিকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন– 'তাকে গিয়ে বলো আমরা এসে গেছি।'

কাদিসিয়ার ক্লান্ত শ্রান্ত মুজাহিদদের মধ্যে যেন কেউ শতসহস্র প্রাণের সুর বাজিয়ে দিলো। সাদ (রা) কে সংবাদ দেয়া হলো ক'কা এক হাজার সওয়ার নিয়ে এসেছেন। মহলের নিচ থেকে তাকে সংবাদ দেয়া হলো।

ঃ 'এক হাজার?' – সাদ (রা) বললেন।

ঃ 'না – সাদ ইবনে ওয়াক্কাস (রা)' ক'কা মহলের নিচ থেকে ভরাট গলায় বললেন– 'আপনার প্রতি আল্লাহর প্রশান্তি বর্ষিত হোক। এক হাজার নয় ছয় হাজার ...... পাঁচ হাজার সাওয়ার পেছনে আসছে। আমাদের সালার আপনার ভাতিজা হাশেম ইবনে উতবা ....... আর আপনার একি হাল বানিয়ে রেখেছেন?

ঃ 'ওপরে এসো ইবনে আমর' – সাদ (রা) এর কণ্ঠে আনন্দ ঝরে পড়লো। – 'তুমি তো ফিরিশতা বনে এসেছো।'

ক'কা ওপরে উঠে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর পাঁচ হাজার সওয়ারও এসে গেলো। এই সেনাদল আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশে সিরিয়া থেকে এসেছিলো। উমর (রা) সিরিয়ার সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা)কে নির্দেশ দিয়েছিলেন–

সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস কাদিসিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সিরিয়ার অভিযান থেকে যখনই সুযোগ মিলবে কিছু সেনাসাহায্য সাদকে ইরাকে পাঠিয়ে দিয়ো।

সাদ (রা) এর জন্যে এই সেনাদল অপ্রত্যাশিত এক মুজিযা ও আল্লাহর পক্ষ থেকে অপার অনুগ্রহ ছাড়া কিছুই ছিলো না। প্রথম দিনই হাজারের ওপর শহীদ ও যখমী হয়ে বেকার হয়ে পড়েছিলো।

হযরত উমর (রা) এর নির্দেশ যখন সিরিয়ার রণাঙ্গনে পৌছেছে তখন দামেশক মুসলমানদের হাতে বিজয় হয়ে গিয়েছে। অত্যন্ত ভয়াবহ যুদ্ধের পর আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের বিজয় দান করেন এবং রোমকরা চরমভাবে পরাজিত হয়ে পিছু হটে। সিপাহসালার আবু উবাইদা (রা) তারপর প্রথমেই সালার হাশেম ইবনে উতবা ও সালার ক'কা ইবনে আমর তামীমিকে ছয় হাজার সৈন্য দিয়ে কাদিসিয়ার উদ্দেশে রওয়ানার হুকুম দিলেন।

হাশেম ইবনে উতবা ক'কাকে এক হাজার সওয়ার দিয়ে অগ্রদল হিসেবে আগে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে পাঁচ হাজার সওয়ার নিয়ে কিছুক্ষণ পর রওয়ানা দিলেন।

সাদ (রা) এটা দেখে আরো অধিক স্বস্তি পেলেন যে, হাশেম ও ক'কা উভয় সালারই রক্তক্ষয়ী লড়াকু ও অসামান্য বীর যোদ্ধা হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ককার বীরত্ব প্রদর্শন ছিলো কোন অলৌকিক কর্মকাণ্ডের মতোই। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে অক্ষত বেরিয়ে আসতে পারতেন তিনি। ক'কা ও মুসান্না খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা) এর সঙ্গে পারসিকদের বিরুদ্ধেও লড়েছিলেন। তারপর সিরিয়ায় রোমকদের বিরুদ্ধে লড়েছেন। ক'কা মুসান্নার সমগোত্রীয় সালার ছিলেন। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) যখন চূড়ান্ত সংকটের মুখে পড়তেন তখন তিনি ক'কা ও মুসান্নার সহযোগিতা নিতেন।

চার বছর পূর্বে ক'কা অগ্নি পূজারীদের বিরুদ্ধে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) এর নেতৃত্বে লড়েছিলেন। তার অবর্ণনীয় বীরত্বের কথা সবার মুখে মুখে ছিলো। পারসিকদের বিরুদ্ধে এক লড়াইয়ের পূর্বে পারস্য জেনারেল রোযবাকে ব্যক্তিগত লড়াইয়ে আহবান করে ছিলেন। বাহদুরীতে তখন রোযবার দারুণ খ্যাতি। ক'কার সঙ্গে সে মোকাবেলা করলো। কিছুক্ষণ পরেই দর্শকরা দেখলো রোযবার যখমী দেহ নিয়ে তার ঘোড়া মাটির সঙ্গে ঘেষটাতে ঘেষটাতে এমনভাবে ছুটছে যে, তার এক পা ঘোড়ার জিনের আংটার সঙ্গে ঝুলন্ত রয়েছে।

ক'কার নৈশ হামলা ও গুপ্ত হামলাই রোমকদের পরাজয়ের কারণ ঘটেছিলো।

সেই ক'কাকেই সাদ (রা) আজ পেয়েছেন হাতের চাঁদ হিসেবে। তিনি এখন ক'কা ও তার ভাতিজা হাশেমকে যুদ্ধের পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

রাতভর লাশের জটলার মধ্য থেকে যখমীদের খুঁজে খুঁজে বের করা হলো এবং দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলো। শহীদদের লাশও উঠানো হলো।

শহীদদের লাশ উঠাতে উঠাতে রাত পেরিয়ে সকাল হয়ে এলো। আজীবের কাছের এক উপত্যকায় জানাযার পর শহীদদের কবরস্থ করা হলো, কবর খুঁড়ে ছিলো মহিলারাই। দিনভর লড়াইয়ে মুজাহিদরা এতই শ্রান্ত ছিলো যে, তাদের হাত পা তাদের কাছে অবশ মনে হচ্ছিলো, এছাড়া পরদিনের লড়াইয়ের জন্য তাদের তাজাদম হওয়ারও প্রয়োজন ছিলো। শহীদদের কবরে রাখার পর মেয়েরাই কবরে সিংহাভাগ মাটি ঢাললো। কবর শুধু কয়েকশ ছিলো না- হাজারের ওপরে ছিলো।

ওদিকে পারসিকরা তাদের মৃত সঙ্গীদের ময়দান থেকে টেনে হেচড়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। রুস্তম চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছেলো। তাড়াতাড়ি লাশ সরিয়ে ময়দান খালি করো। তাদের সৈন্যরা ছিলো বেতনভুক্ত কর্মচারীর মতো। মৃত সৈনিকিরা তাদের কাছে পরিত্যক্ত বস্তুর মতোই ছিলো। মরে যাওয়ার পর কোথাও ফেলে দিলেই হলো। তাদের মৃতদেরকে ময়দান থেকে কিছু দূরে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর গর্ত করে এক একটি গর্তে কয়েকটি লাশ ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে দিলো।

রণাঙ্গন জঞ্জালশূন্য হতে বেলা বেশ চড়ে গেলো। উভয় পক্ষের ফৌজই লড়াইয়ের শৃংখলিত বিন্যাসে দাঁড়িয়ে গেলো। রুস্তম ঝান্ডা উচুঁ করলো, এই ঝান্ডা রুস্তমের ছিলো না। পারস্য সম্রাট ইয়াযদগিরদের ছিলো। এছিলো এক বড় মর্যাদার প্রতীক। যা রুস্তম ও তার লশকরকে দেয়া হয়েছিলো, যে মর্যদার দাবী ছিলো, রুস্তম থেকে নিয়ে প্রতিটি সৈন্যের জানবাজী রেখে লড়াই করে দেশ রক্ষা করা। আজ তারা সেই পণ নিয়েই রণাঙ্গনে এসেছিলো।

সাদ (রা) আগত ছয় হাজার সেনাদলকে সৈন্যের বিভিন্ন অংশে ভাগ করে দিলে ক'কা তার ভিন্ন মত ব্যক্ত করলেন।

ঃ সিপাহসালার! – ক'কা সাদ (রা) কে বললেন– 'আমার সঙ্গে যে অগ্রদল হিসেবে এক হাজার সৈন্য এসেছিলো তাদেরকে আমার নেতৃত্বে থাকার অনুমতি দিন। তাদেরকে আমি আমার কৌশলে ব্যবহার করবো এবং সৈন্য বিন্যাসেও কোন বিঘ্ন ঘটতে দেবো না। আমি আমার দলের সৈন্যদের খণ্ড খণ্ড করে সময় মতো ময়দানে উপস্থিত করবো। এতে আমাদের সৈন্যেদের অনেক কাজ সহজ হয়ে যাবে।'

সাদ (রা) তার আসল কৌশল জানতে চাইলে ক'কা তাকে বিস্তারিত জানালেন। সাদ (রা) তাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন।

ক'কা মহল থেকে নেমে তার এক হাজার সৈন্য নিয়ে পৃথক হয়ে গেলেন। তাদেরকে দশটি সেনাখণ্ডে ভাগ করে মূল সেনাদল থেকে খানিক দূরের এমন এক স্থানে নিয়ে গেলেন দুশমন যেখানে তাদেরকে দেখতে পেতো না। কাদিসিয়া ময়দানের এদিকটা অসমতল ভূমি ছিলো। কাছে একটি জলাভূমিও ছিলো। যুদ্ধের ময়দানের আশে পাশে উঁচু নিচু মালভূমির অসমতল কিছু টিলা  টিকরাও ছিলো। আর রণাঙ্গনের কাছেই যেহেতু নদী ছিলো এজন্য সেখানে বিস্তর জায়গা জুড়ে  নলখাগড়ার উঁচু নিচু ঘাসি জমি, গাছের ঘন সারি ও ঘন জঙ্গল ছিলো।

বাণিজ্য সূত্রে এসব এলাকায় যুবা বয়সে উমর (রা) এসেছিলেন। সে সূত্রে এসব জায়গার ভৌগোলিক অবস্থান তার নখদর্পণে ছিলো। যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য এই এলাকা তিনি এজন্যই নির্বাচন করেছিলেন যে, এখানকার উঁচু নিচু অসমতল জমিন পারসিকদের যে কোন সময় সংকটে ফেলবে, অবস্থা তাই ঘটলো। পারসিকদের ফৌজ এত বেশি ছিলো যে, এই ময়দানে খোলামেলা পরিবেশে তারা লড়তে পারছিলো না। এবং সেনাখণ্ডকে সময়মতো এক দিক থেকে আরেক দিকে স্থানান্তরিত করতে পারছিলো না।

তাদের তুলনায় মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা কম থাকায় অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাদের সেনাখণ্ডের জায়গা বদল করতে পারতো এবং লড়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ স্থান পেতো। উমর (রা) পূর্বেই সাদ (রা) কে নির্দেশ দিয়ে ছিলেন নদীর ওপারে লড়তে যাবে না। বরং পারসিকদেরকে নদীর এপারে আনতে বাধ্য করবে। এই নির্দেশটি মুসলমানদের জন্য ক্রমেই সুবিধাজনক বলে প্রমাণিত হচ্ছিলো।

ঃ 'আমার আত্মত্যাগী বন্ধুরা'!– ক'কা তার এক হাজার সওয়ারকে বললেন– 'আমি তোমাদেরকে যেভাবে একশ সৈন্যের খণ্ডদলে দাঁড় করিয়েছি তোমরা এভাবেই থাকবে। তোমাদের প্রতিটি নড়াচড়া আমার ইংগিতে হবে। প্রথমে একশ সাওয়ারের একটি দল সঙ্গে নিয়ে যাবো আমি। আমি জীবিত ফিরে এলে বাকী সওযাররাও আমার ইংগিতে এভাবেই আমার মতো হামলা করে ফিরে আসবে। যদি আমি জীবিত ফিরে না আসি তবে এই রইলো হারিস ইবনে যিবইয়ান। সে আমার স্থলে সালার হবে। সেও যদি না ফিরে তবে তোমরা আমাদের অনুসরণেই হামলা করবে......

'আমাদের এভাবে হামলার উদ্দেশ্য আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমাদের লশকরের কোন সেনাদল যখন দুশমনের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হবে তখন তোমাদের একশ সওয়ার পার্শ্ব থেকে শত্রুসেনাদের ওপর হামলা করবে। কিন্তু সেখানে বেশিক্ষণ আটকে থাকবে না। দুশমনকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে ময়দান থেকে বেরিয়ে আসবে।

ক'কার এই যুদ্ধ কৌশল আত্মহত্যার শামিল ছিলো। এতবড় সেনাদল যদি মুসলমানদের ফৌজ থেকে বিচ্ছিন্ন একশ জনের এই খরকুটার মতো দলের অস্তিত্ব টের পেতো তাহলে তাদেরকে নিমিষেই ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারতো।'

কাদিসিয়া যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন ছিলো। মুসলমানরা এটা দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হলো এবং খুশীও হলো যে, পারসিকরা একটি হাতিও রণাঙ্গনে উপস্থিত করেনি। মুসলামনদের পক্ষে স্থানীয় কয়েকজন কৌশলে পারসিকদের ভেতরের খবর এনে দিচ্ছিলো। তারা সকাল সকাল এসে সাদ (রা)কে বলে গেলো– গতকালের যুদ্ধে মুজাহিদরা হাতিবাহিনীর ওপর হামলা করে তাদের হাওদা ও হাওদার রশি কেটে দেয়। অধিকাংশ হাওদাই পড়ে গিয়ে ভেঙে যায় মুজাহিদরা একজন মাহুতও জীবিত রাখেনি। সেগুলো এখনো মেরামত হয়নি। প্রায় সবগুলো হাতিই যখমী হয়ে গিয়েছিলো।

হঠাৎ ক'কা ঘোড়ায় পদাঘাত করে দুই লশকরের মাঝখানে এসে পারসিকদের আহবান করলেন ঃ

ঃ 'আগুনের পূজারীরা! তোমাদের হাড় এই আগুনেই পুড়বে...... যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বাহাদুর সে আমার সঙ্গে মোকাবেলায় আসুক'।

পারসিকদের মূলবাহিনীর সেনাদলের কমান্ডার ছিলো বাহমন জাদাবিয়া। তার অসামান্য বীরত্বের জন্য পারস্য সম্রাট তাকে এই উপাধি দিয়েছিলো, সে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা) হাতেও পরাজিত হয়েছিলো এবং মুসান্নার হাতেও। এটা এক অলৌকিক

ব্যাপার ছিলো, সব ময়দান থেকেই সে অক্ষত পালাতে পেরেছিলো। জিসিরের লড়াইয়ে বাহমন জাদাবিয়ার নেতৃত্বে আবু উবাইদার লশকরকে পারসিকরা পাইকারীভাবে হত্যা করেছিলো। সিপাহসালার আবু উবাইদা শহীদ হয়েছিলেন। সেই লড়াইয়ের আঘাতেই মুসান্না পরে শাহাদাতবরণ করেছিলেন। এই বাহমন জাদাবিয়াই মুসলমানদের গণহারে হত্যা করে পারস্যে আরবদের থেকে বিজয় ছিনিয়ে আনতে পেরেছিলো।

মুসলমানদের সেই গণহত্যার খবর মদীনায় তো পৌছে ছিলোই সিরিয়ার রণাঙ্গনেও পৌছেছিলো। বাহমন জাদাবিয়া যখন ক'কার মোকাবেলায় এগিয়ে এলো ক'কার তখন মনে পড়ে গেলো জিসিরের লড়াইয়ে এই বাহমনই পারসিক ফৌজের সেনাপতি ছিলো।

ঃ 'আমি যুলহিযাব বাহমন জাদাবিয়া!' – ফারসী জেনারেল ঘোড়া নিয়ে এলো এবং তলোয়ার বের করে বললো– 'আজ আমি পুরো আরবের মৃত্যু হয়ে এসেছি।'

ঃ 'এসো আবু উবাইদা ও সালীত (রা) এর হত্যাকারী' – ক'কা চিৎকার করে বললেন– জিসিরের এক একজন শহীদের খুনের বদলা নেবো আজ! – ক'কা ঘোড়ায় পদাঘাত করলেন।

বাহমন জাদাবিয়াও ঘোড়ার লাগাম ধরে ঝটকা মারলো। উভয় ঘোড়া সামনা-সামনি এলো না, বরং এক জায়গায় চক্রাকারে ঘুরতে লাগলো। বাহমন জাদাবিয়ার ঘোড়া অন্যান্য জেনারেলের মতোই বিশালাকায় এবং ক্ষিপ্র ছিলো। আচমকা ঘোড়াটি চোখের পলকে ঘুরে গেলো এবং ক'কার ঘোড়ার পেছনে চলে এলো। ঘোড়া নিয়ে বাহমন জাদাবিয়ার এই ঘুরে যাওয়া এত দ্রুত ও আচমকা ছিলো যে, ক'কা তা তখনই টের পেলেন যখন ফারসী জেনারেল ক'কার গরদান কাটার জন্য পুরোপুরি ঘুরে গিয়েছিলো।

মুসলিম ফৌজের ওপর ভূতের নিস্তব্ধতা নেমে এলো। পারসিক ফৌজ থেকে বাহবা আর প্রশংসামুখর শ্লোগান উঠতে লাগলে। এটা এক মুহূর্তের ব্যাপার ছিলো মাত্র। মনে হচ্ছিলো ক'কার জীবনের চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে গেছে। কিন্তু এই চূড়ান্ত মুহূর্তেই ক'কা বিদ্যুৎ গতিতে মাথা নিচু করে ডান দিকে এমনভাবে ঝুঁকে পড়লো যেন পড়ে যাবে।

এবার মুসলিম ফৌজ থেকে শোরগোল শোনা গেলো। সাদ (রা) ও সালমা মহল থেকে দেখছিলেন।

ঃ 'ইবনে আমর!' – সালমা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলো– 'খোদার কসম! তুমি বনু তামীমের সাক্ষাৎ বাঘ। এই অগ্নিপূজারী পুরো আরবের মৃত্যু হয়ে এসেছে। সে যেন জীবিত না ফিরে।'

বাহমন জাদাবিয়ার আঘাত ছিলো খুবই জোরের সঙ্গে। কিন্তু ক'কা সরে যাওয়াতে তার তলোয়ারের আঘাত শূন্য বাতাস ফালা ফালা করে দিলো এবং বাহমন জাদাবিয়াও শূন্যে কোন অবলম্বন না পেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো। এতে বাহমনের ঘোড়া এমনভাবে ঘুরে গেলো যে, ক'কার ঘোড়ার সামনে তার ঘোড়ার এক পাশ পড়লো। ঘোড়ায় ঘোড়ায় সংঘর্ষ হলো, উভয় সওয়ার একে অপরের এত কাছে এসে পড়লো যে, ক'কা তার তলোয়ার বাহমনের ওপর তলোয়ারের মতো চালাতে পারছিলেন না, কিন্তু তিনি এ সময়টাও নষ্ট করলেন না।

বাহমন জাদাবিয়ার মাথায় শিরস্ত্রাণ ছিলো যা তার চেহারাও ঢেকে রেখেছিলো, আর কাঁধ থেকে নাভীমূল পর্যন্ত বর্মে আবৃত ছিলো। শিস্ত্রাণ ও বর্মের মাঝখানের সামান্য একটু জায়গা গর্দানের কাছে উন্মুক্ত দেখা গেলো। ক'কা তলোয়ারকে বর্শার মতো করে মারলেন। একেবারে বাহমনের গর্দান ভেদ করে গেলো। ক'কা আবার তলোয়ার বের করে নিয়ে এলেন। বাহমন তীব্র ব্যথায় পাগলের মতো মাথা ঝাঁকাতে লাগলো। এতে ওর গর্দান সামনের দিক থেকে আরো অনেকখানি খুলে গেলো। ক'কা দারুণ সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন। এবার ভালো করে আঘাত করলেন তার গর্দানে। অধিকাংশ গর্দানই কেটে গেলো এবং মাথা এক দিকে ঢলে পড়লো।

ক'কা বাহমন জাদাবিয়াকে তার ঘোড়া থেকে ফেলে দিলেন এবং নিচে নেমে তার শিরস্ত্রাণ, বর্ম এবং তলোয়ারটি নিয়ে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলেন।

ক'কা তখনো ঘোড়ায় সওয়ার হননি। পারসিকদের দিক থেকে এক ঘোড়ার আওয়াজ শোনা গেলো।

ঃ 'আরবী! একটু দাঁড়া– ক'কা এই আওয়াজ শুনলেন– " জীবিত ফিরে যেতে পারবি না তুইও।'

পারসিকদের অন্যতম অভিজ্ঞ জেনালের বাহমন জাদাবিয়া শেষ নিঃশ্বাস ফেলার জন্য ছট ফট করছিলো। একহারা গড়নের বেশ শক্তিশালী লোক ছিলো বাহমন, তখনো মরেনি। ক'কা তার দিকে এক ফারসী সওয়ারকে আসতে দেখলেন। বাহমন জাদাবিয়ার যেসব পরিত্যক্ত জিনিস উঠিয়ে ছিলেন সেগুলো ফেলে দিয়ে অত্যন্ত খোশ মেজাযে নিজের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গেলেন।

ঃ 'খোদার কসম! ইবনে আমর!' – ক'কার কানে মুসলমান লশকর থেকে আওয়াজ ভেসে এলো- 'একে আমার জন্য ছেড়ে দিতে হবে।'

ক'কা আওয়াজ লক্ষ্য করে তাকালেন। সে ছিলো এক শাহসওয়ার ও কুশলী যোদ্ধা আওয়ান ইবনে কিতবার আওয়াজ। পারসিকদের থেকে যে বহমান জাদারিয়ার খুনের বদলা নিতে এসেছিলো সে ছিলো সীতানের শাহজাদা বারাজ। ক'কা থেকে তার সামান্য দূরে ছিলো বারাজ। আওয়ান ইবনে কিতবা তার এগিয়ে আসার পথে এসে গেলো। উভয়েই একে অপরের ওপর আঘাত হানলো। দুই তলোয়ারের সংঘর্ষে দুজনের হামলাই ব্যর্থ হলো। ক'কা এতক্ষণে তার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গেলেন। একটু সরে গিয়ে আওয়ানকে উৎসাহ দিতে লাগলেন।

তারা একে অপরের কয়েকবার হামলা করলো। কিন্তু দু'জনের হামলাই ব্যর্থ হলো।

ঃ 'ওর হাত কেটে ফেলো ইবনে কিতবা!' -ক'কা চিৎকার করে বললেন।

সীতানের শাহজাদা বারাজ ক'কার কথা কিছুই বুঝতে পারলো না। সে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিলো। এদিকে আওয়ানও ঘোড়া বাড়ালো। বারাজ কাছে এসে সজোরে আঘাত করলো। আওয়ান তার আঘাত নিজের তলোয়ার দ্বারা প্রতিহত করার বদলে বিদ্যুৎ বেগে

তার সেই হাতে আঘাত করলো যে হাতে বারাজের তালোয়ার ছিলো। তলোয়ার বারাযের বাহুর উপর পড়লো এবং হাড় ভেঙে গেলো। হাত থেকে তার তলোয়ার পড়ে গেলো। পালানোর জন্য সে ঘোড়া ঘোরাতে গেলো। আওয়ান তাকে পালাতে দিলো না। পর মুহূর্তেই বারাজ বাহমন জাদাবিয়ার লাশের পাশে পড়ে ছটফট করছিলো।

ঃ 'কোন আজমী আছে যে এই দু'জনের খুনের বদলা নেবে?' – ক'কা আহবান জানালেন।

ঃ হ্যাঁ আরবী!–পারসিকদের থেকে হাঁক শোনা গেলো-'এক ব্যক্তিত্ববান লোক আসছে।'

এই ফারসী ছিলো বাযার হামহার হামদানী। সে জেনারেলদের সমমর্যাদার এক অফিসার ছিলো। বীরত্বের সে অনেক পুরস্কার পেয়েছিলো।

ঃ 'ইবনে কিতবা!'– ক'কা আওয়ানকে বললেন– 'পেছনে চলে যাও তুমি। আমার তরবারি এখনো তৃষ্ণার্ত'।

ঃ 'এটা আমার শিকার ইবনে আমর!' – মুজাহিদদের দিক থেকে আরেকটি হাঁক শোনা গেলো– 'আমার কাছে আসো আত্মমর্যাদা ধারী।'

এটা ছিলো হারিস ইবনে যিবইয়ানের আওয়াজ। ক'কা যাকে তার নায়েব নিযুক্ত করেছিলেন। সে ঘোড়া দৌড়ে এলো। হামদানী ঘোড়ার রুখ তার দিকে করে দিলো। উভয়ের হাতে তলোয়ার ছিলো। উভয় ঘোড়া একে অপরের কাছ দিয়ে যখন যাচ্ছিলো হামদানী তখন এত জোরে তলোয়ারের আঘাত হানলো যে, হারিসের তলোয়ার তার হাত থেকে ছুটে উড়ে যেতে দেখা গেলো। ফারসী লশকর থেকে আকাশ ফাটা জয়ধ্বনি উঠলো। এই প্রথম তারা ব্যক্তিগত লড়াইয়ে কোন আরবীকে নিশ্চিত পরাজিত হতে দেখছিলো।

হারিসের জীবনের দু'একমুহূর্ত বাকী ছিলো, সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে পড়েছিলো সে। ক'কা তাকে তার তলোয়ারটি দেয়ার জন্য ঘোড়া নিয়ে ছুটে এলেন। কিন্তু হামদানী তা করতে দিলো না।

ঃ 'সরে যান ইবনে আমর!' – হারিস ক'কাকে বললো– খালি হাতেই আমি একে সামলাতে পারবো।'

খালি হাতেই ফারসী সওয়ারকে হারিস সামলে নিলো। হামদানী তার ঘোড়ার কাছে নিয়ে হারিসকে আঘাত করতো। আর হারিস ঘোড়াকে এক দিকে সরিয়ে নিজে আরেক দিকে ঝুঁকে পড়তো। এভাবে কিছুক্ষণ চললো। হঠাৎ হারিস তার ঘোড়ার রুখ বদল করে হামদানীর পেছনে চলে গেলো এবং পেছন থেকে ঘোড়া তীব্র বেগে সামনের দিকে নিয়ে গিয়ে পেছন থেকে একটি হাত হামদানীর গলার দিকে বাড়িয়ে দিলো এবং নিজের দিকে টেনে নিলো। তারপর তার ঘোড়া ছুটিয়ে দূরে নিয়ে গেলো।

হামদানী তার ঘোড়ার পিঠ থেকে ছুটে গিয়ে হামদানীর ঘোড়ার সঙ্গে ঘেষটাতে লাগলো। তার গলা হারিসের বাহুর পেচের মধ্যে ঝুলছিলো। হারিস এবার আরো জোরে ঘোড়া ছোটালো এবং হঠাৎ হামদানীকে ছেড়ে দিলো। চিৎপটাং হয়ে মাটিতে গিয়ে পড়লো হামদানী। তারপর হারিস ঘোড়া ঘুরিয়ে নিলো। হামদানী হোচট খেতে খেতে উঠতে যাচ্ছিলো। হারিসের ঘোড়া এসে আবার আঘাত করে তাকে ফেলে দিলো। এবার

সে হোচট খেতে খেতে অনেক দূরে গড়িয়ে গেলো। আর উঠতে পারলো না। হারিস ঘোড়া থেকে নামালো, শিরস্ত্রাণ হামদানীর মাথা থেকে আপনিই পড়ে গিয়েছিলো। এক আঘাতেই তার ধড় দেহ থেকে পৃথক হয়ে গেলো।

ঃ 'রুস্তম!' – হারিস চ্যালেঞ্জ জানালো –'এবার তুমি এসো।'

পারসিকদের মধ্যে নীরবতা নেমে এলো এবং অনেক্ষণ টু শব্দটিও হলো না। অতি মূল্যবান তিন জেনারেলকে এভাবে চোখের সামনে হারাতে হবে বলে কল্পনাও করেনি তাদের কেউ। এর মধ্যে বাহমন জাদাবিয়ার তো কোন বিকল্পই ছিলো না। রুস্তম এতই উত্তেজিত ছিলো যে, সে তার সব কুষ্ঠি আর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা ভুলে গেলো।

ঃ 'পারস্যের গর্বের কান্ডারীরা!'– রুস্তম তার লশকরকে উজ্জীবিত করার জন্য বললো– 'আমি এই অঙ্গীকার করে বেরিয়ে ছিলাম যে, আরবদের ধ্বংস করে ফিরবো। কিন্তু এই সামান্য কিছু আরব পথের মাঝে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমরা কি তোমাদের আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়েছো? আজকের দিন আরবীদের শেষ দিন বানিয়ে দাও। এর কয়েক দিন পরেই আমাদের অবস্থান হবে মদীনায়।'

ক'কা, আওয়ান এবং হারিসকে সাদ (রা) তাদের সংগৃহীত মালে গনীমত দিয়ে দিয়েছিলেন। এবার সম্মিলিত লড়াই শুরুর পালা।

ঃ 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর দাও' – মহল থেকে সাদ (রা) নির্দেশ দিলেন।

মহলের নিচ থেকে তাকবীর ধ্বনি উঠলো, যার অর্থ প্রাথমিক প্রস্তুতি সেরে নাও।

তারপর দ্বিতীয় তাকবীর ধ্বনি দেয়া হলো।

পারসিকরা মুসলমানদের যুদ্ধ শুরুর এই রীতি সম্পর্কে আগ থেকেই জানতো। তারা জানতো এবার তৃতীয় তাকবীর ধ্বনি শোনা যাবে। তারপরই মুসলমানরা হামলা করবে। কিন্তু রুস্তম সে সুযোগ দিতে চাইলো না। তৃতীয় নারাধ্বনির পূর্বেই রুস্তম তার মূল বাহিনীকে হামলার নির্দেশ দিয়ে দিলো।

উভয় পক্ষের সংকটে কেয়ামত ডেকে আনলো। মুসলমানদের যুদ্ধ কুশলীরা সব সময় একথা বলে এসেছেন যে, লড়াইয়ের সময় যদি শত্রুদল পিছু হটতে থাকে তখন তাদেরকে পিছু ধাওয়া করা যাবে না, বরং নিজেরাই পিছু হটার ভান করবে। শত্রুদল এতে বিভ্রান্ত হয়ে এগিয়ে আসবে। তখনই পাশ থেকে তাদেরকে ঘিরে নিয়ে অতর্কিতে হামলা করবে।

সাদ (রা) দেখলেন কিছুটা অপ্রস্তুত অবস্থায় হামলা করায় মুসলমানরা অসুবিধায় পড়েছে। বনু আসাদের সরদার তুলাইহার নামে তিনি পায়গাম লিখিয়ে মহলের নিচে ফেললেন। কাসেদ দ্রুত তুলাইহাকে তা পৌঁছে দিলো। তাতে লেখা ছিলো ঃ

'গতকালের লড়াইয়ে বনু আসাদই সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছে। সেই গর্বের ভাগ আজো তোমাদেরই হোক। দুশমনের এক পার্শ্ব তোমাদের সামনে রয়েছে। তোমরা তাদের খুব কাছেই রয়েছো। অন্য পাশ ক'কার জন্য ছেড়ে দাও।'

তুলাইহা পয়গাম হাতে পেতেই তার গোত্রের যোদ্ধাদের ডেকে বললো– 'হে বনু আসাদ! আল্লাহ্ তায়ালা আজো দুশমনের মাথা গুড়িয়ে দেয়ার জন্য তোমাদের নির্বাচন করেছেন। ...... দেখো, গতকালের শহীদদের অকৃতজ্ঞ হয়ো না।'

তুলাইহার নেতৃত্বে বনু আসাদ তাদের সামনে যে পারসিক দলটি মুসলমানদের ওপর তীব্র আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিলো তাদেরকে পাশ থেকে আক্রমণ করলো। পারসিকদের এ পাশটি যখন আক্রান্ত হলো তখন অন্য পাশের ব্যূহ ভেঙে গেলো। ক'কার নেতৃত্বে একশ জনের ঝটিকা দলটি এ সুযোগ ছাড়লো না। হামলা করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে লাগলো।

পারসিকদের জন্য ক'কা ও তুলাইহার হামলা আকস্মিক বিপদ হয়ে দাঁড়ালো। ক'কা তার এই ছোট দল নিয়েই দুশমনকে ঘিরে ধরে এমন অকল্পনীয় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তলোয়ার চালালেন যে, দূর থেকে পারসিকরাও তা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। মহলে শায়িত সাদ (রা) এর কণ্ঠ থেকে 'আফরী-আফরী' সাবাস সাবাস শব্দ-তরঙ্গ বেরোতে লাগলো।

এই অভাবিত হামলায় পারসিকরা শুধু জান বাঁচিয়ে পালানোর জন্য লড়তে লাগলো। আক্রমণের চেয়ে তারা প্রতিহতই করতে লাগলো বেশি, যুদ্ধ তখন প্রতিরোধের রূপ নিলো। ক'কার এই অপরিচিত আক্রমণের ধরন পারসিকদের জন্য ভয়াবহ আকার ধারণ করলো, ।তার একশ সওয়ার কোথাও জমে লড়ছিলো না, আক্রমণ করেই স্থান বদল করতো তারা।

ফারসীদের এই দলটির সৈন্যকে শেষ পর্যন্ত পালাতে হলো, রুস্তমের সৈন্যের কমতি ছিলো না। তাজাদম ফৌজ নামালো, তাদেরকে খুবই উদ্দীপিত করলো, পুরস্কারের লোভ দেখালো।

লড়াইয়ের কৌশল সম্পর্কে সাদ (রা) তার সালারদের আগেই বলে রেখে ছিলেন। তবুও রণাঙ্গনের মুহূর্মুহু অবস্থা বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে কোন না কোন সালারের নামে পয়গাম লিখে তাদের কাছে তিনি পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন এবং নিজের অক্ষমতার জন্য অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছিলেন। লড়াইয়ের তীব্রতা ক্রমেই বাড়ছিলো। উৎক্ষিপ্ত ধুলোয় চারদিক এমন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিলো যে, কে কার সামনে পড়েছে তা ঠাহর করতে পারছিলো না, দিগ বিদিক ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের নিচে পড়ে মৃত লাশ আর যখমীরা পিষ্ট হচ্ছিলো।

ক'কার তার পরিকল্পনা মতোই হামলা চালিয়ে গেলেন। তার একশ সওয়ার হামলা করে ফিরে যেতো, আরো একশ সওয়ারের দল এসে দুশমনকে পেছন থেকে বা পার্শ্ব থেকে হামলা করে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যেতো।

সাদ (রা) তো মহলে শয্যাশায়ী হয়ে লড়াই থেকে বঞ্চিত হওয়ার ব্যথায় ব্যাকুল হয়ে ছটফট করছিলেন। মহলের নিচ তলায় আরেক যোদ্ধা তার মতোই বঞ্চনার কলংক নিয়ে নিজেকে ফালি ফালি করে দিতে চাচ্ছিলো। সাদ (রা)কে আটকে রেখে ছিলো তার টনটনে ব্যথাভরা পা। সেই মুজাহিদকেও আটকে রেখেছিলো তার পা দুটোই। কিন্তু তা ব্যথায় নয়–শৃংখলিত শিকলে। তার দু'পা-ই- শিকলে বাঁধা ছিলো।

এ ছিলো আরবের বিখ্যাত এক কবি আবু মাজান সাকাফী। তার কলমের চেয়ে তার তলোয়ারই তার জন্য অধিক খ্যাতি কুড়িয়ে ছিলো। 'সাদ (রা) অসুস্থ  নয় যুদ্ধ থেকে বাঁচার জন্য ভনিতা করেছেন– এই গুজব আর অপবাদ রটানোর মধ্যে আবু মাজানও জড়িয়ে পড়েছিলো। জড়িতেদের খুবই লঘু শাস্তি দেয়া হয়েছিলো। সেটা হলো পায়ে শিকল বেঁধে লড়াই থেকে বঞ্চিত হওয়ার শাস্তি। অবশ্য তাদেরকে কোন বন্ধ কামরায় রাখা হয়নি। শৃংখলিত পায়ে, মহলে তারা চলাফেরা করতে পারতো। বাইরে বের হওয়ার অনুমতি ছিলো না। তারা মহলের ওপরের জানালা দিয়ে আসুভরা চোখে সঙ্গীদের লড়াইয়ের দৃশ্য দেখে যেতো, ব্যথায় তাদের বুকগুলি ভেঙে পড়তো। কিন্তু আবু মাজানের বুকের ব্যথা ছিলো আরো গভীর। তলোয়ারের ঝনঝনানি ছুটন্ত তীরের শা শা আওয়াজ ঘোড়ার চিহিচিহি শব্দ রাত দিন তার ভেতরে রক্ত ক্ষরণ ঘটাতো। তলোয়ার চালনা আর তীরন্দাযী তো তার বেঁচে থাকার অবলম্বন ছিলো। ক'কা ইবনে আমরের প্রায় অতি মানবিক বীরত্ব দৃশ্য তাকে এই দুনিয়া ছাড়িয়ে কোন অগম্য জঙ্গলে নিয়ে যেন ফেলতো, তখন পায়ে যখন শিকল বাঁধা দেখতো হাউমাউ করে কেঁদে উঠতো।

যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন আবু মাজান আর টিকতে পারলো না। তার ধমনীর রক্তগুলো ফুটন্ত পানির মতো ফুটতে লাগলো। পা টিপে টিপে মহলের দোতলায় চলে গেলো। সেখানে সাদ (রা) ও সালমা যুদ্ধের অবস্থা দেখছিলেন।

ঃ 'কি ব্যাপার আবু মাজান?' – সালমা তাকে হঠাৎ এখানে দেখে বললো– 'তোমার তো এখানে আসার কথা না............. কিসে তোমাকে এখানে নিয়ে এলো?'

ঃ 'আমার সামনে এসো'– সাদ (রা) বললেন– তুমি দেখতেই পাচ্ছো আমি উঠতেও পারছি না পেছনে তাকাতেও পারছি না।'

ঃ 'বড় আশা নিয়ে এসেছি সিপাহসালার!' – আবু মাজান বললো- আপনাকে ছাড়া আর কেই বা আমার এই আশা পূরণ করতে পারবে'?

ঃ 'তোমার এতবড় আশাটি কি?'

ঃ 'আমার অন্যায় মাফ করে দিন ইবনে ওয়াক্কাস!' – আবু মাজান কান্নাভেজা গলায় বললো'– তারপর আমার এই শিকল খুলে দিতে বলুন। যার জন্য আমি এখানে এসেছি। সেই ফরয কাজটি যেন আমি করতে পারি।'

ঃ তোমার অন্যায়ের জঘন্যতা দেখবে না'?– সাদ (রা) তাকে ঝাঁঝালো গলায় বললেন– 'আমার মাথায় কি টগবগ করছে তা কি দেখতে পাচ্ছো না ..... ...... সালমা! একে নিচে দিয়ে এসো এবং বলে এসো কেউ যেন একে ওপরে আসতে না দেয়।'

আবু মাজান আর কিছু বললো না, শিকল বাঁধা পা টেনে টেনে বাইরে বেরিয়ে এলো। সালমা তার সঙ্গে নিচে যেতে বললো সাদ (রা)কে লড়াই এতই উত্তেজিত করে রেখেছে যে, খাবার দাবারের প্রতিও তার কোন হুশ নেই। অন্যকোন কথা বললেও তিনি এমনই রেগে উঠতেন।

ঃ 'সালমা!' – আবু মাজান অনুনয়ের সুরে বললো'– কমপক্ষে তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো না। একটু অনুগ্রহ করো। আমার শিকলটি খুলে দাও। ঐ দেখো সিপাহসালারের ঘোড়াটি এমনিই পড়ে আছে। আমাকে নিতে দাও ওটা। আমার সঙ্গীরা লড়ছে। মানবতার শত্রুদের লাশ ফেলে দিচ্ছে। আর আমি কয়েদখানায় পড়ে আছি।'

ঃ 'না আবু মাজান! তা হয় না' সালমা বললো- 'আমার অন্তরকে কেউ জিজ্ঞেস করলে উত্তর পেতো সে তোমাকে রণাঙ্গনেই দেখতে চায়। তোমার মতো এমন তলোয়ারের উস্তাদের পায়ে শিকল দেখে আমারও কম কোন দুঃখবোধ হচ্ছে না। কিন্তু তোমার শিকল খুলে সিপাহসালারের ঘোড়া তোমাকে দিয়ে দেবার অধিকার আমার নেই।'

ঃ 'আমি ওয়াদা করছি সালমা!' – আবু মাজান বললো– 'আমাকে যেতে দাও। জীবিত ফিরে এলে নিজে নিজেই শিকল পায়ে দিয়ে নেবো।'

সালমা তবুও রাজী হতে পারলো না, আবু মাজান মাটিতে বসে পড়লো। চরম অনুতাপের চোখে তার শিকলের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার দু'পা জড়িয়ে এগুলো যেন অভিশাপ দিচ্ছিলো তাকে। সালমার মনও তার জন্য ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠলো। সে সেখানে দাঁড়িয়েই আবু মাজানের ব্যথিত মুখটির দিকে তাকিয়ে ছিলো। আবু মাজান ছলছল চোখে তাকালো। তার গলার কান্নার ভাপ ছাপিয়ে কণ্ঠ দিয়ে দূরাগত কবির শোক ঝড়ে পড়লো ঃ

'এর চেয়ে বড় দুঃখও কি কারো কপালে জুটবে- রণাঙ্গন জুড়ে
শাহ্ সওয়াররা উঠাচ্ছে ধূলি ঝড়- আর পায়ে আমার জিঞ্জিরের বেড়।'.......
'উঠতে চাইলে কি হবে– শিকল যে পায়ে জড়িয়ে অভিশাপের চুম্বন আকে
রুদ্ধ কপাট ক্লান্ত পথিকের আর্তি ফিরিয়ে দেয় সপাট।'
সম্পদের নেই আমার অভাব- কিন্তু ঐ যে স্বভাব
'ভাই ও আমার কাড়ি কাড়ি- কিন্তু সবাই যে চলে গেছে দিয়ে
আমায় আড়ি। ফিরে তাকাবার জোও নেই কারোর।.......
'আমার প্রতিশ্রুতির আর্জি পাঠিয়ে দিলাম করুণাময়ের দরবারে।
শরাবের দরজা অবাধ করে দিলেও সে মুখো যে আর হবো না আমি
দরজার খিল হোক না যতই নড়বড়ে।'

আবু মাজানের বিরুদ্ধে সবার অভিযোগ ছিলো ঐ মদ নিয়েই। মদকে সবাই শুধু অপছন্দই নয় ঘৃণাও করতো, বুদ্ধিমানরা তাই করে। সালমা বুঝলো তাকে এবার ছেড়ে দিলে ঠিকই সে আর কখনো মদ ছুঁবে না। আবু মাজানের বুক ভরা কান্নার আওয়াজ সালমার বুকে গিয়ে বাজলো। আবু মাজানের চোখ দিয়ে তখনো অঝোরে অশ্রু ঝরছিলো।

ঃ 'আমার মন বলছে তোমার এই অঙ্গীকার নিশ্চিত মনে মেনে নিতে' – সালমা বললো।'

অনেক বড় মনের মেয়ে ছিলো সালমা। মরীচিকা মুছে গিয়ে আবু মাজানের মনের সজীবতার দীপ্তিটি সালমার চোখে ঠিকই ঝলক দিয়ে গিয়েছিলো। তাই সালমা কেবল

তার স্বামীর হুকুমের অন্যথাই করলো না, আবু মাজানের শিকলটি খুলিয়ে দিলো এবং মহলের আস্তাবলে সিপাহসালারের 'বালকা' নামক ঘোড়াটিও দিয়া দিলো। কোত্থেকে একটি তলোয়ারও জোগাড় করে দিলো।

আবু মাজান এক লাফে ঘোড়ায় চড়ে মহলের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো, সাদ (রা) এর দৃষ্টি সে পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব ছিলো না।

সালমা সাদ (রা) এর কাছে গিয়ে বসলো। সাদ (রা) এমন ডুবে ছিলেন যে, সালমা কেন নিচে গিয়েছিলো একবারও তার মনে হলো না। সাদ (রা) এর চোখ ছিলো ময়দানে, তার চিন্তা চেতনা জুড়ে ছিলো রণাঙ্গনের ভয়াল দৃশ্যের ছবি। দুশমন তখন ময়দানে পদাতিক বাহিনী নামিয়ে ছিলো। সাদ (রা) বিভিন্ন নির্দেশ দিয়ে পয়গাম লেখাতে শুরু করে দিলেন।

সাদ (রা) এর দৃষ্টির কাছের যে পদাতিক দলটি ছিলো সেখানে কোত্থেকে যেন এক আরবী ঘোড়সাওয়ার উদয় হলো। তার চেহারাসুদ্ধ মাথা কাপড়ে আবৃত ছিলো। দুশমন তাকে দেখে ঘিরে ধরলো। তার হাতে তলোয়ার ছিলো। তলোয়ার দিয়ে একজনকে সামলানো কঠিন কিছু ছিলো না। কিন্তু সে যখন তলোয়ার চালালো তখন আর তার তলোয়ার দেখা গেলো না। দেখা গেলো ঘেরাও করা সৈন্যদের কেউ লুটিয়ে পড়ছে। কারো বর্শা দু টুকরো হয়ে শূন্য উঠে গিয়ে মাটিতে নেমে আসছে। কারো হাতটি উড়ে গেছে। কারো মুণ্ড বিহীন শিরটা বাঁকা হয়ে পড়ে গেছে। পিষ্ট হয়ে গেছে কেউ ঘোড়ার পায়ে।

এই আরবী সওয়ার যেমন করে তার তলোয়ার ব্যবহার করলো তা কেবল একজন যুদ্ধবিশারদের পক্ষেই সম্ভব ছিলো। অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে ঘিরে ধরা দলটি ক্ষত বিক্ষত হয়ে জায়গাটি ফাঁকা হয়ে গেলো। তারপর সে পদাতিক যোদ্ধাদের মধ্যে ঢুকে তার তলোয়ারের কারিশমা দেখাতে লাগলো।

আরবী পদাতিক যোদ্ধারা পারসিক পদাতিকদের হটিয়ে দিলে তাদের সওয়ার বাহিনী এগিয়ে এলো, মুসলমানরা তাদের সঙ্গেও লড়ে যেতে লাগলো। সাদ (রা) সেই সওয়ারকে আবার দেখতে পেলেন। কোন দল বা খণ্ড দলের সঙ্গেই ছিলো না সে। একা একা লড়ে যাচ্ছিলো। এমন তুমুল যুদ্ধে কারো দলকেই স্পষ্ট করে চেনা যায় না। কিন্তু এই সওয়ার ঠিকই নজর কেড়ে নিচ্ছিলো।

ঃ 'সালমা!' – সাদ (রা) বললেন– ঐ যে সওয়ারকে দেখতে পাচ্ছো?'

ঃ ' হ্যাঁ আমি দেখছি '- সালমা বললো- 'যে জাতির এমন একজন সাওয়ার আছে সে জাতিকে পরাজিত করবে এমন শক্তি কাদের আছে?

ঃ 'আবু মাজান বন্দী না থাকলে আমি নিশ্চিত করে বলতাম এই সওয়ার আবু মাজান'– সাদ (রা) বললেন– 'আমি তাকে কয়েক জায়গায় লড়তে দেখেছি। দুশমনের ওপর এমন অগ্নিমূর্তি হয়েই তাকে লড়তে দেখেছি।'

সালমা কিছু বললো না। চেহারায় নির্লিপ্ত ভাব ধরে রাখলো।

ঃ 'আফরী' – সাদ (রা) এর মুগ্ধ দৃষ্টি সেই সওয়ারের দিকেই ছিলো। তাকে ঘোড়া নিয়ে এক পাশে বিদ্যুৎবেগে সরে যেতে দেখে তার গলা উচ্ছ্বাসে ভরে গেলো– 'ওহ! আফরী – খোদার কমস! এটা আবু মাজানেরই ধরন...... তার গোড়াটি দেখো। একেবারে আমার 'বলাকা'। দেখো, সওয়ারের ইশারায় কত দ্রুত এদিক ওদিক সরে যাচ্ছে।

– সাদ (রা) একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। অভিমানের গলায় বললেন– 'হে আল্লাহ! তোমার পবিত্র সত্তা কী এক সময়ে আমাকে এখানে ফেলে রেখেছে। ....... 'সালমা! আমার বলাকার' দেখা শোনা হচ্ছে তো ঠিক মতো? আমি এখানে পড়ে আছি আর নিচে 'বলাকা' বন্দীর মতো দাঁড়িয়ে আছে..... ওর তো এখন রণাঙ্গনে থাকার কথা ছিলো।'

সালমা কিছুই বললো না। সাদ (রা) এর দুরন্ত বলাকাকে দেখছিলো।

সেদিনের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে উভয় পক্ষের লশকরই পিছিয়ে এলো। এদিনের যুদ্ধও জয় পরাজয়ের নিষ্পত্তি না করে অমিমাংসিতভাবে শেষ হলো। তবুও দিন শেষে মুসলমানদের পাল্লাই ভারী ছিলো। সাদ (রা) এজন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। যুদ্ধের ফলাফল মুসলমানদের বিরুদ্ধেও যেতে পারতো। পারসিকদের বিশ হাজার সৈন্য মারা গেলেও অবশিষ্ট ছিলো আরো এক লাখ সৈন্য। তাদের হাতি বহর তো ছিলোই ঘোড়সওয়ার সৈন্যও ছিলো দ্বিগুণ। প্রায় তিন থেকে চার হাজার মুজাহিদ শহীদ হয়ে ছিলো, এজন্য মুসলমানদের পরাজয় যে কোন সময় ঘটতে পারতো। কিন্তু অটুট মনোবল অসামান্য ঈমানী শক্তি যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনও শত্রুবাহিনীর ওপর তাদরেকে প্রবল রেখেছিলো।

সাদ (রা) এর মনের মেঘ কিছুটা কেটে গেলো। শরীরের আড়ষ্টতাও সামান্য সরে গেলো। এজন্য তিনি হঠাৎ ব্যথাও কম বোধ করলেন এবং দাঁড়িয়ে গেলেন। সালমাকে বললেন, দেখি কদম কয়েক পা ফেলতে পারি কিনা, কামরার আরেক দিকের জানালার দিকে তিনি যেতে লাগলেন। ওদিকে মহলের প্রশস্ত উঠোনটি ওপর থেকে দেখা যেতো। সালমা তাকে হাটতে সাহায্য করলো।

ঃ 'আমার 'বলাকাকে' একটু দেখে আসি'– সাদ (রা) বললেন– 'ঐ জানালা দিয়ে দেখা যাবে।'

সালামার বুকটা ধক করে উঠলো। জানতো সালমা এই জানালা দিয়ে নিচে তাকালেই তার ঘোড়ার জায়গাটি দেখা যাবে। কিন্তু ঘোড়া দেখা যাবেনা। ঘোড়াতো আবু মাজানের কাছে। সালমা সাদ (রা)কে ঐ জানালার দিকে যেতে বারণও করতে পারছিলো না। তার কাঁধের ওপর সালমা একটি হাত রেখে তাকে চলতে সাহায্য করলো। তার সাহায্যে বড় কষ্টে এক একটি কদম তিনি ফেলতে লাগলেন। জানালা খোলাই ছিলো।।

সূর্য প্রায় ডুবুডুবু তখন। এজন্য দিনের আলোর কিছুটা ছাপ এদিক ওদিক তখনো লেগেছিলো। 'বলাকা' একেবারে জানালার নিচেই বাঁধা যেতো। সাদ (রা) জানালা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। সাদ (রা) দেখলেন ঘোড়া তার নিজের জাগায় দাঁড়িয়ে কি যেন চাবাচ্ছে। সালমার জানে পানি ফিরে এলো। কিন্তু তারপরও রহস্য লুকানো গেলো না।

ঘোড়াটি ঘামে একেবারে চুপসে ছিলো। পিঠ থেকে তার জিন তুলে নেয়া হয়েছিলো। আর আবু মাজান ঘোড়ার এক পাশে বসে পায়ে শিকল দিচ্ছিলো।

ঃ 'বলাকা' এমন ঘামে নেয়ে উঠেছ। কেন সালমা? – সাদ (রা) জিজ্ঞেস করলেন– 'কোন রোগ নয় তো এটা?..... এর ওপর দেখি ধুলোও দেখা যাচ্ছে। যেখানে জিন বসানো হয় সেখানটায় ধুলো নেই। এতো মনে হচ্ছে আমার ঘোড়া কেউ বাইরে নিয়ে গিয়েছিলো। ...... ঘোড়ার সাইসকে ডাকো সালমা!.... আরে আবু মাজান এখানে কি করছে? পা থেকে শিকল খুলে ফেলছে?'

ঃ 'না ইবনে ওয়াক্কাস!' – সালমা বুকে সাহস নিয়ে কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস ফুটিয়ে বললো- 'আবু মাজান শিকল খুলছে না বরং খুলে দেয়া শিকল পায়ে গলিয়ে নিচ্ছে। ..... আর আপনার ঘোড়ার গা থেকে ঘাম দিচ্ছে কোন রোগের কারণে নয়। আজ বলাকা সারা দিন লড়েছে।'

ঃ 'কি বলছো সালমা!'

ঃ 'ঐ সওয়ার আবু মাজানই ছিলো। যাকে দেখে আপনি বলেছিলেন, এতো আবু মাজানের মতো লড়ছে' – সালমা বললো- 'তার ঘোড়াটি আপনার বলাকাই ছিলো। আপনি বলেছিলেন, এঘোড়া তো আমার 'বলাকার' মতো।'

সালমা সাদ (রা)কে খাট পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে বসালো। তাকে শুইয়ে দিয়ে পুরো ঘটনা সাদ (রা)কে খুলে বললো, আবু মাজানের কবিতাও শোনালো। আরো বললো আবু মাজান কাঁদতে কাঁদতে তার সঙ্গে দুটি ওয়াদা করেছিলো। 'জীবিত যুদ্ধের ময়দান থেকে 'জীবিত ফিরে আসতে পারলে নিজে নিজে পায়ে শিকল পরে নিবে। এবং আর কখনো শরাব পান করবে না।'

ঃ 'আপনি তো দেখেছেন ফিরে এসে সে তার পায়ে বেড়ি পড়ছিলো। সালমা বললো– 'আমি আপনার নির্দেশকে অমান্য করেছি ঠিক; কিন্তু জিহাদের জন্য যখন সে আকুল হয়ে কাঁদছিলো আমি তখন সহ্য করতে না পেরে আল্লাহর শরণাপন্ন হই এবং আবু মাজানকে ছেড়ে দিয়ে আপনার ঘোড়া তাকে দিয়ে দেই। আপনি তার লড়াই তো বেশ উপভোগই করেছেন।'

ঃ 'তাকে ওপরে ডাকো।'

সালমা জানালা দিয়ে তাকে ডেকে ওপরে আসতে বললো। সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসতে আবু মাজানের বড় কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু সকালে তার এত কষ্ট হয়নি। কি এক অমোঘ আবেদন তাকে টেনে এনেছিলো তখন।

ঃ 'শিকল ছেড়ে দাও আবু মাজান' – সাদ (রা) বললেন– ' খোদার কসম! ইসলামের জন্য যে এমন উৎসর্গপ্রাণ তাকে আমি শাস্তি দিতে পারি না। ..... আজ থেকে তুমি মুক্ত। যাও সকালে তুমি তোমার ঘোড়া পেয়ে যাবে।'

ঃ 'খোদার কসম! আমার প্রিয় সিপাহসালার!' – আবু মাজান বললো- 'আজ আপনি আমাকে মুক্ত করে দিলেন। আজ থেকে আমি শরাব ছেড়ে দিলাম।'

❖ ❖ ❖

লড়াইয়ের দ্বিতীয় দিন রুস্তম মাঝে মধ্যে দিশাহারা হয়ে যাচ্ছিলো। এক লাখ বিশ হাজার সৈন্যের এজন্যই সমাবেশ ঘটানো হয়েছিলো যে, সৈন্যদের মধ্যে যদি মনোবলের ঘটতি দেখা দেয় তাহলে কয়েকগুণ সংখ্যার চাপেই মুসলমানদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে ময়দানের ধকল সামলে নেয়া যাবে। তারপর অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলমানদের কেটে ফেলা যাবে। কিন্তু রুস্তম এই দিন পদাতিক সৈন্য হোক বা সওয়ারী সৈন্য হোক যাদেরকেই নামালো মুসলমানদের হাতে মার খেয়ে পিছু হটতে চেষ্টা করলো। রুস্তমের ধমকানি হাকডাক কোন কিছুই যুদ্ধে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারলো না। ধন-সম্পদ নারী বাড়ির লোভ কোন কিছুই তাদের লড়াইয়ে রঙ ধরালো না।

পারসিকদের বারবার পিছু হটা আর মুসলমানদের মুহূর্মুহু বিজয়ের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে যে নৈপুণ্য মুসলমানরা দেখিয়েছে মুজাহিদরা এর অর্ধেক কৃতিত্বই দিয়েছে ক'কা ইবনে আমরকে। তার এক একশ সওয়ারের ঝটিকা দলের হামলা পারসিকদের সৈন্যব্যূহ এবং দলীয় বিন্যাস বার বার ভেঙে দিয়েছে। ব্যক্তিগত বীরত্বেও সেদিন ক'কা সবাইকে ছাড়িয়ে যায়। ক'কা একা ত্রিশ জন ফারসীকে হত্যা করে।

আরেক মুজাহিদের নির্ভীকতা ও দুঃসাহিকসতা সবাইকে বিস্ময়ে বাকহারা বানিয়ে দিয়েছিলো। পারসিকদের ঐ সারিতে সে গিয়ে ঢুকে যেখানে রুস্তম ছিলো। রুস্তমকে হত্যার জন্য তলোয়ার যখন সে উদ্যত করলো এমন সময় এক ফারসী পেছন থেকে তাকে বর্শা মেরে বসলো। তারপর ফারসীরা তাকে ঘিরে তলোয়ার আর বর্শার আঘাতে তার দেহটি কিমা বানিয়ে ফেলে।

শেষ বিকেলে মুজাহিদরা ফারসীদের এমনভাবে চেপে ধরেছিলো যে, মনে হচ্ছিলো আজই ফারসীদের পা ময়দান থেকে উপড়ে যাবে। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার উভয় পক্ষকেই পিছু হটিয়ে নিলো। যুদ্ধের এই দ্বিতীয় দিনের নাম দেয়া হয়েছিলো 'ইয়াওমে আগওয়াস।'

সেদিন অর্ধেক রাত পর্যন্ত মুসলিম ক্যাম্প জেগেছিলো। মুসলমানদের চেহারার দুশ্চিন্তার ছাপ অনেকটা কেটে গিয়ে তাদেরকে নির্ভয় মনে হচ্ছিলো। কেউ কেউ সামান্য উৎফুল্লও ছিলো। সেদিনের যুদ্ধে মুসলমানদের পাল্লা ভারী থাকায় সাদ (রা)ও কিছুটা স্বস্তি অনুভব করছিলেন। এজন্য আবু মাজানকেও মাফ করে দিয়েছিলেন এবং তার নির্দেশ অমান্য করায় সালমাকেও কিছু বলেননি।

মুজাহিদদের মধ্যে কেমন এক নিশ্চিন্ততার আবহ তৈরী হয়েছিলো। প্রত্যেক গোত্রই তাদের সৈন্যদের মনোবল আরো চাঙ্গা করার জন্য তাদের বীরত্ব প্রদর্শনের প্রশংসা করছিলো উঁচু আওয়াজে।

ঃ 'আরে প্রশংসা যদি করতেই হয় তবে রবীআ ও মুদার গোত্রের সজীব কান্তি মায়েদের প্রশংসা করো যারা এই পাঁচ হাজার সোনার ছেলে জন্ম দিয়েছেন' – ক'কা উচুঁ আওয়াজে বললেন।

ঃ 'আর সঙ্গীত রচনা করো সেই এক হাজার সওয়ারের, হেজাযের গর্বিত মাটি যাদের জন্ম দিয়েছে' – এক মুজাহিদ বললো– ' যারা মাটি ভেদ করে বের হতো এবং দুশমনকে খুনরাঙা করে আবার মাটির কোলে ফিরে যেতো।'

ঃ 'ইবনে আমর! তুমি তোমার গোত্রের কথা চেপে যাচ্ছো কেন? '– আরেক মুজাহিদ ক'কাকে বললো– বনু তামীমের কথা বলো, যে তোমার মতো এক চিতাকে জন্ম দিয়েছে'।

সিরিয়া থেকে যে ছয় হাজার সওয়ার সাদ (রা) এর জন্য এসেছিলো। তাদের মধ্যেই এই খোশগল্প চলছিলো। এর মধ্যে পাঁচ হাজার বনু রবীআ ও মুদার গোত্রের সওয়ার ছিলেন। ক'কার নির্বাচিত এক হাজার সওয়ারের সবাই ছিলো হেজাযের লোক। ক'কা নিজে বনু তামিমের এক গর্ব ছিলো।

সে রাতে মুজাহিদদের উৎসব উৎসব মেজাজে বড় গলায় কথাবার্তার আওয়াজ সাদ (রা)কে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমুতে দেয়নি। তার কানে তাদের দূরাগত শব্দগুলি পৌছছিলো। মুজাহিদরা তখন একে অপরের বাহাদুরির গল্প করছিলো। সাদ (রা) এর কাছে দুই সালার বসা ছিলেন। তাদের একজনকে তিনি বললেন ঃ

'খেয়াল রেখো, এরা যদি একে অপরের গোত্রের প্রশংসা নিয়ে মেতে থাকে তবে তাদেরকে ঘাটিয়ো না। আমাকে জাগিয়ো না। শেষ পর্যন্ত শত্রুর ওপর তারাই তো প্রবল ছিলো। এরা যদি চুপ করে যায় খুবই ভালো। কয়েকজন যদি চুপ নাও করে অসুবিধা নেই। কিন্তু তাদের কথার সুর যদি পাল্টে যেতে দেখো এবং নিজেদের প্রশংসা আর খ্যাতির মাত্রা নিয়ে গর্ব ও অহংকারের মাত্রায় চলে যেতে দেখো আমাকে তখন জাগিয়ে দিয়ো। কারণ এই মানসিকতাটা আশংকাজনক।'

সাদ (রা) চাচ্ছিলেন মুজাহিদদের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সুন্দর সম্পর্কটা যেন তাদের কারো অতি কথন এবং গোত্রীয় অহংকার-অহমিকার কারণে নষ্ট হয়ে না যায়। কারণ এ পর্যন্ত এটাই মুসলমানদের সফলতার অন্যতম রহস্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। গোত্রে গোত্রে সম্প্রীতি, পরস্পরের প্রতি মমত্ব ও শ্রদ্ধাবোধ এবং নেতার প্রতি নিঃস্বার্থ আনুগত্যই মুসলমানদের সফলতার রূপকার হিসেবে প্রমাণিত হয়ে আসছে।

ক'কা সেখান থেকে উঠে গেলেন। মুজাহিদরা তখনও তাদের খোশগল্পে মেতেছিলো। সারা দিনের লড়াইয়ের ক্লান্তির পরও তাদের শতভাগ ঈমানী শক্তি ও মনের অমিত তেজ তাদেরকে দারুণ সজীব সতেজ প্রাণ লাগছিলো। ক'কা উঠার সময় তার ছোট্ট সেনাদলটিকেও নিয়ে নিলেন। তাদেরকে এমন এক ঘন জঙ্গলের দিকে নিয়ে গেলেন যেখানে জলাভূমি, নলখাগড়ার বন ও বড় বড় ঝোপঝাপের ছড়াছড়ি। ওদিকে কারোই আসা যাওয়া ছিলো না।

সেখানে নিয়ে গিয়ে ক'কা তার সওয়ারদের ঘোড়ার জিন খুলে রেখে আরাম করার নির্দেশ দিলেন। তার এক হাজার সওয়ারের সবাই উপস্থিত ছিলো না। একশর ও বেশি শহীদ বা আহত হয়ে গিয়েছিলো। অবশিষ্টদের নিয়েই ক'কা আবার দশটি ঝটিকা দল করে তাদের কমান্ডার নিযুক্ত করে দিলেন এবং পরদিনের যুদ্ধে তাদের কি করণীয় তাও বলে দিলেন।

এই জঙ্গলেরই আরেক দিকে সাদ (রা) এর ভাতিজা হাশেম ইবনে উতবা তার পাঁচ হাজার সওয়ারকে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। পুরো পাঁচ হাজার সৈন্য এখানে ছিলো না। কিছু সৈন্য দিনের লড়াইয়ে শহীদ বা আহত হয়ে গিয়েছিলো। মূলবাহিনী থেকে এদেরকে এখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো।

পর দিনের লড়াইয়ে পারসিকদের বিভ্রান্তিতে ফেলার জন্য এই সওয়ারীদের জঙ্গলে লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো। এই কৌশলটা বেরিয়েছিলো ক'কার মাথা থেকে। ওদিকে মুসলিম নারীরা হাতে মশাল নিয়ে আহত সৈনিকদের খুঁজে খুঁজে বের করে পানি পান করাচ্ছিলো। তাদেরকে উদ্ধার করছিলো। যারা চলতে পারছিলো না নিজেদের শরীরে তাদেরকে বইয়ে আপন শিবিরে পৌঁছে দিচ্ছিলো।

কোন মুজাহিদের সদ্য যুবতী স্ত্রী যদি কোন যুবক মুজাহিদকে আহত হয়ে পড়ে থাকতে দেখতো তখন তার মনে এটা আসতো না যে, তার স্বামী কোথাও যখমী হয়ে পড়ে আছে বা সে নিজে হয়তো বিধবাই হয়ে গেছে। যে মুজাহিদকেই তার সামনে যন্ত্রণা কাতর দেখতো তার পাশে বসে যেতো। তাকে পানি পান করাতো, তার যুবা শরীরকে নিজের শরীরে ভর করে ছাউনিতে পৌঁছে দিতো। যুবা মুজাহিদটির মনে এটা কখনো উদয় হতো না যে, এটা কোন যৌবনবতী নারী। তাদের আবেগ অনুভূতি অন্তরের উপলব্ধি এক বিন্দুতে গিয়ে মিশে ছিলো। যে বিন্দুর অনন্ত উৎস এক 'আল্লাহ'। এক আল্লাহর পথের জিহাদই তাদের অস্তিত্বকে প্রাণময় করেছিলো। একই তাবুঁর ছায়ায় তাদেরকে জড়িয়ে রেখেছিলো সত্যের অমিত শক্তি। সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা এবং মিথ্যাকে পরাস্ত করার জন্য পরস্পরের হাত ধরে দেশ থেকে দেশান্তর হচ্ছিলো। তাই সত্য মিথ্যার এই লড়াইয়ে কোন মুজাহিদের শরীর যদি রক্তাক্ত হতো তবে আরেক মুজাহিদা এসে তার যখমে হাত বুলিয়ে দিতো। পরবর্তী লড়াইয়ের জন্য তাকে তরতাজা করে তুলতো।

এক মা এক হাতে পানির মশক আরেক হাতে মশাল নিয়ে তার দুই মুজাহিদ সন্তানের খোঁজে বের হলো। তার কানে হঠাৎ কারো কাতরধ্বনি পৌঁছলো। ক্ষীণ কণ্ঠে তার জড়ানো আওয়াজ বের হলো।

'মা'– মার পা জমে গেলো। লাশের পর লাশ ময়দানময়। কোন মৃত ঘোড়ার পায়ের নিচে তার সওয়ার চাপা পড়ে আছে। জমাট রক্তের মধ্যে তার ছড়ানো পা দুটি দেখা যাচ্ছে। মার কানে আবার সেই কাতরধ্বনি এসে আঘাত করলো, মা মশাল উচিয়ে তাকে খুঁজে বের করলো। কিন্তু এ তার ছেলে নয়। তবুও মা ব্যস্ত হাতে মমতাভরে আপন সন্তানের কথা বুকে চেপে রেখে পানি পান করালো। তারপর উচিয়ে তার ছাউনিতে পৌঁছে দিলো।

সেখানকার এক মা সবার মা ছিলো, এক বোন সবার বোন ছিলো। মা তার মমতায়, বোন তার ভালবাসায় মুজাহিদদের পরিচর্যায় তাদের রাতের ঘুম হারাম করে দিতো। শুধু তাই নয় তাদের মনোবল বাড়াতেও সাহায্য করতো তারা।

মুসলিম নারীরা যখন আহত মুজাহিদদের তালাশে বের হতো তখন তাদের মুখে নানা উৎসাহব্যঞ্জক কথা ফিরতো।

ঃ 'যেখানে বোন আছে ভাইয়ের যখম সেখানে কিছুই করতে পারবে না' – কারো স্ত্রী এক আহত সৈনিককে পানি পান করাতে করাতে বলছিলো।

ঃ 'আল্লাহ তোমাদের বিসর্জন দেয়া রক্ত কবুল করুন।'

ঃ 'হাতি বহরকে তোমরা দারুণভাবে ভাগিয়ে দিয়েছো।'

ঃ 'একটু কষ্ট করে উঠে দেখো– দুশমনের অসংখ্য লাশের স্তূপ ............. এই নাও পানি, আরাম করে পান করো। চলো এবার তাঁবুতে রেখে আসি তোমায়।'

ঃ 'কিভাবে যে তোমাদের অনুগ্রহের প্রতিদান দেবো! আমাদের ইয্‌যত আব্রু সম্ভ্রম বাঁচাতে কি বীরের মতোই না তোমরা খুন রাঙা হয়েছো!'

ওদিকে রুস্তম ফারসীদের ক্যাম্পে তার জেনারেল ও ছোট বড় কমান্ডারদের ওপর অগ্নি বর্ষণ করছিলো। যুদ্ধের প্রথম দিনেই সে মুসলমানদের আরবে ঝেটিয়ে বিদায় করবে এমন অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলো। কিন্তু দুদিনে মুসলমানরা এমন অবস্থা করলো যে, এখন তার লশকরের একলাখও অবশিষ্ট নেই। রাগে ক্ষোভে সে পাগল হয়ে যাচ্ছিলো।

এখন কি করতে হবে। কি হবে সে কিছুই বুঝতে পারছিলো না। তাকে জানানো হলো মাদায়েন থেকে ফৌজ আসছে। রুস্তম দৌড়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলো। মাদায়েন থেকে ইয়াযদগিরদ ফৌজ পাঠিয়েছিলো। ইয়াযদগিরদ নিয়মিতই ময়দানের খবর পাচ্ছিলো। কাদিসিয়া থেকে মাদায়েন ঘোড়সাওয়ারের জন্য খুব বেশী হলে একদিনের দূরত্ব ছিলো। ফৌজের এই দলটি ইয়াযদগিরদের বিশেষ বাহিনী ছিলো। নেযাবাযী তীরন্দাযী ও তলোয়ার চালনায় তারা কারো চেয়ে কেউ কম ছিলো না। পারসিকদের এই দলটি ছিলো সবচেয়ে দুর্ধর্ষ দল। এদের সংখ্যা দু'হাজারের চেয়ে কিছু বেশি ছিলো। প্রত্যেকেই পুরো বর্মে আবৃত ছিলো।

এই দলের কমান্ডার রুস্তমের হাতে ইয়াযদগিরদের একটি পয়গাম তুলে দিলো।

'রুস্তম! অনেক কষ্টে যুদ্ধের জন্য তোমাকে রাজী করানো গেছে। তোমাকে এত বড় ফৌজ দেয়া হয়েছে যা ইতিপূর্বে পারসিকরা আর দেখেনি। তুমি অঙ্গীকার করেছিলে আরবকে ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু আমি তো খবর পাচ্ছি তোমার নিজের লশকরই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমার কাছে সর্বশেষ এই দলটিই ছিলো। সেটাও আমি পাঠিয়ে দিয়েছি .......... তোমার হয়েছে কি? সারা পারস্যের চোখ তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। উপাসনালয়ে তোমার বিজয়ের প্রার্থনা করা হচ্ছে। মনে রেখো তোমাদের এত বড় লশকরের যদি কাদিসিয়া থেকে পা উপড়ে যায় তবে সামনে তোমাদের মাদায়েন। মাদায়েনের দেয়ালের বাইরে রেখো মুসলমানদের তোমরা। মাদায়েন চলে গেলে সবই গেলো ....... আচ্ছা তুমি কি বলতে পারবে মুসলমানদের মধ্যে এমন কোন শক্তিটি আছে যা তোমাদের কাছে নেই'?

ইয়াযদগিরদ জানতো না এবং রুস্তম জেনেও তার উপলব্ধি সেই জানা পর্যন্ত পৌঁছেনি। রুস্তমের অনুরোধে মুসলমানদের শেষ দূত মুগীরা ইবনে শুবা (রা) রুস্তমের কাছে গিয়েছিলেন। রুস্তম চাইছিলো মুসলমানরা কোন লোভের টোপ গিলে ফিরে যাবে এবং লড়াইও হবে না। কিন্তু মুসলমানদের পক্ষ থেকে সে একই জবাব পেয়ে আসছিলো যে, ইসলাম গ্রহণ করো না হয় কর দাও। অন্যথায় ফয়সালা করবে তলোয়ার। অবশেষে মুগীরা (রা) গিয়ে রুস্তমকে এমন উত্তেজিত করলো যে, রুস্তম যুদ্ধের টোপ গিলে ফেললো। তখন সে বলেছিলো, 'কাল আমি সারা আরব ধ্বংস করে দিবো।'

ঃ 'হ্যাঁ যদি আল্লাহ চান তবে'– মুগীরা (রা) বলেছিলেন।

ঃ 'না আল্লাহ না চাইলেও'– রুস্তম বলেছিলো।

ইয়াযদগিরদকে এখন কে বলবে মুসলমানরা এক আল্লাহর পয়গাম নিয়ে এসেছিলো এবং এটাই তাদের শক্তির উৎস। অথচ রুস্তম বলছে সেই আল্লাহ না চাইলেও সারা আরব সে ধ্বংস করে দেবে। রুস্তমই বলবেইবা না কেন। এই পারস্যের রূপকার সেই কিসরা পারভেজকে এক আল্লাহর পথে আহবান জানিয়ে রাসূল (সৎ) যে পয়গাম পাঠিয়েছিলেন কিসরা তা ছিঁড়ে শত টুকরায় ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে। কিন্তু কিসরা জানতো না মুসলমানদের এই পয়গাম ছিঁড়লেও তাদের বিশ্বাসের অনন্ত উৎস 'ঈমান'–কখনো কেউ ছিন্ন করতে পারবে না।

ফজরের পর শহীদানের জানাযার নামায পড়া হলো। স্থলাভিষিক্ত সিপাহসালার খালিদ ইবনে উরতুফা জানাযার নামায পড়ালেন। তারপর শহীদানের দাফন কার্য চলতে লাগলো। এমন সময় মদীনা থেকে ছোট একটি কাফেলা এলো। আমিরুল মুমিনীন উমর (রা) এর পয়গাম নিয়ে এসেছিলো এই কাফেলাটি। পয়গাম তো শুধু একজন কাসেদই আনতে পারে। কাফেলার প্রয়োজন হয়েছে এজন্য যে, উমর (রা) পয়গামের সঙ্গে চারটি অতি উৎকৃষ্ট জাতের ঘোড়া ও চারটি অত্যন্ত মূল্যবান তলোয়ার পাঠিয়ে ছিলেন। উমর (রা) এর পয়গামের নিচে লেখা ছিলো, এই চারটি ঘোড়া ও তলোয়ার পুরস্কারস্বরূপ তাকে যেন দেয়া হয় যে কাদিসিয়ার যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করবে।

কাদিসিয়া যুদ্ধ শুরুর কথা মদীনায় তখনো পৌঁছেনি। এই খবর নিয়ে কাসেদ তখনো পথেই ছিলো। হযরত উমর (রা) জানতেন তার পাঠানো বার্তা পৌঁছতে পৌঁছতে লড়াই শুরু হয়ে যাবে। তিনি চিন্তা করলেন মুজাহিদদের উৎসাহিত করার জন্য কিছু করা উচিত। এগুলো তিনি তাই পাঠিয়ে দিলেন। দিনমান উমর (রা) এর চিন্তা জুড়ে এই যুদ্ধ এবং যুদ্ধের খুটিনাটি ঘুরে বেড়াতো। এজন্য তিনি এতই অস্থির থাকতেন যে, সামান্য সুযোগ পেলেই মদীনা থেকে বের হয়ে সেই রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতেন যে রাস্তা দিয়ে কাসেদরা রণাঙ্গন থেকে মদীনায় আসা যাওয়া করতো।

যুদ্ধের তৃতীয় দিন হযরত উমর (রা)-এর এই তোহফা কাদিসিয়ায় পৌঁছলো। এবং সাদ (রা) এর কাছে তা পৌঁছে দেয়া হলো। সাদ (রা) ক'কাকে ডাকলেন। দ্বিতীয় দিনের

যুদ্ধে যে ক'কাই যুদ্ধের মোড় পাল্টিয়ে দিয়েছিলো এনিয়ে কোন মুজাহিদের সন্দেহ থাকা তো দূরের কথা কেউ তা নিয়ে তর্কে যেতেও রাজী ছিলো না। ক'কার কারণে পারসিকরা সবচেয়ে বড় যে ক্ষতির সম্মুখীন হলো তা হলো তাদের বাহমন জাদাবিয়াকে হারানো। ক'কার হাতেই সে নিহত হয়। বাহমন জাদাবিয়াকে হারিয়ে ফারসীরা শুধু একজনে জেনারেলকেই হারায়নি সে ছিলো রুস্তমের প্রেরণাদাতা এবং অন্যতম পরামর্শদাতা।

ঃ 'ইবনে আমর'! সাদ (রা) ক'কাকে বললেন– 'খোদার কসম! এমন কাউকে পাওয়া যাবে না। যে, প্রশংসাযোগ্য বীরত্ব প্রদর্শন করে লড়েনি। পুরস্কারের উপযুক্ত সবাই। আল্লাহই সবাইকে পুরস্কার দেবেন। এটা আমীরুল মুমিনীনের উপহার। এর উপযুক্ত তুমিই, এই চার ঘোড়া আর তলোয়ার নিয়ে যাও।'

ঃ 'আমীরে লশকর! আমার চেয়ে আরো অনেক যোগ্য সৈনিক আছে'– ক'কা বললেন– 'আমি এই ঘোড়া বা তলোয়ার কোনটাই রাখবো না। যারা এর অধিক উপযুক্ত তাদেরকেই আমি এগুলো হাওলা করে দিচ্ছি।'

ক'কা তলোয়ার চারটি জামাল বিন মালিক, রুবাইল বিন আমর, তুলাইহা বিন খুওয়াইলিদ ও আসেম ইবনে আমরকে দিয়ে দিলেন। আর ঘোড়াগুলো ইয়ারবু গোত্রের চার বীর মুজাহিদকে দিয়ে দিলেন।

লড়াইয়ের তৃতীয় দিনের সূচনাটা হয়েছিলো আমীরুল মুমিনীনের উপহার দিয়ে। যা বড় বরকতময় এবং এক শুভ লক্ষণ ছিলো। আরেকটি শুভ লক্ষণ ছিলো আরবের বিখ্যাত মহিলা কবি খানসার আগমন। উমর (রা) যখন পারস্য অভিযানের জন্য স্বেচ্ছাসেবক যোদ্ধা চেয়ে জরুরী ঘোষণা দিলেন তখন খানসা তার চার যুবক ছেলেকে মুসলিম ফৌজে নিয়ে এসেছিলেন। খানসা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে শোকগাথার সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর ইন্তিকালের পর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উমর (র) এর সেই ঘোষণার পরই তার মদীনায় প্রথম আগমন ঘটে।

তার চার ছেলের সঙ্গে তিনিও পারস্য অভিযানে রওয়ানা হয়ে যান। তৃতীয় দিন ভোরে জানাযার নামাযের পর মুজাহিদরা যুদ্ধের জন্য সংগঠিত হয়ে দাঁড়াচ্ছিলো খানসা তখন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সৈন্যদের একটি সারির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ঃ 'আমার ছেলেরা কোথায়? আমার সামনে এসে দাঁড়াও'– খানসা বড় গলায় ঘোষণা দিলেন।

তার চার ছেলে তার সামনে এসে দাঁড়ালো। মুজাহিদরা নীরব হয়ে গেলো এবং দেখতে লাগলো এই বিখ্যাত শোক-সঙ্গীতজ্ঞ তার সন্তানদের কি বলেন! খানসা যা বললেন পুরো সেনাদল শুনতে না পেলেও তার সামনে যে সৈন্যদলটি ছিলো তারা অবশ্যই তা শুনতে পেয়েছিলো।

ঃ 'আমার ছেলেরা! আমার প্রিয় সন্তানরা'– খানসা বলে গেলেন– 'তোমাদের মুনীবের ওপর তোমরা কোন বোঝা হয়ে ছিলে না, না দেশে দুর্ভিক্ষ পড়েছিলো। তারপরও তোমরা তোমাদের প্রৌঢ়া মাকে এখানে নিয়ে এসেছো এবং ইরাকের দরজায়

দাঁড় করিয়ে দিয়েছো। খোদার কসম! তোমরা যেমন এক মার সন্তান তেমনি এক পিতারও সন্তান। তোমাদের বাবার সঙ্গে কোন অনৈতিকতা কখনো আমি করিনি এবং তোমাদের মামুদের বদনাম করিনি। যাও শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়ে যাও।'

চার ছেলের কণ্ঠ তাকবীর ধ্বনিতে উচ্চকিত হয়ে উঠলো।

ঃ 'মা!'– তাদের এক ভাই বললো– 'আমরাও আমাদের বাবার আত্মার সঙ্গে অনৈতিক আচরণ করবো না এবং আমাদের মামাদের সুনামও ক্ষুণ্ন করবো না। আর না তোমাকে লজ্জিত করবো।'

ছেলেরা তাদের নির্দিষ্ট সেনাদলে ভিড়ে গেলো।

ঃ 'হে আল্লাহ!' মা দু'হাত ছড়িয়ে দু'আ করলেন- 'আমার ছেলেদের তুমি বাঁচিয়ে রেখো।'

রণাঙ্গনে দুই পক্ষের সৈন্যরা সংগঠিত হয়ে দাঁড়ালো। এ দিনের ফারসী সৈন্য বিন্যাসের চিত্র ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। রুস্তমের চেহারায়ও আত্মবিশ্বাস দেখা যাচ্ছিলো। ইয়াযদগিরদের বিশেষ বাহিনীকে সে তার অধীনেই রেখেছিলো। পারসিকদের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিলো আজ তারা মুসলমানদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার জন্য অধীর হয়ে আছে।

লড়াইয়ের প্রথম দিন মুজাহিদরা হাতির হাওদা কেটে, সওয়ার এবং মাহুতকে মেরে হাতি ভাগিয়ে দিয়েছিলো। দ্বিতীয় দিন হাওদা মেরামত না হওয়াতে এবং মহুত পাওয়া না যাওয়াতে হাতি নামায়নি পারসিকরা। তৃতীয় দিন তারা প্রথম দিনের চেয়ে আরো অনেক বেশি হাতি নামালো। হাতির বিন্যাসও প্রথম দিনের মতো ছিলো না। এবার তারা একেকটি হাতি আরেকটি হাতি থেকে দূরে দূরে রাখলো এবং ডানে বায়ে ঘোড়সওয়ার মোতায়েন করলো। হাতি রক্ষার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়ে ছিলো।

আগের দিন রাতে সাদ (রা) যখন তার সালারদের পরদিনের লড়াইয়ের ব্যাপারে বিভিন্ন নির্দেশ দিচ্ছিলেন তখন ক'কা ইবনে আমর ও হাশেম ইবনে উতবা তাদের পৃথক পৃথক কৌশল চিন্তার কথা জানালেন। সাদ (রা) তা মঞ্জুর করলেন।

যুদ্ধ শুরুর পূর্বে যথারীতি ব্যক্তিগত লড়াই শুরু হলো। পারসিকদের পক্ষ থেকে বিশাল দেহের এক পাহলোয়ান এগিয়ে এলো। সওয়ার হয়ে নয়। পায়দল আসছিলো সে। তার হাতে ছিলো একটি খঞ্জর। সবাই ভাবছিলো মুসলমানদের পক্ষ থেকে এমনই এক পাহলোয়ান এগিয়ে যাবে। কিন্তু সেখান কাঠির মতো হালকা পাতলা গড়নের এক মুজাহিদ এগিয়ে আসতে দেখা গেলো। যেন ফারসী পাহলোয়ানের সঙ্গে ঠাট্টা করা হচ্ছে। এর তুলনায় ফারসী পাহলোয়ানকে দৈত্য মনে হচ্ছিলো।

পারসিকদের সৈন্যসারি থেকে এক অট্টহাসি ভেসে এলো। মুজাহিদ পাহলোয়ানের কাছে পৌঁছতেই পাহলোয়ান তার খঞ্জরটি চট করে কোমরবন্ধীতে রেখে মুজাহিদের

বগলের নিচে হাত ঢুকিয়ে ওপরে উঠালো। তারপর তাকে মাটিতে এমনভাবে ছুঁড়ে মারলো যে, মুজাহিদটি উপুড় হয়ে পড়লো। পাহলোয়ান দেরী করলো না। মুজাহিদদের গায়ের ওপর সর্বশক্তিতে আছড়ে পড়লো। মুজাহিদের নরম ভাতের মতো ভর্তা হয়ে যাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু মুজাহিদ মাটিতে পড়েই প্রস্তুত ছিলো। পাহলোয়ানকে পড়তে দেখেই বিদ্যুৎ বেগে এক দিকে সরে গেলো। পাহলোয়ান পাথর মাটিতে আছড়ে পড়লো। পড়ে বিস্ময়ে তার মুখ হা হয়ে গেলো।

মুজাহিদ দারুণ ফুর্তির মেজাজে উঠলো। তার খঞ্জরটি বের করলো। পাহলোয়ানের দেহে শক্তি ছিলো ঠিক, কিন্তু ভারী দেহ নিয়ে এত দ্রুত স্থান বদলের ক্ষমতা ছিলো না। মুজাহিদ তার খঞ্জর পাহলোয়ানের পিঠে আমূল বসিয়ে দিলো। একবার নয়, তিনবার। তবুও একজন পাহলোয়ান এত দ্রুত মরতে পারে না। সে চিত হয়ে তার খঞ্জর বের করলো। কিন্তু মুজাহিদ তার বুকে খঞ্জরটি ঢুকিয়ে দিল। পাহলোয়ানের হাত থেকে খঞ্জর পড়ে গেলো এবং তার শরীর বাঁকা হয়ে উপুড় হয়ে গেলো। মুজাহিদ পাহলোয়ানের খঞ্জরটি উঠিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে তার পিঠে ঢুকিয়ে দিলো এবং সেখানেই তা রেখে দিলো।

ঃ এই লড়াই শেষ করে দাও' – রুস্তমের গলা দিয়ে মেঘের গর্জন ডেকে উঠলো– 'হামলা করো। দুই হাতি ডান দিক থেকে এবং দুই হাতি বাম দিক থেকে আগে বাড়াও, ঘোড় সওয়াররা যেন হাতির বেষ্টনী ভেঙে ফেলতে না দেয়।'

ফারসী পদাতিক যোদ্ধারা আগে বাড়লো। মুজাহিদরাও অগ্রসর হতে লাগলো। উভয় পক্ষের পদাতিক যোদ্ধারা পরস্পরের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলো প্রায়। এমন সময় মুজাহিদদের ডানবাহুর দিকের কিছু দূর থেকে অনেকগুলো ঘোড় সওয়ার দৌড়ে এলো।

ঃ 'সাহায্য এসে গেছে–' মুজাহিদদের লশকরে শ্লোগান গর্জাতে লাগলো– 'সেনা সাহায্য এসে গেছে – আল্লাহু আকবার.... আল্লাহ তাআলা আমাদের সাহায্য পাঠিয়েছেন।'

পারসিকদের বোকা বানানোর জন্যে পূর্বেই এই পরিকল্পনা করা হয়েছিলো। ক'কা ও হাশেম জঙ্গলে যে সৈন্যদের লুকিয়ে রেখেছিলেন তাদের থেকে এক সওয়ার দৌড়ে যাবে আর পুরো লশকর 'সাহায্য এসেছে' বলে শ্লোগান দেবে। এর দ্বারা পারসিকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করাই উদ্দেশ্য ছিলো।

এই বিভ্রান্তির প্রভাব ফারসী ফৌজের ওপর পড়লো। কিন্তু জেনারেলরা তাদের ফৌজদের এই বলে প্রভাব দূর করে দিলো যে, মুসলমানদের যতই সেনাসাহায্য আসুক আমাদের ফৌজের অর্ধেক তারা জোগাড় করতে পারবে না। তাছাড়া শাহেনশাহে ফারেস তার ব্যক্তিগত সৈন্যদের বিশেষ দলটিকে আমাদের সাহায্য স্বরূপ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

এই একশ সওয়ারের সঙ্গে কিন্তু ক'কা ছিলেন না। তার জায়গায় কমান্ডর ছিলো কায়েস ইবনে হুরায়রা। ক'কা ময়দান থেকে একটু দূরে অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ফৌজের সঙ্গে উটও থাকতো। ক'কা পঞ্চাশটারও অধিক উট চেয়ে নিলেন। তারপর মহিলাদের ডাকিয়ে নিয়ে পুরনো কাপড় ও লম্বা লম্বা উড়নী এবং পুরাতন তাঁবুর কালো কাপড় জড়ো করে তাদেরকে সেলাই করতে লাগিয়ে দিলেন।

উটের পুরো শরীর আবৃত করার জন্য তিনি বোরকার মতো অনেকগুলো আলখেল্লা বা ঝোল তৈরী করালেন। প্রত্যেক উটের ওপর একটি করে আলখেল্লা চড়িয়ে এর ভেতর একজন করে সওয়ার বসিয়ে দেয়া হলো। উটের মাথা ঘাড় সব কিছুই কাপড় আবৃত ছিলো। উট সওয়ারীদের সহজে দেখার জন্য তাদের চোখ বরাবর ছিদ্র করে দেয়া হলো। সেটি এমন আকার ধারণ করলো যে, এমন বিকট মূর্তির প্রাণী পৃথিবীর কেউ কখনো দেখেনি।

ওদিকে জঙ্গলের দিক থেকে আসা একশ ঘোড়সওয়ার পারসিকদের পদাতিক বাহিনীর ওপর হামলা করলো। হামলা করলো ঠিক কিন্তু জবাবের আশা করলো না। ঘোড়া দৌড়ের ওপরই রাখলো এবং পারসিকদের কেটে মেরে, ছত্রভঙ্গ করে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলো। তারা একই স্থানে থেকে লড়ছিলো না।

ঃ 'হাতি এগিয়ে নাও'- রুস্তম উচুঁ আওয়াজে বললো- 'ঘোড় সাওয়াররা নিজেদের বেষ্টনীতে হাতিগুলোকে রেখে হেফাজত করবে। আর তোমরা এমন করে তীর আর বর্শা মেরে যাও যাতে একজন মুসলমানও জীবিত ফিরতে না পারে।'

দুই হাতি ডান ও বাম দিক থেকে এগিয়ে আসতে লাগলো। আর হাতির হাওদা থেকে সাওয়াররা মুসলমানদের ওপর তীরন্দাযী শুরু করে দিলো। এতে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। এমন সময় ক'কা কাপড়ে আবৃত উটগুলোকে আগে বাড়ালেন। কি করতে হবে উট সওয়ারদের আগেই বলে রাখা হয়েছিলো। উটগুলো ছড়িয়ে পড়ে হাতিগুলোর দিক যেতে লাগলো। হাতিকে ঘিরে রাখা ঘোড়সাওয়াররা উটের দিকে ঘোড়াগুলো ঘুরিয়েছিলো। সওয়াররা তো দেখে নিয়েছিলো গিলাফের ভেতর উট। কিন্তু ঘোড়া ও হাতির মাথায় তা বোঝার মতো বুদ্ধি ছেলো না। এমন ভয়ংকর প্রাণী তারা কখনো দেখেনি। তাদের জন্য এরা ভূত বা দৈত্য ছিলো। ঘোড়াগুলো ভয়ে লাফিয়ে উঠে কিছু পিছু হটতে লাগলো আর কিছু এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ঘোড়সাওয়াররা হাতির আশেপাশে যে বেষ্টনী তৈরী করে ছিলো তা ভেঙে গেলো। উট সওয়াররা হাতিগুলোকে উটের সামনে নিয়ে গেলো। হাতিগুলোও বিকট স্বরে চিৎকার করতে করতে পিছু হটতে লাগলো। ঘোড়া তার সওয়ারদের হাত থেকে এবং হাতি তার মাহুতদের হাত থেকে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়লো।

রুস্তম চরম উত্তেজিত হয়ে সামনে থেকে হুকুম দিচ্ছিলো। সে মুমলমানদের এ অবস্থা দেখে রাগে জ্বলতে জ্বলতে ঘোড়সওয়ারদের এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিলো। সওয়ার যোদ্ধারা প্রস্তুত ছিলো। নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। মুজাহিদদের সওয়াররাও অগ্রসর হলো। ওদিকে ক'কা উটগুলো আবার ঠেলে সামনে নিয়ে এলেন। ফারসীদের ঘোড়াগুলো আবার ভয়ে চিহি চিহি শব্দ করে এদিক ওদিক পালাতে লাগলো।

ঃ 'ভয় পেয়োনা'- রুস্তম চিৎকার করছিলো- এগুলো উট। এদেরকে গিলাফ পরানো হয়েছে, হাজার হাজার ঘোড়ার ভয় পাওয়া চিহি চিহি শব্দের মধ্যে রুস্তমের সেই চিৎকার হারিয়ে গেলো। আর তা না হলেও ঘোড়া তো আর রুস্তমের ভাষা জানতো না।

❖ ❖ ❖

হঠাৎ জঙ্গল থেকে লুকিয়ে থাকা প্রায় পাঁচশ ঘোড় সওয়ার বেরিয়ে এলো। সালার হাশেম ইবনে উতবা তাদের নেতৃত্বে ছিলেন। মুজাহিদরা আরেকবার শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠলো –'সেনাসাহায্য এসে গেছে, সাহায্য এসে গেছে।'

এটাও শত্রুদলের জন্য এক ধোঁকা ছিলো। পূর্বেই এসব ঘোড় সওয়ারদের জঙ্গলে লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো। আর উটের ওপর আলখেল্লা চড়িয়ে পারসিকদের হাতি ও ঘোড়াগুলোকে তো তখন থেকেই নাস্তানাবুদ করা হচ্ছিলো।

হাশিম ইবনে উতবার সওয়াররা এগিয়ে আসা পারসিকদের ঘোড়সওয়ারদের ওপর পর্শ্ব থেকে হামলা করলো। সামনের দিক থেকে মুজাহিদরাও আঘাত শুরু করলো। পারসিকদের ঘোড়াগুলো উটের ভয়ে উদভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলো। মুজাহিদরা এদের যথাসম্ভব ক্ষতি করলো। কিন্তু আলখেল্লা চড়ানো উটগুলো নিজেদের ঘোড়াগুলোকেও ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলো। মুজাহিদরা এতে বেশ অসুবিধায় পড়লো। এর সঙ্গে সঙ্গেই ফারসী পদাতিক যোদ্ধারা উটগুলোকে আহত করতে লাগলো।

সাদ (রা) মহল থেকে মুজাহিদদের কোণঠাসা অবস্থা দেখছিলেন। তিনি পয়গাম লেখিয়ে খালিদ ইবনে উরতুফাকে ডাকিয়ে আনলেন– 'উটগুলোকে এখনই পিছিয়ে নাও। আমাদের ঘোড়াগুলোও এগুলোর ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে।

উট ময়দান থেকে সরিয়ে আনা হলো। উটের কৌশল সফল হলেও রুস্তমের কাছে অক্ষত সৈন্যের অভাব ছিলো না। তিন ভাগের দু'ভাগ সওয়ারী ফৌজ ও সবগুলো হাতিই অক্ষত ছিলো। রুস্তম সওয়ার যোদ্ধাদের মাধ্যমে অবিরত হামলা শুরু করে দিলো। ক'কা ও হাশিম ইবনে উতবার সৈন্যরা ফারসীদের পার্শ্ববাহু থেকে হামলা করে করে অন্য দিকে সরে যেতো। এতে মুজাহিদদের ওপর ফারসীদের চাপ কিছুটা কমে যেতো এবং মুজাহিদরা সামলে নিয়ে দু-এক মুহূর্তের জন্য দম নিতে পারতো।

মাঝে মধ্যে ফারসীদের আক্রমণ এত কঠিন ও ভয়ংকর হয়ে উঠতো যে, মুজাহিদদের পিছু হটতে হতো। কয়েকবার তো এত পিছু হটে গেলো যে, মনে হচ্ছিল মুজাহিদরা আর সামনে বাড়তে পারবে না। মুসলমানদের একে তো সৈন্যসংখ্যা খুবই কম ছিলো, তারপর আবার এটা ছিলো যুদ্ধের তৃতীয় দিন। তাদের অবিশ্রান্ত লড়াইয়ে লেগে থাকায় দৈহিক শক্তিতে তারা প্রায় অচল হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু পারসিকদের এত অধিক সৈন্য ছিলো যে, কিছুক্ষণ পর পর তারা তাজাদম সৈন্য ও ঘোড়সওয়ার নামাতে পারতো। অনেকে তো দিনের শুরুতে লড়াইয়ের সুযোগ পেলেও দিনের শেষ পর্যন্ত তার ডাক পড়তো না।

মুজাহিদরা দৈহিক শক্তিতে নয়, আত্মিক শক্তিতে লড়ছিলো। যে মহান আল্লাহর পথে তারা লড়ছিলো তার কাছে বারবার সাহায্য কামনা করছিলো তারা।

মুজাহিদদের ওপর পারসিকদের অনবরত হামলার চাপ কমানোর জন্য সাদ (রা) হাশেম ইবনে উতবার কাছে পয়গাম পাঠালেন যে, তোমাদের হামলার কৌশল পাল্টে

দাও। তোমাদের ঘোড় সওয়ার সৈন্যদের দু'ভাগে ভাগ করে দাও। পিছনের অনেক দূর থেকে ঘুরে এসে এক অংশকে ডানে এবং আরেক অংশকে বামে নিয়ে গিয়ে দুশমনের ওপর হামলা করো।

ফারসীরা এই হামলার জন্য প্রস্তুত ছিলো না। মুসলমানদের পারসিকরা এত পিছু হটিয়ে দিয়েছিলো, তারা ধরে নিয়ে ছিলো মুসলমানরা আর আগে বাড়তে পারবে না। কিন্তু হাশেম ও ক'কার সওয়াররা এত কঠিন হামলা করলো যে, মুজাহিদদের কদম আর পিছু হটলো না, এগিয়ে আসতে লাগলো।

রুস্তম তার ফৌজকে পিছু হটতে দেখে তার পুরো হাতিবহরকে একযোগে সামনে বাড়ালো। তার নির্দেশ ছিলো হাতির হাওদা থেকে এমন বর্শা আর তীর বৃষ্টি শুরু করতে হবে যাতে একজন মুসলমানও জীবিত না থাকে।

হাতিগুলো যেন কালো পাহাড়ের নরক উপড়ে আসছিলো। এমন উন্মাদ ছিলো ওগুলো যে, শুঁড় ওপরে উঁচিয়ে চিৎকার করতে করতে ধেয়ে আসছিলো। ফারসী ঘোড়াগুলো তো এসবে অভ্যস্ত ছিলো কিন্তু মুসলমানদের ঘোড়াগুলো এই বিকট আর্তনাদের আওয়াজে পালাতে শুরু করলো।

প্রথম দুই দিনের লড়াইয়ে মুসলমানদের হাতে কিছু ফারসী সৈনিকও বন্দী হয়েছিলো। পুরাতন মহলের ছোট কুঠরীতে তাদেরকে রাখা হয়েছিলো। সাদ (রা) ঠিক করলেন এসব কয়দী থেকে কৌশলে হাতি সম্পর্কে জরুরী তথ্যগুলো জেনে নিতে হবে। একজন কয়েদীকে আনা হলো।

সাদ (রা) এর সামনে যাকে উপস্থিত করা হলো সে ছিলো হাতির এক মাহুত। বন্দীর দিন সে হাতি থেকে পড়ে গিয়ে হাউমাউ করে প্রাণভিক্ষা চেয়ে বলেছিলো তাকে যেন হত্যা করা না হয়, সে অস্ত্র ফেলে দিচ্ছে এবং কয়েদখানায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে কিনা এই চিন্তা করবে সে।

ঃ 'তোমার ইচ্ছে হলে আমাকে হাতির স্বভাব সম্পর্কে বলতে পারো–' সাদ (রা) তাকে বললেন, 'হাতিকে কিভাবে মারা যায় তাও বলো।'

ঃ 'হাতির স্বভাব হলো' – মাহুত বললো– 'সে যখন একলা থাকে তখন সে ভয় তাড়িত থাকে। যখন আর আশে পাশে পরিচিত মানুষ বা প্রাণী থাকে তখন তার ভয় ভালাবাসায় পাল্টে যায়। তখন আর তার খেয়াল থাকে না কার ওপর হামলা করতে হবে। আর কাকে মারতে হবে ও কাকে ছাড়তে হবে।

ঃ 'তাহলে তাকে লড়াইয়ে আনা হয় কেন?' সাদ (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি আমাকে ভুল তথ্য দিচ্ছো না তো?'

ঃ 'না সিপাহসালার'! – মাহুত জবাব দিলো– 'আমি সত্যি কথাই বলছি। লড়াইতে হাতি আনা হয় এজন্য যে, হাতির হাওদায় অনেকগুলো তীরন্দায ও বর্শাবাজ উঠতে পারে। যারা হাতিকে সুবিধা মতো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দুশমনের ওপর তীর বর্শার বৃষ্টি চালিয়ে যেতে পারে। এছাড়াও হাতি দুশমনের দিকে ধেয়ে গিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। যাকে পায় শুঁড় দিয়ে পেচিয়ে ওপর থেকে আছড়ে মারে। কাউকে আবার ধাক্কা

দিয়েও ফেলে দেয়। তারপর তার ওপর পা রেখে পিষে ফেলে তাকে। এভাবে এগিয়ে থাকা দুশমনকে পিছু হটতে বাধ্য করে।'.............

'আমি যে আপনাকে বলেছিলাম প্রথমে এরা কে বন্ধু কে শত্রু তা নির্ণয় করতে পারে না এ অবস্থা কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না। মাহুত তার কাঁধের কাছে বসে এমন ইশরা ইংগিত করে যে, সে বুঝে ফেলে কে বন্ধু আর কে শত্রু...... আপনি জিজ্ঞেস করেছেন তাকে কিভাবে মারা যায়?........

'আমি মাহুত। মাহুতই কেবল বলতে পারবে, হাতিকে কি করে বন্ধু শত্রু চিনিয়ে দেয়া হয় এবং কি করে তাকে কাবু করা যায়। হাতিকে প্রাণে মারা খুব কঠিন। তাকে যতই তীর-বর্শা মারা হোক সে ঠিকই মোকাবেলা করবে এবং তখন তার সামনে যাকে পাবে তাকে জানে মেরে দেবে। হাতিকে কাবু করতে হলে তার চোখে তীর বর্শা মারতে হবে এবং তার শুঁড় কেটে ফেলতে হবে।'

❖ ❖ ❖

যুদ্ধের তৃতীয় দিনে এসে পারসিকরা তাদের পূর্ণ হাতির শক্তি ব্যবহার করছিলো। হাতিগুলোর মধ্যে দুটি হাতি ছিলো বিকট দর্শন এবং ভয়ানক আক্রমণাত্মক। একটা ছিলো সাদা আরেকটা কালো। সাদাটার নামছিলো আবয়াজ এবং কালোটার নাম আজরাব। সাদ (রা) হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, এই হাতি দুটি যেদিকে যাচ্ছে অন্যগুলোও সেদিকেই যাচ্ছে। এই দুটোর দেখাদেখি অন্যগুলো উন্মাদের মতো ছুটছিলো।

হাতিগুলো এসে এলাহী তান্ডব শুরু করে দিলো। হাওদা থেকে প্রবল বেগে তীর ও বর্শার হামলা চলতে লাগলো। হাতির খুনে ভাব দেখে ঘোড়-সওয়ার বাহিনী পদাতিক বাহিনী যে যেদিকে পারলো ছুটে পালাতে লাগলো। পেরেশানী যেন সাদ (রা) এর গলা চেপে ধরেছিলো। তার মাহুতের কথা তখনি মনে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক'কা ও আসেমকে ডেকে পাঠালেন।

ক'কা ও আসেম লড়াই থেকে বেরিয়ে এলেন।

ঃ 'কে আছে যে তোমাদের ছাড়া এই হাতিগুলোকে রুখতে পাড়বে?' – সাদ (রা) উত্তেজিত গলায় বললেন- 'হাতিগুলোর চোখে বর্শা মারো আর ওদের শুঁড় কেটে দাও...... তোমরা দু'জনে মিলে সাদা হাতিকে সামলাও।'

তারা চলে যাওয়ার পর বনু আসাদের দুই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হুম্মাল ইবনে মালিক ও রুবাই আমরকে ডাকিয়ে এনে তাদেরকে একই নির্দেশ দিয়ে কালো হাতিকে সামলাতে বললেন।

হাতির চোখে বর্শা মারা তো খুব কঠিন কিছু ছিলো না। মুসলমানদের মধ্যে এমন অনেক দক্ষ বর্শাধারী ছিলো যারা সামান্য ব্যবধান থেকে নিখুঁত নিশানায় বর্শা নিক্ষেপ করতে পারতো। কিন্তু যে কোন হাতির কাছে যাওয়া আত্মহত্যার শামিল ছিলো। কারণ ওগুলোর হাওদা থেকে অনবরত তীর বৃষ্টি চলছিলো।

ক'কা ও আসেম সাদা হাতির কাছে পৌছার একটা কৌশল অবলম্বন করলেন। কয়েকজন সওয়ার ও পদাতিক যোদ্ধাকে পাঠিয়ে দিলেন কোন ক্রমে হাতিকে ঘিরে

নিতে। তিন চার সওয়ার তীরন্দাযকে বললেন হাওদায় বসে থাকা সৈন্যদের যেন তারা তীর ছুঁড়তে থাকে। যাতে এরা মাথা তুলতে না পারে।

সওয়ার ও পদাতিক সৈন্যরা অনেক রক্ত ঝরিয়ে হাতি পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। এক সওয়ার লম্বা এক নেযা ছুঁড়ে মাহুতকে ফেলে দিলো। তীরন্দাযরা হাওদায় তীর ছুঁড়ে গেলো। হাওদার তীরন্দায ও বর্শাবাজরা মাথা তোলার ফুরসত পাচ্ছিলো না। এই ফাঁকে ক'কা ও আসেম হাতির দিকে দৌড়ে লাগালেন। হাতে তাদের বর্শা ছিলো। কিন্তু হাতির ওপর নিচ এবং ডানে বায়ে শুঁড় নাড়ানোতে তাদের মুশকিলে পড়তে হলো। হাতি হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। মুহূর্তের জন্য শুঁড় স্থির করলো। মুহূর্তটিই যথেষ্ট ছিলো। ক'কা আর আসেমের বর্শা হাতির চোখে ঢুকে গেলো।

হাতি ভীষণ জোরে চিৎকার করতে করতে প্রচণ্ডভাবে শুঁড় ওপর নীচ করতে লাগলো। ক'কা বর্শা ফেলে তলোয়ার বের করলেন এবং এক আঘাতেই মস্তক থেকে শুঁড় বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন।

বনু আসাদের হাম্মাল ও রুবাইলও একই কৌশল অবলম্বন করে কালো হাতির ওপর হামলা করলো। কিন্তু এর শুধু এক চোখেই তারা বর্শা গেঁথতে পারলো। তারপর আরেকজন তার শুঁড়ও কেটে দিলো।

দুই আহত হাতি দুই দিকে ছুটতে লাগলো। কালো হাতিটি ফারসীদের দিকে ছুটতে লাগলো। সৈন্যদের পিষে ঘোড়াগুলো ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে ছুটতে লাগলো সেটা। ঘোড়াগুলোও লাগামহীন হয়ে পালাতে লাগলো। পারসিকদের সৈন্যবিন্যাস ও শৃংখলা সব ধ্বংস হয়ে গেলো।

মুসলমানদের জন্য এটা ছিলো দারুণ সুযোগ। সাদ (রা)ও হুকুম পাঠালেন। পুরো ফৌজ নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো। কিন্তু তার হুকুম কেউ পালন করতে পারলো না। কারণ সাদা হাতিটি তার দু'চোখে বিদ্ধ বর্শা ও কর্তিত শুঁড় নিয়ে মুসলমানদের ফৌজী শৃংখলা তছনছ করে ভীষণ ভয় ধরানো আওয়াজে বিলাপ করতে করতে ছুটতে লাগলো। ঘোড়া, ফৌজ যে যেদিকে পারলো পালাতে লাগলো। হাতি দুটি অন্য হাতিগুলোর সরদার ছিলো। তাই কিছু হাতি কালোটির পেছনে আর কিছু সাদাটির পেছনে পেছনে দৌড়াতে লাগলো। সাদা ও কালো হাতি বিপদ সংকেতমূলক আওয়াজ করছিলো। প্রতিটি হাতিই তা বুঝতে পেরেছিলো। এজন্য অন্য সব হাতি ও মাহুতের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পালাতে লাগলো। এখন তারা নিজেদের লোকদেরও শত্রু মনে করছিলো, সাদা ও কালো হাতির যেখান থেকে শুঁড় কাটা হয়েছিলো সেখান থেকে রক্ত ঝরছিলো ঝর্ণার মতো।

এরপূর্বে আমর ইবনে মাদী কারাব হাতির আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য এবং হাতিগুলোকে শায়েস্তা করার জন্য এমন কৌশল অবলম্বন করলেন যা আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তিনি যখন ক'কা, আসেম, হাম্মাল ও রুবাইলকে সাদা ও কালো হাতির ওপর হামলা করতে দেখলেন তখন তার গোত্রের সৈনকদের বললেন–

'আমি আমার সামনের হাতির ওপর হামলা করতে যাচ্ছি। তোমরাও এসো আমার সঙ্গে। না হয় এক মাদী কারাব মারা গেলে দ্বিতীয় মাদী কারাব আর জন্মাবে না।”

তলোয়ার উচিয়ে তার সামনের হাতির দিকে দৌড়াতে লাগলেন তিনি। হাতির কাছে পৌছেও গিয়েছিলেন। কিন্তু হাতির আশে পাশে যে ফারসীরা ছিলো তাকে ঘিরে ধরলো। ধুলোয় চারদিক আচ্ছন্ন ছিলো। মাদী কারাবের সঙ্গীরা তখন দেখতে পাচ্ছিলো না মদীর ওপর কি ঝড় বয়ে যাচ্ছে। এমন সময় ফারসী কিছু ফৌজ মুজাহিদদের ওপর হামলা করে দিলো। এমন তুমুল লড়াই শুরু হয়ে গেলো যে, মাদী কারাবের কথা কারো মনে রইলো না।

এর কিছুক্ষণ পরই সাদা ও কালো হাতি ময়দানে কেয়ামত ডেকে আনলো। উভয় ফৌজের মাঝখানের স্থানটি খালি হয়ে গেলো। তখন মাদী কারাবকে দেখা গেলো। আপাদমস্তক রক্তে ভেসে যাচ্ছিলো। তার শরীরে এতগুলো বর্শা ও তলোয়ারের আঘাত ছিলো যে, তা গুণে শেষ করা যাচ্ছিলো না। তবুও তার হাতে তলোয়ার ছিলো এবং তিনি ঋজু হয়ে দাঁড়িয়েই ছিলেন। অতি আশ্চর্যের বিষয় হলো পরদিনের লড়াইয়ে মাদী কারাব উপস্থিত ছিলেন।

হাতি উভয় পক্ষেরই অনেক সৈন্য মেরে ফেললো। পুরো রণাঙ্গন তছনছ হয়ে গেলো। কালো হাতিটি যাচ্ছিল নদীর দিকে। অন্য হাতিগুলোও পেছন পেছন যেতে লাগলো। সাদা হাতিটি বিনা চোখে দেখতে পাচ্ছিলো না ঠিকই কিন্তু পায়ের শব্দ ধরে দিক ঠিক করে নিচ্ছিলো। অন্য হাতিগুলোর পায়ের আওয়াজ অনুসরণ করে সাদা হাতিটিও ছুটতে লাগলো। কালো হাতি নদীতে নেমে পড়লো। এর সঙ্গে সবগুলো হাতিই তাকে অনুসরণ করে নদীতে ডুবে গেলো। তারপর সাদা হাতিটিও নদীতে এসে তার সঙ্গীদের পেছন পেছন নদীতে নেমে গেলো। এরপর আর কোন হাতি দেখা গেলো না।

রণাঙ্গন থেকে হাতি বেরিয়ে যাওয়ার পর এদিকের সালাররা ওদিকের জেনারেলরা নিজেদের ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া সৈন্যদের আবার সংগঠিত করতে করতে তাদের জান পড়ে গেলো। মুসলমানরা সংখ্যায় কম ছিলো বলে পারসিকদের অনেক আগেই সারিবদ্ধ হয়ে পড়লো। সাদ (রা) এক পয়গাম লিখে খালিদ ইবনে উরতুফাকে পাঠালেন ঃ

'পুরো লশকরকে এই পয়গাম পড়ে শুনিয়ে দাও। নদীতে হাতিগুলোর ডুবে যাওয়াটা আল্লাহর ইংগিত যে, বিজয় আমাদেরই হবে। আমি জানি শারীরিক দিক দিয়ে তোমরা একেবারে বিধ্বস্ত। তবুও দৃঢ়পদ থেকো। আজকের রাত ও আজকের দিনটুকুতে আর অগ্নি পূজারীদের তোমরা পাত্তা দিয়ো না। তোমরা হয়তো দেখবে যেভাবে ওদের হাতিগুলো নদীতে ডুবে বিলীন হয়ে গেছে তারাও বিলীন হয়ে যাবে। আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন।'

আকাশ ফাটানো তাকবীর ধ্বনি বেরিয়ে এলো মুজাহিদদের কণ্ঠ চিরে। সাদ (রা) -এর এই পয়গামকে তারা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত পয়গাম মনে করছিলো।

রুস্তমের কানে মুজাহিদদের এই শ্লোগান অগ্নিশেলের মতো গিয়ে বিধলো। রুস্তম হামলার নির্দেশ দিয়ে তার অর্ধেকেরও বেশি সৈন্যকে। হাতির অভাব পূরণের জন্যে পারসিকদের এই হামলা ছিলো অত্যন্ত জোলারো।

অধিক সৈন্য ও অধিক অস্ত্রবল নিয়ে হামলার মাধ্যমেই কেবল যুদ্ধে জেতা যায় না। মনোবল ও নিখুঁত কৌশলই কেবল যুদ্ধের আসল হাতিয়ার। রুস্তম এটা জানলেও তখন তা ভুলে গিয়েছিলো। মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা যতই কমছিলো ততই তাদের আক্রমণের তীব্রতা ও উন্মত্ত ক্রোধ বাড়ছিলো। এটা দেখেও পারসিকদের মনোবল অনেক কমে গিয়েছিলো।

রুস্তমও তার সৈন্যদের পরাস্ত মনোভাব বুঝতে পারছিলো। সে বুঝে নিয়েছিলো এ অবস্থায় মুসলমানদের পরাজিত করা খুব সহজ কাজ নয়। এতে কমপক্ষে তার অর্ধেক সৈন্যই মারা পড়বে। এ অবস্থায় শুধু একটা কৌশলই প্রয়োগ করা যায়। তাহলে পুরো ফৌজকে মুসলমানদের ওপর চড়িয়ে দেয়া। রুস্তম তাই করলো। তার ফৌজ বাঁধভাঙ্গা তরঙ্গের মতো মুসলমানদের ওপর হামলে পড়লো।

আসরের সময় চলে গেলো। জঙ্গলের আড়ালে সূর্য চলে যাচ্ছিলো। কিন্তু রুস্তম কিংবা সাদ (রা) কারো জানা সম্ভব ছিলো না রণাঙ্গনের এই পাক খাওয়া ধূলিঝড়ের মধ্যে কি হচ্ছে। কার পাল্লা ভারী আর কার পাল্লার সদাই হরি লুট হচ্ছে। শুধু ধুলোর খুনে আস্তরণ চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিলো।

ঃ 'সালমা!' সাদ (রা) তার স্ত্রীকে বললেন– 'মহান আল্লাহ যখন কোন কাজের ইচ্ছে করেন তখন তার ইচ্ছেয় কেউ দখল দিতে পারে না। আমাদের মতো বান্দারা তার দরবারে শুধু আরজিই জানাতে পারে।'

ঃ 'আল্লাহ সব দেখছেন' – সালমা বললো- 'মনের গভীরের সব ইচ্ছার কথাই তো তিনি জানেন।'

সূর্য ডুবে গিয়ে সন্ধ্যা গাঢ় হতে লাগলো। কিন্তু লড়াই চলতেই লাগলো। ফারসী জেনারেলরা আজই যুদ্ধের শেষ চাচ্ছিলো। তারা চাচ্ছিলো আজকের লড়াইয়ে সব চূড়ান্ত হয়ে যাক। মুজাহিদদের সালাররাও এই লক্ষ্য নিয়েই এগুচ্ছিলো।

রাতের অন্ধকার যখন কিছুটা গভীর হলো তখন কোন পক্ষের সৈন্যকেই স্পষ্ট করে চেনা যাচ্ছিলো না। লড়াই বন্ধ না হয়ে উপায় ছিলো না। লড়াই থেমে গেলো।

যুদ্ধের তৃতীয় দিনের নাম রাখা হয়েছিলো 'ইয়াওমে ইমাস।'

সাদ (রা)কে হঠাৎ রাতের একসময় জানানো হলো রুস্তম মুসলিম শিবিরে নৈশ হামলার জন্য একদল সৈন্য পাঠাচ্ছে। মুসলিম গোয়েন্দা ও গুপ্তচররা সব সময় শত্রু ছাউনির প্রতিটি নড়াচড়ার প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখতো। তারা খবর পেলো রুস্তম তার জেনালেরদের ডেকে কিছু একটা বলবে। তাই তারা তাদের সতর্ক কান সেদিকে লাগিয়ে রাখলো।

......'আর আমাদের নৌজোয়ান বাদশাহ তার মার কোলে বসে একের পর এক হুকুম পাঠাচ্ছে' – রুস্তম বললো– 'এই সামান্য কয়েকজন মরু দস্যুকে তোমরা সামলাতে

পারছো না। এর কারণ কি? তোমরা কি সব সাহস ও মনোবল ভেঙে বসে পড়েছো? নাকি তোমাদের দম খতম হয়ে গেছে? প্রতিবারই তার এই সংবাদ আসছে যে, কাল আমার বিজয়ের সংবাদ চাই! এখন তার কাছে সংবাদ পৌঁছবে যে, মুসলমানরা হাতিগুলোর ব্যবস্থা করে ফেলেছে এবং সমস্ত হাতি নদীর স্রোতে ভেসে গেছে। এই খবর পেয়ে না জানি শাহেনশাহে ফারেসের পেরেশানী কোন জাহান্নাম উগড়ে দেবে। আমি নিজেও চাচ্ছি না লড়াই দীর্ঘতর হোক। আমরা এখন যা করতে পারি তাহলো, আজ রাতে আমরা বিছানায় পিঠ লাগাবো না, মুসলমানদেরকে তাদের বিছানায় পিঠ লাগাতে দেয়া হবে না। শুধু পাঁচশ দুর্ধর্ষ জানবায নির্বাচন করে আমার কাছে নিয়ে এসো। মুসলমানরা এখন আহত সৈনিকদের উদ্ধার করছে। তাদের নারীরাও তাদের সঙ্গেই রয়েছে। আর ঘোড়াগুলোও অন্যখানে বাঁধা। তারা এখন সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। এই পাঁচশ জানবায ওদের শিবিরের পিছন দিকে যাবে এবং হামলা করবে। মুসলিম মেয়েরা অবশ্য চিৎকার চেচামেচি জুড়ে দেবে। মেয়েদের যতটুকু পারা যায় ধরে নিয়ে আসবে। মুসলমানদের একনাগাড়ে হত্যা করে যাবে। তাদের ঘোড়াগুলোর লাগাম খুলে দিয়ে ভাগিয়ে দেবে'.......

'আমি আগেই জানতে পেরেছি মুসলমানদের সিপাহসালার কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে আছে এবং কুদায়েসের মহল থেকে যুদ্ধের ময়দানের অবস্থা দেখে দেখে হুকুম পাঠিয়ে দায়িত্ব পালন করছে। চারজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধারী জানবায তৈরি করো যারা মহলে ঢুকে সিপাহসালারকে হত্যা করে আসবে। আমাদের এই দুর্ধর্ষ সৈন্যরা তাদের মধ্যে স্পষ্ট ধ্বংসের মানচিত্র একে চলে আসবে। দেখবে সকাল পর্যন্ত তারা লড়াইয়ের প্রস্তুতিই নিতে পারবে না। সূর্যোদয়ের পূর্বেই আমরা তাদের ওপর হামলা করবো এবং তাদেরকে ঘিরে নিয়ে পাইকারীভাবে হত্যা করবো।'

মুসলিম ছাউনির আশেপাশে একেবারে ফারসী ক্যাম্প পর্যন্ত অনেক প্রহরী নিয়োজিত ছিলো। পারসিকদের সেই পাঁচশ ফৌজের দলটি যখন লুকিয়ে চুরিয়ে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলো। তখন এক প্রহরী দূর থেকে দলবদ্ধ মানুষের পায়ের আওয়াজ পেলো। আলতো পায়ে সে কাছে গিয়ে ফারসীদের রুখ যেদিকে ছিলো তা দেখে এবং তাদের হাবভাব দেখে তার সন্দেহ হলো। প্রহরী দৌড়ে এসে তার সালারকে খবর দিয়ে জানালো সে কি সন্দেহ করছে। নৈশ হামলায় মুসলমানরা যে খুবই দক্ষ পারসিকরা এবং রোকমরাও তা মেনে নিয়েছিলো। সালারের বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, পারসিকরা নৈশ হামলার জন্যই বেরিয়েছে।

সা'দ (রা)কে তা জানানো হলো। সাদ (রা) ডেকে পাঠালেন ক'কা, তুলাইহা ও হুম্মাল ইবনে মালেককে। তারা আসলে সাদ (রা) বললেন, দলটিতে নাকি পাঁচশ সৈন্য রয়েছে এবং খুবই দুর্ধর্ষ ও ক্ষিপ্র তারা। সম্ভবত তারা গুপ্ত হামলা চালাতে আসছে। তারা যেন সামনে বাড়তে না পারে।' তারপর তাদের যতজন সৈন্য লাগে নিয়ে যেতে বললেন সা'দ (রা)। তবে সওয়ার সৈন্য নয়, পদাতিক সৈন্য নিতে হবে।

ক'কা, তুলাইহা ও হুম্মাল তারা তিনজনই লড়াইয়ে অসাধারণ বীরত্ব দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার জন্য উভয় পক্ষের সৈন্যদের কাছে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছিলো। দিনভর যেভাবে তাদের লড়তে হয়েছে এবং যে সাক্ষাত কেয়ামতের বিভীষিকা তাদেরকে তাড়া করে বেরিয়েছে এতে হাড়ও ভেঙ্গে যাওয়ার কথা ছিলো। স্বাভাবিকভাবেই তারা চরম ক্লান্ত ছিলো। কিন্তু যে মিশনে তাদের পাঠানো হয়েছিলো এজন্য তাদের চেয়ে যোগ্য খুব কমই ছিলো। লড়াই তো বটেই নেতৃত্ব দানের দায়িত্বও তাদের মাথায় ছিলো। নির্দেশ পেয়ে তারা এখনই একশ থেকে কিছু বেশি সৈন্য বেছে নিয়ে রওয়ানা দিয়ে দিলো। দুই সিপাহীকে অগ্রগামী বাহিনীর মতো আগেই পাঠিয়ে দেয়া হলো। যাতে ফারসীদের আভাস পেলেই তারা তাদেরকে জানাতে পারে।

খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। পারসিকদের গুপ্ত দলটিকে তারা আবিষ্কার করে পেছনে এসে সালারদের জানালো। ক'কা তার দুই সঙ্গী তুলাইহা ও হুম্মালকে নিয়ে সৈন্যদের দু'দিকে গুপ্তঘাটি তৈরী করে বসিয়ে দিলেন। পারসিকরা গুপ্তঘাটির মাঝামাঝি এলাকায় প্রবেশ করলো। মুসলিম সৈন্যরা নিঃসাড় পড়ে থেকে ওঁৎ পেতে রইলো। পুরো দলটি যখন দু'দিকের ওঁৎ পেতে থাকা সৈন্যদের আওতায় এসে গেলো, দুদিকের মুজাহিদরা বুক কাঁপানো আওয়াজে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। একশ মুজাহিদের দলটি পাঁচশ ফারসীকে প্রায় ঘিরে নিয়েছিলো। সামান্য সময়ের মধ্যেই ফারসীদের রক্তাক্ত লাশগুলো গড়াগড়ি খেতে লাগলো।

মুসলিম মেয়েরা আহত সৈন্যদের উদ্ধার কাজে পানি পান করানোর কাজে এবং ক্ষত পরিচর্যায় তখন দারুণ ব্যস্ত। তারা জানতেও পারলো না কত বড় বিপদ তাদের মাথার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে উড়ে গেছে।

***'একটি আনকোড়া যুবতী মেয়ে' – বুড়ো পাদ্রী বললেন– 'নবজাতক একটি শিশু – দুই বা তিন দিনের বেশি বয়সী হলে চলবে না – দু'টি পেঁচা – এসব জীবন্ত বস্তু। আর অন্যান্য জিনিস আমি নিজেই যোগাড় করে নেবো।'***

মুসলিম ছাউনীতে মেয়েরা জানলোও না তাদের ওপর দিয়ে কি বয়ে গেছে। রুস্তমও তখন পর্যন্ত জানতে পারেনি তার বাছাই করা পাঁচশ সৈন্যের কি হয়েছে বা তার পরিকল্পিত অভিযানটির কি পরিণাম হয়েছে। যে স্বপ্ন তার চোখে প্রশান্তি এনে দিয়েছিলো, তার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিলো সেই স্বপ্নের তাবীর স্বপ্নের চেয়ে আরো অনেক আনন্দদায়ক হবে। তার জেনারেলরা দারুণ প্রশংসা করছিলো তার এই পরিকল্পনার। রুস্তমের চাটুকারিতাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু রুস্তমের ঘোর লাগা কানে তাদের তোষামোদির সুর ধরা পড়েনি।

তার পরিকল্পনা সফল হয়েছে এই কল্পনায় রুস্তম নিজেই নিজেকে পুরস্কৃত করলো। তার পুরস্কার ছিলো মাদায়েনের দুই যুবতী। পারস্যের রূপের গর্ব নিয়ে যেন তাদের জন্ম হয়েছিলো।

ফারসী জেনারেলদের ব্যাপার এমনই ছিলো। রণাঙ্গনে যা তাদের সঙ্গে সবসময় থাকতো। নারী আর মদ ছাড়া আরা সামনে অগ্রসর হওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারতো না। মেয়ে দুটি রুস্তমকে মদপান করাচ্ছিলো। সে যতটুকু পান করছিলো এর চেয়ে বেশি

চিন্তা করছিলো। তার কান তীক্ষ্ণ হয়েছিলো বাইরে থেকে আসা কোলাহলের দিকে। মাঝে মধ্যে সে হামাগুড়ি দেয়ার মতো করে ঝুঁকে গিয়ে তাদের একজনকে জড়িয়ে ধরছিলো। কয়েকবার তাঁবুর বাইরেও গেলো। তাঁবুর বাইরের প্রহরী তাকে দেখে ঝুঁকে পড়তো এবং দেহরক্ষী বাহিনীর কমান্ডার তার কাছে দৌড়ে আসতো।

ঃ 'এখনো কোন খবর পাওয়া গেলো না?' – রুস্তম শেষ বার যখন তাঁবু থেকে বের হলো তখন জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'না মুহতারাম'! – দেহরক্ষী বাহিনীর কমান্ডার বললো– 'আসছে হয়তো তারা। কোন সাধারণ সিপাহী তো নয় ওরা, যে ভেগে যাবে। সমস্ত ফৌজ থেকে বাছাই করা জানবায সিপাহী ওরা।'

ঃ 'ওরা এসে গেছে'– কুদায়েস মহলে এটা সালমার উৎসুক কণ্ঠ ছিলো। সাদ (রা) কে সালমা বলছিলো– 'ওদের চলার ধরন থেকে মনে হচ্ছে কিছু একটা করে এসেছে ওরা।'

ঃ 'তাড়াতাড়ি ডাকো ওদের'– সাদ (রা) উচ্ছ্বাসভরে বললেন– 'এখনি ডাকো।'

সাদ (রা) উত্তেজনায় আবেগে উঠতে গেলেন। কিন্তু ব্যথার হঠাৎ ধাক্কা তাকে বিছানায় উপুড় করে ফেলে দিলো। সালমার চোখ ছিলো জানালার বাইরে। সাদ (রা) এর কাতরধ্বনি শুনে তার দিকে পেরেশান হয়ে তাকালো।

ঃ 'তারা এদিকেই আসছে'–সালমা উদ্বিগ্ন গলায় বললো–'আপনি কেন উঠতে যাচ্ছেন?'

ঃ 'আসসালামু আলাইকুম সিপাহসালার!' – এটা ছিলো ক'কার গলার আওয়াজ– 'খোদার কসম! আমাদের কাপড় যে খুনে রাঙা দেখছেন তা আমাদের নয় অগ্নিপূজারীদের খুন। সূর্যের পূজারীদের খুন দেখে নিন।'

ক'কা, তুলাইহা, হুম্মাল ও খালিদ ইবনে উরতুফা একসঙ্গেই এসেছিলেন। সাদ (রা)কে তারা পারসিকদের নৈশ হামলার কথা এবং ওঁতপেতে থেকে মুসলমানদের পাল্টা হামলা চালিয়ে তাদেরকে খতম করার বিস্তারিত সব কথা জানালেন।

ঃ 'খোদার কসম!'– পরের প্রজন্মের এবং তারও পরের প্রজন্মের সন্তানরা তোমাদেরকে গর্বভরে স্মরণ করবে ... তোমরা কি বুঝতে পারছো না এটা মহান আল্লাহর ইংগিত যে, বিজয় আমাদেরই হবে।

ঃ 'কিন্তু আরামে বসে থাকার সময় নেই আমাদের সিপাহসালার!' – তুলাইহা বললো– 'দুশমনের নৈশ হামলার অর্থ হলো তারা লড়াই চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছে।'

ঃ 'ওরা চাক বা না চাক'– ক'কা বললেন– 'আমরা চাই কাল যেন যুদ্ধের চূড়ান্ত ফল ঘোষিত হয়ে যায়। আমাদের সৈন্যদের শারীরিক অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, তাদের মধ্যে পূর্ণ ঈমানী শক্তি যদি না থাকতো কেউ মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো না।'

ঃ 'আল্লাহর একান্ত সঙ্গ তারাই পায় যাদের ঈমান সদা মজবুত থাকে'– সাদ (রা) বললেন।

❖ ❖ ❖

এদিকে ঈমানের ঐশী শক্তিতে তারা বলীয়ান হয়ে উঠছিলো, আর ওদিকে এক উদ্যতা যৌবনা ষোড়ষীর রূপের কটাক্ষে রুস্তম ভিমড়ি খাচ্ছিলো। মেয়েটি অল্প সময়েই রুস্তমের মন হরণ করে নিয়েছিলো। মাদায়েনের শাহীমহলের কি গোপন কথা জানি সে রুস্তমকে শোনাচ্ছিলো। রাতের প্রহর সবে শুরু হয়েছে। সেই পাঁচশ জানবাযের কোন খবর এখনো এসে পৌঁছায়নি। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে তারা। অপেক্ষায় অপেক্ষায় রুস্তমের মাঝেমধ্যে বিরক্তি ধরে যেতো। কিন্তু সে তাদের জন্য উদ্বিগ্ন হতো না। তারা তো সফল হয়েই আসছে। বিজয়ের আনন্দে মনে হয় পথে একটু ফুর্তি করে নিচ্ছে। ফুর্তি তো করবিই বেটারা। আগে খুশীর খবরটা জানিয়ে যাবি না! আমরাও একটু গলা ভিজিয়ে নিতাম।

আর ঘুম তো আসছিলোই না ঝিমুনিও আসছিলো না। মেয়ে দুটির একটিকে আরেক তাঁবুতে পাঠিয়ে দিলো রুস্তম। যেটাকে সঙ্গে রাখলো সেটাকে নিয়ে সে জেগে বসে রইলো। দু'জন থাকলে অনেক কিছুই করা যায় না। একজনকে নিয়ে সব কিছুই করা যায়। রুস্তম তাই আরেকজনকে অন্য তাঁবুতে পাঠিয়ে দিলো। রুস্তমের এই তাঁবুটি দামী মখমলে মুড়ানো ছিলো। ভেতরটা ঝলমল করছিলো নানান রঙের ফানুসে। রণাঙ্গনে সে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বের হতো না। চার ঘোড়ায় বহন করা কারুকার্যময় একটি তখতে সে বসে থাকতো। তখতটি রাজরাজড়াদের সিংহাসনের মতো দেখাতো। এর ওপর বসে সারা ময়দানের দৃশ্য দেখা যেতো। রুস্তম নিজেকে পারস্য সম্রাটের মর্যাদার আসনে দেখতে পছন্দ করতো। এজন্য সে কখনো অনিবার্য মৃত্যুর কথা চিন্তা করতে পারতো না। পারস্যের সিংহাসন ও মুকুটের ওপর তার দৃষ্টি সবসময় আঠার মতো লেগে থাকতো।

এখনো তাদের কারো ফেরার নাম নেই। অপেক্ষা করতে কারতে রুস্তম ক্লান্ত হয়ে এবার মেয়েটিকে নিয়ে পড়লো। তার রক্তজবা ঠোঁট, ফুলের পাঁপড়ির মতো গাল ও দেহের নিটোল বাঁধন রুস্তমের দৃষ্টিশক্তি যেন কেড়ে নিচ্ছিলো।

ঃ 'থাকো কোথায়?' – রুস্তম ভেজা গলায় জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'মাদায়েন'।

ঃ 'তোমার কি কোন বোন নেই?'

ঃ 'এক বোন আছে।'

ঃ 'ওর তো মনে হয় বিয়ে হয়ে গেছে।'

ঃ 'না। সে এখন শাহে ফারেস ইয়াযদগিরদের কাছে। ... আমার চেয়ে অনেক সুন্দরী, সতর্ক এবং বুদ্ধিমতী।'

রুস্তম তার সঙ্গে অবুঝ শিশুর মতো উল্টা পাল্টা বকে যাচ্ছিলো।

ঃ 'আপনাকে একটা কথা বলবো'– মেয়েটি রুস্তমের আরো কাছে সরে এসে বললো– 'শাহে ফারেস ইয়াযদগিরদকে আমার বোন দারুণ মজার মজার কথা শোনায়। শাহে ফারেসের মা নাওরীনই আমার বোনকে পছন্দ করেছিলেন। আমার বাবাকে অনেক স্বর্ণ এবং দুটি হীরার অলংকার দিয়ে বোনকে মাদায়েন নিয়ে আসেন এবং তার সম্রাট

পুত্রের কাছে তাকে সোপর্দ করেন। আমি তখন আমাদের ঘরেই থাকতাম। আমার বোন দু' তিন-দিন পর পর দারুণ কারুকার্যময় ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে ঘরে আসতো এবং অনেক কিছু শোনাতো আমাদের.....'

'শাহে ফারেসের মা তাকে বলেছিলো– ছেলেটি আমার সবসময় লড়াইয়ে যাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। কিন্তু সে যুদ্ধে যাক এটা আমি কখনো চাইনা। এই একটি ছেলেই তো আমার। কত লুকিয়ে চুরিয়ে বিপদকে আড়াল করে ওকে আমি বড় করেছি। শুধু চোখ জুড়িয়ে মন ভরিয়ে দু'দণ্ড শান্তির মধ্যে বেঁচে থাকার স্বপ্ন নিয়ে ওকে যৌবনে নিয়ে এসেছি। বাধ্য না হলে ওকে মাদায়েনে আসতে দিতাম না। পারস্যের শাহেনশাহী থেকে আমার কাছে আমার ছেলে অনেক বেশি প্রিয়। কিন্তু পারস্যের ইযযত আবরু সার্বভৌম আমার ছেলেকে এমন অধিকার করে নিয়েছে যে, এর জন্য তার প্রাণটি দিয়েও সে তৃপ্ত হবে না যেন....'

'শাহেনশাহের মা নাওরীন আমার বোনকে বলেছেন, তুই তো জানিস ছেলে আমার সবে যৌবনে পা দিয়েছে মাত্র। তোর পাগল করা রূপে ও ভরা যৌবনের শিকলে আটকে রাখিস তাকে। ওর শরীরে তোর যৌবনের নেশা ধরিয়ে দে। মদের নেশায় তাকে সবসময় মাতাল রাখবি। যারা লড়ার তারা তো লড়ছেই। মুসলমান বড় হিংস্র ও যুদ্ধবাজ জাতি। প্রতিটি ময়দানেই ওরা আমাদের পরাজিত করেছে। এমন পিঁপড়ার মতো ওরা আমাদের ফৌজ মেরেছে যে, আমাদের আবার নতুন ফৌজ তৈরী করতে হবে। আমাদের ফৌজ যদি পরাজিতই হয় আমার ছেলে তো আর পরাজয়কে জয়ে বদলাতে পারবে না...'

আমার বোন যেমন দুরন্ত সাহসী তেমনি বুদ্ধিমতি। শাহে ফারেসকে সে ঠিকই তার প্রেমের কোমল বাহুতে জড়িয়ে নিয়েছে। কিন্তু আমার বোনের যৌবনের নেশায় এবং মদের উন্মাদনায়ও পারস্যের প্রতি তার বাঁধভাঙ্গা ভালোবাসার ও মুসলমানদের প্রতি তার দুশমনীর কথা ঠিকই মনে থাকে। তিনি সবসময় বলেন– রুস্তমের ওপরও আমার ভরসা নেই এবং কোন জেনারেলের প্রতিও আমার আস্থা নেই... এসব আপনার কাদিসিয়া আসার আগের কথা। শাহেনশার মা অনেক পেরেশান ছিলেন। পরে তিনি 'সুফূফ' নামক এক ধরনের অসম্ভব কড়া কিন্তু কোমল মদ যোগাড় করে আনলেন এবং আমার বোনকে দিয়ে বললেন ইয়াযদগিরদের মাথায় যখন যুদ্ধে যাওয়ার পাগলামী উঠবে তখন এই সুফূফ মদের সঙ্গে মিলিয়ে পান করিয়ে দেবে...'

"আপনার কাছে যেদিন আমাকে পাঠানো হলো এর দুদিন আগে আমার বোন আমাদের বাড়ি এসেছিলো এবং গল্পে গল্পে বলেছিলো ইয়াযদগিরদকে এই সুফূফ পান করানোর পরও তিনি বেহুঁশ হন না। আরো যেন সচেতন-সজাগ হয়ে উঠেন। তবে যুদ্ধের কথা ক্ষণিকের জন্য ভুলে যান। হাসেন খেলেন। আমার বোনকে আদর করেন। তার সঙ্গে প্রেম করেন। তাকে যে কড়া নেশা জাতীয় মদ পান করানো হয়েছে সেটা একদমই বোঝা যায় না। এখন জানি তিনি কি করছেন ... আপনি আমার কথায় বেজার হননি তো? শাহে ফারেসের ব্যাপারে আমি বেয়াদবীমূলক কথা বলে ফেলেছি!'

রুস্তম হেসে ফেললো। তার শুনতে বেশ লাগছিলো। শাহী মহলে কত কিছুই না হয়। রুস্তম হাসতে হাসতে মেয়েটিকে তার বুকে তুলে নিলো। তারপর তুলতুলে বিছানায় শুইয়ে দিলো। এমন সময় তাঁবুর বাইরে থেকে দেহরক্ষী বাহিনীর ডাক শোনা গেলো ঃ

ঃ 'উজীরে সালতানাত! মহান সেনাপতির খেদমতে এক যখমী সিপাহী উপস্থিতির অনুমতি চাইছে।'

ঃ 'এখনি তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও'– রুস্তম উঁচু আওয়াজে বললো এবং মেয়েটিকে ধাক্কা দিয়ে এক দিকে এমনভাবে সরিয়ে দিলো যেন এটা কোন অসাড় বস্তু। তারপর সে উঠে দাঁড়ালো।

রক্তলাল কাপড়ে এক আহত সৈনিক তাঁবুতে ঢুকলো। তখনো দেহের কয়েক জায়গা থেকে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছিলো। তার দেহে কতগুলো যখম যে ছিলো মোটেও বোঝা যাচ্ছিলো না। তাঁবুতে ঢুকে মেঝেতে বসে পড়লো– যেন গড়িয়ে পড়েছে। মুখ হাঁ করে সে হাঁপাচ্ছিলো।

ঃ 'কি হয়েছে? বলো'– রুস্তম বললো।

ঃ 'পানি। পা-পানি। বাঁচবো না হয়তো আর।'

ঃ 'মরার আগে সব শুনিয়ে যাও তাহলে'– রুস্তম কর্তৃত্বের সুরে বললো এবং প্রহরী ডেকে বললো– 'তাকে পানি দাও'।

ঃ 'সবাই মারা গেছে'– বড় কষ্টে বললো সৈনিকটি।

তখন পারস্যের আরেক বিখ্যাত জেনারেল জালিয়ুনুস তাঁবুতে প্রবেশ করলো।

ঃ 'কে একজন আমাকে বললো নৈশ হামলাকারী দলের এক লোক নাকি এসেছে'– জালিয়ুনুস দ্রুত বললো– তার অপেক্ষায় আমি ঘুমাইওনি।'

ঃ 'তাহলে তুমিও শোন' রুস্তম জালিয়ুনুসকে একথা বলে যখমীকে বললো– 'হ্যাঁ... সব মারা গেছে এবং তুমি যখমী হয়ে বেরিয়ে এসেছো। কিন্তু নৈশ হামলা হয়েছে কেমন? ... তোমরা আরবদের কতটা ক্ষতি করতে পেরেছো?'

ঃ 'যেখানে গুপ্ত হামলা চালানোর কথা ছিলো সে পর্যন্ত তো আমরা পৌঁছতেই পারিনি'– যখমী হাঁপাতে হাঁপাতে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে বললো– 'তখনো আমরা রাস্তাতেই ছিলাম। আচমকা চারদিক থেকে মুসলমানরা আমাদের ওপর হামলে পড়লো। ওরা যেন আমাদের অপেক্ষাতেই সেখানে ওঁৎ পেতে ছিলো। ওদের হামলা এত আচমকা ও প্রচণ্ড ছিলো যে, আমাদের অস্ত্র বের করে তা সামলে নেয়ারও সুযোগ মিললো না। চারদিক থেকে ওরা আমাদেরকে চেপে ধরলো যে, আমরা একে অপরের ওপরে গিয়ে পড়তে থাকলাম। জবাবে কোন কিছুই করতে পারছিলাম না আমরা। কেউ অস্ত্র বের করলেও তা ছিলো হাতে জঞ্জাল নেয়ার মতো।'

ঃ 'জীবিত ফিরতে পেরেছে কতজন?'

ঃ 'মনে হয় আমিই শুধু ফিরে এসেছি। কোন সৌভাগ্যবান ফিরে আসতে পারলে আমি জানাতাম।'

তার আওয়াজ ক্ষীণ হতে হতে হারিয়ে গেলো। তারপর কাত হয়ে পড়ে গেলো সে। রুস্তম প্রহরীকে আওয়াজ দিলো।

ঃ 'একে নিয়ে যাও'– রুস্তম প্রহরীকে বললো– 'তারপর কোথাও ফেলে দিয়ে এসো'– এবার জালিয়ুনুসের দিকে ফিরে বললো– 'জালিয়ুনুস তুমি শুনেছো তো? এই বদবখতের বাচ্চারা সে পর্যন্ত পৌঁছতেই পারেনি। বাছাই করা সৈন্য ছিলো এরা। প্রত্যেকটা জানবায ছিলো। এদের মরে যাওয়াটাই কি ভালো হয়নি?'

ঃ 'এর অর্থ এই যে, আমাদের মধ্যে মুসলমানদের গুপ্তচর রয়েছে'– জালিয়ুনুস বললো।

ঃ 'না এটা নয়'– রুস্তম ঝাঁঝালো গলায় বললো– 'এর অর্থ হলো তারা সজাগ এবং আমরা বেহুঁশ। ওরা রাতেও আমাদের ফৌজের ওপর চোখ রাখে। কিন্তু এখন এসব বলার সময় নয় জালিয়ুনুস! সূর্যোদয়ের জন্য অপেক্ষা করার সময় নেই আমাদের হাতে। ফায়রুযান ও হারমুযানকে এখনি ডাকো। সূর্যোদয়ের পূর্বেই হামলা করতে হবে। কিছুক্ষণ পরেই মুসলমানদের প্রভাতকালীন নামাযের সময় হয়ে যাবে। তারা নামাযের জন্য যখন জড়ো হবে তখনই আমরা হামলা করবো। কালই যুদ্ধের শেষ চাই আমি। আমি কোন মুসলমানকেই আমাদের মাটিতে জীবিত দেখতে চাই না।'

হরমুযান ও ফায়রুযান পারস্যের দুই জাদরেল জেনারেল। তারা রুস্তমের তাঁবুতে এলো। রুস্তম তাদেরকে বললো কাল পুরো ফৌজ নিয়ে হামলা করতে হবে। হামলার কলাকৌশল বুঝিয়ে দিয়ে তাদের একজনকে ডানপার্শ্বস্থ সেনা ব্যূহ ও আরেকজন বাম পার্শ্বস্থ সেনা ব্যূহের অধিনায়ক বানিয়ে দিলো।

এত বড় ফৌজের সম্মিলিত হামলার জন্য প্রস্তুতি দরকার এবং এ জন্য সময়ও দরকার। ঘোড়া তৈরী, সেনাদলের বিন্যাস অনেক কাজই বাকী। সবাইকে প্রস্তুতির হুকুম দেয়া হলো। পুরো শিবিরে যেন হাঙ্গামা বেঁধে গেলো।

মুসলিম ফৌজী কমান্ডাররা তাদের নিযুক্ত প্রহরা রেখেছিলো, যারা রাতভর পারসিকদের ক্যাম্পে নজর রাখছিলো। রাতটি ছিলো চন্দ্রালোকিত। এই চাঁদের স্বচ্ছ আলোয় ওদের ক্যাম্পের অনেক দূর পর্যন্ত দেখা তো যাচ্ছিলোই এর চেয়ে বেশি ওখান থেকে আওয়াজ আসছিলো। হাঁকডাক সবই শোনা যাচ্ছিলো। অমুকের ঘোড়া কোথায়? ঘোড়ার জিন কোথায়? তলোয়ার পাওয়া যাচ্ছে না আরেকজনের! আরে আমার শিরস্ত্রাণটি ওখানে কেন? ইস! কে আমার পা মাড়িয়ে গেলো। আরে জলদি করো। পূব আকাশ ফর্সা হয়ে যাচ্ছে! এসব বিক্ষিপ্ত শব্দ ও দৌড় ঝাপের আওয়াজ শুনে প্রহরীদের কারো বুঝতে বাকী রইলো না যে, পারসিকরা যে কোন কারণেই হোক হামলার আগাম প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রহরীরা যার যার সালারের কাছে গিয়ে তাদের সন্দেহের কথা জানালো। সালাররা জানালেন সাদ (রা)কে।

এক মুজাহিদ তখন ফজরের আযান দিলো।

ঃ 'ইবনে উরতুফা!'– সাদ (রা) বললেন– 'যদি আমার দেমাগ আমাকে ছেড়ে গিয়ে না থাকে তবে বলবো পারসিকরা এমন চাল চালছে যা আমাদের জন্য খুবই বিপদসংকুল হবে। আমাদের ফৌজ যখন নামায পড়তে থাকবে তখনই তারা হামলা করবে। সমস্ত ফৌজকে তৈরী হতে বলো। আজ নামায কাযা পড়া হবে... আজ তো হাতিও নেই ওদের... তাড়াতাড়ি সবাইকে ডাকো।'

ঃ 'বন্ধুরা আমার!'– সাদ (রা) উঁচু গলায় বললেন– 'আজ যদি অটল অবিচল থাকতে পারো তবে তোমাদের ঘোড়া ও মাদায়েনের পথে কোন বাঁধা আর থাকবে না। দুশমনের তৎপরতায় মনে হচ্ছে আজই তারা যুদ্ধের শেষ দেখতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ও। আল্লাহর ওয়াদামতে ফয়সালা আজ তোমাদেরই করতে হবে এবং আজই করতে হবে। আল্লাহর সঙ্গে তোমরা যে অঙ্গীকার করেছো তা তোমাদের পূর্ণ করতে হবে আজ। আল্লাহও তার অঙ্গীকার পূর্ণ করবেন।'

তারপর সাদ (রা) সবাইকে জানালেন দুশমনের আজকের অবস্থান কি হবে। যদি দুশমন প্রথমে হামলা করে এবং এটাই শতভাগ নিশ্চিত– তাহলে কোন সালার তার সেনাদল নিয়ে হামলা প্রতিহত করবে এবং অন্যরা তখন কি করবে।

ঃ 'মনে রেখো'– সাদ (রা) পরিশেষে বললেন– 'দুশমন তোমাদের মাথার ওপরও যদি ভেঙে পড়ে নিজেদের জায়গা ছেড়ে তোমরা এক পাও নড়বে না। তাকবীর ধ্বনির তৃতীয় নারা শোনার পর শুধু সেই সেনাদলই অগ্রসর হবে যাদেরকে হামলা প্রতিহত করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আপাতত সালারদের নিজ নিজ দলের সৈন্যদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখাই আসল কাজ এবং এটা খুবই জরুরী। আমি দেখতে পাচ্ছি রুস্তম আজ দুনিয়া বিনাশী তীব্র ঝঞ্ঝা তুফান হয়ে আসবে। এমন যেন না হয় যে শৃংখলা ও অবিচলতা কাল ছিলো আজ তা ভেঙে তোমরা আবেগে উত্তেজিত হয়ে উঠলে। নিজের সৈন্যসংখ্যা দেখো। খুবই সামান্য। নিজেদের শরীরের দিকে তাকাও। ভেঙে চুরে বিধ্বস্ত অবস্থা। যদি তোমরা উত্তেজিত হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলো তবে মনে রেখো দুশমনের এত বড় ফৌজে তোমরা শুধু হারিয়ে যাবে। .... আমি সব সময় তীক্ষ্ণ নজর রাখবো।'

মুসলমানদের সূর্যোদয়ের আগে নামায পড়াকালীন হামলার জন্য রুস্তম কম চেষ্টা করেনি। রুস্তম তার ফৌজদের সঙ্গে চিল্লা পাল্লা, হুড়োহুড়ি বকাবাদ্য, গালি গালাজ কম করেনি। যেভাবেই হোক সূর্যোদয়ের আগে তার ফৌজকে হামলা করতে বলছিলো সে। কিন্তু ক্লান্ত শ্রান্ত বেতনভুক্ত এসব সৈন্যরা ঘুমের ঘোরে চোখ খুলতে পারছিলো না। বড় বড় জেনারেল ও অফিসাররা রাতের অর্ধেকের বেশি কাটিয়েছে মদ খেয়ে। তাই তাদেরও উঠতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিলো। তাছাড়া সবাই তো জানতো সূর্য উঠার পরই লড়াই শুরু হবে। এজন্য তাদের কোন তাড়া ছিলো না।

ফৌজ তৈরী হতে হতে সকাল হয়ে এলো। যখন ফৌজ ময়দানে সংগঠিত করে নিয়ে দাঁড়ালো রুস্তম, তার চোখ উঠে গেলো কপালে। বড় বড় চোখ করে দেখলো সে – মুসলমানরা তাদের স্বাগত জানানোর জন্য তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সাদ (রা) ওপর থেকে দেখছিলেন। আজ পারসিকরা সেনাবিন্যাসে কিছুটা পরিবর্তন এনেছে। যদি এটা সফল করতে দেয়া হয় মুসলমানদের আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না। সাদ (রা) দেখলেন রুস্তম বিরাট এক তখতের ওপর রয়েছে। তখতটি বহন করছিলো হাতির সমান বিশাল বিশাল চারটি ঘোড়া। সিংহাসনের মতো আলীশান এক কুরসীও দেখা যাচ্ছিলো তখতের ওপর। কুরসীর গায়ে হীরা জহরতের দৃষ্টিনন্দন কারুকাজ অনেক দূর থেকেও যে কারো মনোযোগ কেড়ে নেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো। অগ্রবাহিনীর সৈন্যদের মাঝে ছিলো রুস্তমের এই শাহী তখত। তার চার পাশে শোভা পাচ্ছিলো মুহাফেজ সৈন্যদের মজবুত দেয়াল।'

ঃ 'সালমা!'– সাদ (রা) বললেন– 'পারসিকদের অবস্থা দেখতে পাচ্ছো? দেখতে পাচ্ছো কী উন্মত্ত খুনের নেশায় ক্রুদ্ধ গর্জন আর রণ হুংকার দিতে দিতে চোখ রাঙাচ্ছে?'

ঃ 'হ্যাঁ ইবনে ওয়াক্কাস!'– সালমা বললো– 'মরুর তুফান তো এভাবেই আসে। এই তুফানে সামনে নিজেদের সামান্য লশকরের দিকে চোখ গেলে আপনিই আল্লাহর দরবারে হাত উঠে যায়।'

ঃ 'হ্যাঁ একমাত্র আল্লাহই তো আছেন সালমা!'– সাদ (রা) বললেন– 'গোত্রের সরদারদের আমি বারবার বলেছি তারা যেন তাদের সেনাদলকে পবিত্র কুরআনের এই বাণী স্মরণ করিয়ে দেয়–

'হে মুমিনদের দল! নিজেরা অটল অবিচল থাকো। অন্যদেরকেও অবিচল

থাকতে উৎসাহিত করো, আল্লাহর প্রতি তাকওয়া বজায় রাখো। পরস্পর সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকো। অভীষ্ট মনযিল পেয়ে যাবে।'

'আর সালমা! যা বলতে চেয়েছিলাম তা হলো– আমি এখানে ভালোই থাকবো। আমাকে একা রেখে মেয়েদের ছাউনীতে চলে যাও। তাদেরকে গিয়ে বোঝাও দুশমন আজ সব উজাড় করতে এগিয়ে আসছে। অনেক কিছুই আজ ঘটতে পারে। এবং যে কোন মুহূর্তেই ভালোমন্দ কিছু একটা হয়ে যেতে পারে। তখন দুশমন নিশ্চিত তাদের পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। মেয়েরা যেন তাই সবসময় প্রস্তুত থাকে। আক্রান্ত হলে যেন মেয়েরা স্থির হয়ে লড়তে পারে। কেউ যেন জীবিত দুশমনের হাতে না পড়ে।'

শুধু আবেগ নয়। দায়িত্ববোধের কারণেও সাদ (রা)কে একা রেখে সালমার যেতে ইচ্ছে করছিলো না। তবুও বাঁচা মরার মুহূর্ত উপস্থিত ভেবে সালমা চলে গেলো।

বিশাল ফৌজ ছিলো রুস্তমের কাছে। যেভাবে সে ফৌজ সাজিয়ে ছিলো তাতে বেশ রণকৌশলের গভীরতা ছিলো। সত্যিই রণক্ষেত্র সম্পর্কে রুস্তমের অভিজ্ঞতা ও নিপুণতা শত্রুরাও স্বীকার করতে বাধ্য ছিলো। মূলবাহিনীর ডান ও বায়ের সেনাদলসহ সে তার ফৌজকে সংগঠিত করেছিলো তেরটি সারিতে। এর সামনে মুসলমানদের সৈন্যসারি ছিলো মাত্র তিনটি। রুস্তম তার সওয়ার সৈন্যকে পেছনে রেখেছিলো। আর মুসলমানদের সওয়ার সৈন্যরা ছিলো সর্বাগ্রে।

সাদ (রা) প্রথম তাকবীর ধ্বনি দিয়ে দিলেন। মুজাহিদরা প্রস্তুত হয়ে গেলো। তৃতীয় নারা শুনেই মুসলমানরা অগ্রসর হতো। মুসলমানদের এই পদ্ধতি সম্পর্কে পারসিকরা আগ থেকেই জানতো। আগের কয়েকদিনের লড়াইয়ে রুস্তম দুইদিন তো মুসলমানদের প্রথম নারার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বাকী প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়ে হামলা করে বসে। কিন্তু বরাবরই মুসলমানদের সিপাহসালারের শক্ত হুকুম ছিলো তৃতীয় তাকবীর ধ্বনির পূর্বে কেউ জায়গা থেকে নড়তে পারবে না।

কিন্তু আজকের প্রথম তাকবীরের পর পারসিকরা এমন চাল চাললো যা শুধু প্রশংসনীয়ই নয় ভয়ংকরও ছিলো; প্রথম তাকবীর ধ্বনি শেষ হতেই তাদের তীরন্দায সওয়াররা ভোজবাজির মতো কোত্থেকে যেন উদয় হলো। তারপরই তীর বর্ষণ শুরু করলো। রুস্তমের উদ্দেশ্য ছিলো এতে মুসলিম ফৌজের শৃংখলা ভেঙে যেন পিছু হটতে শুরু করে এবং অটলপায়ে দাঁড়িয়ে লড়তে না পারে।

সাদ (রা) দুশমনের চাল বুঝে গিয়ে দ্বিতীয় নারা লাগালেন। এদিকে ক'কা যখন দেখলেন দুশমন তীরন্দাযী করতে করতে এগিয়ে আসছে এবং তীরন্দাযদের পেছনে পদাতিক যোদ্ধারা আসছে তখন ক'কা বুঝলেন দুশমন মুসলমানদের ফাঁদে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছে। রাগে ক্রোধে তিনি সিপাহসালারের সেই হুকুম ভুলে গেলেন যে, তৃতীয় নারার আগে নড়াচড়াও করা যাবে না।

ঃ 'হে বনু তামীম!'– তিনি তার গোত্রীয় সেনাদের সুউচ্চ স্বরে ডেকে বললেন– 'খোদার কসম! পারসিকদের এই চাল আমি সফল হতে দেবো না। আমার পেছনে এসো।'

তৃতীয় নারার অপেক্ষা না করে তিনি ঘোড়ার গায়ে খোঁচা লাগালেন। তার গোত্রের সব সৈন্যই তলোয়ার আর উদ্যত বর্শা নিয়ে তার অনুসরণ করলো।

সাদ (রা) এটা দেখে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। ক'কার মতো এমন বিচক্ষণ ও দায়িত্ববান সালার সিপাহসালারের হুকুমের বরখেলাফ করবে এটা তিনি ভাবতেই পারছিলেন না। সৈন্যদের সালারের হুকুম অমান্য করাটাকে পাপ মনে করা হতো। পুরো রণক্ষেত্রের সবকিছু তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন। শত্রুপক্ষের প্রতিটি পদক্ষেপ তৎপরতা তিনি তীক্ষ্ণ চোখে যাচাই করছিলেন। এজন্য তিনিই বুঝতে পারছিলেন ফৌজের কোন দলকে আগে বাড়াতে হবে এবং কোন দলকে পিছু হটাতে হবে।

ক'কা তার পুরো গোত্রকে পেছনে নিয়ে অগ্রসরমান দুশমনের সারিতে ঢুকে পড়লেন। তারপর দুশমনের সারি ছত্রভঙ্গ করে দিতে লাগলেন। সওয়ার তীরন্দাজের ওপরেই তিনি আক্রমণ জোরদার করলেন।

ঃ 'হে আল্লাহ!' – সাদ (রা) হাত উঠিয়ে আল্লাহর দরবারে মিনতি করলেন– 'ওকে মাফ করে দিন। সাহায্য করুন ওকে ও ওর দলকে। সে আমার অনুমতি নেয়নি ঠিক; কিন্তু আমি তাকে অনুমতি দিয়ে দিচ্ছি .... হে আল্লাহ! ওগো ক্ষমাময় দয়াময় সত্তা! তাকে সাহায্য করুন। তাকে নিরাপদ রাখুন।'

ক'কা তীরন্দায বাহিনীর সারি উলট পালট করে দিলেন এবং তার সৈন্যদের দুশমনের তীর থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে পারসিকদের প্রথম পরিকল্পনা ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন।

কিন্তু ক'কার এভাবে এগিয়ে যাওয়াতে মুসলিম ফৌজে কিছুটা বিশৃংখলা দেখা দিলো। ক'কার উত্তেজনা আবেগ ও ক্রোধ আরো কয়েকজন সালার ও সরদারের মধ্যে সংক্রমিত হলো। কায়েস ইবনে আশআস তার গোত্রের সৈন্যদের উত্তেজিত করে তুললেন– 'হে বীর সৈনিকেরা! বনু তামীমকে দেখো, দুশমনের ভেতর ঢুকে পড়ে কিভাবে ওদের কলিজা ছিড়ে নিচ্ছে। আরো বীরত্ব তোমাদের দেখাতে হবে। আল্লাহর পথে বনু তামীম যেন তোমাদেরকে ডিঙ্গিয়ে না যায়। আমাকে অনুসরণ করো।'

এর দেখাদেখি আমর ইবনে মাদী কারাবের গোত্রও দুশমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সাদ (রা) এদের জন্যও দুআ করলেন।

আরেক গোত্রের সরদার ইবনে যিলবারদীনও টগবগ করে উঠলেন। নিজের গোত্রকে প্রণোদিত করে সিপাহসালারের অনুমতি ছাড়াই হামলা করে দিলেন।

বনু তামীমের অনুসরণে আরো চারটি গোত্র– বনু আসাদ, বনু নাখা, বনু বুজায়লা এবং বনু কিন্দাহ– বিস্ময় জাগানো বীরত্ব দেখিয়ে দুশমনের সারিতে ঢুকে পড়লো এবং এমন আক্রমণ চালালো যার তীব্রতা ও প্রচণ্ডতায় রুস্তমের সব পরিকল্পনা তো বরবাদ হলোই নতুন পরিকল্পনা করবে সেই সাহসও যেন সে হারিয়ে ফেললো। তার ফৌজ শুধু ছত্রভঙ্গই হলো না অনেকে মারাও পড়লো।

ক্রমেই লড়াই এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছলো যে, না রুস্তমের হাতে তার সৈন্যদের এবং না সাদ (রা) এর হাতে তার ফৌজের নিয়ন্ত্রণ রইলো। সাদ (রা) মহান আল্লাহর কাছে অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে তার সৈন্যদের নিরাপত্তা ও সফলতার জন্য দুআ করতে লাগলেন। প্রার্থনা ছাড়া তার আর করারইবা কি ছিলো। দুআ করতে করতে তার গলা একসময় বুঁজে এলো।

ক'কা ও অন্যান্য সালার এবং গোত্র সরদার– যারা সিপাহসালারের নির্দেশ অমান্য করে হামলা করে দিয়েছিলো তাদের কেউ আনাড়ী বা অনভিজ্ঞ ছিলো না। তাদের মধ্যে যেমন আবেগ ছিলো তেমনি রণকৌশলের তীক্ষ্ণতা ছিলো। তৃতীয় তাকবীর ধ্বনির পর অন্যান্য গোত্রও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে হামলা আরো জোরদার করেছিলো। ক'কার সৈন্যদল সওয়ার তীরন্দাযদের বিক্ষিপ্ত করে দিয়ে পারসিকদের এক পার্শ্বে গিয়ে হঠাৎ হামলা চালালো। অন্য পার্শ্বে আরো দুই গোত্র হামলা চালালো। এর ফলে পার্শ্ববাহিনীর সৈন্যরা মূলবাহিনীর সৈন্যদের সঙ্গে গিয়ে মিশে গেলো এবং মূলবাহিনীর সৈন্যরা পার্শ্ববাহিনীর দিকে চেপে গেলো। এতে মাঝখানে ফাঁকা জায়গা পেয়ে মুসলিম সালাররা দারুণ ফায়দা উঠালো।

রুস্তম এ অবস্থায় তার ফৌজ পিছু হটিয়ে আনাই সমীচীন মনে করলো। সে তখনো তার রাজ-কুরসীতে বসা ছিলো। ঘোড়ার গাড়ি তাকে নিয়ে ময়দানময় দৌড়াচ্ছিলো। দলে দলে তার সৈন্যদের পেছনে সরিয়ে আনলো। মুসলিম সালাররা আগ থেকেই অনুভব করছিলেন নিজ নিজ দলের সৈন্যদের সরিয়ে আনা উচিত। নিজ ফৌজের শৃংখলা ভঙ্গ করে তারা যে ক্ষতি করেছিলেন তা দুশমনের মনোবল ভেঙে দিয়ে ও বিন্যাস-শৃংখলা খুবই শোচনীয় করে দিয়ে পুষিয়ে দিয়েছিলেন।

উভয় পক্ষের ফৌজ পিছু হটে এলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার তারা নিজেদেরকে সংগঠিত করে নিলো। সাদ (রা) তার সহযোগী সিপাহসালার খালিদ ইবনে উরতুফার কাছে পয়গাম পাঠালেন। এতে বিভিন্ন সালারের নাম লেখা ছিলো। খালিদ তার লশকরের উদ্দেশে তা পড়ে শোনালেন ঃ

'তোমাদেরকে আল্লাহ মাফ করুন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় নারা ধ্বনির অপেক্ষা না করে তোমরা এগিয়ে গেছো। আল্লাহ তোমাদের উদ্দীপ্ত আবেগ কবুল করুন। কিন্তু রণাঙ্গনের নিয়ম শৃংখলা আর যেন কেউ না ভাঙ্গে। মহান আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন। যার প্রমাণ হলো শত্রুর ওপর তোমাদেরই আধিপত্য ছিলো। এখন থেকে সবসময়ই তৃতীয় তাকবীর ধ্বনির অপেক্ষা করবে। আবার যদি দুশমন পূর্বের মতো আচমকা হামলা করে বসে তাহলে দুশমনের পার্শ্ব ব্যূহতে তোমাদের হামলার চাপ বাড়াবে। আমি জানতে পেরেছি রুস্তম তার সৈন্যের দুই পার্শ্ব ব্যূহতে তার দুই শ্রেষ্ঠ জেনারেল ও বীর বাহাদুরকে নিযুক্ত করেছে। তারা হলো ফায়রুযান ও হরমুযান।'

খালিদ ইবনে উরতুফা পয়গাম পাঠ শেষ করতে না করতেই দূর দিগন্ত থেকে ধূলির আস্তরণ উঠতে দেখা গেলো। চারদিক ছেয়ে ঝড়টি ময়দানের দিকেই চেয়ে আসছিলো। সারা ময়দান জুড়ে বাতাস বন্ধ হয়ে কেমন নিস্তব্ধতা নেমে এলো। এটা ছিলো ঝড় আসার পূর্বের নৈঃশব্দতা। বোঝাই যাচ্ছিলো এই তুফান বড় ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। চারদিকের আলোর বন্যায় কেউ যেন নিকষ কালো চাদর টেনে দিয়েছে।

ঃ 'আল্লাহর সাহায্য আসছে'– কোন এক মুজাহিদ বা সালার উঁচু গলায় শ্লোগান তুললো।

প্রকৃতিতে কেয়ামতের বিভীষিকা ছড়িয়ে আসছিলো এই তুফান। বড় বড় গাছগুলো যেন শিকড়সুদ্ধ সিজদায় লুটিয়ে পড়তে যাচ্ছিলো। কি যে ভয়ংকর শোনাচ্ছিলো গাছের পাতায় পাতায় ডালে ডালে বাতাসের তীব্র সংঘর্ষের আওয়াজ। ঘোড়াগুলো আতংকে সওয়ারীসুদ্ধ লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিলো। মরু থেকে আস্ত বালির ঢিবিগুলো যেন উড়িয়ে আনছিলো। ধুলোর প্রচণ্ড ঝাপটায় চোখ খোলা রাখার উপায় রইলো না কারো।

সাদ (রা) পয়গাম লেখালেন না এবার। মহলের নিচে দাঁড়ানো কাসেদকে চিৎকার করে বললেন খালিদ ইবনে উরতুফাকে বলো– এই ঝড়কে যেন আল্লাহর বড় সাহায্য মনে করে। দেখো ঝড়ের রুখ দুশমনের দিকেই ধেয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর নাম নিয়ে দুশমনের ওপর হামলা চালাতে বলো।

হঠাৎ দেখা গেলো রুস্তমের শাহীমহলের আকারের বিশাল তাঁবুটি কি অনায়াসে আতীক নদীর দিকে উড়ে যাচ্ছে। পরমুহূর্তেই সেটি গোত্তা খেয়ে নদীতে গিয়ে পড়লো। ভেতরের অতি দামী ফার্নিচার আসবাবপত্র নদীর বুকেই নিজেদের উৎসর্গ করে দিলো। রুস্তমের হাতির বহরও এই নদীতেই ডুবে গিয়েছিলো।

সিপাহসালারের হুকুম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলিম ফৌজ পারসিকদের ওপর হামলা করে দিলো। উভয় পক্ষের সৈন্যসংখ্যা ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম দেখে মনে হচ্ছিলো কোন বিড়াল এক হাতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মুসলমানরা হামলা চালাচ্ছিলো পারসিকদের পার্শ্ব ব্যূহের দিক থেকে। পারসিকরা ভাবতেও পারেনি এই প্রচণ্ড ঝড়

তুফানের মধ্যে মুসলমানরা হামলা করে বসবে। দৈহিক মানসিক কোনভাবেই তারা এই হামলার জন্য প্রস্তুত ছিলো না। আর ঝড়ের রুখ তাদের দিকে তো ছিলোই, ধুলোবালি যেন উড়ছিলো তাদের চোখ লক্ষ্য করেই। ছোট ছোট নুড়ি পাথর মাটির ঢেলা উড়ে উড়ে তাদের শরীরে, মাথায়, মুখে অনবরত আঘাত করে যাচ্ছিলো। বিপাকে পড়ছিলো হামলাকারী মুসলিম ফৌজও। লড়াইয়ের সময় ডানে বায়ে দিক বদলানোর মুহূর্তে বা সামনে পেছনে সরে যাওয়ার সময় তাদের চোখে মুখেও ধূলি কণা আঘাত করছিলো। ঝড় উভয় পক্ষের জন্যই দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। কিন্তু ফারসীরা বেতনভুক্ত সৈনিক ছিলো বলে শুধু তাদের জেনারেলদের মন জয়ের জন্য বা পুরস্কারের লোভে লড়ছিলো। আর মুসলমানরা লড়ছিলো কেবল সর্বশক্তিমান আল্লাহর দ্বীনের অস্তিত্বের জন্য। এ ছাড়াও পারসিকরা এই তুফানকে নিজেদের বিপক্ষে অপার্থিব বিপদ হিসেবে নিয়েছিলো। কিন্তু মুসলমানরা এটা গ্রহণ করলো আল্লাহর নেয়ামত ও গায়েবী সাহায্য হিসেবে।

রণাঙ্গনের অবস্থা আরেকবার এমন আকার ধারণ করলো যে, এদিকে রুস্তম ওদিকে সাদ (রা) কারোই জানার উপায় ছিলো না ময়দানে কি হচ্ছে, কে সুবিধাজনক স্থানে আছে, কে সংকটাপন্ন। তবে রুস্তম এতটুকু বুঝতে পারছিলো, তার ডান বামের রক্ষাব্যূহ অনেক আগেই ছত্রাখান হয়ে পড়েছে এবং পুরো ফৌজই চরম বিশৃংখলার মধ্যে আছে।

এরপরও রুস্তমের হাতে আরেকটি শক্তি ছিলো। যে কারণে মুসলমানদের আক্রমণের তীব্রতা নিপুণ কলাকৌশল কোন কিছুই সুবিধা করতে পারছিলো না। বরং মুসলমানরাই উল্টো বেশ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছিলো। এটা ছিলো ইয়াযদগিরদের পাঠানো বিশেষ বাহিনী। এই দলের প্রতিটি সওয়ারের গায়ে এমন মজবুত বর্ম ছিলো যে, মুজাহিদদের তলোয়ারের আঘাত যেভাবেই আসতো বর্মগুলো তা প্রতিহত করতো। আঘাতকারীর শরীরেই তলোয়ারের আঘাত ফিরে আসতো, এতে মুসলমানরা বেশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছিলো। এক গোত্রের সরদার তখন মুজাহিদদের বললো এটা তোমরা ভুল পদ্ধতি ব্যবহার করছো।

ঃ 'তোমাদের আসলে জানা নেই ওদের বর্মগুলো দেখো নাভীমূল পর্যন্ত গিয়েই শেষ হয়ে গেছে। এটা শুধু বুক আর পেটই বাঁচাতে পারে। তোমরা নাভীর নিচে যেখানে বর্ম নেই সেখানে বর্শা মারো বা তলোয়ারকে বর্শার মতো ব্যবহার করো।'

মুজাহিদরা এই পদ্ধতিতে হামলা শুরু করলো। ইয়াযদগিরদের বিশেষ বাহিনী এবং রুস্তমের হাতের তরুপের তাস এবার ভাঁজ ভাঁজ হয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে গুটিয়ে পড়ে যেতে লাগলো।

ঝড়ের বেগ আস্তে আস্তে কমে এলো। আশপাশের পরিবেশ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এলো। দূরের জিনিসও পরিষ্কার দেখা যেতে লাগলো। কিন্তু ততক্ষণে পারসিকদের যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেছে। সৈন্যবিন্যাস ও শৃংখলা ভেঙে রণ বিন্যাস প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। সাদ (রা) আর দেরী করলেন না। পয়গাম পাঠালেন, হামলা আরো তীব্রতর করো এবং রুস্তম পর্যন্ত যে কোন মূল্যেই পৌঁছে যাও।

ক'কা পর্যন্ত যখন ওই পয়গাম পৌঁছলো তখন তিনি তার দলের বাছাই করা কিছু মুজাহিদ নিয়ে রুস্তমের দিকে এগুতে থাকলেন।

তাদের বেশি দূর যেতে হলো না। চারটি ঘোড়ার গাড়িতে বহন করা রুস্তমের বিশাল তখতটি নজরে পড়লো। কিন্তু রুস্তমকে তার কারুকার্যময় কুরসীতে দেখা গেলো না। ফারসী ফৌজের পায়ের তলার মাটি তখন সরে গিয়েছিলো। সাদ (রা) খবর পাঠালেন পুলের দিকে তাকিয়ে দেখো পারসিকরা পালাচ্ছে।

মুসলিম ফৌজ তখন উমর (রা) ও মুসান্না ইবনে হারিসার অসাধারণ দূরদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ মেধার আরো প্রমাণ পেলো যখন পারসিকদের পিছু হটতে হটতে পুলের কাছে ভীড় করতে দেখলো। মানুষ ও ঘোড়া পুলের দিকে এমন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিলো যে, কোথাও কদম ফেলার জায়গা ছিলো না। কিছু ফারসী সৈন্যকে নদীতে ঝাঁপ দিতে দেখা গেলো। কিন্তু তখনো লড়াই চলছিলো।

ফারসী ফৌজের নদী পার হয়ে পালানোর একমাত্র উপায় ছিলো পুল ও পুলের পাশে বিকল্প হিসেবে চওড়া একটি সাঁকো। লড়াইয়ে বেঁচে থাকা পুরো ফৌজের একবারে পুল বা সাঁকো পার হওয়ার কোন উপায় ছিলো না। অন্যদিকে অধিকাংশ ফারসীই নদীতে এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে ভয় পাচ্ছিলো। এজন্য তারা নদীর প্রান্ত ধরে বিশাল ভীড় জমিয়ে ফেললো।

লড়াই তখন এমন পর্যায়ে পৌঁছলো যে, মনে হচ্ছিলো কোন ফৌজ নয়, সাধারণ মানুষ একে অপরের রক্ত নিয়ে হোলি খেলছে। সালাররাও সাধারণ সৈন্যদের মতো লড়ছিলেন। উভয় পক্ষের সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ কারো হাতেই ছিলো না। ক'কার ঝটিকা দলটি রুস্তম পর্যন্ত পৌঁছলো। রুস্তম তখন তার মুহাফেজ সৈন্যদের দুর্ভেদ্য বেষ্টনীতে অক্ষত ছিলো। মুহাফেজ সৈন্যের সংখ্যা ক'কার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি তো ছিলোই, এ ছাড়াও বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিলো তারা। মুহাফেজ দলের প্রতিটি সৈন্যই সাক্ষাত প্রাণ হাতে নিয়ে লড়ছিলো। মুজাহিদরা এজন্য বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হলো।

ক'কার দলও রুস্তমের প্রাচীর ভাঙ্গার জন্য প্রাণপণ লড়ছিলো। অনেকে যখমী হয়েও লড়ছিলো। একে তো ছিলো প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী লড়াই তারপর আবার পারসিকদের হাজার হাজার ঘোড়ার খুরের আঘাতে উঠে আসা ধুলো বালিতে চোখে সব কিছু ঝাপসা দেখা যাচ্ছিলো। এর ফলে রুস্তম প্রাচীর বেষ্টনীর ভেতর থেকে কখন যে বেরিয়ে গেলো মুজাহিদদের কেউ তা বুঝতে পারল না। তারা তখনই টের পেলো যখন রুস্তমের অবশিষ্ট মুহাফিজ সৈন্যরা এদিক সেদিক পালাতে লাগলো। অনেক খোঁজার পরও রুস্তমকে দেখা গেলো না।

নদীর কাছে মালপত্র বোঝাই পারসিকদের অনেক খচ্চর আর গাধা দাঁড়িয়েছিলো। মালপত্র তাবু ও ত্রিপল দিয়ে পেঁচানো ছিলো। আর বড় বড় কিছু জিনিস স্তূপের আকারে মাটিতে পড়েছিলো। রুস্তম এসব মালপত্রে লুকিয়ে পড়লো। খুঁজতে খুঁজতে মুজাহিদরা সে পর্যন্ত পৌঁছে সবাই আবার বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো।

হেলাল ইবনে আলকামাও রুস্তমকে খুঁজছিলো। কয়েকটি লড়াইয়ে অংশ নিয়েও সে এ পর্যন্ত খ্যাতি পাওয়ার মতো বীরত্ব দেখাতে পারেনি। মালপত্রের একটি স্তূপের মধ্যে হেলাল একটু নড়াচড়া টের পেলো। এই স্তূপটির পাশ ঘিরে রশি বাধা ছিলো। হেলাল এত জোরে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলো যে, রশি কেটে গিয়ে বড় বড় কয়েকটি কাঠের ও লোহার বাক্স গড়িয়ে পড়লো। কিন্তু হেলাল এর মধ্যে কোন মানুষের অস্তিত্বই দেখতে পেলো না।

রুস্তম ঐ স্তূপের মধ্যেই লুকানো ছিলো। এর মধ্যে অনেকগুলো কাঠের ও লোহার বাক্স ছিলো। হেলাল তলোয়ার দিয়ে এর রশি কেটে দিলে ভারী একটি বাক্স ছুটে গিয়ে রুস্তমের পিঠে পড়লো একেবারে মেরুদণ্ড বরাবর। রুস্তমের মনে হলো মেরুদণ্ড গুড়িয়ে গেছে। হেলাল কিছুই টের পেলো না। সেখান থেকে চলে গেলো।

রুস্তম মেরুদণ্ডে ভারী বাক্সটি নিয়ে হেলালকে দেখছিলো। হেলাল যখন কিছু দূরে চলে গেলো রুস্তম হামাগুড়ি দিয়ে সেখান থেকে বের হলো। মেরুদণ্ডের তীব্র যন্ত্রণার কারণে সে দাঁড়াতে পারছিলো না, তবুও বাঁকা হয়ে নদীর দিকে এগুচ্ছিলো। একমাত্র নদীই ছিলো তার শেষ আশ্রয়। আর কয়েক কদম মাত্র দূরে নদী। সোজা হয়ে তো দাঁড়াতে পারছিলোই না বাঁকা হয়েও বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলো না। উপুড় হয়ে বুকে হেটে গিয়ে নদীতে নেমে পড়লো। সেই মুহূর্তে হেলাল তাকে দেখে ফেললো।

রুস্তম সাঁতরাতে শুরু করলো। সে বলিষ্ঠ শক্তির অধিকারী ছিলো। পিঠের এই দশা না হলে এতটুকু সরু নদী খুব দ্রুতই পার হয়ে দুশমনের হাত থেকে বেরিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু সে আহত মাছের মতো খুড়িয়ে খুড়িয়ে সাঁতার কাটছিলো। হেলাল রুস্তমকে দেখতে পেয়ে আর দেরী করলো না। সঙ্গে সঙ্গে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। রুস্তমের পায়ের গোড়ালি ধরে হেলাল তাকে নদীর কিনারায় নিয়ে এলো। রুস্তমের মুহাফিজরা ভেবেছিলো রুস্তম নিরাপদে চলে গেছে। নিশ্চিন্ত হয়ে তারা পালিয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু রুস্তমের দুর্ভাগ্য রুস্তমকে যেতে দেয়নি। এক মুজাহিদের হাতে তার ভাগ্য নির্ধারিত ছিলো।

হেলাল নদীর কিনারার কাঁদা মাটিতে রুস্তমকে ধরে তার তলোয়ার বের করলো। রুস্তম কয়েকবারই উঠার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো।

ঃ 'শোন আরবী!' – রুস্তমের গলায় অনুনয় ঝরে পড়লো – 'তুমি যা চাইবে যত সম্পদ চাইবে আমি দেবো ছেড়ে দাও আমাকে ... কি চাও বলো।'

ঃ 'আজমী সরদার!'–হেলাল ইবনে আলকামা বললো– 'আমি যা চাই তা নিজেই নিয়ে নেবো।'

হেলাল তলোয়ারের এক আঘাতেই রুস্তমের ধর তার দেহ থেকে পৃথক করে ফেললো।

ঃ 'যে সম্পদ আমার চাওয়ার ছিলো তা আমি নিয়ে নিয়েছি।'

হেলাল একথা বলেই সেখান থেকে দৌড়ে রুস্তম যে মালের স্তূপের নিচে লুকিয়ে ছিলো এর ওপরে গিয়ে উঠলো। ময়দানের পরিস্থিতি দেখলো। রুস্তমের হীরাখচিত কুরসী ও তখতসুদ্ধ ঘোড়ার গাড়িটি তার নজরে পড়লো। হেলাল দৌড়ালো না প্রায় উড়ে গিয়ে রুস্তমের কুরসীতে চড়ে বসলো। ঘোড়ার সহিস– গাড়ির চালক অনেক আগেই পালিয়ে গিয়েছিলো।

ঃ 'কাবার প্রভুর শপথ!' – হেলাল গলা ফাটিয়ে ঘোষণা করলো– 'আজমের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর রুস্তমকে আমি হত্যা করেছি। ... এসো ... এদিকে এসো।'

হেলাল পরপর তিনবার এ ঘোষণা করলো। যাদের কানেই এই আওয়াজ পৌঁছলো দৌড়ে এসে দেখলো রুস্তমের মুকুটবিহীন মাথাটি নদীর পারে অনাদরে পড়ে আছে। মুজাহিদরাও শ্লোগানের সুরে ঘোষণা করতে লাগলো 'রুস্তম নিহত হয়েছে, 'রুস্তমকে কোতল করা হয়েছে।'

এই ফাঁকে রুস্তমের দুই বিখ্যাত জেনারেল ফায়রুযান ও হরমুযান যারা ডানে ও বামের সৈন্যব্যূহের সেনাধিনায়ক ছিলো তারাও পালিয়ে গেলো। রুস্তমের হত্যার খবর যখন পারসিকদের মধ্যে চাওর হলে এবং যারা তখনো লড়ছিলো তাদের শেষ মনোবলটুকুও চিড়ে গেলো। এবার তারা জীবিত পালানোর পথ খুঁজতে লাগলো।

পালানোর পথ ছিলো মাত্র দুটি। একটা ছিলো পুল। পলায়নপর ফারসীরা সেখানে এমন ভীড়ের সৃষ্টি করেছিলো যে, কেউ সেখান থেকে সরতেও পারছিলো না আবার নদীও পার হতে পারছিলো না। এভাবে পুল দিয়ে পালানোর পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। দ্বিতীয় পথ ছিলো নদীর ওপর দিয়ে ফারসীদের বানানো সেই বিকল্প পথ, ফালতু আসবাবপত্র ও মাটি ফেলে নদীর একদিকের স্রোত বন্ধ করে বানানো হয়েছিলো। এটা দিয়েও অসংখ্য ফারসী পালাচ্ছিলো। কিন্তু একসময় এর ওপরও এমন অস্বাভাবিক ভীড়ের সৃষ্টি হলো যে, হাজার হাজার ঘোড়া ও মানুষের ভারে সেটি নদীগর্ভে দেবে দেলো। দেবে যেতেই এতদিনের আটকে রাখা স্রোত এমন পাহাড় সমান উঁচু হয়ে তরঙ্গ তুললো যে, ত্রিশ হাজার ফারসী ও ঘোড়া খড়কুটার মতো ভাসিয়ে নিয়ে গেলো।

পুলের ওপর ভীড়ের মধ্যে যারা ফেঁসে গিয়েছিলো তারা যখন নিজেদের সঙ্গীদের এভাবে মুহূর্তের মধ্যেই ভেসে যেতে দেখলো এবং পেছন থেকে নিশ্চিত যমদূত হয়ে মুসলমানদের দৌড়ে আসার পদ শব্দ শুনতে পেলো তখন উন্মাদের মতো একে অপরকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে পথ তৈরী করে নিতে লাগলো। দৃশ্যতই পুরো রণক্ষেত্র মুজাহিদদের হাতে এসে গিয়েছিলো।

সাদ (রা) ওপর থেকে নির্দেশ পাঠালেন ফারসীদের পিছু ধাওয়া করা হোক। যাতে কেউ এদের কোথাও থেকে দম নিতে না পারে এবং একত্রিতও হতে না পারে। তবে সতর্ক থাকতে হবে এ কারণে যে, পারসিকদের সাধারণ সৈনিক থেকে জেনারেলদের অবস্থা এখন আহত সিংহ বা তীর খাওয়া রক্তাক্ত বাঘের মতো। মৃত্যু পূর্বের শেষ তেজটুকুর জন্য তারা প্রচণ্ড আকার ধারণ করতে পারে। এমন হলে মুসলমানদের অবস্থা করুণতর হয়ে উঠতে পারে। কারণ, মুসলিম সৈনিকরা ক্লান্তিতে দাঁড়ানোর শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছে।

পিছু ধাওয়াকারীদের মধ্যে ক'কা, শুরাহবীল এবং যাহরা তামীমীরা অগ্রণী ছিলেন। তাদের গোত্রের সৈন্যরাও তাদের সঙ্গে ছিলো। সাদ (রা) যে আশংকা করছিলেন

কিছুক্ষণের মধ্যেই তা সত্যি হয়ে দেখা দিলো। পারসিকদের আরেক প্রসিদ্ধ জেনারেল জালিয়ুনুস রণাঙ্গন থেকে সামান্য দূরে পালিয়ে যাওয়া সৈনিকদের একসঙ্গে জড়ো করে পাল্টা হামলার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছিলো। সে বলছিলো এভাবে নির্লজ্জের মতো হেরে গিয়ে মাদায়েন পৌঁছলে তোমাদের স্ত্রীরা সুন্দরী প্রেমিকারা কি তোমাদেরকে বুকে তুলে নেবে না মুখের ওপর ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবে? অনেক সৈন্যই তার কথায় উজ্জীবিত হয়ে পাল্টা হামলার জন্য একত্রিত হচ্ছিলো।

তখনই মুজাহিদরা গিয়ে সেখানে পৌঁছলো। সংখ্যায় তারা এবার ফারসীদের তুলনায় হাস্যকর পর্যায়ের ছিলো। কিন্তু বিজয়ের সূর্যরশ্মি তাদের শরীরে অমিত শক্তির তরঙ্গ বইয়ে দিয়েছিলো। পারসিকদের জোড়াতালি দেয়া উৎসাহ উদ্দীপনা তাদেরকেই যেন উপহাস করছিলো।

মুজাহিদরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। একখানে জালিয়ুনুসকে তার সৈন্য ঘিরে রেখেছিলো। যাহরা তামীমী তার কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে সেখানে আচমকা হামলা চালালো। তাদের হামলায় ঘিরে থাকা সৈন্যদের মধ্যে এমন ভয় ধরিয়ে দিলো যে, তারা একেকজন যেন ছিটকে ছিটকে দূরে সরে যেতে লাগলো। জালিয়ুনুস একাই লড়লো এবং অসাধারণ বীরত্ব নিয়ে লড়লো। কিন্তু এটা ছিলো তার আত্মহত্যার প্রচেষ্টার মতো। যাহরা তামীমী একটি সুযোগই পেলো এবং সে সুযোগেই জালিয়ুনুসের বীরত্ব ইতিহাস হয়ে গেলো। পারসিকদের উৎসাহ উদ্দীপনা কোথায় উড়ে গেলো। তারা দড়ি ছেঁড়া গরুর পালের মতো পালাতে লাগলো।

শেষ হয়ে গেলো কাদিসিয়ার যুদ্ধ। মারা পড়লো পারসিকদের প্রায় অর্ধেক সৈন্য। আহতের সংখ্যা ছিলো অগণিত। বেঁচে থাকা সৈন্যরা উর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছিলো। তবুও আশংকা ছিলো এসব পালিয়ে যাওয়া সৈন্য ও অসংখ্য জেনারেল যে কোন জায়গায় একত্রিত হয়ে প্রতিশোধ নিতে পারে। এই আশংকায় সাদ (রা) তাদেরকে পিছু ধাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

পলায়নোদ্যত পারসিকরা লড়ছিলো, কিন্তু বোঝা যাচ্ছিলো না তারা কি লড়ছে, না প্রাণ বাঁচানোর জন্য হাতিয়ার ফেলে দিচ্ছে, না পালানোর জন্য নতুন কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করছে। মুসলিম সৈন্যদের তুলনায় শারীরিকভাবে তারা অনেকটা তাজাদমই ছিলো। কিন্তু তাদের ধৈর্য-মনোবল ভেঙে গিয়ে মনের অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিলো যে, কেউ যেন তাদের শরীর থেকে জোর করে প্রাণখানি খুলে নিচ্ছে। তবুও তারা উদ্যত তলোয়ার হাতে লড়ছিলো।

মুজাহিদরা তাই তাদেরকে গণহত্যা শুরু করে দিলো। তলোয়ার হাতে যে ফারসীই সামনে এলো কোতল হয়ে গেলো। এমনকি কেউ কেউ এক এক ফারসীকে ধরে বলতো তোমার ঐ সঙ্গীটিকে হত্যা করে আসো। সে সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ পালন করতো।

এমন দৃশ্যও দেখা গেলো যে, এক একজন মুজাহিদ বিশ বাইশ জনের এক একটি দলকে ভেড়া-বকরীর পালের মতো হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর তারা মাথা নুইয়ে ছুটছে।

এক মুজাহিদ–হাম্মাম বিন হারিসের স্ত্রী ছিলো উম্মে কাসীর। যুদ্ধ শেষের এক গল্পের আসরে উম্মে কাসীর যুদ্ধের কথা বলতে বলতে বললো ঃ

'কাদিসিয়া যুদ্ধের শেষ দিন সিপাহসালারের স্ত্রী সালমা আমাদের ছাউনীতে এসে বললো– লড়াই এমন আকার ধারণ করছে যে, আমাদের মেয়েদের তৈরী থাকতে হবে। মুজাহিদরা যখন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এবং পারসিকরা পলায়নরত, আমরা আমাদের হাতে লাঠিসোটা নিয়ে রণাঙ্গনে পৌছে গেলাম। আমাদের যে আহত সৈন্যকেই দেখলাম পানি পান করিয়ে সেনাছাউনীতে রেখে এলাম। আর যে ফারসীকেই উঠতে দেখলাম পিটাতে পিটাতে তার হাড়গোড় ভেঙে দিলাম। আমাদের সন্তানরাও আমাদের সঙ্গে ছিলো। পারসিকদের সঙ্গে তারা আমাদের মতোই আচরণ করে গেলো।'

শেষ দিনের লড়াইয়ে মুসলমানদের ছয় হাজার সৈন্য শহীদ হলো। এর আগের কয়েক দিনের লড়াইয়ে শহীদ হয়েছিলো আড়াই হাজার। কিন্তু পারসিকদের যে কত হাজার সৈন্য মারা গিয়েছিলো তার কোন হিসাব ছিলো না।

পারসিকদের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে ক'কা, শুরাহবীল ও যাহরা তামীমী দেখলেন, পারসিকরা পালাতে পালাতে ময়দানের আশপাশ শূন্য করে চলে গেছে এবং ছোটখাটো কোন দলও নজরে পড়ছে না। তারা একে একে ফিরে এলেন।

ফিরে এসে তারা সোজা সাদ (রা) এর কাছে গিয়ে হাজির হলেন। সাদ (রা)-এর দু' চোখ ভরে অশ্রুর ধারা বইছিলো। এ ছিলো আনন্দের অশ্রু। উপস্থিত সবার চোখেও যেন সেই অশ্রু উঠে এলো। সাদ (রা) হঠাৎ শয্যা থেকে উঠে বসলেন। আনন্দে তার পায়ের যন্ত্রণার বিষম অনুভূতি কোথায় যেন চলে গেলো।

এক জায়গায় গনীমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) মুজাহিদরা জড়ো করছিলো। সেখানে যিরার ইবনে খিতাব আরো কয়েকজনকে সঙ্গে করে পারসিকদের সেই বিশাল ঝান্ডাটি নিয়ে এলো যা পারস্য সম্রাট ইয়াযদগিরদের পক্ষ থেকে সম্মাননা স্বরূপ রুস্তম ও তার ফৌজকে দেয়া হয়েছিলো। ঝান্ডাটি এত বিশাল ছিলো যে, এক লাখ বিশ হাজার সৈন্যকে তা দ্বারা আবৃত করা যেতো এবং পুরো ঝান্ডা জুড়ে স্বর্ণের জড়ি লাগানো ছিলো এবং বহু মূল্যবান মনিমুক্তা ও হীরার টুকরাও এতে খচিত ছিলো। এজন্য এটাকে লৌহ ঝান্ডাও বলা হতো। এর দাম ছিলো কয়েক লাখ দিরহাম।

ঃ 'আচ্ছা সেই মুজাহিদকে কি দেখতে পাবো না রুস্তমকে যে হত্যা করেছে?' – সাদ (রা) বললেন।

ঃ 'তাকে আমাদের সঙ্গেই নিয়ে এসেছি' – ক'কা বললেন এবং মহলের জানালা দিয়ে উঁচু আওয়াজে হেলাল ইবনে আলকামাকে ডাকলেন।

হেলাল দৌড়ে মহলে পৌছে গেলো। সাদ (রা) তার দু' হাত নিজের হাতে নিয়ে চুমু খেলেন। তারপর তার চোখে ছোঁয়ালেন।

ঃ 'রুস্তমের দেহ থেকে তুমি সবকিছু খুলে নিয়েছিলে?' – সাদ (রা) হেলালকে জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ 'হ্যাঁ আমীরে লশকর! আপনি নির্দেশ দিলে সেগুলো আমি এখানে উপস্থিত করছি'।

ঃ 'না আলকামার বেটা! ঐ জিনিসগুলো যত দামীই হোক সব তোমার।'

ঃ 'হায় আফসোস!' – হেলাল হতাশ গলায় বললো– 'রুস্তমের হীরা স্বর্ণখচিত মুকুটটি নদীতে পড়ে গেছে। ওটা পেলে আমি দারুণ লাভবান হতাম।'

রুস্তমের যুদ্ধ পোষাক, তলোয়ার, খঞ্জর, বর্ম এবং অন্যান্য জিনিসের ন্যূনতম দাম ছিলো সত্তর হাজার দিরহামেরও বেশি। তার টুপি যার মধ্যে সম্রাটদের শাহী মুকুটের মতো হীরা ও স্বর্ণ খচিত ছিলো সেটি ডুবে গিয়েছিলো নদীতে। রুস্তমের সেই কুরসী সমেত তখতটিও এ ধরনেরই ছিলো।

তারপর সাদ (রা) এর কাছে আসলেন যাহরা তামীমী। যাহরা তামীমী জালিয়ুনুসকে হত্যা ও তার ফৌজকে কিভাবে ছত্রভঙ্গ করা হয়েছে সে ঘটনা খুলে বললেন।

ঃ 'আমীরে লশকর!' – যাহরা জিজ্ঞেস করলেন– 'জালিয়ুনুস থেকে যে সম্পদ উদ্ধার করেছি তা কি আমার নয়?'

সাদ (রা) জালিয়ুনুস থেকে প্রাপ্ত জিনিসের তালিকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। এসব জিনিসের মধ্যে জালিয়ুনুসের ব্যক্তিগত সম্পদ ছাড়াও অনেকগুলো টুকরো স্বর্ণ ও হীরাও ছিলো। জালিয়ুনুস এগুলো সুযোগ পেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছিলো।

ঃ'যাহরা!' – সাদ (রা) বললেন– 'তোমার এই কৃতিত্ব যে অনেক বড় পুরস্কারের উপযুক্ত তা কে অস্বীকার করতে পারবে। কিন্তু এখানে অর্থ সম্পদ এত বেশি যে, আমীরুল মুমিনীনের অনুমতি ছাড়া তা আমি শুধু একজনকে দিতে পারবো না।'

কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই যাহরা এই ফয়সালা মেনে নিলেন। সাদ (রা) তখনই বিজয়ের সুসংবাদ জানিয়ে ও যাহরার এত বড় কৃতিত্ব এবং তার প্রাপ্ত মালে গনীমতের ব্যাপারে ফয়সালা চেয়ে পয়গাম লেখালেন।

ঃ 'ঘোড়ায় নয় উটে করে এই পয়গাম যাবে' – সাদ (রা) বললেন– 'ঘোড়ার চেয়ে উট দ্রুত তো যাবেই এবং একবারের পানি পানের মাধ্যমেই ঘোড়া থেকে অনেক বেশি সফর করতে পারবে।

নির্দেশ অনুযায়ী উট সওয়ার কাসেদ সাদ ইবনে উমাইলা ফাযারী তখনই রওয়ানা করলো।

কয়েকদিন আগেই উমর (রা) খবর পেয়েছিলেন কাদিসিয়ার লড়াই শুরু হয়ে গেছে। কাদিসিয়ার যে কোন খবরের জন্য তিনি সবসময় এত উদগ্রীব থাকতেন যে, ফুরসত পেলেই মদীনা থেকে বের হয়ে সেই রাস্তায় গিয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকতেন যেটা ইরাক হয়ে কাদিসিয়া থেকে মরুর মালভূমির ওপর দিয়ে মদীনায় পৌঁছেছে। একদিন তিনি সেই কাদিসিয়ার রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘোড়ার খুরধ্বনি শোনার প্রতীক্ষায় ছিলেন। তখনই দেখলেন এক উট সওয়ার এদিকেই আসছে।

ঃ 'কোত্থেকে আসছো ভাই' – উমর (রা) তার ঘোড়া সামনে নিয়ে উট সওয়ারকে জিজ্ঞেস করলেন– 'আর যাচ্ছোই বা কোথায়?'

ঃ 'কাদিসিয়া থেকে' – একথা বলে উট সওয়ার এগিয়ে গেলো।

উমর (রা) তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছুটালেন।

ঃ 'তুমি কাদিসিয়ার কোন কাসেদ নও তো?' – উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ 'হ্যাঁ ভাই! কাদিসিয়ার সিপাহসালার সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) এর পক্ষ থেকে আমীরুল মুমিনীনের কাছে পয়গাম নিয়ে যাচ্ছি।'

কাসেদ সাদ ইবনে উমাইলা ছিলো সদ্য যৌবনে পা দেয়া মদীনা থেকে দূরের এক গ্রামবাসী। উমর (রা)কে সে কখনো দেখেনি। উমর (রা)ও তাকে নিজের পরিচয় দিয়ে বিব্রত করতে চাইলেন না। তার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়া দৌড়ালেন।

ঃ 'খোদার কসম!' – উমর (রা) বললেন– 'কাদিসিয়ার খবর শোনার জন্য আমি মুখিয়ে আছি। মদীনাতেই থাকি আমি। কোন সুসংবাদ থাকলে আমাকে কি শোনাবে না?'

ঃ 'চারদিনের লড়াইয়ের পর মহান আল্লাহ্ অগ্নিপূজারীদের শোচনীয় পরাজয় দান করেছেন' – কাসেদ বললো– 'মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে এতবড় ফৌজের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেছেন যে, এমন বিজয়ের দৃশ্য আমরা না কখনো দেখেছি না কখনো শুনেছি।'

উটের গতি মদীনায় গিয়ে কমে গেলো। উমর (রা) ও তার সঙ্গে শহরে প্রবেশ করলেন। লোকেরা তাকে এক উট সওয়ারের সঙ্গে এমনভাবে আসতে দেখে রাস্তায় নেমে এলো।

ঃ 'আমীরুল মুমিনীন!'– এক লোক সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'কাদিসিয়ার কোন খবর কি এখনো আসেনি?'

আরো কয়েকজন তাকে সালাম দিয়ে আমীরুল মুমিনীন বলে সম্বোধন করলো। উটসওয়ার তার উট থেকে লাফিয়ে নামলো। উমর (রা)ও ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন।

ঃ 'আমীরুল মুমিনীন!'–উটসওয়ার সাদ ইবনে উমাইলা উমর (রা) এর হাত নিজের হাতে নিয়ে বললো– 'আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন। পথে কেন আপনার পরিচয় দিলেন না। আমাকে কেন এই অসৌজন্যতা করার সুযোগ দিলেন?'

ঃ 'অসুবিধা নেই কোন'– উমর (রা) মুচকি হেসে বললেন– 'কে আমাকে আমীরুল মুমিনীন বলছে আর কে বলছে না তা নিয়ে আমার কোন কৌতূহল নেই ভাই। তুমি যে পয়গাম নিয়ে এসেছো ওটা নিয়েই আমার আগ্রহ ও কৌতূহল।'

উমর (রা) পয়গামটি হাতে নিয়ে সেখানেই পড়তে শুরু করলেন। রাস্তায় ভীড় জমে গেলো। সবাইকে তিনি বিজয়ের সুসংবাদ দিলেন। সামান্য সময়ের মধ্যেই এই সুসংবাদ ঘরে ঘরে পৌঁছে গেলো। সারা মদীনার সবাই উচ্ছ্বাসে ঘর থেকে বেরিয়ে উঠলো। সবার মুখে তাকবীর ধ্বনির সমস্বরিত আওয়াজ উচ্চকিত হয়ে এলো। ছোট ছোট বাচ্চারাও নেচে উঠলো আনন্দে।

উমর (রা) ঘরে চলে গেলেন। মালে গনীমত সম্পর্কে যে পয়গামটি ছিলো সেটি খুলে পড়লেন। তখনই তিনি এর উত্তর লেখিয়ে কাসেদকে দিয়ে বললেন সে যেন পর্যাপ্ত বিশ্রাম করে রওয়ানা দিয়ে দেয়।

কয়েকদিন পরই সাদ (রা) উমর (রা) এর পাঠানো উত্তর পেলেন। সাদ (রা) যাহরা ইবনে তামীমীর প্রাপ্ত মালে গনীমত সম্পর্কে উমর (রা) এর যে ফয়সালা চেয়েছিলেন উমর (রা) তার জবাব দিলেন এভাবে ঃ

'পৃথিবীতে প্রতিদিনই যাহরার মতো আত্মত্যাগী মুজাহিদ জন্মগ্রহণ করে না। তার প্রতি আস্থা রাখতে পারো। সে যে বীরত্ব দেখিয়েছে তা সত্যিই অতুলনীয়। ইরাক ও পারস্য তো এখনো বিজয় হয়নি। সে তোমার সঙ্গেই থাকবে এবং তোমাদের আরো অনেকগুলো লড়াইতে জিততে হবে। তার মন ভেঙে দিও না। জালিয়ুনুসের দেহ থেকে সে যা উদ্ধার করেছে তা তাকে দিয়ে দাও। এর পর যখন মুজাহিদদের মধ্যে মালে গনীমতের বন্টন করবে তাকে আরও পাঁচশ দিরহাম অতিরিক্ত দিও।'

কাদিসিয়া থেকে যে বড় ধরনের গনীমত পাবেন এটা সাদ (রা) আশা করছিলেন, কিন্তু গনীমতের পরিমাণ এত বেশি যে হবে তা তিনি মোটেও কল্পনা করতে পারেননি।

একপাল খচ্চর ও গাধাগুলোর ওপর যে বড় বড় অগণিত বাক্সের স্তূপ ছিলো সেগুলো সোন-রুপার মুদ্রায় একেবারে ঠাসা ছিলো। এগুলো ছিলো পারস্য ফৌজের বেতন-ভাতার টাকা। এই চিন্তায় তারা এত টাকা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো যে, রুস্তম অঙ্গীকার করেছিলো কাদিসিয়ার পর সে মদীনাও জয় করবে। এজন্য কয়েক মাস সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। ফারসী জেনারেল ও উচ্চপদস্থ অফিসারদের রাজকীয় জীবন যাপনের কথা তখন সবাই জানতো। তারা তাদের সঙ্গে অনেক দামী দামী বিলাস উপকরণ ও আসবাবপত্র নিয়ে এসেছিলো। এ ছাড়াও ফৌজের সঙ্গে বহু দামী জিনিসপত্র ছিলো।

মালে গনীমত বন্টন করা হলো। প্রত্যেক সওয়ারকে ছয় হাজার দিরহাম ও পদাতিক যোদ্ধাকে দুই হাজার দিরহাম করে দেয়া হলো। যারা বীরত্বে সাহসিকতায় অগ্রগামী ছিলো তাদেরকে অতিরিক্ত পাঁচশ দিরহাম করে বেশি দেয়া হলো।

রাষ্ট্রীয় কোষাগারের জন্য গনীমতের মাল থেকে যে এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করে রাখা হয় তা আলাদা করে সাদ (রা) উমর (রা) কে পয়গামে জানালেন, রাষ্ট্রীয় কোষাগারের জন্য এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করে বাকিটা এভাবে সৈন্যদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয়েছে। ফিরতি জবাবে উমর (রা) জানালেন ঃ

'খুমুস' তথা এক-পঞ্চমাংশও মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দাও। যারা এই নগণ্য সংখ্যার শক্তি নিয়েও এত বড় শক্তির বিরুদ্ধে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে তাদের কৃতিত্ব তো কোন সাধারণ বিষয় নয়। কোন মুসলিম সৈন্য যদি অসুস্থতা বা অন্য কোন অক্ষমতার কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না থাকে তাকেও সবার সমান অংশ দাও।'

সাদ (রা) খুমুসও সবার মধ্যে বন্টন করে দিলেন। শহীদানের অংশ তাদের বিধবা স্ত্রীদেরকে দিয়ে দিলেন এবং যারা শহীদানের সঙ্গে আসেনি তাদেরটা পৃথক করে রেখে দিলেন। সাদ (রা) বারবার ঘোষণা দিলেন কেউ যদি তার নির্ধারিত অংশ না পেয়ে থাকে বা কম পেয়ে থাকে সে যেন তারটা এসে নিয়ে যায়। কাউকেই এমন পাওয়া গেলো না। সাদ (রা) এই ঘোষণা এজন্য দিলেন যে, প্রত্যেককে অতিরিক্ত দেয়ার পরও মালে গনীমতের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ রয়ে গিয়েছিলো। তিনি আবারও উমর (রা) এর কাছে জানতে চাইলেন এগুলো কি বায়তুলমালে পাঠিয়ে দেয়া হবে না অন্য কিছু করা হবে। উমর (রা) জবাব পাঠালেন এগুলো হাফেজে কুরআন সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে দাও।

উমর (রা)-এর পয়গামটি সারা ফৌজের সামনে ঘোষণা করে দেয়া হলো।

একে একে হাফেজে কুরআন আসতে লাগলো এবং সাদ (রা) তার পরীক্ষা নিয়ে তাকে তার অংশ দিয়ে যেতে লাগলেন। হাফেজ দলের মধ্যে আমর ইবনে মাদী কারাব ও বিশির ইবনে রবীআও শরীক হয়ে গেলেন।

ঃ 'ইবনে মাদী কারাব!'–সাদ (রা) আমর ইবনে মাদী কারাবকে জিজ্ঞেস করলেন– 'ভাই তুমি কতটুকু কুরআন হেফজ করেছো?'

ঃ 'হাফেজে কুরআন হওয়ার আন্তরিক ইচ্ছা আছে আমার!' – ইবনে মাদী কারাব জবাব দিলেন– 'ইয়ামানে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তারপর এতগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি যে, হেফজে কুরআন শেষ করার সুযোগ মেলেনি।

ঃ 'নারে ভাই!' – সাদ (রা) দুঃখিত গলায় বললেন– 'তোমার বীরত্বের কথা অস্বীকার করার মতো কার সাহস আছে? কিন্তু তুমি তো হাফেজে কুরআন নও ভাই! তোমাকে কি করে আমি এখান থেকে দিতে পারি... 'আর তুমি ইবনে রবীআ'? – সাদ (রা) বিশির ইবনে রবীআকে জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি পবিত্র কুরআনের কতটুকু হেফজ করেছো?'

বিশির বললো– 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' –একথা বলে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

সবাই হাহা হোহো করে হাসিতে ফেটে পড়লো। সাদ (রা)ও হাসি আটকাতে পারলেন না। সাদ (রা)-এর মনটা আরো ভালো হয়ে গেলো। যুদ্ধের মাঠের বিভীষিকা, তাজা আর জমাট রক্তের নাড়ীভুড়ি উল্টানো উৎকট গন্ধ, ছিন্ন ভিন্ন লাশের সারির দৃশ্য এসবের পর মুজাহিদরা এই প্রথম এমন মন খোলা হাসির পরিবেশ গেলো।

তবুও সাদ (রা) তাকেও হাসিমুখে ফিরিয়ে দিলেন।

আরবদের মধ্যে এমনিতেই সহজাত কাব্যপ্রীতি ছিলো। আমর ইবনে মাদী কারাব ও বিশির রবীআ এই সহজ পরিবেশে যেন একটু কৌতুকের সুযোগ পেলেন। হাফেজে কুরআনের অংশ না দেয়াতে কবিতার ঢঙে মাদীকারাব এভাবে তার দাবী তুলে ধরলেন ঃ

'উদ্যত তলোয়ার আমাদের হত্যা করতে আসলো যখন
আমাদের জন্য চোখের পানি ফেলার ছিলো না কেউ তখন
বলেছিলো কুরায়েশ নেতারা– এসব ভাগ্যের খেলা'...
'চিড়ে দিচ্ছিলো বুকের নরম হাড়
অগণিত বর্শার তীক্ষ্ণ ধার
লড়াইয়ে তো আমাদের শিকল দিয়ে রেখেছে প্রায়ই–বরাবর...
কিন্তু যখন বন্টন হলো মুদ্রা–অনেক কিছু আরো
মিললো না আমাদের এক-টুকরোও...'
আমর ইবনে মাদী কারাব নীরব হলে বিশির ইবনে রবীআর কণ্ঠ সরব হলোঃ
'কাদিসিয়ার প্রশস্ত দরজায়
যখন রাখলাম আমার উটের কাজাওয়া
সাদ ইবনে ওয়াক্কাস ছিলেন তখন আমাদের আমীর...
তার ভালো ছাড়া মন্দ কিছু নেই–সাদ এমনই আমীর
কিন্তু ইরাকের সবচেয়ে ভালো আমীর কিন্তু জারীর...'
আপনাকে আল্লাহ ভরিয়ে দিন কল্যাণের শিশিরে
স্মরণ করুন তো কুদায়েসের দরজার ভেতরে
আমাদের তলোয়ারের আঘাত,
তলোয়ারের ভীড় চারদিক করে তুলেছিলো মাত
বের হওয়ার উপায় ছিলোনা তো তখন প্রাণটি নিয়ে...
'কী ভয়ংকর রাত–কী যে দুঃসহ
উড়ন্ত অন্তরে অনুরণ তুলছিলো সবার
পাখির পালক নিয়ে উড়ে যেতে পারতো যদি পৈতৃক প্রাণটি সহ...'

সাদ (রা) ব্যাপারটা হালকাভাবে নিলেন না। এর মধ্যে তিনি তাদের ঈষৎ ক্ষোভ টের পেলেন। সেদিনই তিনি কাদিসিয়ার সার্বিক পরিস্থিতি ও তাদের দু'জনের কৌতুকভাষ্যসম্বলিত কবিতাগুলো উল্লেখ করে উমর (রা) এর কাছে পয়গাম পাঠালেন। তাদের জন্য তিনি সুপারিশও করলেন এই ভাষায়–

'এসব কবিতায় ওরা দু'জন যুদ্ধের ময়দানে নিজেদের বীরত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। এতে তারা একটুও বাড়িয়ে বলেনি। আবার এরা এর দ্বারা আমার প্রতি তাদের ব্যক্তিগত ক্ষোভের কথাও জানিয়েছে। জিহাদ বা লড়াইয়ের ময়দানের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় তাদের এই ক্ষোভ। কিন্তু আমার প্রতি ক্ষোভ আছে বলে আমি চিন্তিত নই। আমি শুধু ফয়সালা চাচ্ছি ওদেরকে অতিরিক্ত কিছু দেয়া হবে কি না।'

সাদ (রা) ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন ন্যায়সঙ্গতভাবেই। হাফেজে কুরআনদের অংশের উপযুক্ত না হয়েও অন্যায়ভাবে সাদ (রা)কে দোষারোপ করছিলো। কিন্তু তিনি তার ব্যক্তিগত সম্মান অসম্মানের ওপর সবসময় ফৌজের অধিকারকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তাদের মতামতের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ করে এসেছেন। তাই

কোন ধরনের বে-ইনসাফী যেন না হয় এজন্য তিনি আমীরুল মুমিনীনের ফয়সালা জানতে চান। তিনি আরো ভেবেছিলেন গনীমতের মালের বণ্টনের পরও যেহেতু আরও থেকে যাচ্ছে তাই উমর (রা) হয়তো অন্য কোন সিদ্ধান্তও নিতে পারেন।

এই পয়গাম উমর (রা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি তার উপদেষ্টা পরিষদদের নিয়ে মসজিদে নববীতে বসলেন।

ঃ 'প্রিয় বন্ধুরা'– উমর (রা) বললেন– 'মহান আল্লাহ দৈত্যের মতো যে বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয়ী করেছেন তা নিয়ে আমার ভয় হয়– কি জানি আমরা কি এটা সহ্য করতে পারবো? এই বিজয় আমার হৃদয়ে চেপে থাকা অনেক বড় বোঝা নামিয়ে দিয়েছে। আমার ওপর রাসূলুল্লাহ (স) এর একটি ঋণ ছিলো। আমাদের এই সামান্য কিছু মুজাহিদ এই ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছে।'

ঃ 'কিসের ঋণ আমীরুল মুমিনীন!' – একজন জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ 'খোদার কসম! তোমরা নিশ্চয় রসূলুল্লাহ (স) এর ভবিষ্যদ্বাণী ভুলে যাওনি'– উমর (রা) বললেন– তিনি বলেছিলেন– 'সালতানাতে ফারেস এভাবেই টুকরো টুকরো হয়ে যাবে যেমন করে কিসরা পারভেজ আমার প্রেরিত পয়গাম ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে... মুজাহিদরা কি রাসূলুল্লাহ (স) এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর অনেকটাই বাস্তবায়ন করেনি?'

ঃ 'অবশ্যই আমীরুল মুমিনীন! অবশ্যই!' – কয়েকজনের উচ্ছ্বাস ধ্বনি ভেসে এলো।

ঃ 'তোমাদেরকে আমি সাদ (রা)-এর একটি পয়গাম শুনিয়েছিলাম'– উমর (রা) বললেন– 'তাতে সে লিখে যে, রুস্তম মুগীরা (রা)কে বলেছিলো আমি আরবকে ধ্বংস করে দেবো। মুগীরা বলেছিলো– হ্যাঁ আল্লাহ যদি চান তবে। ...রুস্তম বলেছিলো আল্লাহ না চাইলেও...আজ কোথায় সেই রুস্তম? পারস্যের কিংবদন্তী বীর, পারস্য সম্রাটদের ওপর প্রাধান্য বিস্তারকারী রুস্তম – যাকে পারস্যের মুকুটহীন সম্রাট মনে করা হতো... আজ তার লাশ, বিলাসিতার সোনায় মোড়া তার হাড়-গোড় নদীর শূন্য প্রান্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। তার হাড়ের ওপরের গোশতগুলো কুকুর শিয়ালে খেয়ে চলে গেছে... আল্লাহর সন্তুষ্টির বিরুদ্ধে যারা পদক্ষেপ ফেলে তাদের পরিণতি কি এমনই হয় না?'

ঃ 'অবশ্যই আমীরুল মুমিনীন!' – সবাই বললেন – তার এই পরিণতিই হয়।'

ঃ 'খোদার কসম!' – উমর (রা) বললেন– 'এই কৃতিত্ব আমাদের বীর মুজাহিদদের। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর সম্মান সমুন্নত করেছে এবং কুফরীর ওপর প্রমাণ করে দিয়েছে ইসলাম সত্যধর্ম। আমর ইবনে মাদী কারাব এবং বিশির ইবনে রবীআ এসব বীর মুজাহিদদেরই অন্যতম। বন্ধুরা! এবার আমাকে পরামর্শ দাও – আমি কি সাদকে অনুমতি দিয়ে দেবো তাদের দু'জনকে অতিরিক্ত আরো কিছু দিয়ে দিতে?'

ঃ 'ইবনুল খাত্তাব!' – এক বর্ষীয়ান সাহাবী বললেন– 'যেখানে তুমি রাষ্ট্রীয় কোষাগারের এক-পঞ্চমাংশ মুজাহিদদেরই বণ্টন করে দিলে সেখানে ওদের দুজনকে এই সামান্য অংশ দিলে আল্লাহ তোমাকে এজন্য পাকড়াও করবেন না। ওরা কিভাবে এটা চেয়েছে সেটা দেখো না। দেখো ওরা কি করেছে?'

ঃ 'হ্যাঁ আমীরুল মুমিনীন!' – আরেকজন বললেন– 'সিপাহ্সালারকে কিছু দিয়ে দিতে অনুমতি দিয়ে দিন। আশংকা হলো এই অতিরিক্ত দাবীর রেওয়াজ না আবার শুরু হয়ে যায়। নির্দেশ পাঠিয়ে দিন ভবিষ্যতে কাউকে কোন অবস্থাতেই অতিরিক্ত কিছু দেয়া হবে না।'

বৈঠকের সকলেই প্রায় রায় দিলেন এই দুই মুজাহিদকে তাদের দাবী অনুযায়ী কিছু দেয়া হোক।

উমর (রা) সেখানে বসেই সাদ (রা)কে জবাবী পয়গাম লেখালেন। অন্যান্য নির্দেশাবলি দিয়ে তিনি বললেন– আমর ইবনে মাদী কারাব ও বিশির ইবনে রবীআকে যেন দু'হাজার করে অতিরিক্ত দিরহাম দিয়ে দেয়া হয়। আর সবাইকে যেন জানিয়ে দেয়া হয়, ভবিষ্যতে যেন কেউ এভাবে অতিরিক্ত কিছু পাওয়ার দাবী না তুলে। অন্যথায়, এই অতিরিক্ত দাবীর অভ্যাস সবার মনকে দুনিয়ার প্রতি মোহিত করে তুলবে।

উমর (রা) পয়গামে আরেকটা কথা লিখলেন 'ওদের জানবাযীর মূল্য যেন ওদেরকে দিয়ে দেয়া হয়।'

কাদিসিয়ায় এই পয়গাম পৌঁছলে সাদ (রা) পুরো লশকরের সামনে তাদের দু'জনকে দুই দুই হাজার করে দিরহাম দিয়ে দিলেন। তারপর উমর (রা) শেষের নির্দেশগুলোও শুনিয়ে দিলেন।

এই পয়গাম শুনে মুজাহিদদের মধ্যে কেমন ব্যাকুলতা ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মধ্য থেকে আওয়াজ উঠে ঃ

ঃ 'খোদার কসম! দুনিয়ার মোহ আমাদের কারো মধ্যেই নেই।'

ঃ 'আমাদের পুরস্কার আর প্রতিদান তো আল্লাহর দেয়া বিজয়!'

ঃ 'খোদার কসম! আমরা কখনো কিছু চেয়ে নেবো না। আল্লাহই আমাদেরকে দেবেন।'

ঃ 'কসম আল্লাহর! পুরো পারস্যকেই আমরা পুরস্কারস্বরূপ জয় করবো।'

তাদের মনের এই নির্মল অভিব্যক্তিগুলোই যেন তাদের অবিনাশী বিশ্বাসের পংক্তিমালা ছিলো। এই অজেয় বিশ্বাসকেই তারা ঈমান বলতো।

পারসিক ফৌজের যারা বেঁচে গিয়েছিলো তাদের রুখ ছিলো মাদায়েনের দিকে। সাদ (রা) হুকুম দিয়েছিলেন ফারসীদের পিছু ধাওয়া করতে।

উমর (রা) বিজয়ের খবর পাওয়ার পরপরই লিখে পাঠান– সাদ (রা) যেন তার পরবর্তী নির্দেশ পাওয়ার আগ পর্যন্ত কাদিসিয়াতেই অবস্থান করেন।

উমর (রা) যেমন কাদিসিয়ার তাজা খবরের প্রতীক্ষায় কখনো কখনো দৌড়ে মদীনার বাইরে চলে আসতেন ইয়াযদগিরদও এমন ব্যাকুল হয়ে শহরের প্রাচীর বাধের ওপর গিয়ে দাঁড়াতো এবং কাদেসিয়ার পথের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকতো। তার মা নাওরীনও ছেলের সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে যেতো।

সেদিন ইয়াযদগিরদ তার শাহীমহলের এক কামরায় বসা ছিলো। সেদিনই কাদিসিয়ার শেষ কাসেদ মহলের সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামলো। যুদ্ধের ময়দানে রুস্তমের মনোরঞ্জনের জন্য যে মেয়েটি ছিলো তারই বড় বোন তখন ইয়াযদগিরদের বাহুবেষ্টনীতে বসেছিলো। সেদিন ইয়াযদগিরদ অশান্ত হয়ে উঠেছিল একটু বেশি মাত্রায়। মেয়েটি তার পাগল করা রূপ যৌবনে ভাসিয়ে ইয়াযদগিরকে শান্ত করতে চেষ্টা করছিলো। মদও সেদিন তার মুখে বিস্বাদ ঠেকছিলো। তবুও কয়েক ঢোক খাওয়ার পর তার অস্থিরতা কিছু ঝিমিয়ে আসতো।

কাদিসিয়ার কাসেদ তার দরজায় পৌঁছে গেলো। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা দারোয়ানকে বললো এই পয়গামটি শাহেনশাহকে দিয়ে এসো। কারণ এতে কোন সুখবর নেই। তাই আমি ভেতরে যাচ্ছি না। দারোয়ান বললো, কাসেদকে তো শাহেনশাহ জরুর ডাকবেন। আর কি খবর নিয়ে এসেছো? কাসেদ তাকে জানালো আমাদের ফৌজ চরম মার খেয়েছে এবং রুস্তম মারা গেছে।

ঃ 'বেওকুফ হয়ো না'–দারোয়ান বললো– 'শাহেনশার কাছে আমি পয়গাম পৌঁছে দেবো আর কাসেদ বাইরে থেকে চলে যাবে এটা কখনো হতে পারে না। আমি তোমার আসার খবর জানিয়ে আসছি।'

ইয়াযদগিরদ আর রুস্তমের মধ্যে যুদ্ধের ময়দান থেকে সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো এবং আওয়াজ শোনা যায় এতটুকু ব্যবধানে সারিবদ্ধ কাসেদের মাধ্যমে যে সংবাদ প্রবাহের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিলো পারসিকরা রণাঙ্গণ থেকে পালানোর সঙ্গে সঙ্গে তা বরবাদ হয়ে যায়। পয়গম পৌঁছানোর জন্য সামান্য পর পর যাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছিলো তারা যখন তাদের ফৌজকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে দেখলো তারা তখন পিঠ দেখাতে দেরী করলো না। জালিয়ুনুস নিহত হওয়ার আগে এই কাসেদকে পাঠিয়েছিলো।

দারোয়ান ইয়াযদগিরদের কামরায় প্রবেশ করলো।

ঃ 'কাদিসিয়া থেকে কি কেউ এসেছে?' – ইয়াযদগিরদ জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'জ্বি, শাহেনশাহে ফারেস!' – দারোয়ান হতাশ গলায় বললো– 'ভেতরে আসার জন্য অনুমতি চাইছে।'

ঃ 'তুমি কি পেরেশান?' – ইয়াযদগিরদ তার মুখের মলিনতা দেখে জিজ্ঞেস করলো– 'কাসেদ কি তোমাকে কোন দুঃসংবাদ শুনিয়েছে?'

ঃ 'আমি তাকে ভেতরে পাঠাচ্ছি' – দারোয়ান দ্রুত বললো।

ঃ 'এখনি পাঠাও।'

❖ ❖ ❖

ঃ 'তোমার মুখ বলছে তুমি কোন ভালো সংবাদ আনোনি' – কাসেদ ভেতরে গেলে ইয়াযদগিরদ তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে থাকা মেয়েটিকে একটু দূরে সরিয়ে বললো।

ঃ 'শাহেনশাহে মুআযযম! আমি কারও প্রেরিত কাসেদ নই' – কাসেদ বললো– 'আমি আমার দায়িত্ব মনে করে এসেছি।'

ঃ 'রুস্তম তোমাকে পাঠায়নি?'

ঃ 'না শাহেনশাহে মুআযযম!' – কাসেদ জবাব দিলো– 'রুস্তম নিহত হয়েছে। আমি নিজে তার খণ্ডিত মস্তক নদীর তীরে পড়ে থাকতে দেখেছি।'

ঃ 'না!' – ইয়াযদগিরদ প্রায় শূন্যে লাফিয়ে উঠলো, তার গলা দিয়ে যেন হাহাকার বেরিয়ে এলো– 'রুস্তম যদি না থাকে তাহলে...'

ঃ 'জালিয়ুনুসও নেই শাহেনশাহে ফারেস!' – কাসেদ বললো– 'তিনি তার পলায়নরত ফৌজের সঙ্গে মারা গেছেন।'

ঃ 'আর ফায়রুযান?'

ঃ 'একেবারে লাপাত্তা' – কাসেদ বললো– 'পালিয়েছে হয়তো।'

ঃ 'হরমুযান?'

ঃ 'তিনিও পালিয়েছেন' – কাসেদ বললো– 'সেখানে কিছুই নেই এখন শাহেনশাহে মুআযযম! কাদিসিয়ার ময়দানে আমাদের লাশ ছাড়া আর কিছুই নেই। পারস্যের সম্মান, গর্ব...লৌহ ঝাণ্ডাটিও... মুসলমানরা নিয়ে গেছে' – কাসেদ প্রায় কেঁদে ফেললো – 'আমি সাধারণ একজন ফৌজী অফিসার। আমি আমার দায়িত্ব মনে করে এসেছি আপনাকে সতর্ক করার জন্য। মুসলমানরা আমাদের পালিয়ে আসা ফৌজের পিছু ধাওয়া করে আসছে। মাদায়েনকে বাঁচান। আমাদের ফৌজ এমন বিশৃংখল হয়ে পড়েছে যে, তাদের কোথাও আর একত্রিত করা সম্ভব নয়।'

ইয়াযদগিরদ আর কাসেদের কথার মাঝখানে সেই মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। কাসেদ ইয়াযদগিরদকে যুদ্ধের বিস্তারিত বয়ান শুনাচ্ছিলো। আর ইয়াযদগিরদ কেমন পাথর চোখে তার অফিসারটির দিকে তাকিয়েছিলো।

তখনই ইয়াযদগিরদের মা মেয়েটিকে সঙ্গে করে দৌড়ে ঘরে প্রবেশ করলো এবং ইয়াযদগিরদের পাশে বসে তাকে তার কোলে এমনভাবে টেনে নিলো যেন সে একটি বাচ্চা।

ঃ 'কি হয়েছে ইযদী!' – মা ছেলের এই রক্তশূন্য মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো।'

ঃ 'যা হওয়ার কথা ছিলো না' – ইয়াযদগিরদ বোমার মতো ফেটে পড়লো– 'আর এর সব দায়দায়িত্ব তোমার...সব দোষ...তোমার...যে আমার মা...রুস্তমের সাথে সাথে আমার থাকা উচিত ছিলো। তোমার এই অবুঝ মমতার শিকলে আমাকে বেঁধে রেখেছো।'

প্রচণ্ড রাগে ইয়াযদগিরদ বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছিলো। মেয়েটি এগিয়ে এলো। যদি তার শাহেনশাকে শান্ত করা যায়। এই চিন্তা করে সে চেতনা অবশ করা মদের সুরাটি উঠিয়ে ইয়াযদগিরদের সামনে তুলে ধরলো।

ঃ 'এই অবস্থা জেনারেলদের কাপুরুষতার কারণেই হয়েছে' – মেয়েটি আবেগী গলায় বললো– 'আর এর সব বোঝা একা শাহেনশার ঘাড়ে এসে পড়েছে' – এ কথা বলে মেয়েটি মদের পাত্রটি ইয়াযদগিরদের হাতে দিতে দিতে বললো– 'দুই ঢোক পান করে নিন শাহেনশাহে ফারেস! কিছুটা শান্তি ফিরে পাবেন। আপনার তো এখন শান্ত মনে চিন্তাভাবনার দরকার। মুসলমানরা তো জিন ভূত নয়।'

ইয়াযদগিরদ পাত্রটি হাতে নিলো। পেয়ালাটে ছিলো খাঁটি সোনার তৈরী। এর চার পাশে ছোট হীরার কারুকাজ ছিলো। ইয়াযদগিরদ একবার পাত্রটির দিকে তাকালো। তারপর মেয়েটির রূপে মোড়ানো সুন্দর চেহারাটির দিকে তাকালো। পাত্র আর মেয়েটির মধ্যে কার রূপ বেশি ইয়াযদগিরদ যেন এরই তার নিরীক্ষণ করছে। আচমকা পাত্রটি তার দু'হাতে ওপরের দিকে তুলে পুরো শক্তি দিয়ে মেয়েটির মাথা সই করে ছুঁড়ে মারলো। এক টগবগে যুবকের সর্বশক্তি ব্যয়ে এমন ভারী একটি পাত্রের আঘাতে একটি মেয়ের মাথা ফেটে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো। তাই হলো। মেয়েটির মাথা একবার দুলে উঠলো। তারপর হাটু মুড়ে একদিকে ধপাস করে পড়ে গেলো। মাথা থেকে রক্তের ঝর্ণা ছুটলো যেন। রেশমের কার্পেটটি মুহূর্তেই খুনে রাঙা হয়ে উঠলো।

ঃ 'বেহুঁশ হয়ে গেছিস ইযদী!' – নাওরীন উঠে দাঁড়িয়ে তার ছেলের কাঁধ খামচে ধরলো এবং জোরে ঝাঁকি দিয়ে বললো– 'এই হতভাগীর ভালোবাসার এই প্রতিদান দিলি?'

ঃ 'তোমারও এই প্রতিদানই পাওয়া উচিত ছিলো মা!' – ইয়াযদগিরদ এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো– 'তোমার ভাগ্য ভালো তুমি আমার মা। যখন আমার সজাগ হওয়া উচিত এই মেয়ে তখন আমাকে মদ পান করাচ্ছে। শাহী মহলের অন্দরে সুন্দরী মেয়ের অভাব নেই। সেখানে তুমি এই মেয়েকে বিশেষভাবে নিয়ে এসেছো। আজ সব পরিষ্কার হয়ে গেলো – তুমি এই মেয়েকে শিখিয়ে পরিয়ে দিয়েছো সে যেন সবসময় আমাকে নেশাগ্রস্ত করে রাখে, তার কমনীয় দেহ আর রূপ দিয়ে আমাকে যেন অচেতন করে রাখে। তুমি সবসময় এই চেষ্টাই করেছো যে, আমি যেন মহলে সবসময় বন্দী থাকি এবং কখনো রণাঙ্গনের নাম না নিই।'

যুদ্ধের খবর নিয়ে আসা ফৌজী অফিসারটি সেখানে দাঁড়িয়েছিলো।

ঃ 'তুমি তোমার দায়িত্ব শেষ করেছো' – ইয়াযদগিরদ তাকে বললো– 'এই মেয়ের পায়ে ধরে হেচড়াতে হেচড়াতে বাইরে নিয়ে ফেলে দাও। কাউকে বলে দাও হুঁশ ফিরলে সে যেন তার ঘরে ফিরে যায়। আর মরে গেলে যেন লাশ তার মা বাবার কাছে বুঝিয়ে দিয়ে আসে।

ঃ 'এমন নির্দয় হসনি ইযদী!' নাওরীন বললো– 'এই সালতানাতকে এর বাদশাহ ও এর জেনারেলদের পাপই খেয়েছে। একদিন না একদিন এই সালতানাত ধ্বংস হতোই, ডুবতোই। তোকে আমি ডুবন্ত দেখতে চাই না।'

ঃ 'ভুলে যেও না মা! – ইয়াযদগিরদ হিসহিসিয়ে বললো– 'ভুলে যেও না জনগণ আমাকে তোমার বন্দীখানা থেকে কেন মাদায়েন নিয়ে এসেছিলো...শুধু কিসরার এই মহান সালতানাতের মর্যাদা রক্ষার জন্য। আমি জানি তুমি কি চাও। তুমি আমাকে আবার সেই বন্দীখানায় নিয়ে যেতে চাও যেখানে আমার জীবনের ষোল সতের বছর অপচয় হয়েছে। কিন্তু আমি চাই না ইতিহাসের কালো ভাষণ সারা দুনিয়াকে সবসময় এ কথা শুনিয়ে যাক যে, ফারসী ফৌজ পরাজিত হওয়ার পর ইয়াযদগিরদ তার মাকে নিয়ে পৃথিবীর কোন এক অজ্ঞাত কোণায় গিয়ে পালিয়েছিলো... আমাকে

পুরুষ করে জন্ম দিয়েছো মা! আমার পথে আর কাঁটা হয়ো না। মাদায়েনকে বাঁচানো আমার পবিত্র দায়িত্ব।'

ইয়াযদগিরদ তার মাকে সাধারণ এক মহিলা প্রজার মর্যাদায় নামিয়ে নির্দেশ দিলো তাকে যেন তার ঘরে বন্দী করে রাখা হয়।

ইয়াযদগিরদের কাছে পরাজয়ের খবর নিয়ে আসা সেই ফৌজী অফিসারের পেছন পেছন আরো একদল ঘোড়সওয়ার পালিয়ে এসেছিলো। তারা এসে মাদায়েনে প্রবেশ করলো। তাদের কেউ কেউ আহত ছিলো। লোকজনের সঙ্গে তারা কথা বলছিলো ভীত কম্পিত গলায় ঃ

ঃ 'সব কেটে গেছে। কেউ বেঁচে নেই।'

ঃ 'রুস্তম মরেছে। বাহমন জাদাবিয়া নিহত হয়েছে। জালিয়ুনুসও। কেউ নেই।'

ঃ 'আর সব জেনারেলরা কোথায় গেলো! পালিয়েছে।'

ঃ 'আরবরা মানুষ নয়...হিংস্র প্রাণী...।'

ঃ 'হায়! চোখের সামনে আমাদের হাজার হাজার সঙ্গী ডুবে গেলো।

ঃ 'নিজেদের বাঁচাও...ওরা তো এলো বলে...।'

ঃ 'নিজেদের ধন-দৌলত তাড়াতাড়ি লুকাও।'

তারা এমন করে বলছিলো মনে হচ্ছিলো মুসলমানরা সত্যি সত্যিই রক্তপায়ী হিংস্র প্রাণী এবং তারা ফারসীদের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে সমস্ত ফৌজকে চিড়ে ফেড়ে শেষ করে দিয়েছে। নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য এ ধরনের আরো অনেক কথা মাদায়েনবাসীদের বুঝাচ্ছিলো এসব পালিয়ে আসা পারসিকরা।

সারা শহরে পরাজয়ের খবর ছড়িয়ে পড়লো। লোকদের মধ্যে ভয়ের কম্পন শুরু হয়ে গেলো। মাদায়েনের অধিকাংশই সম্পদশালী ছিলো। যাদের ঘরে হীরা, জওহর, স্বর্ণ ও রূপার মজুদ ছিলো এবং যাদের যুবতী কন্যা ছিলো, তারা তাদের অর্থ-সম্পদ ও যুবতী কন্যাদের নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিলো।

শহরের কয়েকজন সরদার গোছের সম্ভ্রান্ত লোক তখন শাহী মহলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তাদেরকে দেখে শহরের সাধারণ লোকেরা সেখানে জমায়েত হলো। তারা সবাই দাবী তুললো– তাদেরকে অবশ্যই এই নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, মাদায়েন রক্ষার যথেষ্ট প্রতিরক্ষা শক্তি এখনো মাদায়েনে টিকে আছে।

খবর পেয়ে ইয়াযদগিরদ বাইরে বেরিয়ে এলো। এলাকার সম্ভ্রান্ত লোকেরা লোকদেরকে শান্ত করলো এবং নিচু স্বরে ইয়াযদগিরদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলো।

ঃ 'আমাদের ফৌজের পরাজয় ঘটেছে একথা কে তোমাদেরকে বলেছে?' – ইয়াযদগিরদ ভীড়ের দিকে লক্ষ্য করে বললো।

জবাব দিলো ঐ সব অভিজাতরা। কাদিসিয়া থেকে কিছু ফৌজ এসেছে যাদের মধ্যে কয়েকজন যখমীও আছে। তারাই এই কথা বলে লোকদেরকে আতংকিত করে তুলছে।

ইয়াযদগিরদ নির্দেশ দিলো– কাদিসিয়া থেকে যেসব ফৌজ মাদায়েন এসেছে তাদেরকে বন্দী করে কয়েদখানায় বন্দী করো। আর যারা এর পর কাদিসিয়া থেকে পালিয়ে এখানে আসবে তাদেরকে শহরের বাইরে আটকে রেখে এই হুকুম শুনিয়ে দাও যে, শহরের লোকদের যেন কাদিসিয়ার কোন কথা না শোনায়। যারা শহরে ভীতি ছড়াবে তাদেরকে কয়েদখানার শাস্তি দেয়া হবে।

ঃ ...'আর হে শহরবাসীরা! ইয়াযদগিরদ বড় আওয়াজে বললো– 'তোমাদের শহর থেকে পালিয়ে যাওয়াই কি আরবদেরকে পরাজিত করার কৌশল?... কোথায় যাবে? যেখানেই যাবে দুশমন সেখানে ঠিকই পৌছে যাবে। পিছু ধাওয়া করা হয় তাদেরকেই যারা পালায়। আর যারা বুক পেতে লড়াই করে তারা দুশমনকে শুধু প্রতিহতই করে না পালিয়ে যেতেও বাধ্য করে। তখন দুশমন সেই এলাকা থেকে পালিয়ে তবেই দম নিতে পারে...'

'...যরথুষ্টের কসম! আরবদের তোমরাও পালাতে বাধ্য করবে। সেটা তো যুদ্ধের ময়দান। যেখানে জয় পরাজয় উভয়টাই হতে পারে। কিন্তু যে কোন যুদ্ধের আসল ফয়সালা হয় সে দেশের শহরে। আর কোন শহরই অবরোধের বাঁধা সফলতার সঙ্গে দূর করা ছাড়া জয় সম্ভব নয়। তোমরা না পালিয়ে দুশমনের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নাও। তোমাদেরকে আমি এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি। আরবরা কখনো মাদায়েন পর্যন্ত পৌছতে পারবে না। দুশমন এখনো কাদিসিয়াতেই আছে। মাদায়েন পর্যন্ত কয়েক স্থানেই আমাদের ফৌজ রয়েছে। আর আছে দজলা নদী। দুশমন দজলা পর্যন্ত যদি পৌছেও যায় তবে পুলটি ভেঙে দেয়া হবে এবং সেখানে একটি নৌকাও রাখা হবে না। এসব ছাড়া আরবরা নদীই বা পার হবে কি করে? ...যাও, নিজেদের ঘরে যাও, যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকো। আর বাকীটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

মাদায়েনবাসীদের ইয়াযদগিরদ যেন ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললো। মুসলমানদের ভয় তাদের মন থেকে অনেকখানি নামিয়ে দিলো। এমন ভাষায় তাদেরকে উজ্জীবিত করে তুললো যে, যারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তার কাছে এসেছিলো সেই তারাই উদ্দীপিত সুরে শ্লোগান দিতে দিতে এবং বুক উচিয়ে নিজেদের ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

ইয়াযদগিরদ সেখান থেকে মহলের দিকে যাচ্ছিলো। পথে সাবেক পারস্য সম্রাজ্ঞী পুরান দখত চলে এলো। শাহীমহলের রক্ষীরা তাকে সংবাদ দেয় যে, কাদিসিয়ায় পারসিকরা বড় শোননীয়ভাবে হেরেছে এবং জেনারেলরা সবাই ময়দান ছেড়ে পালিয়েছে। আর কিছু মারা গেছে। এটা শুনতেই পুরান ইয়াযদগিরদকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে চলে আসে।

বয়সে ইয়াযদগিরদ পুরানে চেয়ে অনেক ছোট ছিলো। সম্পর্ক ছিলো তাদের সতালো ভাইবোনের। নিজের দেশ নিয়ে ইয়াযদগিরদের মধ্যে যে তীব্র টান ছিলো পুরানের মধ্যেও তা ছিলো। পুরান ইয়াযদগিরদের সামনে গিয়েই তাকে জড়িয়ে ধরলো। ইয়াযদগিরদ এমন আবেগসিক্ত ছিলো যে, তার চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এলো।

ঃ 'পুরুষ হও ইযদী!' – পুরান বললো– 'বিজয়ের পর এমন আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত হতে নেই এবং পরাজয়ের পরও এমন হতাশ ও ভেঙে পড়তে নেই। তুমি একা নও। আমরা সবাই তোমার সঙ্গেই তো আছি।'

ঃ 'কিন্তু আমাদের কাছে আর রইলোই বা কি?' – ইয়াযদগিরদ নিজেকে সামলে নিয়ে বললো– 'যে পরিমাণ ফৌজ সমাবেশ ঘটানো যায় আমি তাই করেছি এবং তাদেরকে রণাঙ্গনে পাঠিয়েছি। আমার সবচেয়ে বড় পেরেশানী হলো এমন উন্নত অস্ত্রশস্ত্রধারী এবং এত বড় ফৌজ শুধু চল্লিশ হাজার লোকের কাছে কিভাবে পরাজিত হলো?'

ঃ 'এটা এখন ভেবে লাভ নেই' – পুরান বললো– 'এই পরাজয়ের সব দায়দায়িত্ব একমাত্র রুস্তমের ওপরেই বর্তায়। তোমার কি মনে নেই লড়াইয়ে যেতে রুস্তম কতটা সময় বিলম্ব করেছে? তুমিই না তাকে ভালো মন্দ বলে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য তৈরী করেছো।'

কথা বলতে বলতে দু'জন মহলে ঢুকলো। পুরানকে ইয়াযদগিরদ তার ঘরে নিয়ে গেলো। নাওরীন সেখানেই ছিলো।

ঃ 'পুরান!' – ইয়াযদগিরদ বললো– 'আমার মাকে সামলাও। তাকে বোঝাও যে, এই সিংহাসনে বসে এবং পারস্যের মুকুট আমার মাথায় ধারণ করে আমি আর তার একার পুত্র হয়ে রইনি। আমি এখন পারস্যের সন্তান। এই পারস্যই আমার মা। আমার রক্তের প্রতিটা ফোটা পারস্যের আবরু রক্ষার জন্য উৎসর্গীত। আমার পূর্বসূরীদের মতো নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীদের হত্যা করে এই সিংহাসন আমি দখল করিনি। জনগণ আমাকে এখানে বসিয়েছে। অনেক প্রত্যাশা নিয়েই তারা আমাকে বসিয়েছে।'

ঃ 'এসব কথা এখন থাক ইযদী!' – পুরান বললো– 'এসব এখন আমার ওপর ছেড়ে দাও। এখন ভাবনার আরো অনেক জরুরী বিষয় আছে। তুমি জানো আমার দু'হাজার ঘোড়সওয়ারের এক প্লাটুন সৈন্য সিবাতে রয়েছে। এটাও নিশ্চয় জানো আমার এই দলটি লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেনি। এখন আমি এই বাহিনীকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবো। কিন্তু মুসলমানদেরকে এগিয়ে আসতে দাও। সিবাতের পথ দিয়েই তাদের আসতে হবে। আমি আমার বাহিনীকে নির্দেশ পাঠিয়ে দেবো মুসলমানদের কখন কোথায় বাঁধা দিতে হবে।'

পুরানের এই দুই হাজার ঘোড়সওয়ার অত্যন্ত কঠিন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্যদল ছিলো। ফৌজের বাছাই করা আত্মত্যাগী এবং দুর্ধর্ষ সওয়ারদের এতে নেয়া হয়েছিলো। এই বাহিনীর সঙ্গে ছিলো একটি পালিত হিংস্র বাঘ। পুরানের বাহিনীর সঙ্গে তো বাঘটির দারুণ ভাব ছিলো। কিন্তু শত্রুর জন্য ছিলো সেটা সাক্ষাৎ যমদূত। দুশমনের ওপর কিভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে একে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিলো।

প্রতিদিন সকালে বিশেষ একটি জায়গায় এই ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে যুদ্ধের কঠিন সব কৌশল প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। তারপর এক ধর্মীয় নেতা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে উঁচু আওয়াজে একটি অঙ্গীকারনামা সবাইকে পাঠ করাতো। প্রতিটি ঘোড়সওয়ার দৃঢ় কণ্ঠে

তা উচ্চারণ করতো। তাদের অঙ্গীকার ছিলো– যতদিন এই বাহিনী থাকবে পারস্যের পতন ঘটতে দেবে না তারা। পারস্যের সুউচ্চ মর্যাদা তারা চিরদিন সমুন্নত রাখবে। তাদের দৈনন্দিন কর্মসূচীর শুরু এই অঙ্গীকারনামা দিয়ে শুরু হতো। এদেরকে বলা হতো কিসরার 'শাহী বাহিনী'।

ঃ 'আমার আফসোস হচ্ছে রুস্তম নিহত হয়েছে বলে' – ইয়াযদগিরদ বললো– 'তার মতো এমন যুদ্ধনেতা খুব কমই পাওয়া যাবে।'

ঃ 'না ইযদী!' – পুরান বললো– 'তার মৃত্যুতে আমার এতটুকু দুঃখও হচ্ছে না। আমি একটি ভুল করেছিলাম। পারস্যকে বাঁচাতে রুস্তমের হাতে সব ক্ষমতা আমি দিয়ে দিয়েছিলাম। গভীরভাবে আমি লক্ষ্য করে দেখেছি এই লোকের চোখ ছিলো সবসময় পারস্যের রাজসিংহাসন ও মুকুটের দিকে। নারীদের প্রতি তার দুর্বলতা ছিলো ভীষণ। এটা বলতে আমি মোটেও লজ্জাবোধ করবো না যে, সবসময় সে আমাকে তার সঙ্গে রাখতো। প্রায় প্রতি রাতেই সে আমাকে আমার কামরায় যেতে দিতো না। যা ইচ্ছা তাই করতো আমাকে নিয়ে। পারস্যের মুকুট তার মাথায় ধারণের জন্যই কেবল সে জীবিত থাকতে চাইতো। সে যাক, ভালো ছিলো কি মন্দ ছিলো তা বলা এখন অর্থহীন। সে মরে গেছে। মৃতের জন্য অশ্রু ঝরানোর সময় নেই এখন। এখন ভাবনার বিষয় হলো আমরা যারা জীবিত আছি তাদের কি করা উচিত। তুমি একাই কেন শোকতপ্ত হবে! এখনো তুমি সদ্য যুবক। আমরা যা দেখেছি তুমি তা দেখোনি। এখন থেকে আমি আর তোমাকে একা থাকতে দেবো না।'

তারপর থেকে পুরান দিন রাত ঘোড়া নিয়ে শহরের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে লাগলো এবং ইরাক ও পারস্যকে রক্ষার জন্য লোকদেরকে উজ্জীবিত করতে লাগলো। মাদায়েন ছোটখাট একটি দেশের চেয়ে বড় শহর ছিলো। পুরান ঘোড়ায় চড়ে কোন এক স্থানে গিয়ে দাঁড়াতো আর লোকেরা তার আশে পাশে এসে ভীড় করতো। পুরান অত্যন্ত জ্বালাময়ী ভাষায় আত্মত্যাগের জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে আসতো।

পরদিন।

ইয়াযদগিরদকে খবর দেয়া হলো ধবধবে সাদা চুলো এক অশীতপর বৃদ্ধ তার সাক্ষাতে এসেছে। ইয়াযদগিরদ বৃদ্ধকে ভেতরে নিয়ে আসতে বললো। বৃদ্ধের শুভ্র দাঁড়ি রুপার পালঙ্কের মতো ঝলমল করছিলো। ফিনফিনে দাঁড়িতে আবৃত তার চেহারা ছিলো গৌড় বর্ণের এবং চোখের মণি দুটি ছিলো সবুজ বর্ণের। চেহারা এমন বৈশিষ্ট্যময় ছিলো যে, এক নজর তার দিকে তাকালেই যে কেউ আকৃষ্ট হয়ে পড়তো। মাথায় জড়িযুক্ত কাপড়ের গোল টুপি এবং কালো একটি আলখেল্লা তিনি পরেছিলেন। এক হাতে ছিলো তার একটি ঋজু লাঠি। অন্য হাতে পনের বিশটি দানার তসবীহ।

তিনি যে কোন ধর্মীয় নেতা ছিলেন এতে কোন সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু অগ্নিপূজারী ছিলেন না। অগ্নিপূজারী কোন পাদ্রীর পোষাক এ ধরনের ছিলো না। পারস্য সম্রাট

ইয়াযদগিরদের কাছে কোন অভ্যাগত আসলে তার সামনে এসে মাথা ঝুঁকিয়ে রুকু করতো। তারপর তাকে সালাম করতো। কিন্তু ইয়াযদগিরদ নিজেই এই বৃদ্ধকে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানালো।

ঃ 'হে পবিত্র পিতা!'–ইয়াযদগিরদ বললো– 'আপনি নিশ্চয় ইহুদী....আপনার উপাসনালয়ে আমাদের পক্ষ থেকে কোন বিঘ্ন ঘটছে না তো?'

ঃ 'না শাহেনশাহে ফারেস!' – ইহুদী পাদ্রী বললেন– 'আমি আমার বাড়িতেই উপাসনালয় বানিয়ে নিয়েছি। এখানে ইহুদীদের সংখ্যাই বা কত যে, আলাদা উপাসনালয় নির্মাণ করা হবে! প্রয়োজন আমার ঘরেই সেরে নিই। আপনার প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা কোন অসুবিধায় নেই।'

ঃ 'পবিত্র পিতা!' – ইয়াযদগিরদ বললো– 'আপনি সম্ভবতঃ আমাদের পরাজয়ের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে এসেছেন...আমাদের বিজয়ের জন্য কি আপনি দুআ করেন না?'

ঃ 'প্রতিদিনই আমরা আপনার জন্য দুআ করি' – ইহুদী পাদ্রী বললেন– 'আমরা আপনার অনুগত এবং আমাদের মাতৃভূমি ইরাক। আপনি অনুমতি দিলে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে এসেছি। আমার কোন কথা আপনার ভালো নাও লাগতে পারে।'

ঃ 'পারস্যের জন্য কল্যাণমূলক যাই বলুন না কেন আমার কোন কথাই খারাপ লাগবে না' – ইয়াযদগিরদ বললো– 'আপনি তো যুগের অনেক সিঁড়ি ভেঙে এসেছেন। জানিনা যুগের কত রং কত বর্ণ–খেলা আপনি দেখেছেন। আপনিই বলতে পারবেন। আমি জানতে চাই অতি সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মাত্র চল্লিশ হাজার লোক অতি উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এক লাখ বিশ হাজার সৈন্যকে সম্মুখযুদ্ধে কি করে পরাজিত করতে পারে। এই আরবীরা এমন হিংস্র হাতির পালগুলোকেও কেটে কেটে নদীতে ডুবিয়ে মারলো। এটাও আমার বুঝে আসছে না যে, রুস্তম কি করে মারা গেলো?'

ঃ 'যুদ্ধের সবই আমি জানি' – পাদ্রী বললেন– 'শুধু কাদিসিয়াই নয়, মুসলমানরা এখানে এসে যতগুলো লড়াইয়ে লড়েছে তার সবই আমি বলে যেতে পারবো। গত দু'তিন দিনে আমি কাদিসিয়ার সব কথা জেনে নিয়েছি...রুস্তম ভাগ্য আর নক্ষত্রচক্রে পড়ে গিয়েছিলো এবং কুষ্ঠি ও শুভাশুভ লক্ষণ বের করে সে সবাইকে তার ভবিষ্যদ্বাণী শোনাতো। তার ভবিষ্যদ্বাণী ছিলো সালতানাতে ফারেসের পরিণতি ভালো হবে না...'

'এই ভবিষ্যদ্বাণী সারা ফৌজে ছড়িয়ে পড়লো। এর যে ফল হওয়ার কথা ছিলো তা তো আপনি দেখেছেনই। আমাদের ফৌজ পালিয়েছেও এজন্য যে, পারস্যের ভাগ্য তো খারাপ হবেই, তাহলে আমরা কেন আমাদের প্রাণ খোয়াতে যাবো?'

ঃ 'আপনি কি বলতে চাচ্ছেন রুস্তমের ভবিষ্যদ্বাণী ভুল ছিলো?' – ইয়াযদগিরদ আশান্বিত গলায় জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'অবশ্যই ভুল ছিলো!' – পাদ্রী বললেন– 'আপনার কি মনে নেই যুদ্ধে যেতে সে কেমন আনমনা ছিলো? আপনি তাকে ভালো মন্দ বলে তার সঙ্গে এমন কঠোর আচরণ

না করলে সে কিছুতেই যেতো না। আপনি যখন নিজে ফৌজ নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে যাবেন বলে হুমকি দিলেন সে তখন ভাবলো, এমন হলে তো পারসিকরা তার বিরুদ্ধে চলে যাবে; তাই সে ফৌজ নিয়ে বের হয়ে গেলো। কিন্তু সে একদিনের পথ অতিক্রম করলো চার মাসে। শেষ পর্যন্ত কাদিসিয়ায় যখন পৌছলো তখন মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি ও সমঝোতার আলোচনা শুরু করে দিলো...'

'সে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলো যে, পারস্যের পরিণতি ভালো হবে না–এটা আসলে ছিলো তার মনের ভাষা। এজন্যই সে লড়তে চাইতো না। লড়াইয়ে পরাজয়ের আশংকা যেমন ছিলো তেমনি ছিলো নিজের কোতল হওয়ার আশংকা। পারস্য নয় তার আকর্ষণ ছিলো নিজেকে নিয়ে। নিজের ব্যাপারে সে অন্ধ ছিলো। সে অনেক যুদ্ধে লড়েছে ঠিক। কিন্তু এজন্য সে এর প্রতিদান পেতে চাচ্ছিলো। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সে নিজেকে পারস্যের সম্রাট ভেবে নিয়েছিলো। তার এই অভিলাষ আর মোহই তাকে এই ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য বাধ্য করেছিলো যে, পারস্যের ভাগ্য বড় মন্দ....'

'আপনি জিজ্ঞেস করেছেন, সামান্য সংখ্যক মুসলমান কি করে এত বড় ফৌজকে পরাজিত করলো! কারণ একেবারেই পরিষ্কার। মুসলমান একটি ধর্মে বিশ্বাস করে। তারা তাদের ভাগ্য নক্ষত্রের ঘূর্ণনে ছেড়ে দেইনি বরং নিজেদের হাতেই তারা তাদের ভাগ্য গড়ে নেয়। তাদের মনে আল্লাহ ও মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নির্জলা ভালোবাসা ও বিশ্বাসের সমর্থন আছে, যাকে তারা আল্লাহর রাসূল বলে মান্য করে। রুস্তমের অবলম্বন ছিলো তার নিজের অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব। কিন্তু মুসলমানরা নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থের ব্যাপারে সম্পূর্ণই উদাসীন...'

'আমি আপনাকে একটি গোপন কথা বলতে চাচ্ছি। মুসলমানদের সঙ্গে আপনারা লড়ছেন তো এজন্য যে, তারা যেন এদেশ দখল করে না নেয়। কিন্তু মুসলমানদের সাথে আমাদের লড়াই ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে। আপনারা রণাঙ্গনে লড়াই করেন। কিন্তু আমরা জমিনের নিচ থেকে তাদেরকে আঘাত করি। আমাদের লোকেরা নানান বেশ ধারণ করে কোন নেতৃস্থানীয় মুসলমানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। নজর কাড়া সুন্দরী যুবতীদের দিয়ে জাল বিস্তার করে তাদের পাশার দানার মতো ব্যবহার করা হয়। পুরুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো সুন্দরী নারী। এই দুর্বলতাটুকুই কাজে লাগাতে আমরা চেষ্টা করেছি। কিন্তু এতে আমরা সফল হইনি। যেখানেই আমরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছি, সেখানেই আমাদের মেয়েরা হয় মুসলমানদের নির্মল চরিত্রে প্রভাবান্বিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে না হয় তাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গেছে এবং তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে অথবা তাদের সঙ্গে যে দু' একজনকে মুসলমান বেশে পাঠানো হয়েছে তারা নিহত হয়েছে।'

তাদের রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন জীবিত ছিলেন তখনকার ঘটনা। মক্কার কাফেররা মদীনায় হামলা করতে আসলে মুসলমানরা মদীনার আশেপাশে পরিখা খনন করে। এতে কুরাইশরা মদীনার বাইরে আটকে যায়। আমি তখন সেখানে ছিলাম না অবশ্য। আমাদের অনেক ইহুদী মদীনায় ছিলো। তারা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে আনুগত্যের ধোকা দিলো। তিনিও তাদেরকে বন্ধু মনে করে

তাদেরকে মদীনায় থাকার অনুমতি দিয়ে দিলেন। খন্দকের যুদ্ধ শুরু হলে মুসলমানরা তাদের নারী ও শিশুদের বড় একটি দালান বাড়িতে নিয়ে তুললো। যাতে কুরাইশরা রাতে পরিখার কোন স্থান টপকে এসে পড়লেও নারী ও শিশুরা হেফাজতে থাকে...।'

'ইহুদীরা তাদের এক লোককে তলোয়ার দিয়ে সেই দালান বাড়ির দিকে পাঠিয়ে দিয়ে তাকে নির্দেশ দিলো, সে যেন এর ভেতরে গিয়ে দু' একজন নারী বা শিশুকে হত্যা করে পালিয়ে আসে। এতে নারী ও শিশুরা চিৎকার চেচামেচি হট্টগোল শুরু করে দেবে এবং এই শোরগোলে মুসলমানরা সব পরিখা ছেড়ে সেই বাড়ির দিকে ছুট দেবে। এই সুযোগে কুরাইশরা পরিখার কাছে চলে যাবে। পরিখা টপকানো খুব সহজ কাজ নয়। কিন্তু এমন কয়েকটি জায়গা ছিলো যেখানে পরিখা ছিলো না। মুসলমানরা খুব মজবুত প্রতিরক্ষা গড়ে তুলেছিলো। আমাদের সেই লোকটি যদি সফল হতো কুরাইশরা সেদিন মদীনায় ঢুকে পড়তো। কিন্তু এক মুসলমানের সন্দেহ হলে সেখানেই তাকে হত্যা করে দেয়া হলো। হত্যাকারী কোন পুরুষ ছিলো না। সে ছিলো মুসলিম নারী। সেই মহিলা ছিলো মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ফুপী। ইহুদীরা এর পরও থেমে রইলো না। কুরাইশদের যথাসাধ্য মদদ দিয়ে গেলো এবং মুসলমানদের পরাজিত করার সবরকম চেষ্টা করলো। এসব ছিলো সব গোপনে গোপনে। তারপরও মুসলমানদের কাছে তা ফাঁস হয়ে গেলো। এই ষড়যন্ত্রের অপরাধে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানকার সব ইহুদীকে হত্যা করলেন। তারপরও যেখানেই ইহুদীরা ছিলো মুসলমানদের পিঠে ছুরি মারার কোন সুযোগই হাতছাড়া করেনি।'

ঃ 'পবিত্র পিতা!' – ইয়াযদগিরদ বললো– 'আপনার সব কথাই আমি বুঝতে পেরেছি। আগ থেকেই আমি জানতাম মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু যদি কেউ থেকে থাকে তাহলে তারা হলো ইহুদী জাতি। আমাকে আপনার আর বেশি কিছু বলতে হবে না। এখন প্রয়োজন হলো মুসলমানদের কি করে প্রতিহত করা যায় তা ভেবে বের করা। দজলা পার হয়ে যাতে তারা এপারে না আসতে পারে।'

ঃ 'হ্যাঁ শাহেনশাহে ফারেস' – পাদ্রী বললেন– 'আমি এখানে এসেছি এজন্য যে, কিভাবে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা রোখা যায় তার কৌশল বের করতে। আপনাকে আমি বলেছি যে, পুরুষের যে দুটি দুর্বলতার সুযোগ নেয়া যায় তা নিতে গিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। এক হলো মদ, আরেক হলো নারী। যুদ্ধ করে মুসলমানরা মালে গনীমত হিসেবে সবকিছুই জমা করে; কিন্তু মদ যতই দামীই হোক না কেন তারা তা ফেলে দেয়। মদের পাত্রও তারা ছুঁয়ে দেখে না। যুদ্ধে নারীদের তারা বন্দী করে মদীনায় নিয়ে যায়। কিন্তু তাদের উপযুক্ত তারাই হয় যারা তাদেরকে যথারীতি বিয়ে করে নেয়। আমাদের কাছে এখন একটা জিনিসই আছে, তাহলো জাদু। তাই এখন আমরা এটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই। কিন্তু এর জন্য যেসব জিনিস প্রয়োজন তা সংগ্রহ করতে এবং তা নিয়ে ধ্যান ইত্যাদি করতে অনেক দিন সময়ের দরকার। যদি আপনি এসব জিনিস জোগাড় করিয়ে দিতে পারেন তবে আমি এমন জাদু করবো যে, মুসলমানদের সালার ও সিপাহসালার অন্ধ হয়ে যাবে। চোখই শুধু অন্ধ হবে না, বরং তাদের বুদ্ধিও অন্ধ হয়ে যাবে।'

ঃ 'এখনই বলুন' – ইয়াযদগিরদ তাড়া দিলো– 'কি কি জিনিস আপনার চাই'।

ঃ 'আনকোড়া একটি যুবতী মেয়ে' – বুড়ো পাদ্রী বললেন– 'নবজাতক একটি শিশু, দুই বা তিন দিনের অধিক বয়স হলে চলবে না...দুটি পেঁচা...এসব জীবন্ত বস্তু। আর অন্যান্য জিনিস আমি নিজেই যোগাড় করে নেবো!

ইয়াযদগিরদ তখনই হুকুম দিলো এসব জিনিস যেন খুব দ্রুত ইহুদীর উপাসনালয়ে পৌছে দিয়ে আসে।

ইহুদী পাদ্রী চলে গেলো।

একদিকে ছিলো যেমন ইহুদীদের জাদুর কৌশল অন্যদিকে ছিলো তেমনি মুসলমানদের অব্যাহত সাফল্য। যা জাদুর কারিশমাকেও হার মানাচ্ছিলো। কাদিসিয়ার যুদ্ধের শুরুতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো চল্লিশ হাজার। পরে আরো ছয় হাজার সৈন্য সাহায্যের জন্য যোগ দিয়েছিলো। কিন্তু এর মধ্যে আট নয় হাজার শহীদ হয়ে যায়। আহতের সংখ্যা ছিলো অগণিত। যার অর্ধেকেই লড়াইয়ের জন্য অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছিলো। তারপরও তারা মাদায়েনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো অবিশ্রান্তভাবে। তারা যে এবার ব্যর্থ হবে স্পষ্টতই তা চোখে পড়ছিলো।

উমর (রা) সাদ (রা)কে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন, যে পর্যন্ত তার পরবর্তী নির্দেশ না পৌছবে সে পর্যন্ত মুসলিম ফৌজ যেন কাদিসিয়াতেই থাকে। তবে ছোট ছোট সেনাদল যেন ময়দানের পথে বিভিন্ন জায়গায় অভিযানে নিয়োজিত রাখে। যাতে পারসিকরা কোথাও একত্রিত হতে না পারে।

এভাবে দু' মাস কেটে গেলো। এই দুইমাস সাদ (রা) ও উমর (রা) এর মধ্যে নিয়মিত পত্র আদান প্রদান হয়েছে। দু'মাস যেদিন পূর্ণ হলো সাদ (রা) সেদিন হঠাৎ অনুভব করলেন তার ব্যথা চলে গেছে। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। অবিশ্বাস্য পায়ে কামরায় একটুক্ষণ হাঁটলেন। না, কোন ব্যথা অনুভব করলেন না। তিনি তার পুরো শরীর ঝাকাতে শুরু করলেন। অবিশ্বাস আর বিশ্বাসের দোলায় তিনি যেন কেঁপে উঠলেন। মহল থেকে নামলেন। ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। কয়েক চক্কর ঘুরেও এলেন। কোন ব্যথা, অস্বস্তি কিছুই অনুভব করলেন না। আনন্দে সালমার চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এলো। লড়াইয়ের জন্য সাদ (রা) তৈরীও হয়ে গেলেন। একটু পর সাদ (রা) ও সালমাকে সিজদায় পড়ে থাকতে দেখা গেলো।

***'ইহুদীদের বিস্তার করা জাল থেকে বের হও ইযদী!' আমি জানি ইহুদীরা জাদুবিদ্যায় অতি দক্ষ। কিন্তু এই বাচ্চা যে মায়ের সে মায়ের কাছে ওকে ফিরিয়ে দাও। এক মায়ের আহাজারীর অভিশাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করো।'***

দেশ প্রেমে পাগল দিওয়ানা সম্রাট ইয়াযদগিরদ শাহী মহলের বাইরে পঞ্চাশ ষাটজন রক্তাক্ত লোকের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো। এরা সবাই ছিলো আহত। লড়াইয়ের সব ক্ষমতাই তাদের চলে গিয়েছিলো। বড় কষ্টে এরা মাদায়েন পৌছেছিলো কাদিসিয়া

থেকে। ইয়াযদগিরদ তাদেরকে ডেকেছিলো কাদিসিয়া যুদ্ধের বিস্তারিত সব শোনার জন্য। তাদের যে কেউ কথা বলছিলো– কম্পিত স্খলিত স্বরে বলছিলো।

ঃ 'তোমরা কি আমাকে ভয় করছো না কি এখনো তোমরা আরবদের ভয়ে শংকিত?' – ইয়াযদগিরদ তাদের কথা শুনে জিজ্ঞেস করলো।

কেউ কিছু বললো না। ইয়াযদগিরদ শাহী মেজাযে প্রশ্নটি দ্বিতীয়বার ছুঁড়ে দিলো।

ঃ 'হ্যা শাহেনশাহ।' – তাদের একজন বললো– 'আমরা আপনাকেও ভয় পাচ্ছি এবং আমাদের মনে আরবদের আতংকও বিরাজ করছে। আমি তো বলবো আরবদের কাছে নিশ্চয় কোন জাদু আছে। তারা সংখ্যায় এত কম ছিলো যে, আমাদের ফৌজের মধ্যে তাদের কোন অস্তিত্বই দেখা যাচ্ছিলো না। কিন্তু লাশ হয়ে পড়তে দেখা গেলো যাদের তারা সব আমাদেরই লোক। আমাদের পাঁচশ বাছাই করা জানবায সৈন্য আরবদের ওপর নৈশ হামলা চালাতে গেলো। কিন্তু পথেই তারা আরবদের হাতে সাবাড় হয়ে গেলো। তারপর আমরা নির্দেশ পেলাম ভোর থাকতে থাকতেই আরবরা যখন প্রভাতকালীন নামাযে ডুবে থাকবে তখন হামলা করতে হবে। তাদের নামাযের সময় আমরা হামলা করতে গিয়ে দেখি তারা আমাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে। তারপর যে লড়াইয়ে কি হলো তা বলার সাধ্য আমার নেই।'

ঃ 'শাহেনশাহে ফারেস!' – এক বৃদ্ধ ফৌজী অফিসার বললো– 'প্রাণ ভিক্ষাও চাচ্ছি। আপনি কাপুরুষতার যে শাস্তিই আমাদের দেবেন তাও মাথা পেতে নেবো। কিন্তু এর আগে একটা কথা শোনার জন্য নিবেদন করছি। আপনার এই গোলাম অনেক যুদ্ধে লড়াই করেছে। কিন্তু এটাই প্রথম লড়াই ছিলো যাতে আমার মন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। এমন বিশ্বাসও আমার হতে লাগলো যে, আরবের এসব মুসলমানের মধ্যে নিশ্চয় কোন জাদু আছে। তারা নির্ভীক মনে অসম্ভব সাহসিকতায় লড়াই করেছে, এটা কোন জাদুর কারিশমা নয়। জাদু হলো লড়াই শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড এক ঝড় উঠে এলো। ঝড় এতো তীব্র ছিলো যে তাতে লড়াই সম্ভব ছিলো না। মুসলমানদের দিক থেকেই ঝড় আসছিলো...।

'ঝড় ধূলি বালির এমন বিশাল দেয়াল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো যার উচ্চতা ছিলো জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত। যখন ঝড় দিগন্ত জুড়ে ছেয়ে গেলো, মুসলিম লশকর থেকে উচ্ছ্বসিত শ্লোগান ভেসে আসতে লাগলো– 'আল্লাহর সাহায্য আসছে...আল্লাহর সাহায্য আসছে' – এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করলো ঝড় যে, বড় বড় গাছের ডালগুলো দুমড়ে মুচড়ে ফেলতে লাগলো। এর শো শো আওয়াজ এমন ভীতিপ্রদ ছিলো যে, আমাদের গায়ে রীতিমতো কাঁটা দিচ্ছিলো। মরুর সব ধুলোর কণা আমাদের চোখে জায়গা করে নিচ্ছিলো। ঘোড়াগুলোর চোখও আক্রান্ত হচ্ছিলো এবং ওগুলো দিগ্বিদিক ছুটে যাওয়ার জন্য লাফিয়ে উঠছিলো ঝড়ের কলজে কেড়ে নেয়া চিৎকার ধ্বনিতে।

ঃ 'আরবদের চোখে তো তখন ফুলচন্দন পড়েনি; ধুলোই পড়ছিলো' – ইয়াযদগিরদ ক্রুদ্ধ গলায় বললো– 'চোখ খুলতে পারছিলো না তাদের ঘোড়াগুলোও। সেগুলোও লাগাম ছিঁড়ে পালাতে চাইছিলো। শুধু তোমাদের জন্যেই ঝড় আসেনি।'

ঃ 'শাহেনশাহে ফারেস!' – বৃদ্ধ অফিসার বললো– 'আমি জানি আমার প্রাণ ভিক্ষা দেয়া হবে না। তাহলে যা আমি বলতে ভয় পাই তা কেন মুখে উচ্চারণ করবো না...সূর্যের কসম! আমি যার পূজারী। আরবের সালারদের চোখও ধুলোয় ধূসরিত হয়েছিলো। কিন্তু তাদের মস্তিষ্কের চোখ খোলা ছিলো। ঝড়ের সময় তারা ঘোড়া ব্যবহার করেনি। ঘোড়া থেকে নেমে সমস্ত ঘোড়সওয়ার পদাতিক সৈন্যদের মতো লড়েছে.....

'অথচ আমাদের জেনারেলরা শুধু ঝড় থেকে বাঁচার পথ খুঁজে বেড়িয়েছে। আর তাদের সালাররা পদাতিকদের মতো দৌড় ঝাপ করে লড়েছে। ওদিকে চলছিলো রাজকীয় তখতে বসে রুস্তমের হুকুম জারী। তার তাঁবু আপনার এই মহলের চেয়ে কম ছিলো না। শেষ পর্যন্ত কি হলো? তার কাপড়ের মহল ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেলো এবং রুস্তম মারা গেলো। তার হীরা মুক্তাখচিত তখত নিয়ে গেলো মুসলমানরা। শুধু আমিই নই, ফৌজের যারা বাঁচতে পারলো তাদের মধ্যে একটা আওয়াজই উঠতে লাগলো যে, মুসলমানদের কাছে জাদু আছে। এই জাদুর জোরেই এই ভয়াবহ ঝড় উঠিয়েছিলো তারা।'

পঞ্চাশ ষাটজন সৈন্য দাঁড়িয়েছিলো ইয়াযদগিরদের সামনে। সবার মুখে একই উচ্চারণ ছিলো কাদিসিয়ার লড়াইয়ের এই পরিণতি নিঃসন্দেহে কোন জাদুর কারিশমা।

ইয়াযদগিরদের ভেতরে যত আবেগ ও স্বপ্ন ছিলো তা ছিলো ইরাক ও পারস্যকে কেন্দ্র করেই। পারস্যের নামের মধ্যেই সে তার প্রাণের স্পন্দন পেতো। দেশের ভাবনা তাকে এক অপার্থিব শক্তির স্বাদ যোগাতো। কিন্তু আজ তার কানে শুধু বাজছিলো– 'এসব জাদু, এসব জাদু' – এটা ভাবতেই তার চেহারায় ফুটে উঠা যন্ত্রণার দগদগে জ্বালার ছাপ কেমন পাল্টে গেলো। তখনই সে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আহত সৈনিকদের চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলো। তারপর তার প্রধানমন্ত্রীর প্রতি মনোযোগ দিলো।

ঃ 'সেই ইহুদী পাদ্রী কিছু বলেছে'? – ইয়াযদগিরদ তার মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো– 'সে কি কিছু করতে পারবে? ...সে একটি যুবতী মেয়ে চেয়েছিলো। আরো সম্ভবতঃ দু'টি পেঁচার কথাও বলেছিলো'।

ঃ 'হ্যা শাহে ফারেস!' – মন্ত্রী বললো– 'জাদুবিদ্যায় ইহুদীরাই পারদর্শী। পুরাণ ও আপনার মুহতারামা আম্মিজান একটি মেয়ের ব্যবস্থা করছেন। ...শাহে ফারেস! আমি আপনার দাদার বয়সী। দুনিয়ার যে বৈচিত্র্য আমি দেখেছি তা আপনি দেখেনওনি শুনেনওনি। আমি ঐ আরবের মুসলমানদের এর আগেও ইরাকে দেখেছি। তখন তাদের সালার ছিলেন রণাঙ্গনের মহান নাম খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও মুসান্না ইবনে হারিসা। মাদায়েন তারা প্রায় নিয়েই নিয়েছিলো। তাদের খেলাফত যদি তখন এই দুই সালারকে সিরিয়ার রণাঙ্গনে পাঠিয়ে না দিতো তবে হয়তো আজ আমরা আরবদের গোলাম হয়ে থাকতাম।'

ঃ 'আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?' – ইয়াযদগিরদ অসহিষ্ণু গলায় বললো– 'এতো আমিও জানি, দুনিয়ার যে বৈচিত্র্য আপনি দেখেছেন যে রং আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন তা আমি দেখিনি। আমার অনেক আগে আপনি দুনিয়ায় এসেছেন...আমার পিতারও আগে...আমাকে বলুন আজ আমি যে দুনিয়ার রং দেখছি তাতে আমার কি করার আছে?'

ঃ 'হ্যা শাহেনশাহ!' – বৃদ্ধ মন্ত্রী বললো– 'আমি বলতে চাচ্ছি, আমি আরবদের তলোয়ারের তীক্ষ্ণতা আগেও দেখেছি এখনও দেখছি।'

ঃ 'সে তো আমিও দেখছি' – ইয়াযদগিরদ বললো।

ঃ 'আমি বলতে চাচ্ছি' – মন্ত্রী বললো– যেখানে তলোয়ারের তীক্ষ্ণধার ফৌজকে পালাতে বাধ্য করে সেখানে জাদু চলে না।

ঃ 'ইহুদী ধর্মজাযক যদি জাদু চালাতে পারে তাহলে মন্দটা কি?'

ঃ ঐ ধর্মজাযককে অবশ্যই সুযোগ দেবেন শাহেনশাহ!' – বৃদ্ধ ওযীর বললো– 'কিন্তু তার ওপরেই ভরসা করে বসে থাকবেন না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ফৌজকে আবার একত্রিত করে মাদায়েন নিয়ে আসুন। মুসলমানদের মাদায়েন অবরোধ করতে দিন। তাদের অবরোধই তাদের জন্য মৃত্যু ডেকে আনবে। আবারো আমি বলছি, শুধু জাদুর ওপরেই ভরসা করে নিশ্চিন্ত হবেন না।'

ঃ 'বন্ধুরা আমার!' – সাদ (রা) কুদায়েস মহলে তার সালারদের বললেন– 'আল্লাহ তাআলা যে পবিত্র কুরআনে তালুত ও জালুতের যুদ্ধের কথা বলেছেন তা স্মরণ করো। তালুত ও তার ঈমানদার সঙ্গীরা যখন নদী পার হয়ে সামনে অগ্রসর হলো তখন তারা তালুতকে বললো, জালুত ও তার সৈন্যদের মোকাবেলা করা আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। আমাদের সে শক্তি নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করতো আল্লাহর সামনে একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বললো, এমন তো কতই হয়েছে যে, সামান্য কয়েকজনের দল বিশাল এক বাহিনীকে পরাস্ত করেছে। দৃঢ়চেতা ও ধৈর্যশীলদের সাথেই আল্লাহ থাকেন। তারা যখন জালুত ও তার বাহিনীর মোকাবেলার জন্য বের হলো তখন দুআ করলো, হে আমাদের রব! আমাদেরকে দৃঢ়তা ও ধৈর্যশীলতা দান করুন। আমাদের দৃঢ়পদ করুন এবং ঐ কাফেরবাহিনীর ওপর আমাদের বিজয় দান করুন। আল্লাহর হুকুমে তারা সেই কাফেরদেরকে পরাজিত করে এবং দাউদ (আ) জালুতকে হত্যা করেন। আল্লাহতাআলা দাউদ (আ) কে রাজত্ব ও প্রাজ্ঞতা দান করেছেন। মহান আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে আরেকদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবীতে বিপর্যয় নেমে আসতো। সমস্ত শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়তো। বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ মেহেরবান...

'আমাদের অবস্থা তো এমনই ছিলো। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে ব্যক্তি একথা ভাবেনি যে, এত সামান্য সংখ্যক সৈন্য ও এত ক্লান্ত শরীর নিয়ে এত বিশাল ফৌজের সামনে কিভাবে দাঁড়াবো! আমরা তো জাদুকর নই যে, দুশমনকে অন্ধ করে দেবো। এমন কোন জাদুকরও আমাদের মধ্যে নেই যে দুশমনের জেনারেলদের জাদু করে অস্ত্র কেড়ে নেবে। কিন্তু তোমরা আল্লাহর এই বাণী স্মরণে রেখেছো যে, তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো, আল্লাহও তোমাদের কথা স্মরণ করবেন। তোমরা আল্লাহর পথে সাহায্য করো আল্লাহও তোমাদের সাহায্য করবেন...মহান আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্যই প্রচণ্ড এক ঝড় পাঠালেন।...

'আল্লাহর পথে যারা অবিচল থাকে, বিজয় ও সাহায্যের অমিয় ধারায় তারা এমনভাবে স্নাত হয় যে, মনে হয় এটা জাদুর কারিশমা। কিন্তু আসলে এটা আল্লাহর কুদরতের কারিশমা। আর এটা মহান আল্লাহর প্রদত্ত অঙ্গীকার যা তিনি পূরণ করেছেন। আমাকে দেখো, যে উটে বসতেও অক্ষম ছিলো। অথচ কি আশ্চর্য এখন আমার মনে হচ্ছে যেন কখনো আমার কোন অসুখই হয়নি। ... আমাদের আপাতত গন্তব্য এখন মাদায়েন। আরামের সময় নেই এখন। দুশমনকে কোথাও স্বস্তিতে বসে থাকতে দেয়া যাবে না।'

অবশেষে উমর (রা) সাদ (রা) কে হুকুম পাঠালেন মাদায়েনের দিকে কোচ করতে। হুকুমনামায় তিনি লিখলেন, মুজাহিদদের স্ত্রী সন্তান ও অন্যান্য মহিলা আত্মীয়দের মুসলিম ফৌজী চৌকি আতিকে রেখে যাবে। তাদের হেফাজতের জন্য মুজাহিদদের একটি দলকেও সেখানে নিযুক্ত করে যাবে এবং পরবর্তী যুদ্ধে জয়ী হলে তাদেরকেও অন্যান্য মুজাহিদদের সমান গনীমতের মালের অংশ দিতে হবে।

সাদ (রা) মুজাহিদদের একটি দলকে পৃথক করে তার সঙ্গে মহিলাদের আতীক নামক ছাউনীতে নিয়ে গেলেন। সেই দলের আমীর নির্ধারণ আমীরকে করে বলে দিলেন সে তার দল নিয়ে এখানে নারীদের পূর্ণ হেফাজতের দায়িত্ব পালন করবে।

মুসলিম নারীরা সাদ (রা)কে তার 'বালাকা' ঘোড়া থেকে নামতে দেখে হর্ষধ্বনি করে উঠলো। তারা শুনেছিলো সাদ (রা) বিছানায় পড়ে আছেন। সালমা যখনই এই ছাউনীতে আসতো তখনই বলতো সাদ (রা) এর অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকেই যাচ্ছে। কিন্তু সাদ (রা)কে তারা ঘোড়া থেকে নামতে দেখে তাদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। সবাই বাইরে এসে দাঁড়ালো।

ঃ 'আল্লাহর কসম! সালমা মিথ্যা বলতে পারে না' – এক বুড়ি চোখে বিস্ময় নিয়ে বললো– 'কিন্তু এতো সাদই! খোদার কি মহিমা! সাদ এখন সুস্থ।

ঃ 'রাতে আমরা তার সুস্থতার জন্য দুআ করেছি।'

ঃ 'আল্লাহ শুনেছেন... আল্লাহ আমাদের দুআ কবুল করেছেন।'

ঃ 'মুসলিম বাহিনী অগ্নিপূজারীদের ওপর বিজয়ী হয়েছে। আর সাদ তার রোগকে পরাজিত করেছে।'

ঃ 'এটা মুজিযা...নিশ্চিত মুজিযা।'

এ ধরনের আরো অনেক শব্দে মুখর হয়ে তারা তাদের আনন্দ প্রকাশ করলো।

মেয়েরা যখন জানতে পারলো ছোট একটি সেনাদলের হেফাজতে তাদেরকে এখানেই রেখে যাওয়া হবে তারা আবার চিৎকার চেচামেচি শুরু করে দিলো। তাদের হট্টগোলের মধ্যে সাদ (রা) শুধু এতটুকু বুঝতে পারলেন যে, তারাও পুরুষদের সঙ্গী হতে চায়। সাদ (রা) তাদেরকে শান্ত করে যে কোন একজনকে কথা বলতে বললেন।

ঃ 'আমাদের ফৌজের সাথেই আমরা থাকতে চাই' – প্রৌঢ়ের কাছাকাছি এক মহিলা বললো– 'এর কারণ এই নয় যে, আমরা একা একা থাকতে ভয় পাবো, বরং আমরা আমাদের পুরুষদের একা ছাড়তে পারবো না। আপনি কি তখন নিজেই এ হুকুম দেননি যে, লড়াই এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, মেয়েরাও যেন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে? তখন আমরা লড়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম এখনও প্রস্তুত আছি।'

ঃ 'আমরা এটাও দেখতে পাচ্ছি আপনাদের সংখ্যা দিনদিন হ্রাস পাচ্ছে' – আরেকজন বললো– 'আমরা এটাও জানি যে, পারসিকরা কয়েক জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাদের পেছনে আমাদের ফৌজের ভালো একটা অংশ নিয়োজিত আছে। কে না জানে এভাবে পিছু ধাওয়া করা কতটা আশংকাজনক। এক্ষেত্রে আমরা পুরষদের অভাব দূর করতে পারবো।'

ঃ 'এটাও ভেবে দেখুন সিপাহসালার!' – এক সদ্যযুবতী মেয়ে বললো– 'লড়াইয়ের জন্য না হলেও আহতদের শুশ্রূষার জন্যও তো আমাদের সঙ্গে থাকা উচিত। পারসিকদের পিছু নিয়ে আপনারা এবার অভিযানে বের হচ্ছেন। কোথায় কোথায় লড়াই হবে তা কে জানে। আমাদের সৈন্যরা যখন আহত হয়ে পড়ে থাকবে কে তাদেরকে উঠাবে? ... এ কাজ আমাদেরকে সোপর্দ করুন।'

ঃ 'আহতরা তোমাদের কাছেই আসবে' – সাদ (রা) বললেন– 'কিন্তু আমরা এবার মেয়েদেরকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবো না। বিধর্মীরা কোথাও পরাজিত হলে বিজয়ী দলকে তারা খুশী করার জন্য নিজেদের কন্যা পর্যন্ত দিয়ে দেয়। দুশমনকে বিভ্রান্ত ও দুর্বল করার জন্য তারা নিজেদের মেয়েদের অনায়াসে ব্যবহার করে। কিন্তু একজন মুসলিম মেয়েও যদি কোন বিধর্মীর হাতে পড়ে তবে মুসলমানরা সে দেশ জয় করার পূর্বে তাদের সেই নারীকে উদ্ধারের জন্য নিজেদের সর্বশক্তি তার পেছনে ব্যয় করে। আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন কোন জাতিই নিজেদের সম্মানের হানি ঘটতে দিতে পারে না। ... যখন যেখানেই তোমাদের প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করবো তোমাদের তখন ডেকে নেবো আমরা।'

ঃ 'আপনার স্ত্রীকেও আপনার সঙ্গে রাখবেন না?' – এক মহিলা জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'না' – সাদ (রা) বললেন– 'আমি অসুস্থ ছিলাম তাই সবসময় সালমাকে আমার প্রয়োজন হয়েছে। সালমা এখন তোমাদের সাথেই থাকবে। ...এটাও শুনে নাও। তোমাদেরকে আমি নিজ ইচ্ছায় এখানে রেখে যাচ্ছি না। এটা আমীরুল মুমিনীনের হুকুম। তার হুকুম মান্য করা আমাদের জন্য ফরজ।'

সাদ (রা) মহিলাদের থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসছিলেন। এমন সময় এক সৈন্য সেখানে উপস্থিত হলো। কয়েকজন সৈন্যের একটি দলকে সবসময় আশেপাশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে তা সাদ (রা)কে জানানোর জন্য তিনি নিযুক্ত করেছিলেন। এই দলে স্থানীয় কয়েকজন লোকও ছিলো। এরা সামনে এগিয়ে গিয়ে গোপন তথ্য সংগ্রহ করে আনতো।

ঃ 'কি খবর? তোমার কাছে কি আমি এটা আশা করতে পারি যে, তুমি কোন মন্দ খবর আনোনি'? – সাদ (রা) ফুরফুরে গলায় বললেন।

ঃ 'আল্লাহ্ আপনাকে মন্দ সংবাদ থেকে দূরে রাখুন সিপাহসালার!' – আগন্তুক সৈন্য বলল– 'অগ্নিপূজারীরা কোথাও দাঁড়াতে পারছে না। তারা কোথাও একত্রিত হওয়ার চেষ্টা করলেই মুজাহিদরা সময়মতো সেখানে পৌঁছে যায় এবং তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। অগ্নিপূজারীরা কোথাও জমে লড়াই করে না। লড়াই শুরু হতেই পালিয়ে যায়। তাদের রুখ মাদায়েন থেকে দক্ষিণ প্রান্তে এবং বাবেলের পোড়ো শহরের দিকেই বেশি। আমার এক স্থানীয় সঙ্গী লড়াই থেকে পলাতকদের কৃষকের বেশে গিয়ে খোঁজখবর করেছিলো। সে এসে জানালো, পারসিকদের বিরাট একদল বাবেলে সমবেত হচ্ছে। তাদের জেনারেলরা আমাদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য তাদেরকে দারুণভাবে সংগঠিত করছে।'

সাদ (রা) এর আগে হুকুম দিয়েছিলেন, পলায়নরত পারসিকরা যাতে কোথাও একত্রা হতে না পারে সে জন্য তাদেরকে পিছু ধাওয়া করা হবে। মুজাহিদরা তাদের পেছনে এলোপাতাড়ি দৌড়ে যোগ দিলো না। বরং সাদ (রা) তাদেরকে যথারীতি সুশৃংখলরূপে ভাগ করে দিয়ে দিক ও এলাকা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তাদের সবার শেষ গন্তব্য মাদায়েন হলেও বিভিন্ন দলের বিভিন্ন পথে মাদায়েন পৌঁছার নির্দেশ ছিলো তাদের ওপর।

যাহরা ইবনে হাওয়াইয়াকে সাদ (রা) ইরাকের অতি প্রসিদ্ধ শহর হীরায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হীরা মুসলমানদেরই দখলে ছিলো। আরো দুই সালার – আবদুল্লাহ্ ইবনে মুতাম ও শুরাহবীল ইবনে সিমাতকে অন্য পথে পাঠানো হলো। এই দু'জনের বাহিনী পারসিকদের ধাওয়া করতে করতে বিভিন্ন এলাকা অতিক্রম করে হীরায় পৌঁছলো। সাদ (রা) আগেই বলে রেখেছিলেন হীরায় একত্রিত হয়ে কোন দল কোন দিকে যাবে।

ঃ 'এখন বলো' – সাদ (রা) সেই সৈন্যকে জিজ্ঞেস করলেন– 'যাহ্রা, আবদুল্লাহ ও শুরাহবীল কে কোথায় আছে? তারা খুব বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়নি তো?'

ঃ ক্ষতি খুব সামান্যই হয়েছে সিপাহসালার!' – সৈন্যটি জবাব দিলো– 'নিজেদের কিছু সৈন্য আহত হয়। যাহরা হীরা পৌঁছে গিয়েছিলো। একদিন পরেই সালার আবদুল্লাহ ইবনে মুতাম ও শুরাহবীল তাদের দল নিয়ে হীরায় পৌঁছে যায়। এরপর যাহ্রা ইবনে হাওয়াইয়া তার দল নিয়ে মাদায়েনের পথে রওয়ানা হয়ে যায়। আমি আমার স্থানীয় এক সঙ্গীর সঙ্গে তখন ঐ এলাকাতেই ছিলাম'...

'বুরুসে পারসিকদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৈন্য জমায়েত হয়। আমাদের মুজাহিদদের সংখ্যা তাদের চেয়ে অনেক কম ছিলো। লড়াইয়ে পারসিকরা সুবিধাজনক স্থানে ছিলো। কিন্তু মুজাহিদরা সামনাসামনি মোকাবেলা না করে ডান ও বাম দিক থেকে এমন কৌশলে আক্রমণ চালালো যে, কিছুক্ষণ লড়ে পিছু হটে এলো বা এদিক ওদিকে সরে পড়লো। তারপর আবার আক্রমণ করলো। এভাবে কয়েকবার আক্রমণ করে তারা পারসিকদের বিক্ষিপ্ত করে দিলো...'

'আমার সেই স্থানীয় সাথী আগেই বলেছিলো, কাদিসিয়া থেকে পালিয়ে আসা এসব ফারসীদের মনোবল একেবারেই শেষ হয়ে গেছে। এর একটি কারণ হলো, তাদের ওপর আরবদের আতংক চেপে বসেছে। আরেকটি কারণ হলো, রুস্তম ও ইয়াযদগিরদ পারস্যের যে নতুন ফৌজ তৈরী করেছিলো, এতে কিছু লোককে তারা জোর করে ফৌজে ভর্তি করা হয়। আর অন্যদের অতিরিক্ত বেতন-ভাতা, পুরস্কার ও মোটা অংকের মালে গনীমতের লোভ দেখানো হয়। তাদেরকে বলা হয়, মুসলিম ফৌজ সংখ্যায় খুবই কম। তাদেরকে লাশ বানিয়ে আরব দখল করতে হবে। আর আরব সোনা রুপা ও জওহারের খনিতে ভরা। কিন্তু যা ঘটলো তা তো আমরা প্রত্যক্ষই করছি।'

ঃ 'আর কি কি দেখেছো তুমি?' – সাদ (রা) জিজ্ঞেস করলেন– মনে রেখো, শত্রুকে কখনো তুচ্ছ ও দুর্বল মনে করতে নেই। আহত বিড়াল বাঘের ওপর হামলা করতেও ভয় পায় না। এটাও মনে করো না যে, শত্রুরা পালাতে থাকলেই তোমাদের বিজয় নিশ্চিত হয়ে গেলো।'

ঃ 'সিপাহসালার যা বলেছেন তাতে আর কিসের সন্দেহ থাকতে পারে' – সৈন্যটি বললো– 'যা দেখেছি আমি তা তো বলবোই এবং যা শুনেছি তাও বলবো। সিপাহসালারের কাছে সব কথা পৌছানো আমার ফরয কর্ম। দুশমনের অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, তারা ভয় পাওয়া ভেড়া বকরীর মতো পালিয়ে বেড়াচ্ছে... বুরুসে পারসিকদের লড়াইয়ের কথা বলছিলাম। সালার যাহরা তাদের কিছু ফৌজকে হত্যা করেন। আর বাকীরা পালিয়ে বাবেলের দিকে চলে যায়। আপনাকে আমি বলতে চাচ্ছি পারসিকরা বাবেলে একত্রা হচ্ছে। জানা গেছে ফারসীদের পাঁচ জেনারেল– ফায়রুযান, হরমুযান, খায়েরজান, মেহরান ও বাসিরী– বাবেলের পোড়ো শহরে পৌঁছে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।'

ঐসব এলাকায় মুসলিম ফৌজ আল্লাহর গজব হয়ে বিধর্মীদের ওপর টুটে পড়ছিলো। কত হাজার বছরের ইতিহাসের স্মৃতি চিহ্ন বয়ে চলেছে এসব এলাকার স্থির মাটি আর বাড়ন্ত গাছের সারি। সেসব ছিলো পাপ-পুণ্যের ইতিহাস। মানুষ ও মানবতার সবকিছুই পাপের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলো। মহান আল্লাহ তার পথভ্রষ্ট বান্দাদের সরল পথে চালিত করার জন্য কত নবী রাসূল এই মাটিতে প্রেরণ করেছেন তখন।

এই বুরুসেই ইবরাহীম (আ) নমরুদকে কারাগারে বন্দী করেছিলেন। বুরুস অতিক্রম করে সামনে গেলে পড়ে কূসা নামক একটি জায়গা। সেখানকার কারাগারের চিহ্ন কত স্মৃতির স্তূপতি হয়ে তখনো তেমন ছিলো যেমন হযরত ইবরাহীম (আ) এর যুগে ছিলো। পুরোপুরি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়নি। প্রাচীরের মতো দেয়ালগুলো তখনো মাথা উচু করে কালের চিহ্ন বহন করছিলো। দেয়ালের কোথাও কোথাও এক আধ ফিট উঁচু ছিলো। এসব এলাকা তখন থেকেই জন-আবাদহীন হয়ে চলে আসছে। এখানেই নমরুদের 'ইয়াম্বারুননমরুদ' নামক নমরুদের মহল ছিলো। এর কিছু দূর ছিলো বাবেল। ইযাম্বারুননমরুদের বুরুস ও কূসার মধ্যবর্তী একস্থানে অবস্থান হলো।

নমরুদের আসল মহলটি ছিলো বাবেলে। একে বলা হতো 'কসরুননমরুদ'। এর একটু দূরে এক বিশাল গভীর গর্ত আছে। নমরুদের মহল তৈরীর সময় এখান থেকে মাটি নিয়ে ব্যবহার করা হয়েছিলো। আরেক জনশ্রুতিতে আছে, নমরুদের চরম পাপিষ্ঠ বাহিনীকে আল্লাহ তাআলা যখন আসমানী গজব নাযিল করে শাস্তি দেন তখন এখানকার জমিন ধ্বসে যায়। নমরুদের যেসব অট্টালিকা এখানে ছিলো সেগুলোও ধসে যায় মাটিতে।

সাদ (রা) যখন এই এলাকার অবস্থা জানতে পারলেন তখন তিনি বাবেলের দিকে রওয়ানা দিলেন। মুজাহিদদের দু'তিনটি দল ছিলো তার সঙ্গে। পথে পারসিকদের কয়েকটি দলের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়।

ভাঙ্গা মনোবল নিয়েও পারসিকরা যে সাদ (রা) এর দলের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলো এর কারণ ছিলো তাদের প্রসিদ্ধ জেনারেল ফায়রুযান। ফায়রুযান চাচ্ছিলো না পরাজয়ের চিহ্ন নিয়ে মাদায়েন ফিরতে। কিছু একটা করে গেলে বলতে পারবে সে পরাজিত নয়। পরাজয়ের সব দায়িত্ব অন্যান্য জেনারেলদের ওপর। এছাড়াও যে সৈন্য তার সঙ্গে ছিলো তা মুসলমানদের চেয়ে অনেক বেশি ছিলো। এ কারণেও সে ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ ছিলো। তার সৈন্যরা যে মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত এটা আর তার মনে রইলো না।

ওদিকে সাদ (রা) লম্বা এক অসুস্থতার বিরতির পর উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তার ওপর অভিযোগ উঠেছিলো, তিনি অসুস্থতার বাহানা করে লড়াই এড়িয়ে চলছেন। কিন্তু পরে এই অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা প্রমাণিত হয়। তবুও তার মনে একটা কষ্টের শূন্যতা ছিলো। সেটা ছিলো অসাধারণ কিছু করে তার সক্ষমতা প্রমাণ করার তাগিদ। আরো ছিলো সশরীরে কাদিসিয়ার লড়াইয়ে শরীক না হতে পারার বেদনা। মন থেকে এসব ঝেড়ে ফেলার সময় এসে গিয়েছিলো। এর একমাত্র পথ ছিলো অল্প কয়েকজনের দল নিয়ে বিশাল বাহিনীকে পরাস্ত করা।

সাদ (রা) তার এই অল্প সংখ্যক সৈন্যকে এমনভাবে সাজালেন যে, দুশমনের মোকাবেলাও করতে পারেন এবং সৈন্যরাও তার নিয়ন্ত্রণে থাকে। সামনাসামনি আক্রমণ না করে ডান ও বাম দিক থেকে তিনি আক্রমণ শুরু করলেন। তার সৈন্যরা আক্রমণ করে করে পিছনে সরে আসতে লাগলো। এভাবে তারা পারসিকদের এমন অবস্থা করে দিলো যে, তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো এবং ফায়রুযানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলো। এই সুযোগে মুজাহিদরা তাদের কাটতে শুরু করলো।

যে পর্যন্ত ফায়রুযানের ঝাণ্ডা দেখা গেলো সে পর্যন্ত ফারসীরা লড়ে গেলো। তবুও তাদের লড়াই আক্রমণাত্মক ছিলো না, প্রতিরোধমূলক ছিলো। শুধু প্রাণ বাঁচানোর জন্য তারা লড়ছিলো। হঠাৎ ফায়রুযানের ঝাণ্ডা অদৃশ্য হয়ে গেলো। সবাই ধরে নিলো ফায়রুযান নিহত হয়েছে। একটু পরেই জানা গেলো সে পালিয়েছে। তার ফৌজের অনেকে তার সঙ্গে পালালো। অনেকে হাতিয়ার ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করলো।

সাদ (রা) সেখান থেকে হীরা চলে গেলেন।

❖ ❖ ❖

বুরুস শহরের একটু দূরে যাহরা ফারসীদের কয়েকটি দলকে চরমভাবে পরাজিত করলেন। এতে বেঁচে থাকা ফারসীদের অনেকে বাবেল আর কিছু বুরুসে চলে গেলো। সাদ (রা) এর খন্ড সেনাদলের কাছে ফায়রুযানের পরাজিত সৈন্যদেরও অনেকে বাবেল এবং কিছু বুরুসে গিয়ে আশ্রয় নিলো। বুরুসের শহরবাসীরা আগেই জানতে পেরেছিলো, তাদের ফৌজ কাদিসিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে করুণভাবে অনেকে মারা গেছে। কয়েক হাজার সৈন্য আতীক নদীতে ডুবে মরেছে এবং অনেক অনেক হাতি মুসলমানদের হাতে শেষ হয়ে গেছে। শহরবাসীকে দারুণ আতংকে পেয়ে বসলো। এ অবস্থায় ফারসী ফৌজ বুরুস গিয়ে পৌছলো। তাদের মধ্যে কিছু ছিলো আহত। শহরবাসীর কাছে তারা এটা প্রকাশ হতে দিলো না যে, তারা বুযদিল ও পালিয়ে এসেছে। শহরবাসীকে তারা বললো, মুসলমানরা সংখ্যায় তো বেশিই এবং অত্যন্ত উগ্র ও হিংস্রও বটে।

এই শহরের নেতা ছিলো বুস্তাম নামক এক বিরাট বিত্তশালী লোক। বিশাল এক ধনভাণ্ডারের অধিকারী ছিলো সে। তার বড় ভয় ছিলো সুন্দরী দুই মেয়েকে নিয়ে। সে বুঝে ফেললো তার যত অর্থসম্পদই থাক মুসলমানদের সঙ্গে লাগতে গেলে এগুলো কোন কাজেই আসবে না। তা ছাড়া প্রাণ নিয়ে পলায়নপর ফারসী ফৌজের ওপরও তার কোন ভরসা ছিলো না। এরপরও যদি সে মোকাবেলা করে তবে ফল হবে এই যে, মুসলমানরা তার সমস্ত সম্পদ মালে গনীমত হিসেবে তো নেবেই, সাথে করে তার কুমারী দুই কন্যাকেও দাসী করে নিয়ে যাবে।

এ অবস্থায় তার করণীয় কি তা নিয়ে সে ভাবছিলো। এমন সময় ঘরের বাইরে অনেক লোকের কণ্ঠ শোনা গেলো। সে ভীত পায়ে এমন কাঁপতে কাঁপতে বাইরে বেরুলো, যেন মুসলমানরা শহরে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু বাইরে ছিলো শহরের লোকদের ভীড়। হাত নেড়ে নেড়ে তারা দাবী তুলে যাচ্ছিলো ঃ

ঃ 'শহর মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দাও।'

ঃ 'মুসলমানদের স্বাগত জানাও।'

ঃ 'তাদেরকে নিরাপদে শহরে ঢুকতে দাও।'

ঃ 'আমাদের মান-সম্মান ও ধনসম্পদ রক্ষা করো।'

ঃ 'আমাদের ফৌজ আমাদের জানমাল ও আবরু ইযযতের হেফাজত করতে পারবে না।'

ঃ 'তারাই আমাদের ছিঁড়ে খাবে।'

শহরবাসীর শ্লোগান বাড়তেই লাগলো। এ সময় মহিলারা সামনে এসে বুস্তামকে বলতে লাগলো, 'আমাদের লুকোবে কোথায়? আরবদের হাতে কি আমাদের সোপর্দ করে দেবে?'

ঃ 'না' – বুস্তাম এত জোড়ে 'না' করলো যে কোলাহল থেমে গেলো – 'আমি তোমাদের ব্যাপার নিয়েই চিন্তিত ছিলাম। তোমাদের মতো আমিও জেনেছি, আমাদের ফৌজ আরবদের কাছে খুব মন্দভাবে পরাজিত হয়েছে। যারা বেঁচে গিয়েছে তারা ভেড়া বকরীর মতো পুরো পারস্যে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আমাদের শাহেনশাহ মহলে বসে ভোগবিলাসে মত্ত। তোমরা যদি আমার সঙ্গে থাকো, আরবদের সঙ্গে আমি সমঝোতা করে নেবো। তারপর আমি তোমাদের যা বলবো তা তোমরা করে যাবে।'

সাদ (রা) এই এলাকা দিয়েই যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন, বিরাট এক রাজকীয় ঘোড়া ও শাহী পোষাকে সজ্জিত এক লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে। পেছনে ছিলো তার চার পাঁচটি ঘোড়সওয়ার। আরো পেছনে মালপত্রে ঠাসা পাঁচ ছয়টি খচ্চর।

সাদ (রা) এর কাছে এসে লোকটি ঘোড়া থেকে নামলো। তার সঙ্গীরাও ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়ালো। লোকটি সাদ (রা) এর কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বুকের মধ্যে দু'হাত বেঁধে সালাম করলো। তারপর সিজদার মতো করে মাথা নুইয়ে ফেললো।

ঃ 'খোদার কসম! এই লোক তো আমার ধর্মকে অপমান করছে' – সাদ (রা) তার দোভাষীকে বললেন– 'ওকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বলো। আমি পারস্যের বাদশাহ নই যে, লোকেরা আমার সামনে মাথা নুইয়ে আদব জানাবে। তাকে বলো, যে ধর্ম আমরা তোমাদের জন্য সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি তাতে আল্লাহর কোন বান্দা আরেক বান্দার সামনে মাথা নোয়াতে পারে না... কেন এসেছে সে জিজ্ঞেস করো ওকে।'

দোভাষী সাদ (রা) এর বক্তব্য তাকে বুঝিয়ে বললো। দোভাষীর মাধ্যমে বুস্তাম তার পরিচয় দিলো এবং তার বক্তব্য পেশ করলো।

ঃ 'আমার নাম বুস্তাম' – সে বললো– 'আমি বুরুস শহরের আমীর। সন্ধি করার ইচ্ছায় এসেছি আমি। আমার শহরের লোকেরাও সন্ধি করতে চাচ্ছে। কিছু উপঢৌকন এনেছি আমি। তা এই শর্তে পেশ করছি যে, আমাদের জান মাল ও ইযযত যেন হেফাজতে থাকে। এর বিনিময়ে আমি আপনাদের এগিয়ে যাওয়ার পথ সহজ করে দেবো। শহরের লোকেরা আপনাকে পূর্ণ সহযোগিতা দেবে।'

ঃ 'আমরা উপহার উপঢৌকন নিই না' – সাদ (রা) বললেন– 'আমরা জানি এই শহরের অধিবাসীদের নিরাপত্তাদানের জন্য ফারসী ফৌজ নেই। তোমরা আমাদের কাছে নিরাপত্তা চেয়েছো, আমরা নিরাপত্তা দিলাম। এগুলো নিয়ে ফিরে যাও। আর লোকদের বলে দাও, তারা যেন নিশ্চিন্ত নিরাপদে থাকে।'

বুস্তাম দারুণ খুশী হয়ে তার উপঢৌকনের জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেলো। এসব এলাকায় ছিলো চমৎকার সবুজ-শ্যামলের আবহ। কিন্তু এর অধিকাংশ জায়গাই পতিত, অনাবাদ, জনহীন প্রান্তর, সমতল-অসমতল, উঁচু নিচ খাস জমি ইত্যাদিতে ভরা ছিলো। আরো ভেতরে ছোট বড় নদী-নালা, গভীর খাদ, বিস্তীর্ণ উপত্যকা এবং নলখাগড়ার জঙ্গলে ভরপুর ছিলো। এসব জায়গা দিয়ে চলতে গেলে একদিনের পথ মাসখানেক লেগে যায়। এখান দিয়েই মুসলমানরা মাদায়েনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। বুস্তাম মুসলমানদের অসুবিধা বুঝতে পেরে শহরের লোকদের বাইরে নিয়ে এসে খুব দ্রুত নদী-নালা, খাল-বিলের ওপর কাঠের পুল লাগিয়ে দিলো এবং আরো কয়েকটি প্রাকৃতিক বাধা দূর করে দিলো। পথ চেনার জন্য মুসলমানদের গাইডেরও ব্যবস্থা করলো এবং অন্যান্য প্রয়োজন পুরো করলো।

মুজাহিদদের পথ চলা বেশ সহজ হয়ে গেলো এতে।

যাহ্‌রা ইবনে হাওয়াইয়া আরেকটু ঘুরপথে মাদায়েনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তার পথে ছিলো কূসা শহর। বুস্তামের দেয়া গাইড যাহ্‌রা জানালো, কূসায় আগ থেকেই কিছু ফৌজ ছিলো। আরো অনেক পালিয়ে আসা ফৌজ সেখানে জমা হয়েছে। এই শহ্‌রের আমীর হলো শাহ্‌রিয়ার। শাহ্‌রিয়ার ফৌজী জেনারেলও এবং অত্যন্ত আবেগী ও দৃঢ়চেতা।

ঃ 'শাহ্‌রিয়ার কি আমাদের পথ আটকে দাঁড়াবে?' – যাহ্‌রা জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ 'অবশ্যই আটকে দাঁড়াবে' – গাইড বললো– 'আমি আমার এক সঙ্গীর সঙ্গে কূসা থেকে এসেছি। শাহ্‌রিয়ার ফৌজ ও শহ্‌রবাসীকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করছে। তার প্রস্তুতি দেখে মনে হলো, শহ্‌রের বাইরে এসে সে লড়বে। সে তার ফৌজ ও শহ্‌রবাসীকে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে দারুণ গরম করে তুলেছে। আর বলেছে, মুসলমানদের যে দলটি আসছে তারা সংখ্যায় হাজারও নয়। কয়েকদিনের বিভিন্ন লড়াইয়ে তারা এতোই ক্লান্ত যে, লড়াইয়ের মানসিক শক্তি ওদের মধ্যে নেই। শাহ্‌রিয়ারের বিশ্বাস আপনার লোকেরা ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। তাই সে শহ্‌রের বাইরে খোলা ময়দানে লড়াইয়ের প্রস্তুতি শেষ করে আপনাদের অপেক্ষা করছে।'

যাহ্‌রা তার ফৌজকে বলে দিলেন, কূসায় মুখোমুখি লড়াইয়ের আশংকা রয়েছে। সতর্ক থাকতে হবে। তিনি তার বাহিনীকে লড়াইয়ের জন্য সুবিন্যস্ত করে এগুতে লাগলেন। কূসা তখনো কিছু দূরে। যাহ্‌রা দেখলেন, শহ্‌রের বাইরে খোলা ময়দানে পারসিকরা লড়াইয়ের বিন্যাসে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফৌজের সারির পেছনে শহ্‌রবাসীর সারি। এদের মধ্যে সওয়ারই বেশি। মুজাহিদদের সংখ্যা এবার আরো অনেক কম। সঙ্গে সঙ্গে তারা ক্লান্তও ছিলো। কিন্তু অদৃশ্য এক ঈমানের দীপ্তিতে তাদের মনোবল দিনদিন আকাশসমান উঁচু হচ্ছিলো।

উভয় দল মুখোমুখি দাঁড়ালো। শাহ্‌রিয়ার তার ফৌজের সামনে ঘোড়ার ওপর বসা ছিলো। পালোয়ানের মতো অতিকায় দেহাবয়ব ছিলো তার। পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছিলো কোন অস্ত্র ছাড়া লড়লেও সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে অনায়াসে আছড়ে মেরে ফেলতে পারবে।

ঃ 'আরে আরবের দুর্ভাগারা!' – শাহ্‌রিয়ার চিৎকার করে বললো– 'অনারবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে মরণ তোমাদের কোথায় নিয়ে এসেছে। রুস্তম কাপুরুষ ছিলো। সে মরে গেছে। তোমরা আর এখান থেকে সামনে এগিয়ে যেতে পারবে না। অক্ষত প্রাণ নিয়ে নিরাপদে ফিরে যাওয়াটাই কি তোমাদের জন্যে ভালো নয়?'

ঃ 'এর ফয়সালা করবে তলোয়ার', – যাহ্‌রা বললেন– 'কে প্রাণ নিয়ে যাবে আর কে প্রাণ খুইয়ে যাবে এর ফয়সালা মহান আল্লাহর হাতে; যার দ্বীন আমাদের বুকে ধারণ করে আমরা এখানে এসেছি'।

ঃ 'না, এর ফয়সালা আমার হাতে'–শাহ্‌রিয়ার সগর্জনে বললো–'তোমার আল্লাহকে এখানে কে চিনে? তোমার লোকদের লাশে পরিণত করার পূর্বে তোমার সঙ্গে আমি কিছু খেল তামাশা করতে চাই... আমার সাথে লড়ার মতো কি কোন বাহাদুর আছে?'

ঃ 'আমি নিজেই তোমার সঙ্গে মোকাবেলা করতে আসতাম' – যাহ্‌রা তাকে উস্কে দিয়ে বললেন– 'কিন্তু আয় দুর্ভাগা অগ্নিপূজারী! আমার আল্লাহ্‌কে তুমি চ্যালেঞ্জ করেছো। তোমার বিরুদ্ধে আমি আমার এক নগণ্য সৈনিককে এগিয়ে দিচ্ছি।'

যাহ্‌রা বড় একটি ঝুঁকি নিলেন। শাহ্‌রিয়ারের মতো এমন দানবীয় দেহের এক জেনারেলের সঙ্গে মোকাবেলার জন্য যাহ্‌রা যাকে পাঠালেন, সে দেখতে যেমন ছিলো শীর্ণকায় তেমনি দুর্বল। সে ছিলো বনু তামীমের আযাদকৃত এক গোলাম। নাম নাবিল। নাবিলের ঘোড়া শাহ্‌রিয়ারের দিকে এগিয়ে গেলে শাহ্‌রিয়ার আকাশ ফাটানো হো হো হাসিতে ফেটে পড়লো। যাহ্‌রা নাবিলের ওপর নয়; তার সব ভরসা, নির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস ছিলো সকল শক্তির আধার আল্লাহর ওপর। তার বিশ্বাস ছিলো, এই দুর্বল মুজাহিদটির ওপর নিশ্চয় আল্লাহ্ সাহায্য পাঠাবেন। কিন্তু বাস্তবে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো নাবিল নিশ্চিত আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ফারসী ফৌজ থেকে শুধু অট্টহাসির শব্দ ভেসে আসছিলো।

শাহ্‌রিয়ার নাবিলকে দেখে এটাকে তার সাথে মুসলমানদের মস্করা ধরে নিলো। তবুও সে ঘোড়া থেকে নামলো। তার হাতে স্বর্ণখচিত বাটের রুপালী ফলার বর্শা ছিলো। সেটা সে ফেলে দিলো। একেবারে নিরস্ত্র হয়ে সে বুঝাতে চাচ্ছিলো নাবিলকে মারার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করা হাস্যকর।

নাবিল ঘোড়া থেকে নামলো। তার কাছে তলোয়ার ছিলো। শাহ্‌রিয়ারকে তার বর্শা ফেলে দিতে দেখে সেও তার তলোয়ার ফেলে দিলো। আচমকা শাহ্‌রিয়ার এক থাবায় নাবিলকে উঁচু করে মাথার ওপর উঠালো তারপর মাটিতে আছড়ে ফেললো। নাবিল চিত হয়ে পড়লো। নাবিলের মনে হলো তার মেরুদণ্ডের হাড় দু'ভাগ হয়ে গেছে। তবুও দাঁত কামড়ে যেই উঠতে গেলো শাহ্‌রিয়ার তার বুকের ওপর আছড়ে পড়লো, সবাই ধরে নিলো একটু পর নাবিলের চিরা চেপ্টা লাশ দেখা যাবে। হঠাৎ শাহ্‌রিয়ারের একটি হাত নাবিলের মুখের কাছে চলে গেলো। নাবিল শাহ্‌রিয়ারের আঙ্গুল এত জোরে কামড়ে ধরলো যে, শাহ্‌রিয়ার যন্ত্রণায় টলমলিয়ে উঠলো এবং আঙ্গুল ছাড়াতে গিয়ে এক পাশে ঝুঁকে পড়লো। নাবিল এই সুযোগটা নিলো। তার শরীরের সমস্ত শক্তি একদিকে জড়ো করে শাহ্‌রিয়ার যেদিকে ঝুঁকেছিলো সেদিকে গড়িয়ে গেলো। দাঁত থেকে তার আঙ্গুল পৃথক করলো না। কামড়ের চাপ আরো বাড়ালো। তার তলোয়ারটি পাশেই পড়েছিলো। পা লম্বা করে তলোয়ারটি তার দিকে টেনে আনলো নাবিল। তারপর পূর্ণশক্তিতে শাহ্‌রিয়ারের পেট ও বুকের মাঝখানে তলোয়ার দিয়ে বর্শার মতো আঘাত করলো। তারপর টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো এবং তলোয়ারটি বুক ও পেটের মাঝখান থেকে টেনে বের করে এবার একই শক্তিতে পেটে আঘাত করলো। তার পেট পুরোটাই ফাঁক হয়ে গেলো। এরপর শাহ্‌রিয়ারের কয়েক মুহূর্ত ছটফট করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিলো না।

মুসলমানদের দিক থেকে সাবাস আর বাহ্‌বা ধ্বনি ভেসে আসতে লাগলো। ফারসী ফৌজ ও শহরবাসীদের যেন নিস্তব্ধতার ভূত চেপে ধরলো। তারা নিষ্পলক তাকিয়ে

শাহরিয়ারকে ছটফট করতে দেখলো। তারপর মরতেও দেখলো। শাহরিয়ারের শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেলে নাবিল তার কোমর থেকে স্বর্ণখচিত বাটযুক্ত তলোয়ার ও হীরকখচিত বাটটি নিলো। শাহরিয়ারের শাহী পোষাক, তার বর্ম ও শিরস্ত্রাণ অত্যন্ত দামী ছিলো সেগুলোসহ বর্শাটিও উঠালো নাবিল। তারপর নাবিলের ঘোড়ার ওপর রেখে ঘোড়ার লাগাম ধরে ধীরে ধীরে কমান্ডার যাহ্‌রার কাছে গিয়ে তার কাছে হাওলা করে দিলো।

শহরের লোকেরা যখন দেখলো, এমন দুর্বল ও শীর্ণ দেহের এক সৈন্য হাতির মতো বিশাল দেহের বিখ্যাত এক জেনারেলকে এমন সহজে হত্যা করেছে, তাদের মধ্যে তখন লক্ষ্মীছাড়া অবস্থা ছড়িয়ে পড়লো। এই লশকরে কাদিসিয়া থেকে পালিয়ে আসা অনেক সৈন্যও ছিলো। তারা পালানোটাই এ মুহূর্তে নিরাপদ মনে করলো। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে তারা পালাতে লাগলো। কিন্তু যাদের মাথায় সামান্য বুদ্ধিও ছিলো তারা অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করলো।

শহরের যোদ্ধারা যখন এ অবস্থা দেখলো তারা তখন শহরের নেতৃস্থানীয়দের একটি প্রতিনিধিদল যাহ্‌রার কাছে পাঠালো। তারা এসে বললো, মুসলমানরা নির্বিঘ্নে শহরে ঢুকে যেন শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। শহরবাসীরা তাদেরকে নিয়মিত কর প্রদান করবে। শহরের কিছু লোক মুসলমানও হয়ে গেলো।

সাদ (রা) এখন কোথায় আছেন যাহ্‌রা তা জানতেন। সাদ (রা) এর কাছে পয়গাম পাঠালেন কূসা তার নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। শাহরিয়ার ও নাবিলের লড়াইয়ের কথাও পয়গামে লিখে জানালেন। জানতে চাইলেন, শাহরিয়ারের লাশ থেকে নাবিল যে জিনিসগুলো উদ্ধার করেছে তা কি করা হবে? সাদ (রা) জবাব পাঠালেন, সেই জিনিসগুলো যতই মূল্যবান হোক না কেন তা নাবিলেরই প্রাপ্য। তাকে দিয়ে দাও এসব। সাদ (রা) যাহ্‌রাকে আরো নির্দেশ পাঠালেন, হাশেম ইবনে উতবাকে নিয়ে তিনি যেন মাদায়েনের দিকে এগুতে থাকেন।

যাহ্‌রা ও হাশেম ইবনে উতবা তাদের ক্লান্ত সৈন্যদল নিয়ে মাদায়েনের দিকে এগুতে লাগলেন। সিবাত এ পথেই ছিলো। সিবাত পারস্যের আরেকটি বড় শহর। সিবাতের একেবারে লাগোয়া আরেকটি শহর হলো 'বাহারশীর'। এই সিবাতেই ছিলো সাবেক সম্রাজ্ঞী পুরান দখতের দুই হাজার ঘোড়সওয়ার বাহিনীর দুর্ধর্ষ একটি দল। প্রতিদিন সকালে এরা সম্মিলিত কণ্ঠে এই অঙ্গীকার করতো যে, যতদিন পর্যন্ত আমাদের এই দল থাকবে, পারস্যের পতন ঘটতে দেবো না আমরা। এদের সাথে একটি বিশাল আকৃতির বাঘও ছিলো। তাদের সাথে বাঘটি আচরণ করতো বন্ধুর মতো, কিন্তু শত্রুর সামনে সে তার হিংস্র থাবা খুলে ঝাঁপিয়ে পড়তো।

মুজাহিদরা সিবাত পৌঁছে পারসিকদের এই জানবায দলটিকে লড়াইয়ের জন্য টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো। তারা কাছে পৌঁছতেই ফারসীরা তাদের ওপর বাঘটি লেলিয়ে দিলো।

শেষ পর্যন্ত বাঘের মুখে পড়তে হবে এবং এমন হিংস্র থাবাওয়ালা বাঘের মুখে, মুসলমানদের কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। মুসলমানদের মধ্যে এবার মৃত্যুভয় সওয়ার হলো। মানুষেরই যদি এ অবস্থা হয় তবে ঘোড়ার কি অবস্থা হবে! বাঘটি যখন এদিকে আসতে লাগলো মুসলমানদের ঘোড়াগুলো আতংকে চিহি চিহি ডাকতে শুরু করলো এবং সওয়ারীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলো ঘোড়াগুলো। শুধু একটি বাঘই যেন মুসলমানদের ঘাড় মটকে তাতে পরাজয়ের চিহ্ন এঁকে দেবে। কিন্তু হাশেম ইবনে উতবা তার প্রাণ বাজি রেখে এগিয়ে গেলেন এবং তার ঘোড়া বাঘের দিকে ছুটালেন।

এমন বেপরোয়া হয়ে ঘোড়াটিকে এগিয়ে আসতে দেখে বাঘটি যেন অবাক হলো। সটান দাঁড়িয়ে পড়লো এবং ঘোড়ার ওপর হামলার জন্য তার শরীর ঘোরাতে শুরু করলো। হাশেম ঘোড়া থামালেন না, দৌড়াতে লাগলেন। বাঘ পিছু হটতে শুরু করলো। হাশেম ঘোড়া থেকে এক লাফে মাটিতে নেমে সেখান থেকে ঘোড়াটিকে ভাগিয়ে দিলেন। তলোয়ার বের করে বাঘের এক পাশে চলে এলেন। এক মানুষ উঁচুতে বাঘটি লাফিয়ে পড়ে হাশেমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি এক দিকে গড়িয়ে গেলেন। আবারো ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য বাঘটি দু' পা পিছিয়ে আগের চেয়েও আরো জোরে হুংকার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। হাশেম এবার আরো ক্ষিপ্রতায় আরেক পাশে সরে গেলেন এবং চোখের পলক ফেলার চেয়ে দ্রুত তালে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলেন। বাঘের সামনের পায়ের বুকের কাছে গিয়ে আঘাতটি লাগলো। সেখানে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হলো। এতে বাঘটি এমন আহত হয়ে পড়লো যে, সামনের পা দু'টো মাটিতে ফেলতে পারলো না। নেংড়াতে লাগলো। আহত বাঘের চেয়ে বিপজ্জনক আর কিছুই হয় না। তাই হাশেম প্রথম আঘাতটি করে আর দেরী করলেন না এবং বাঘকে উঠতেও দিলেন না। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় বাঘের ঘাড়ে আঘাত করলেন। এতে পুরো ঘাড় না কাটলেও মাথাটি ঝুলে পড়লো এবং বাঘটিও আর তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলো। হাশেম তার তলোয়ার দিয়ে এবার বাঘের পেট চিড়ে দিলেন। বাঘের আর উঠার ক্ষমতা রইলো না। কয়েকটি পিলে চমকানো হুংকার ছেড়ে তার দেহটি স্থির হয়ে গেলো।

পুরানের এই শাহী বাহিনীর কেউ কল্পনাও করতে পারেনি একজন মুসলমান এতো নির্ভীক-সাহসী হতে পারে। তাদের আগেই বদ্ধমূল ধারণা জন্মে গিয়েছিলো মুসলমানরা সাহসী ও বেপরোয়া। কিন্তু এতটা অবিশ্বাস্য রকম সাহসী কোন মানুষও হতে পারে এটা কারোই বিশ্বাস হচ্ছিলো না। কোন মানুষও শুধু তলোয়ার দিয়ে সামনাসামনি লড়াই করে একটি বাঘকে মারতে পারে? এই দৃশ্য দেখে তাদের মনোবল তো ভাঙ্গলোই, এতদিনের তিল তিল করে জমে উঠা আত্মবিশ্বাস, প্রতিদিনকার সকালের প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার বাণী পাঠ – এসব কিছু নিমিষেই ভুলে গেলো তারা। না পুরানের কথা মনে রইলো না তাদের ধর্মীয় নেতার কথা মনে রইলো। সবার মধ্যে এই উপলব্ধি আসলো যে, এত কম সংখ্যক ফৌজ নিয়ে এত বিশাল বাহিনীকে এজন্য পরাস্ত করতে পেরেছে যে, এই মুসলমানের মধ্যে এমন অদৃশ্য কোন শক্তি আছে যা তাদের কারো বোঝার নয়। অনবরত লড়াই ও

একটি বিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকলেই কেবল এই শক্তি ও ক্ষমতার মালিক হওয়া যায়। মাসের পর মাস লড়াইয়ের ময়দানে থেকেও তাদের কারো মধ্যে ক্লান্তির কোন চিহ্ন নেই। কোন ঝড় ঝাপ্টাই তাদের মধ্যে কোন অবসাদ সৃষ্টি করতে পারে না যেন। মুসলমানদের ব্যাপারে তাদের মধ্যে পূর্বের যে ভয় ছিলো, এই রক্তপিপাসু হিংস্র বাঘটিকে স্রেফ একজন মুসলমানের হাতে ধ্বংস হতে দেখে এবং এসব উপলব্ধিতে তাদের আতংক আরো কয়েকগুণ হয়ে তাদেরকে চেপে ধরলো।

যাহরা আশা করছিলেন, যেহেতু পারসিকদের এই দলটি তাজাদম ও এর সওয়াররাও অনেক অভিজ্ঞ, তাই এদের হামলা খুবই প্রচণ্ড হবে। কিন্তু এদের মধ্যে কোন নড়াচড়া দেখা গেলো না। যাহরা এটা সুযোগ মনে করে তার সওয়ারদের হামলা করার হুকুম দিয়ে দিলেন। পারসিকদের সম্মুখ সারির যোদ্ধারা হামলা প্রতিহত করার জন্য তৈরী হয়ে গেলো। কিন্তু তাদের এক পাশের কিছু সওয়ার ঘাবড়ে গিয়ে ঘোড়া ঘুরিয়ে বাহারশীরের পথ ধরলো। তাদের দেখাদেখি পেছনের সারির সওয়াররাও পালাতে লাগলো। তারপর পুরো লশকরের মধ্যেই ভাগডোর শুরু হয়ে গেলো। পালিয়ে তারা সবাই বাহারশীরের কেল্লায় গিয়ে শহরের দরজা বন্ধ করে দিলো। বাহারশীর একেবারে নিকটেই ছিলো।

যাহরা তার ফৌজ নিয়ে বাহারশীর অবরোধ করলেন।

বাবেলের দিকে সাদ (রা) তার সৈন্যদল নিয়ে দ্রুত এগুতে লাগলেন। বুরুসের আমীর বুস্তাম মুসলমানদের পথের প্রাকৃতিক সব বাধা দূর করে দেয়াতে মুসলমানদের জন্য পথ চলা বেশ সহজ হয়ে গিয়েছিলো। কাদিসিয়ার পলাতক ফারসী সৈন্যরা বাবেলের ধ্বংসাবশেষে একাট্টা হচ্ছিলো। সাদ (রা) এজন্য তার সৈন্যদের কবেল অবরোধের জন্য প্রস্তুত করে এগুচ্ছিলেন। তাদেরকে বলে রাখলেন ইংগিত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তারা হামলা করে বসে।

মুজাহিদরা সাবধানে এগুতে লাগলো।

ঃ 'ভেতরে যারাই আছো বেরিয়ে এসো' – সাদ (রা) কাছে গিয়ে ঘোষণা করলেন– 'লড়াই করতে এলে একজনকেও জীবিত ছাড়া হবে না। বাইরে এসে হাতিয়ার ফেলে দাও। তোমাদের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখা হবে।'

বিশাল বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে বাবেলের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো। অক্ষত অনেকগুলো উঁচু উঁচু প্রাচীর ভেতরটাকে বিরাট এক মজবুত শহরের রূপ দিয়েছিলো। ধ্বংসাবশেষের প্রত্যেক পাশে গিয়ে প্রত্যেক প্রান্তে গিয়ে এই ঘোষণা করা হলো। কিন্তু কোন জবাব এলো না ভেতর থেকে। শেষমেশ শুভ্র দাঁড়ি বিশিষ্ট কালো আলখেল্লায় আবৃত এক অশীতপর বৃদ্ধ ঝুঁকে ঝুঁকে, নিজের চেয়ে লম্বা একটি লাঠিতে ভর করে এগিয়ে এলেন। সাদ (রা) তাকে দেখে একজনকে নির্দেশ দিলেন বৃদ্ধকে তার সামনে নিয়ে আসার জন্য।

বৃদ্ধ কাছে এলে সাদ (রা) ঘোড়া থেকে নামলেন।

ঃ 'হে আরবী সালার!' – শুভ্রকেশী বৃদ্ধ বললেন– 'কাকে ডেকে হয়রান হচ্ছেন। তারা সবাই পালিয়েছে। যে ফৌজের অফিসাররা পালিয়ে যায় সে ফৌজের সিপাহীরা ময়দানে কি করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।... ঘুরে ফিরে এই ধ্বংসস্তূপে দেখে আসুন। আহত কিছু সিপাহী পড়ে পড়ে কাতরধ্বনি করছে আর তাদের অফিসারদের মাথা কুটে খাচ্ছে, যারা তাদেরকে এ অবস্থায় রেখে পালিয়ে গেছে। এ ছাড়া চার জন যুবতী-রূপসী মেয়েকেও পাবেন, যারা নিজেদের ফৌজের লোকদের হিংস্রতার শিকার হয়ে এদিক ওদিক পড়ে আছে আর তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে।'

সাদ (রা) এগিয়ে গেলেন। সর্বপ্রথম তিনি সেই কয়েদখানার ধ্বংসাবশেষে গিয়ে পৌছলেন যেখানে ইব্রাহীম (আ) নমরূদকে বন্দী করেছিলেন। আবেগে তাঁর চোখে পানি চলে এলো। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো একটি আয়াত। যার অর্থ "মানবজাতির মধ্যেই এসব দিনপঞ্জী আমি আবর্তন করে থাকি।"

তারপর তিনি বাবেলের বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষে গেলেন। শাহী মহলের অগণিত অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষগুলো কালের শিক্ষা বহন করছিলো।

ঃ 'তোমরা কি জানো এই বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষগুলো কোন শহরের?' – সাদ (রা) তার সাথীদের জিজ্ঞেস করলেন এবং কোন জবাবের প্রত্যাশা না করেই বললেন– 'এটা সেই শহর যে শহরে মহান আল্লাহ তাঁর দুই ফেরেশতা হারূত ও মারূতকে অবতীর্ণ করেছিলেন। তাদেরকে জাদুবিদ্যা দান করেছিলেন। তারা লোকদের বলতেন, এই জাদু বৈধ নয়। কিন্তু তখনকার লোকেরা এই জাদু শিক্ষা করা, শিক্ষা দেয়া ও মানুষকে জাদুগ্রস্ত করার কাজ শুরু করে দিয়েছে। ....দেখে নাও আজ। আল্লাহতাআলা কেমন শিক্ষাপ্রদ বানিয়ে রেখেছেন এ অঞ্চল। অগ্নিপূজারীদের সম্রাটরা যদি এসব থেকে শিক্ষা নিতো তবে আজ তাদের এটা দেখতে হতো না যে, তাদের প্রাসাদগুলো তাকবীর ধ্বনিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে। যে ফৌজের ওপর তাদের এই নির্ভরতা ছিলো যে, ওরাই তাদেরকে সব বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে, সে ফৌজ আল্লাহর মুষ্টিমেয় কয়েকজন সিপাহীর ভয়ে এদিক ওদিক পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কিসরা পারভেজ রাসূলুল্লাহ (সা) এর পয়গাম ছিঁড়ে-ফেড়ে ফু দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলো। আজ তার শাহেনশাহী খণ্ড খণ্ড হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে' – তারপর সাদ (রা) বৃদ্ধের দিকে ফিরে বললেন– 'আপনি কি করছিলেন এখানে?'

ঃ 'আমার জীবন এখানেই কেটেছে' – বৃদ্ধ বললেন– 'আমার খান্দান কোন এক ধর্মের অনুসারী ছিলো। আমি কবে এখানে এসেছি আজ তা মনে নেই। আমার পূর্বপুরুষরা এখানেই থেকে গেছেন। একে একে সবাই চলে গেছেন। আমি শুধু রয়ে গেছি। একশ'রও কিছু বেশি বয়স আমার।'

ঃ 'কোন ধর্মের অনুসারী আপনি?'

ঃ 'আমার ধর্মের কোন নাম নেই' – বৃদ্ধ জবাব দিলেন– 'বাপদাদারা সূর্যের পূজা করতেন। কখনো আগুন জ্বালিয়ে তার উপাসনা করতেন। তারা সবাই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল। আমি ওসব উপসনা ছেড়ে দিই। আর খুঁজতে থাকি সেই খোদাকে যাকে কেউ খোঁজে সূর্যের দিগন্ত প্রসারী জ্যোতির মধ্যে, কেউ আগুনের লেলিহান শিখার মধ্যে, কেউ তরঙ্গায়িত অথৈ জলরাশির মধ্যে, কেউ আকাশের বিদ্যুৎ চমকের মধ্যে এবং কেউ খোঁজে বিনাশী ঝড়ের অদম্য বার্তার মধ্যে। বয়সের সিঁড়ি আমি যত ভাঙ্গতে লাগলাম ততই অনুভব করলাম আমার খোদা আমার অস্তিত্বের মধ্যেই মিশে আছেন। তারপর আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উপলব্ধি করলাম আমি নিজেই আমার স্রষ্টা।... বয়সের চিহ্ন যখন আমার চুলকে স্পর্শ করলো – চুলগুলো সাদা হয়ে উঠতে শুরু করলো তখন যেন এই রহস্যের পর্দা উন্মোচিত হলো যে, খোদার খোঁজ তো সেই পায় যার মনে তার বান্দার ভালোবাসা চর্চিত হয়।'

সাদ (রা) ও তার সঙ্গীরা বৃদ্ধের কথা শুনছিলেন গভীর তন্ময়ে। বৃদ্ধের কথায় যেন কী এক জাদুময়তার আভা ছিলো।

'আমি মাদায়েন যাই' – বৃদ্ধ গেলেন – 'শাহীমহলের সারির দিকে তাকিয়ে থাকি। সেগুলোর রূপ দেখি। বাদশাহদের জাঁকজমক, বিলাস সামগ্রী দেখি। সেই শরাবের গন্ধ শুঁকি, যার অন্ধ নেশা বাদশাহদের খোদার আসনে বসায়। সেই রূপের পালক গায়ে দেয়া তন্বী সুন্দরীদের দেখি, যাদের চুম্বকীয় যৌবনের স্বাদ নিয়ে রাজরাজড়ারা প্রশান্তি অনুভব করে। এরপর আবার আমি বাবেলের এসব ধ্বংসচিহ্নে ফিরে আসি আর ভাবি, মানুষ নিজেকে নিজে কতভাবে ধোঁকা দেয়, প্রতারণা করে, কিন্তু এর পরিণতির কথা তার মনে উদয় হয় না...আপনাকে আমি জিজ্ঞেস না করেও বলে দিতে পারি যে, আপনি আরবের সিপাহসালার। আপনি সম্ভবতঃ জানেন, কোথায় আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন। এটা বাবেল! এটা ছিলো বিশাল বিশাল উপাসনালয় ও ইবাদতখানার শহর। আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন, এই শহরে ছিলো একটি ঝুলন্ত উদ্যান। আজকের মানুষ ভাবতেও পারবেনা সেই উদ্যান কিভাবে তৈরী করা হয়েছিলো। সেটা না জমীনের ওপর ছিলো না আসমানের ওপর। বলা হয়, সেই উদ্যানে এসে লোকেরা মনে করতো এটাই বুঝি পরকালের জান্নাত'...

'কোথায় সেই উদ্যান?... তার চিহ্নও নেই আজ। রাজরাজড়াদের মহলগুলো ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকে এমন কানায় কানায় পূর্ণ ছিলো যে, সাধারণ মানুষ এর সৌন্দর্যের কথা কল্পনাও করতে পারবে না। হুরপরীর সৌন্দর্যকেও হার মানায় এমন দুই শাহযাদী শহরের এদিক ওদিকে এমন উচ্ছলতা নিয়ে ঘুরে বেড়াত, যেন ঝুলন্ত উদ্যানের বৃক্ষমেলার মধ্যে রঙবেরঙের পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। তাদের কাকলিতে শহরময় থাকতো মুখর। পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞান আর সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু ছিলো এই শহর। কত বিজয়ী দল এসেছে এখানে। প্রত্যেকেই এই শহরের কাঠামো মজবুত করেছে আর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। সুদৃশ্য মিনার নির্মাণ করেছে। প্রত্যেক বিজয়ী দলই তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্পর্শ রেখে গেছে। বাবেল কত সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করছে। কত বৈচিত্র্য রূপমাধুর্য সে লালন

করেছে। কিন্তু এখানকার রাজা বাদশাহরা খোদা বনে গিয়েছিলো। মিসরের অত্যাচারী ফেরআউন ছিলো। কিন্তু এখানকার রাজা বাদশাহরা ফেরআউনের চেয়ে কম ছিলো না কোন অংশে। .... আপনারা কি তা জানেন?'

ঃ 'হ্যাঁ মহামান্য!' – সাদ (রা) বললেন– 'আমরা সবই জেনেছি। এই শহরের কথা আমাদের সেই পবিত্র গ্রন্থে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ যা আমাদের রাসূলুল্লাহ (স) এর ওপর নাযিল করেছেন। আমরা এ গ্রন্থকে কুরআন বলে থাকি। আল্লাহতাআলা আমাদেরকে এসব রাজা বাদশাহদের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে– 'সুলাইমানের রাজত্বকালে তারা যা পাঠ করতো তা ছিলো শয়তানের বিদ্যা। সুলাইমান কুফরী করেননি। বরং শয়তান কুফরী করেছে। সে ঐ শহরের লোকদেরকে জাদু শেখাতো যে শহরে – বাবেলে হারুত ও মারুত নামক দুই ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়েছিলো.....' সাদ (রা) শেষ পর্যন্ত আয়াতটি পাঠ করলেন।

ঃ 'সিপাহসালার! আপনি জাদুর কথা বলেছেন' – বৃদ্ধ বললেন – 'সেই জাদু তো আজও প্রয়োগ করা হচ্ছে। মাদায়েনে ইহুদী পাদ্রীরাও আছে। তারা জাদু বিদ্যায় পারদর্শী বলে স্বীকৃত। আমার বিশ্বাস পারস্য সম্রাট তাদের থেকে জাদুর সাহায্য নিচ্ছে। একদিন আমি এক পাদ্রীকে শাহে ফারেসের মহল থেকে বেরোতে দেখেছি। এতে আমার সন্দেহ হলো যে, সম্রাট তাদের সাহায্য নিচ্ছে ... আমি দেখতে পাচ্ছি, বিজয় আপনাদেরই হবে। সালতানাতে ফারেসের সিংহাসন আপনাদের পদতলে চুমু খাবে।'

ঃ 'এসব কিছুই আল্লাহর হাতে' – সাদ (রা) বললেন– 'আমাদের এত ফৌজ নেই যা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। আল্লাহর হুকুম নিয়ে এসেছি আমরা। তাই পালন করি। তারপর এর পরিণাম তার মহান দরবারে সোপর্দ করি। আমাদের বিজয় হবে – একথা বলার শক্তি আমার নেই। তিনি কি মঞ্জুর করে রেখেছেন তা কেইবা জানে।'

ঃ 'এই বিজয়ের ব্যাপারে আমি এজন্য ভবিষ্যদ্বাণী করছি না যে, পারস্যের অর্ধেক সৈন্য নিহত হয়েছে এবং যারা বেঁচে আছে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে' – বৃদ্ধ বললেন– 'বরং আমি যা দেখছি তা অন্য কিছু। মানুষ তো নিজেকেই নিজে পরাজিত করে। ফারসী জেনারেলরা ময়দান থেকে পালিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নেয়। তারপর সিপাহীরাও আসে এবং তাদের সঙ্গে জেনারেল ও অন্যান্য অফিসারদের রক্ষিতা মেয়েগুলো আসে। আমি ভেবেছিলাম, এরা একাট্টা হয়ে এই পোড়ো শহরকে কেল্লা বা মোরচা বানিয়ে আপনাদের সঙ্গে লড়ে যাবে। কিন্তু এখানে এসে তারা শরাবে নিজেদের ভাসিয়ে দিলো। রক্ষিতা ও প্রেমিকাদের নিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে লিপ্ত হলো। তারপরই আমি ওদেরকে এখান থেকে পালাতে দেখলাম। তারা খবর পেয়েছিলো, আরবরা বড় দ্রুত এগিয়ে আসছে। পথে যে শহর বা গ্রাম পড়ছে তার আমীর ও অন্যান্যরা তাদের আনুগত্য গ্রহণ করে নিচ্ছে এবং তাদেরকে সব ধরনের সাহায্যও দিচ্ছে। জেনারেল ও অফিসাররা পালানোর পর সেনাকর্মকর্তা ও সাধারণ সৈন্যরা এই মেয়েদের ইয্যত নষ্ট করতে লাগলো এবং এজন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে পরস্পরের রক্ত নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেও তারা কসুর করলো না'...।

'যুদ্ধের ময়দানেও যে ফৌজের লোলুপ দৃষ্টি নারী আর মদের সুরাতে আটকে থাকে তাদের সংখ্যা শত্রুর তুলনায় দশ বারো গুণ বেশি হলেও তারা ময়দানে দাঁড়াতে পারবে না। এই বাবেলের পতনও কি এই নারীসক্তির জন্য নয়? নারী, মদ, সীমাহীন ভোগবিলাস আর রাজরাজড়াদের ফেরআউনী দম্ভ, অহংকার এসব তো তাদের জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলো। ...নমরূদ, ফেরআউন এদের কথা নিশ্চয় আপনারা শুনেছেন। ফেরআউন যেমন নিজেকে মিসরের খোদা বলে দাবী করেছিলো, নমরুদও নিজেকে এই এলাকার খোদা বলে দাবী করেছিলো। কিন্তু তার মৃত্যু হয়েছে এই কয়েদখানায়।'

ঃ 'হ্যাঁ মান্যবর!' – সাদ (রা) বললেন– 'মিসরের ফেরআউন ও এই এলাকার নমরুদ সম্পর্কেও আমরা জেনেছি। এদের কথাও আমাদের কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। আপনি সম্ভবত জেনে থাকবেন, নমরুদকে আমাদের নবী হযরত ইবরাহীম (আ) এই কয়েদখানায় বন্দী করেছিলেন। ইবরাহীম (আ) ছিলেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা, যাকে তিনি তার বান্দাদের কল্যাণের পথে পরিচালিত করার জন্য পয়গম্বরী দান করেছিলেন।... নমরুদ বলেছিলো, একজন সাধারণ প্রজাকে সবাই সম্মান করবে এটা আমি কি করে মেনে নেবো? ইবরাহীম (আ)কে সে বন্দী করে হুকুম দিলো, বড় করে আগুন জ্বালিয়ে একে গভীর আগুনে নিক্ষেপ করো। ভয়াবহ ধরনের আগুন জ্বালিয়ে তাঁকে যখন নিক্ষেপ করা হলো, তিনি তখন একটুও ঘাবড়ালেন না। যেন আগুনের কোন শক্তিই নেই। আল্লাহ তাআলা হুকুম দিলেন... হে আগুন! তার জন্য তুমি নাতিশীতোষ্ণ হয়ে যাও।... ইবরাহীম (আ) আগুনে গিয়ে দেখলেন, এ যেন কোন মিষ্টি শীতল বাগান। শেষ পর্যন্ত এই নমরুদই ইবরাহীম (আ) এর হাতে বন্দী হয়।'

ঃ 'তবুও তো কেউ শিক্ষা নেয় না' – শুভ্রকেশী বৃদ্ধের কণ্ঠে হতাশার সুর– 'যারা মানুষকে নিজেদের গোলামে পরিণত করেছে তাদের পরিণাম তো এমনই হয়েছে।... মানুষের আদি স্বভাব হলো, তার অতীতের সব ভুল, সব অপরাধ ভুলে গিয়ে বর্তমানের অন্ধকার জীবনকেই সে সবচেয়ে মূল্যবান মনে করে। অতীত থেকে যারা শিক্ষা নেয় না, শিক্ষা নিতে জানে না, তাদের সমাপ্তি ঘটে ধ্বংসের অতলে গিয়ে। প্রাচুর্য আর উন্মত্ত বিলাসের চূড়ায় উঠে যারা প্রশান্তি খোঁজে, উঠতে উঠতে একদিন তারা সূর্যের পূজারী হয়ে যায়, এটা দেখে না যে, এই সূর্য দিনমান ঘুরে এক সময় ডুবেও যায় ... আপনারা এই পোড়া শহরে ঢুকে দেখুন, পারস্য সম্রাটদের যারা রক্ষাকারী ছিলো তারা আজ দীর্ঘশ্বাস আর আর্তনাদ ছাড়া কিছুই দিতে পারছে না।'

সাদ (রা) তার সঙ্গীদের নিয়ে এগিয়ে গেলেন।

সত্যিই, অসংখ্য রাজরাজড়াদের প্রাচুর্যের ওপর, তাদের রক্তমাংসের ওপর শহর থেকে শহর ব্যাপী যে সব প্রাসাদ দুর্গ গড়ে উঠেছিলো তার আধো কঙ্কাল আধো মাংসল ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকালে শরীরে ভয়ের হিমস্রোত বয়ে যায়। প্রাসাদগুলোর অধিকাংশ দালানই চুন সুরকির স্তূপে পরিণত হয়েছে। কিছু কিছু দালানের স্তম্ভগুলো একা নিঃসাড় দাঁড়িয়ে আছে। কোনটার ওপরের অংশ কোন ঝড়ের আচড়ে উড়ে গেছে। কোথাও কোথাও দু' একটি প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও হেলে পড়েছে। কোন

মহলেরই ছাদ অক্ষত নেই। কোন কোনটার ছাদ প্রাচীরের অনেকাংশসহ ঝুলে পড়ছে। সাপ, বিচ্ছু, পেঁচা বড় বড় বাদুরেরই রাজত্ব এখন সেখানে।

সাদ (রা) সৈন্যদের চারপাশে অনেক দূর পর্যন্ত ধ্বংসাবশেষের ভেতর খোঁজার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তিনি নিজে নমরুদের প্রাসাদ দুর্গের ভগ্নাবশেষের দিকে চলে গেলেন। কত ধরনের কীট পতঙ্গ আর পোকামাকড় যে সেখানে বিচরণ করছে তার বর্ণনা অসম্ভব।

ঃ 'আহ মানবজাতি!' – সাদ (রা) এর মুখ থেকে অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এলো। তিনি সূরা হুদের একটি আয়াত পাঠ করলেন–

'যখন আপনার প্রভুর নির্দেশ এলো তখন সেসব জাতির ধ্বংস

ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। পাপের কারণে তিনি যখন কোন জনপদকে পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও এমনই হয়ে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহর পাকড়াও বড়ই কঠোর।'

এমনই আরেক জাতি মহান রবের হাতে ধৃত হচ্ছে, যারা সূর্য ও আগুনের পূজা করতো। যাদের শাসকদের সামনে লোকেরা সিজদায় নুয়ে পড়তো। সেসব শাসকদের যুদ্ধ শক্তিরা – যারা দুনিয়ার বড় বড় শক্তির জন্য ত্রাস ছিলো – তারা আজ বাবেলের ধ্বংসস্তূপে পড়ে কাতর ধ্বনি করছে। নিজেদের ক্ষত নিজেরাই চেটে খাচ্ছে।

ফারসী ফৌজের এই আহতদের সংখ্যা প্রায় দু' হাজার ছিলো। যারা উঠতে পারলো তারা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ভেতর থেকে বাইরে চলে এলো। যারা মারাত্মক আহত ছিলো তারা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলো। তারা প্রত্যেকেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো। তাদের অফিসারদের অভিশাপ দিচ্ছিলো। আর তাদের শাসকদের গালাগাল করছিলো।

ঃ 'সিপাহসালার!' – সাদ (রা)কে বনী তামীমের এক সরদার বললো– 'যখমীর সংখ্যা তো কম নয়। তারা তাদের সালার ও বাদশাহদের অভিশাপ দিচ্ছে। অনেকে বলছে, তারা ইসলাম গ্রহণ করতে চায়। কেউ কেউ বলছে, পুরো খান্দানসহ মুসলমান হয়ে যাবে।'

ঃ 'না' – সাদ (রা) বললেন– 'তারা তাদের প্রাণভয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে চাচ্ছে। তারা ভেবেছে, আমরা তাদেরকে এ অবস্থাতেই রেখে চলে যাবো আর তাদের যখম থেকে রক্ত ঝরতে ঝরতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে তারা। এ অবস্থায় ওদেরকে মুসলমান বানালে এটা জোরজবরদস্তি হবে। মন থেকে এরা মুসলমান হবে না। তাদের ক্ষতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দাও। পানি পান করাও। এরা হয়তো কয়েকদিনের ক্ষুধার্ত। ওদেরকে খাবার দাও। তাদেরকে বলো, তোমরা এখন আমাদের আশ্রয়ে রয়েছো, তোমাদের ওপর কোন জোরজবরদস্তি ও জুলুম করা হবে না... তবে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়াগুলো নিয়ে নাও।'

সিপাহসালারের নির্দেশ সঙ্গে সঙ্গেই বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গেলো।

তারপর চার-পাঁচ জন মেয়েকে সাদ (রা) এর সামনে আনা হলো। পাষণ্ডরা তাদের কুমারিত্ব তাদের হিংস্র থাবায় হরণ করে নিয়েছে। তবুও তাদের সৌন্দর্যের আভা ম্লান

হয়নি। কিন্তু তাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এতই খারাপ যে, তারা পা চালাতে পারছিলো না। এ ভয়ে আর্তনাদ করছিলো যে, মুসলমানরাও তাদের সঙ্গে তাই করবে, যা করেছে তাদেরই রক্ষক ফৌজি অফিসার ও কর্মকর্তারা।

সাদ (রা) তাদেরকে অভয় দিলেন যে, তাদের সঙ্গে মুসলমানরা স্রেফ সেই আচরণই করবে যা এক ভাই তার বোনের সঙ্গে করে থাকে। কিন্তু তারা এই বলে আর্তনাদ তুলছিলো যে, তাদেরকে যেন জীবিত রাখা না হয়।

ঃ 'তোমরা কি তোমাদের ঘরে ফিরে যাবে না?' – তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো।

ঃ 'না' – সবাই একসঙ্গে যেন করুণা ভিক্ষা চাইলো – 'আমাদের কেউ জীবিত থাকতে চায় না।'

ঃ 'তোমাদেরকে আমি এমন জীবনের সন্ধান দেবো যে, তোমরা তখন আর মৃত্যু চাইবে না, জীবন উপভোগ করতে চাইবে' – সাদ (রা) বললেন– 'আমাদের নারীদের সঙ্গে তোমরা থাকবে। কোন পুরুষ তোমাদের কাছ দিয়েও ঘেঁষবে না'।

সাদ (রা) এর নির্দেশে তাদেরকে ঘোড়ায় করে দূরের মহিলা ছাউনীতে পৌছে দেয়া হলো।

দজলা নদীর এক প্রান্তে মাদায়েন, আরেক প্রান্তে বাহারশীর অবস্থিত। অর্থাৎ মাদায়েন ও বাহারশীর একটাই শহর। দজলা দুই শহরের মাঝখানে বিভাজন তৈরী করে দিয়েছে।

মাদায়েন শহরের রক্ষাবাঁধটি নদী থেকে আড়াই তিন ফার্লং দূরে ছিলো। বর্ষার মৌসুমে নদীতে পানি বেড়ে গেলে নদী গিয়ে পৌছতো শহরের প্রাচীর পর্যন্ত। এমনিতে সে এলাকাটি ঢালু ছিলো। বর্ষার পরও সে জায়গাটায় বিলের মতো পানি ভরে থাকতো। এজন্য এর তীর ঘেঁষে বিরাট সুদৃশ্য জঙ্গলের সৃষ্টি করেছিলো। বড় বড় গাছের ঘন ছায়ায় দিনের বেলায়ও জঙ্গলটি গাঢ় অন্ধকারে ডুবে থাকতো।

নদীর কুল ঘেঁষে মাল্লা-মাঝি ও জেলেদের কর্মতৎপরতা দেখা যেতো। কিন্তু তাদের কেউ ভুলেও সেই বিলের ধারে যেতো না। এই বিলটি তাদের কাছে যত অমঙ্গল আর অশুভর আখড়া ছিলো। এর পানিতে নাকি মাঝে মধ্যে অশরীরি অনেক কিছু ভেসে উঠতে দেখতো তারা। এছাড়াও পানিতে মানুষ খেকো কয়েকটি কুমীর ছিলো। আরো ছিলো বিশ বাইশ ফিট লম্বা জলচর এক বিশাল অজগর। মানুষ গরু ছাগলসহ যে কোন প্রাণীই এক নিঃশ্বাসে গিলে ফেলতো।

রাতে জঙ্গল থেকে শোনা যেতো পেঁচার গা চমকে দেয়া ডাক। ঘন বৃক্ষের আড়ালে আবডালে মানুষ খেকো শকুন শকুনী লুকোচুরী খেলতো। অসংখ্য বাদুরের অবিরাম চিৎকার চেচামেচিতে দিনের বেলায়ও গায়ে কাঁটা দিতো।

লোকেরা বলতো, সেখানে ভূত প্রেত আর কতগুলো নারী-প্রেতাত্মার আড্ডা রয়েছে। প্রমাণস্বরূপ অনেক দিন ধরেই তাদের চোখে ধরা দিচ্ছিলো ঘন বৃক্ষের ফাঁক ফোঁকর থেকে বেরিয়ে আসা এক চিলতে আলোর ঝলক। রাতের বেলায় সেটা দেখা যেতো। মাঝি ও জেলেদের কাছ থেকে শহরবাসী জানতে পারলো ঐ ঘন জঙ্গলের গভীরে নলখাগড়ার ওপর একটি কুটির দেখা যায়। এর আগে সেটা দেখা যায়নি কোন দিন।

শহরের লোকদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো এটা। শহরের প্রাচীরে দাঁড়ালে সেটা দেখা যেতো মাঝে মধ্যে। এজন্য লোকেরা দল বেঁধে রাতের বেলা শহরের প্রাচীরে গিয়ে ভীড় করতো। আর ভূত-প্রেত নিয়ে রসালো গল্পে মজে যেতো।

ঃ 'শহরে এবার বড় এক বিপদ ঘনিয়ে আসছে' – লোকেরা বলতো।

ঃ 'আরে বিপদ তো এসেই গেছে' – বৃদ্ধরা বলতো – 'আরবের মুসলমানরা আসমানী গজব হয়ে আসছে। আমাদের নিয়মিত ফৌজের এখন অর্ধেকও অবশিষ্ট নেই। আর যারা আছে, প্রাণভয়ে তারা না জানি কোথায় কোথায় আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

শহরবাসীর এই ভয় আশংকা ও কৌতূহলের কথা শাহী মহল পর্যন্ত পৌঁছলে সেখান থেকে হুকুম এলো, দিন বা রাতে শহরের কেউ শহরের প্রাচীর বাঁধে উঠতে পারবে না। কেউ ধরা পড়লে সেখানেই তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে।

কেন এই ফরমান জারী হলো শহরবাসীর কেউ তা জানতে পারলো না।

শাহে ফারেস ইয়াযদগিরদ, নাওরীন ও পুরানরা জানতো, নদীর পারের সেই ভয়ংকর জঙ্গলে মাঝে মধ্যে রাতে যে আলো দেখা যায় সেটা কি। তাদের সব ভরসা এখন এই আলোর ওপরেই। নিজেদের মধ্যে তারা এ বিশ্বাস তৈরী করে নিয়েছিলো যে, এই আলোর প্রভাবই মুসলমানদেরকে অন্ধ ও দুর্বল করে ফেলবে এবং শাহে ফারেসের সামনে তারা এসে আত্মসমর্পণ করে তার গোলাম হয়ে যাবে।

কাদিসিয়ায় পারসিকদের পিছু হটার খবর যখন মাদায়েনের শাহী মহলে এসে পৌঁছলো তখন মাদায়েনের এক ইহুদী পাদ্রী ইয়াযদগিরদকে গিয়ে বলে, সেই এখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন কিছু করতে পারে যাতে মুসলমানদের অগ্রযাত্রাই কেবল ব্যাহত হবে না, তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

তবে এজন্য পাদ্রীর কয়েকটা জিনিস প্রয়োজন। তা পাওয়া গেলে সে এমন জাদুর চাল চালবে যে, মুসলমানদের সালাররা শারীরিকভাবে অক্ষম তো হবেই, তাদের বুদ্ধিসুদ্ধিও লোপ পেয়ে যাবে। একটি কুমারী তন্বী মেয়ে, দুটি পেঁচা, তিন দিনের চেয়ে কম বয়সের একটি নবজাতক শিশু এগুলোসহ আরো কয়েকটি জিনিস সে চেয়েছিলো।

এগুলো যোগাড় করতে বেশ কয়েকদিন লেগে যায়। যে কোন সুন্দরী কুমারী মেয়ে যোগাড় করা শাহী মহলের জন্য কঠিন কোন বিষয় নয়। যে কোন পিতা মাতাই শাহীমহলে তাদের মেয়েকে সোপর্দ করতে পারলে গর্ববোধ করতো। ইহুদী পাদ্রীকে তার প্রয়োজনমতো একটি মেয়ে সরবরাহ করা হলো। মেয়েটিকে এটা বলা হলো না, তাকে শাহী হরমের অন্দর মহলের জন্য নয় এক ইহুদী পাদ্রীর জন্য নেয়া হয়েছে।

পাদ্রী মেয়েটিকে তার উপাসনালয়ে নিয়ে গেলো। বিশেষ ধরনের খাবার দিতে লাগলো তাকে। প্রতিদিন অর্ধেক রাতের পর পাদ্রী মেয়েটিকে তার সামনে নিয়ে বসতো। তারপর তার কাপড় খুলে কিছুক্ষণ পর একটি কালো আলখেল্লা পরাতো। আলখেল্লার উপরি অংশ দিয়ে মেয়েটির মাথা ঢেকে দিতো। তারপর পাদ্রীর একটি হাত মেয়েটির মাথায় রেখে বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে তার এক কান এবং মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে তার আরেক কান ঘঁষতে থাকতো এবং মুখে বিড়বিড় কিসব বলে যেতো। দিনে মেয়েটিকে তার নিজের কাপড়েই রাখতো এবং নানান ধরনের উপাসনা করাতো।

ঃ 'হে পবিত্র পিতা!' – একদিন মেয়েটি ইহুদীকে জিজ্ঞেস করলো– 'এসব কি? আমাকে আমার ঘর থেকে কেন আনা হয়েছে? আমি তো অন্য কিছু ধারণা করেছিলাম।'

ঃ 'হ্যাঁ, মেয়ে!' – পাদ্রী বললো– 'তুমি যা ভেবেছিলে তাই ঠিক। তুমি এতদিন ধরে এখানে এসেছো। তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছো, তোমার মতো এমন পরমা সুন্দরী ও আকর্ষণীয় শরীরের প্রতি আমার কোন লোকই লোভ দেখায়নি। তোমার সঙ্গে কেউ অপ্রয়োজনীয় কথাও বলেনি। তোমাকে ও তোমার দেহ পবিত্র রাখা হবে।'

ঃ কিন্তু কেন?

ঃ 'কারণ তুমি শাহে ফারেস ইয়াযদগিরদের রাণী হতে যাচ্ছো'–ইহুদী পাদ্রী বললো– 'তুমি হয়তো তাকে দেখেছো। অত্যন্ত সুদর্শন ও বিচক্ষণ। তিনি তোমাকে অন্দর মহলে রাখবেন না। তোমাকে রাণী বানানোর জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তোমার মধ্যে সেসব রূপ গুণ সৃষ্টি করা যা একজন রাণীর জন্য প্রয়োজন।'

মেয়েটিকে ভাবী রাণীর স্বপ্নে পেয়ে বসলো। যেন এখনই সে রাণী বনে গেছে।

ইয়াযদগিরদ ইহুদী পাদ্রীকে ডেকে মাঝে মধ্যে জিজ্ঞেস করতো। তার জাদু কদ্দুর এগুলো। পাদ্রী প্রায়ই একটি জবাব দিতো, সে সময় নষ্ট করছে না। এমন মারাত্মক জাদু এত জলদি শেষ হওয়ার নয়।

প্রতিদিন ইয়াযদগিরদের কাছে নিজের ফৌজের পিছু হটা ও মুসলমানদের অগ্রযাত্রার খবর আসছিলো। ইয়াযদ একদিন অনুভব করলো দিন দিন তার পায়ের তলার শক্ত মাটি নরম কাদা হয়ে সরে যাচ্ছে। ইরাকের পুরোটাই তার হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। পেরেশানী, দুশ্চিন্তা ও হতাশায় তাকে এতো কাবু করলো যে, একদিন সে ইহুদী পাদ্রীকে ডেকে পাঠালো।

ঃ 'আপনার দ্বারা কিছু যদি না হয় আমাকে বলুন' – ইয়াযদগিরদ গম্ভীর গলায় বললো– 'আপনাকে আমি এজন্য কোন শাস্তি দেবো না।'

ঃ 'আমার উপাসনালয়ে যে কাজ ছিলো তা শেষ হয়ে গেছে' – পাদ্রী বললো– 'আমি নদীর পারের সেই ঘন জঙ্গলে একটি ঝুপড়ি তৈরী করিয়েছি। মেয়েটিকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি। পেঁচা দুটি সেখানে পৌছে দেয়া হয়েছে। চার-পাঁচ দিন পর আমার নবজাতকের প্রয়োজন পড়বে।'

ঃ 'আপনি কি জানেন মুসলমানরা কোথায় পৌঁছে গেছে?' – ইয়াযদগিরদ বললো– 'বুরুস তাদের কব্জায় চলে গেছে। কূসায় শাহরিয়ারের মতো জেনারেল মারা গেছে। এই শহরও মুসলমানদের দখলে এখন। 'সুরা' ও'দিরা শহরও এখন মুসলমানদের হাতে। বাহারশীর এখন তারা অবরোধ করে রেখেছে। অথচ আপনি দিনের পর দিন নষ্ট করছেন। মুসলমানরা যখন মাদায়েনে ঢুকে পড়বে তখন বুঝি আপনি আপনার কাজ দেখাবেন?'

ঃ 'শাহেনশাহে ফারেস!' – পাদ্রী বললো– 'আপনি আমার কয়েকটি কথা ভুলে গেছেন। আমি বলেছিলাম, যে কোন মূল্যেই হোক, আপনি আপনার ফৌজের মনোবল বৃদ্ধি করুন। এজন্য আপনাকে ময়দানে নামতে হলেও আপনি পিছপা হবেন না। আমি আশা করেছিলাম, আমাদের ফৌজ কোথাও না কোথাও মুসলমানদের রুখতে পারবে এবং কিছু দিন তাদেরকে থামিয়ে রাখতে পারবে। এতে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা পিছিয়ে পড়বে। এ সময়ের মধ্যে আমি আমার কাজ শেষ করে ফেলবো। কিন্তু আমাদের ফৌজ কোথাও পা জমানোর চেষ্টা করেনি...একজন মানুষের ওপর জাদু প্রয়োগ করলে অল্প সময়ের মধ্যেই তা কার্যকরী হয়। কিন্তু একটি সৈন্যবাহিনীকে জাদুর জোরে প্রতিহত করতে গেলে নিশ্চয় অনেক সময় লাগবে। এই জাদু করার সময় আমার প্রাণেরও আশংকা কম নয়। আপনাকে খুশী করার জন্য যদি আমি তাড়াহুড়া করি তবে জাদু দুর্বল হয়ে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। অথবা উল্টো প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। তখন আপনার ও পারস্যের ধ্বংস আরো তরান্বিত হবে। একটা কাজ করতে পারেন আপনি, বাহারশীরে সেনাসাহায্য পাঠিয়ে দিন। অবরোধ এতে দীর্ঘ হবে। আপনার ফৌজের কাছে পয়গাম পাঠিয়ে দিন। গায়েব থেকে সাহায্য আসছে। জমে লড়ে যাও।'

পবিত্র কুরআনে আল্লাহতাআলা দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুত সম্পর্কে যে জাদুর কথা উল্লেখ করেছেন, এই ইহুদীর জাদু সে ধরনেরই ছিলো। আল্লাহতাআলা এটাকে শয়তানের কর্ম বলে চিহ্নিত করেছেন। ইহুদী স্বভাবের একটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা সে কাজই পছন্দ করে যার মধ্যে শয়তানের অন্তর্ভুক্তি রয়েছে। ইহুদীরা সবসময় মুসলমান ও সত্যের দুশমন ছিলো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা এর আগেও জাদুর প্রয়োগ করেছে। রাসূলুল্লাহ (স)কেও তারা জাদু করেছিলো এবং ধোঁকা দিয়ে বিষযুক্ত খাবার খাইয়েছিলো। মুসলমানদেরকে যখনই তারা সফল হতে দেখেছে কোথাও, সেখানেই তাদের ষড়যন্ত্রের ঘৃণ্য জাল বিস্তার করেছে। আর মুসলমানদের বিপক্ষ শত্রু শিবিরকে সব ধরনের সাহায্য করেছে। ইয়াযদগিরদকে তারা তো কাবু করেছিলোই। তাকে জাদু বিদ্যা দ্বারা সম্মোহনও করে নিয়েছিলো।

সে রাতেই ইহুদী পাদ্রী মেয়েটিকে নিয়ে দজলার কূল ঘেঁষা জঙ্গলের সেই কুটিরে যায়। পাদ্রীর সঙ্গে তার একটি যুবক শিষ্যও ছিলো। সে পাদ্রীও মেয়েটির জন্য রান্নাবান্না ও বিছানা পাটির ব্যবস্থা করতো। কুটিরের বাইরেই তাদের কাজকর্ম চলতো বেশি এবং রাতে।

পাদ্রী দুটি পেঁচাও জোগার করলো। কি এক ধরনের খাবার খাইয়ে সে দুটোকে বশ করে নেয়। ওগুলো উড়তে পারতো না। কুটিরে সব সময় লোবানের ধুনি জ্বলতো। রাতে পাদ্রী মেয়েটিকে কালো আলখেল্লা পরিয়ে আসন ধরে বসাতো এবং একটি পেঁচা তার ডান কাধে আরেকটি বাম কাঁধে বসিয়ে কি মন্ত্র জানি আওড়ে যেতো। রাতে কুটিরে যে ফানুসটি জ্বলতা সেটা দূর থেকে দেখা যেতো। লোকেরা এটাকেই কোন রহস্য বলে ভাবতে পছন্দ করতো। এখানে কোন মানুষ থাকতে পারে এটা তাদের ভাবনার বাইরে ছিলো।

কয়েকদিন পরেই মেয়েটি পাদ্রীর ইংগিতে বিড়বিড় করে কি সব বলে যেতো। পাদ্রী তাকে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করতো, আর সে এর জবাব দিতো। মেয়েটি যখন কথা বলতো তখন মনে স্পষ্ট হতো এটি এই মেয়ের কণ্ঠস্বর নয়। কোন অশরীরির শীতল কণ্ঠস্বর। পরিষ্কার বোঝা যেতো, মেয়েটির কণ্ঠ অন্য কেউ দখল করে বসে আছে।

ঃ 'না...এখন নয়। এখন কাজ হবে না...এখন হওয়া সম্ভব নয়।'

মেয়েটির মুখ থেকে এসব দুর্বোধ্য শব্দ বেরোত। তিন-চার রাত ধরে তার মুখ থেকে এই শব্দগুলোই বেরোতে লাগলো। পাদ্রী এর দ্বারা বুঝে গেলো, তার জাদু এই মেয়ের ওপর খুব ভালো ক্রিয়া করছে। পাদ্রী আসলে মেয়েটির মাধ্যমে ভবিষ্যত সময় সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলো এবং তার জাদুর প্রভাব কতটা শক্তিশালী এটাও সে দেখতে চাচ্ছিলো। মেয়েটি যখন বিড়বিড় করে কিছু বলতো, পেঁচা দুটিও এক ধরনের আওয়াজ করে কি যেন বলতো। জাদুর এই প্রতিক্রিয়ায় পাদ্রী বেশ খুশী ছিলো।

এখনো নবজাতককে আনা হয়নি। হয়তো ইহুদীর জাদুকর্ম সে স্তর পর্যন্ত এখনো পৌছেনি।

ইয়াযদগিরদ তার অসংখ্য কাসেদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ফৌজের উদ্দেশে পাঠিয়ে দিলো। সবাইকে এই পয়গাম দিলো যে, যে যেখানেই থাক সবাই যেন একাট্টা হয়ে যায়। অদৃশ্য জগৎ থেকে সাহায্য আসছে। সবাই যেন দৃঢ়পদ হয়ে লড়াই করে। মুসলমানরা এবার অবশ্যই পিছু হটতে বাধ্য হবে।

বাহারশীর আর মাদায়েনের দূরত্ব রেখা ছিলো কেবল দজলার অববাহিকা। ইয়াযদগিরদ সেখানেও পয়গাম পাঠিয়ে দিলো, যেখানেই আমাদের ফৌজ আছে সেখান থেকে তাদেরকে বাহারশীর নিয়ে এসো এবং বাহারশীরের প্রতিরক্ষা আরো মজবুত করো। যাতে মুসলমানরা সম্মিলিতভাবে এই শহর অবরোধ করলেও অবরোধ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। তারপর তারা যেন হতাশ হয়ে ফিরে যায়।

সাদ (রা) বাবেল থেকে মাদায়েনের দিকে আসার পথে অসংখ্য শহর ও গ্রামের অধিবাসীরা ও তাদের রঈস ও আমীররা এসে সাদ (রা) এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। তাদের কেউ কেউ ইসলামও গ্রহণ করে। অনেকে কর দিতেও সম্মত হয়।

তারপর তিনি বাহারশীর পৌঁছলেন। আগেই তিনি জানতে পেরেছিলেন হাশেম ইবনে উতবা বাহারশীরের বাঘকে এককভাবে তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করেছেন। সাদ (রা) হাশেমকে দেখেই তার গলা জড়িয়ে ধরে পরম স্নেহে মাথায় হাত রাখলেন এবং কপালে চুমু খেলেন। হাশেম ইবনে উতবা ঝুঁকে পড়ে পরম শ্রদ্ধায় সাদ (রা) এর পা স্পর্শ করলেন। হাশেম ছিলেন সাদ (রা)-এর ভাতিজা।

বাহারশীর থেকে মাদায়েন তো দেখা যেতোই, তার পদশব্দও যেন শোনা যেতো। নানান ধরনের অট্টালিকা, প্রাসাদ, হাজারো বৈচিত্র্যে ভরা অসংখ্য উদ্যানে ঘেরা বাবেল শহরের সৌন্দর্যের কথা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিলো। কিন্তু বাবেলের সৌন্দর্য-ঐতিহ্য ততদিনে গল্পের খাতায় চলে গেছে। তার ধ্বংসাবশেষ তার জন্য আহাজারী করছিলো। বাবেলের পরই ছিলো মাদায়েন। মাদায়েনকে তখন সবাই বলতো 'পরমা সুন্দরী' শহর। পারস্যের এই রাজধানী শহরের রূপ সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য রাজ্যের ধনভাণ্ডার উপুড় করে ঢেলে দেয়া হয়েছিলো।

মাদায়েন রোমকরাও দখল করে নিয়েছিলো। অসংখ্যবার আভ্যন্তরিন বিদ্রোহীদের কোন্দলে আক্রান্ত হয়েছিলো। কতবার তার শান্তি-নিরাপত্তা ধ্বসে পড়েছে। তার রাস্তাঘাট, অলিগলি রক্তে ভেসে গিয়েছে। কিন্তু এই শহরের রূপের গায়ে কেউ আচড় কাটতে পারেনি। এর উগ্রো সৌন্দর্য, জাদুময় আকর্ষণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। কোন পথিক সে শহরে আসলে সে জাদুগ্রস্ত হয়ে পড়তো যেন। তার মুখ দিয়ে কথা সরতো না। এখানকার সরাইখানা, নিষিদ্ধ পল্লী, মদশালা, নৃত্যশালা–এসবের মন পাগল করা আকর্ষণ দূর দূরান্তের পরদেশীকেও কাছে টেনে আনতো।

সাদ (রা) তাঁবু ফেলেছিলেন বাহার শীরের একটু দূরে দাজলার পারে। সেখান থেকে তিনি মাদায়েন দেখছিলেন। হীরার গোলকের মতো মাদায়েন জ্বলজ্বল করছিলো। শহর রক্ষার প্রাচীরের ওপরে নির্মিত বুরুজের চূড়া ছিলো স্বর্ণনির্মিত। দেখা যাচ্ছিলো শাহীমহলের গম্বুজ ও মীনারগুলো। কিসরার প্রাসাদ এতো উঁচু ছিলো যে, শহর-প্রাচীরের ওপার থেকেও স্পষ্ট দেখা যেতো। সেটা ছিলো যুগের অত্যাচর্য নির্মাণ শৈলীর এক বিস্ময়। ৫৫০ খ্রিস্টাব্দে নওশিরওয়ার যুগে এই প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিলো। এর প্রকৌশলী ও কারিগররা ছিলো রোমক ও গ্রিকের। এ জন্য এই প্রাসাদের গ্রিক ও রোমকীয় নির্মাণ ঐতিহ্যের নিদর্শনগুলো এর সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি করেছিলো।

প্রাসাদের সম্মুখভাগের মর্মর পাথরের চাতালটির প্রশস্ততা ছিলো ১৫০ মিটার। প্রাসাদের উচ্চতা ছিলো চল্লিশ মিটারের বেশি। এর গম্বুজ ছিলো পাঁচটি। প্রতিটি গম্বুজই সোনায় মোড়ানো ছিলো। মাঝখানের গম্বুজটি ছিলো সবচেয়ে বড় ও উঁচু। এর নিচেই ছিলো কিসরার রাজদরবার ও সিংহাসন। হীরা, পান্না, মুনিমুক্তা এবং দুর্লভ সব পাথর দ্বারা এটি জড়ানো ছিলো। বিশাল সিংহাসনটির অবকাঠামো ছিলো খাঁটি স্বর্ণের তৈরী। স্বর্ণের পরিমাণ ছিলো কয়েক মন।

সাদ (রা) এক পর্বতশৃঙ্গে উঠে তার ঘোড়ার ওপর সওয়ার ছিলেন। তার একপাশে ছিলেন যাহরা ইবনে হাওয়াইয়া অন্য পাশে হাশেম ইবনে উতবা। অনেকক্ষণ ধরে তিনি

মাদায়েনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এত বড় এবং এত সুন্দর জগৎ তিনি হয়তো এই প্রথম দেখছিলেন। মাদায়েন যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিলো। তাকে যেন বলছিলো, এটাই ইরাকের শেষ শক্তিধর শহর। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন এবং দু'হাত ওপরে তুলে মহান আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন। তারপর উঁচু আওয়াজে এই আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

'তোমরা (কাফেররা) না শপথ করে বলতে যে, তোমাদের পতন ঘটবে না?'

সাদ (রা) যেন পুরো পারস্যকেই জিজ্ঞেস করছিলেন – তোমাদের কি পতন ঘটবে না?

ঃ 'তোমরা বলোতো' – সাদ (রা) তার দুই প্রিয় সালার যাহরা ও হাশেমকে বললেন– 'ঐ যে শাহী মহলের গম্বুজ দেখা যাচ্ছে। কিসরা পারভেজ এর নিচেই সিংহাসনে বসে রাসূলুল্লাহ (স) এর সত্যের পয়গামটি ছিঁড়ে ফুঁ দিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছিলো। – তোমরা কি এই গম্বুজের কম্পন অনুভব করছো না?'

ঃ 'অবশ্যই... অবশ্যই সিপাহসালার' – উভয়ে আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে বললেন এবং আকাশপানে হাত উঠিয়ে ডাকলেন– 'হে আল্লাহ! আপনি তো শুনছেন!'

কাদিসিয়া থেকে পালিয়ে দলে দলে তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। এবার তাদের রুখ ছিলো বাহারশীর – অবশ্যই মাদায়েন হয়ে। তখনো তারা বাহারশীর থেকে কিছু দূরে ছিলো। সাদ (রা) রাতে সমস্ত সালার ও গোত্র সরদারদের তার তাঁবুতে ডাকলেন।

ঃ 'আমি জানি আমাদের মুজাহিদরা অত্যন্ত ক্লান্ত' – সাদ (রা) বললেন– 'জানি ক্লান্তি তাদের হাড়মজ্জা পর্যন্ত পৌঁছেছে। কিন্তু আমরা যদি বিশ্রামের জন্য সময় ক্ষেপণ করি তাহলে পারসিকরা ঐ শহরে একাট্টা হয়ে যাবে এবং আমাদের জন্য অনেক বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের এখনই হামলা চালানো উচিত। দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়া পলাতক ফারসীদের ভেতরে ঢোকানোর জন্য শহরের দরজা খোলা হয়েছে। শহরের ভেতরে যদি আমরা ঢুকতে পারি তাহলে ভেতরে যত ফৌজই থাক আমরা মোকাবেলা করতে পারবো। দরজা বন্ধ হয়ে গেলে কিন্তু এই অবরোধ অনেক দীর্ঘ হবে। শহরে হামলা করার জন্য মুজাহিদদের প্রস্তুত করো।'

মুজাহিদরা এদিকে হামলার জন্য তৈরী হচ্ছিলো। ওদিকে পারস্যের যেসব ফৌজ বাহাশীরের বাইরে দেখা যাচ্ছিলো, তারা বড় দ্রুত শহরে ঢুকে পড়লো এবং শহরের দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। একটু পরেই শহরের দেয়ালের ওপর তীর ধনুক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ফৌজের ভীড় দেখা যাচ্ছিলো।

বাহারশীরের যে দেয়ালটি নদীর দিকে ছিলো সেটা একেবারে নদীর অনেকখানিসহ নদীর মধ্যেই দাঁড়ানো ছিলো। এখান থেকে নদীর ওপর দিয়ে মাদায়েন পর্যন্ত পুল সংযুক্ত ছিলো। পুলও এতো মজবুত ছিলো যে, এর ওপর দিয়ে একসঙ্গে অনেক ফৌজ চলতে পারতো। সাদ (রা) জানতেন না রাতে এই পুল দিয়ে মাদায়েন থেকে ফৌজ ও অন্যান্য জরুরী সামগ্রী বাহারশীরে পাঠানো হয়। এভাবে ধীরে ধীরে এই শহরের প্রতিরক্ষা খুবই

মজবুত হয়ে গেলো। অবরুদ্ধ শহরের লোকেরা যদি খাবার-দাবারসহ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সবকিছু ঠিকমতো পায়, কোন অভাব দেখা না দেয় তবে সে শহরের অবরোধ দীর্ঘ হতে বাধ্য। বাহারশীরে খাদ্যের কোন কমতি ছিলো না। কয়েক বছরের খাবার সেখানে মজুদ ছিলো।

ইয়াযদগিরদ বাহারশীরকে দুর্ভেদ্য কেল্লার রূপ দিতে সব প্রচেষ্টাই ব্যয় করলো। রাতে নিজেই ফৌজের সবকিছু দেখভাল করতো। বাহারশীরে এসে দেখে যেতো লোকজনের মনোবল অটল আছে কিনা।

ইয়াযদগিরদের চেয়ে পুরানের দেশপ্রেম আরো কয়েক গুণ বেশিই ছিলো। পুরান তার সেই পদ্ধতি অব্যাহত রেখেছিলো। সে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মাদায়েনের পথে পথে ঘুরে বেড়াতো আর এখানে সেখানে লোকদের জমায়েত করে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করে লোকদের উত্তেজিত করে তুলতো। বাহারশীরের লোকেরা তার কথায় এতই প্রভাবান্বিত হলো যে, ছোট ছোট বাচ্চারা পর্যন্ত পারস্যের জন্য জানবাজী রাখতে প্রস্তুত হয়ে গেলো। তাদের ভয়-ডর সব দূর করে দিলো পুরান।

ঃ 'তোমরা দেখতে পাচ্ছো, মুসলমানরা ইরাকের অর্ধেকেরও বেশি দখল করে তোমাদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে' – মাদায়েন ও বাহারশীরের অলিগলিতে পুরানের এই গর্জন সবসময় শোনা যেতো– 'আমাদের জেনারেল ও আমাদের ফৌজের একটা অংশ এমন কাপুরুষ ছিলো যে, মাত্র কয়েক হাজার মুসলমানের সামনে দাঁড়াতে পারলো না'–পুরান লোকদের উস্কে দেয়ার জন্য একথা অবশ্যই বলতো– 'যেসব শহরে মুসলমানরা দখল করে নিয়েছে, সেসব শহরের সমস্ত যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে তারা নিজেরা ভোগ করছে। আর যারা বেশি সুন্দরী তাদেরকে আরবে পাঠিয়ে দিয়েছে। তোমরা জানো না মুসলমানরা কেমন নিষ্ঠুর ও হিংস্র জাতি। গৃহপালিত যত পশু আছে তারা সব নিয়ে নিয়েছে। এখন তারা ওগুলো যবাই করে খেয়ে খেয়ে সাবাড় করছে। ধর্মীয় নেতা, বড় বড় আমীর, রঈস ও সম্মানিত লোকদের তারা গোলাম বানিয়ে রেখেছে। মুসলমানদেরকে যদি তোমরা এখানেই শেষ করে না দাও, তাহলে তোমাদেরও এ অবস্থা হবে। তোমাদের চোখের সামনে তোমাদের মেয়েদের বোনদের দাসী ও রক্ষিতায় পরিণত করবে। তোমাদের ঘরের সঞ্চিত সব ধনভাণ্ডার মুসলমানরা হাতিয়ে নেবে। অনাহারে অর্ধাহারে তখন তোমরা ভিক্ষার ঝুলি বয়ে বেড়াবে। এটাও মনে রেখো, আমাদের দেবতা ও যরথ্রুষ্টের যে অভিশাপ তোমাদের ওপর নেমে আসবে তা হবে আরো ভয়াবহ। এখানে যদি তোমরা আরবদের বিরুদ্ধে জমে লড়াই চালিয়ে যাও তাহলে সূর্যদেব এমন এমন নেয়ামত দিয়ে তোমাদেরকে শক্তিশালী করে তুলবেন যে, তোমরা তা কল্পনাও করতে পারবে না।'

সাদ (রা) যখন অগ্রসর হয়ে বাহারশীর পুরোপুরি অবরোধ করে নিলেন তখনই তিনি টের পেলেন, নদীর ওপার থেকে শহরে নিয়মিত সেনাসাহায্য ও প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ হচ্ছে। কিন্তু এটা বন্ধ করার কোন উপায় তার হাতে ছিলো না। কারণ নদীর মধ্যে শহরের যে দেয়ালটি ছিলো তার দৈর্ঘ্য ছিলো অনেক এবং পুলটির অবস্থান ছিলো

এমন জায়গায় যে, শহরের ভেতরে না গিয়ে এর কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব ছিলো না। মুসলমানদের অবস্থান থেকে পুলের ওপর তীর পৌঁছানোও সম্ভব ছিলো না। সেখান থেকে পুলটি অনেক দূরে ছিলো। এমনকি দৃষ্টিসীমার আড়ালে।

সাদ (রা) শহরের তিন দিক ঘুরে ফিরে দেখলেন। শহরের প্রাচীরের ওপর এত সংখ্যক তীরন্দায ও বর্শাধারী ফারসী সবসময় প্রহরায় থাকতো যে, দেয়ালের কোন অংশ ভেঙে বা দড়ির সাহায্যে দেয়ালে ওঠা একেবারে অসম্ভব ছিলো।

ঃ 'বন্ধুরা আমার!' – সাদ (রা) তার সালার ও সরদারদের ডেকে বললেন– 'তোমরা দেখতে পাচ্ছো, শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত মজবুত। আর আমরা এখন এমন প্রাণের ঝুঁকি নিতে পারিনা যে, শহরের প্রধান ফটক ভাঙ্গার জন্য মুজাহিদদের সামনে ঠেলে দেয়া হবে। সুতরাং অবরোধ শেষ পর্যন্ত দীর্ঘতর হবেই। এতে আমাদের লাভ শুধু এতটুকুই হবে যে, আমাদের ফৌজ বিশ্রামের যথেষ্ট সুযোগ পাবে এবং আহতরা সুস্থ হয়ে লড়াইয়ের জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠবে।'

'কিন্তু একটা বিষয় চিন্তা করে দেখো, আমরা কিন্তু অত্যন্ত বিপদসংকুল অবস্থায় রয়েছি। অসংখ্য ফারসী ফৌজ এখনো আমাদের পেছনের শহরগুলোতে লুকিয়ে আছে। তাদের বড় বড় কয়েকজন জেনারেল মারা গেলেও এখনো অনেক জেনারেল ও অফিসার বহাল তবিয়তে আছে। তোমাদের কি মনে নেই, এই এলাকার লোকেরা মুসান্না ইবনে হারিসার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো। এখনও তারা তা করতে পারে। তাদের সঙ্গে এমন ফৌজও আছে, যারা নতুন করে সংগঠিত হচ্ছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এরা একত্রিত হয়ে পেছন থেকে আমাদের ওপর হামলা চালাবে। শহরের ভেতরের ফৌজও আমাদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। পেছন থেকে যদি আমাদের ওপর হামলা করে, তখন শহরের ফৌজ বাইরে এসে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারপর আমাদের কি হবে তা কি ভাবতে পারছো তোমরা? দেখো আমাদের এই প্রস্তাব কি তোমাদের পছন্দ হয় কিনা – দজলা ও ফুরাতের মধ্যবর্তী এলাকার লোকদের ধরে ধরে একত্রিত করা এবং তাদের ওপর প্রহরা নিযুক্ত করা। তারা কৃষক হোক, সাধারণ লোক হোক, আমীর হোক, যেই হোক।'

ঃ 'অবশ্যই....অবশ্যই' – সাদ (রা) এর প্রস্তাবকে সবাই সমস্বরে সমর্থন জানালো– 'আর এর বাস্তবায়ন এখনই হওয়া উচিত।'

সবাই স্বীকার করলো, এই প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত সাদ (রা) এর দূরদৃষ্টির প্রমাণ। কারণ, এই এলাকার লোকদের স্বভাবই ছিলো এটা যে, তারা প্রশাসনের সামান্য শিথিলতা দেখলেই বিদ্রোহ করে বসতো। সাদ (রা) তার সালারদের সম্মতি গ্রহণের পর সে এলাকার পুরুষদের ধরে আনার জন্য একদল ফৌজ পাঠিয়ে দিলেন।

এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে কয়েকদিন লেগে গেলো। অবশেষে প্রায় এক লাখ পুরুষ একত্রিত করা হলো। তাদের কারো কাছেই কোন অস্ত্র ছিলো না। তাদেরকে বলা হলো, খাবার দাবারের জন্য তারা ঘরে যেতে পারবে। এছাড়া সবসময় এখানেই থাকতে হবে। তবে কোন ধরনের কষ্ট দেয়া হবে না তাদেরকে।

অবরোধের পর অনেক দিন চলে গেলো। একদিন সিবাতের এক রঈস সাদ (রা) এর কাছে আসলো।

ঃ 'মান্যবর সিপাহসালার!'–রঈস বললো– 'আপনি এই অঞ্চলের সবাইকে বন্দী করে রেখেছেন। কিন্তু এটা ভাবলেন না যে, এরা সবাই কৃষক। এদের জীবিকা কৃষিকর্ম দ্বারাই নিশ্চিত হয়। তাদেরকে এভাবে বন্দী করে রাখার কারণে ফসল ফলাদির বড় ক্ষতি হচ্ছে। তাদেরকে এভাবে বসিয়ে রাখলে তো ফসলের মাঠ বিরান হয়ে যাবে। এ কারণে স্থানীয়রা তো ক্ষতিগ্রস্ত হবেই, আপনাদেরও এজন্য মূল্য দিতে হবে। অবরোধ আরো দীর্ঘ হলে আপনার ফৌজকে আপনি কোত্থেকে খাবার দিবেন? এরা সবাই দরিদ্র কৃষক। তলোয়ার চালনায় ও তীরন্দাযীতে এদের কোন জ্ঞান থাকলে তো এদেরকে ফৌজেই নেয়া হতো। এদের মধ্যে এমন অনেককে পাবেন আপনি যারা জঙ্গী ঘোড়ায়ও সওয়ার হতে ভয় পায়।'

ঃ 'কিন্তু কে তাদের জামানত নেবে'? – সাদ (রা) বললেন– 'তাদের মধ্যে তো ফৌজও থাকতে পারে।'

ঃ 'একজন ফৌজও নেই। আমরা এমন একজন ফৌজও দেখিনি যে কোন বসতিতে এসে আত্মগোপন করেছে। এরও কারণ আছে। পলাতক ফৌজ লোকদের কাপুরুষ বলে তিরস্কারকে ভীষণ ভয় পায়... এর জামানত আমি দিতে রাজী আছি। অন্যান্য এলাকার আমীর ও সরদারদেরও আমি নিয়ে আসছি। তারা সবাই তাদের লোকদের জামানত দেবে। তাদের সবাই নয়– শুধু একজনও যদি আপনাদের কোন বিপদের কারণ ঘটায়, আপনি আমাদের কোতল করে দেবেন।'

সাদ (রা) অভিযানের খুঁটিনাটি সবকিছুই মদীনায় আমীরুল মুমিনীনের কাছে পয়গাম দিয়ে জানিয়ে আসছিলেন। তিনি সেই রঈসকে বললেন, আজই তিনি তাদের সবাইকে মুক্ত করে দেবেন। যাতে এরা নিজেদের কাজে আবার ফিরে যেতে পারে। এবং আজই তিনি মদীনায় এ ব্যাপারে কাসেদ পাঠাবেন। আমীরুল মুমিনীন যদি হুকুম পাঠান তাদেরকে আবার কয়েদ করার জন্য, তবে তাদেরকে আবার কয়েদ করতে আমি বাধ্য হবো।

সাদ (রা) তাদের সবাইকে এই সতর্কতা দিয়ে ছেড়ে দিলেন যে, যদি সামান্য সন্দেহও হয় যে, এদের কেউ বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন তবে তাকে হত্যা করে দেয়া হবে। এরপরই সাদ (রা) তাঁর এই কাজের অনুমোদন ও সমর্থন চেয়ে উমর (রা) এর কাছে পয়গাম পাঠালেন।

কয়েকদিন পর উমর (রা) তাকে এ কাজের প্রতি সমর্থন জানিয়ে পয়গাম পাঠালেন। আরো লিখলেন, তাদেরকে নিরাপত্তা দান করো এবং তাদের কেউ কর দিতে চাইলে তা গ্রহণ করো। জোর করে কারো কাছ থেকে কিছু আদায় করো না। কারণ ভালোবাসা দিয়ে তুমি যা আদায় করতে পারবে জোর করে তা করতে পারবে না।

অধিক সতর্কতার জন্য সাদ (রা) সেখানকার স্থানীয় কয়েকজনকে গুপ্তচর বানিয়ে নিলেন। যারা কৃষক ও দরিদ্র মুসাফিরের বেশে সারা এলাকায় ঘুরে বেড়াতো এবং লোকজনের কাছ থেকে গোপন কিছু ঘটছে কিনা সেই খবর সংগ্রহ করতো।

❖ ❖ ❖

পুরো একমাস হয়ে গেলো অবরোধের।

শাহী মহলে ইয়াযদগিরদ ও পুরান এই ভেবে কখনো কখনো প্রশান্তি অনুভব করতো যে, মুসলমানদের বাহারশীর অবরোধ ব্যর্থ হয়ে যাবে। আবার কখনো কখনো মুসলমানদের নারাধ্বনি শুনে হতাশ হয়ে ভাবতো, হায় মুসলমানদের দম যেখানে টুটে যাওয়ার কথা ছিলো সেখানে জোশে-আবেগে তাদের সবাই তাজাদম হয়ে উঠছে। ইয়াযদগিরদ শাহী ভোগবিলাসের সব যেন ভুলে গিয়েছিলো। তার মা নাওরীনের সঙ্গেও তার দেখা হতো কম। পুরানের স্বভাবেও রাজকীয় ভোগমত্ততা কম ছিলো না। কিন্তু সে যখন অনুভব করলো মুসলমানরা মাদায়েনের চৌকাঠ অতিক্রম করার জন্য দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, পারস্য ছাড়া তখন আর তার ভাববার কিছু রইলো না। পুরান ও ইয়াযদগিরদ মাদায়েনের বিভিন্ন ধর্মের ধর্মজাযকদের ডেকে বলে দেয়, উপাসনালয়গুলোতে যেন সবসময় উপাসনা অব্যাহত রাখেন তারা।

একদিন সেই জাদুগর ইহুদীপাদ্রী ইয়াযদগিরদের কাছে এলো। তাকে দেখে ইয়াযদগিরদের চোখে যেন আলোর ঝলকানি মূর্ত হয়ে উঠলো। যেন পারস্যের মুক্তিদাতা একমাত্র এই ইহুদী পাদ্রীই হতে পারে।

ঃ 'আপনার কাজ শেষ হয়েছে?'–ইয়াযদগিরদ তাকে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'আমার কাজ এখন শেষ ধাপে পৌছে গেছে।'

ঃ 'আপনি কি বুঝতে পারছেন কতটা সময় এই কাজের পেছনে ব্যয় করেছেন' – ইয়াযদগিরদের গলায় ক্ষোভ ঝরে পড়লো – 'আরবী ফৌজ তো আমাদের শাহরগ পর্যন্ত পৌছে গেছে।'

ঃ 'আমি জানি শাহেনশাহ! আমার জাদু আরবদেরকে এখানেই শেষ করে দেবে। পিছু হটার মওকা পাবে না তারা।'

ঃ 'তাহলে এখন আবার কি নিতে এসেছেন আপনি? আপনি কেন বুঝতে পারছেন না মিথ্যা সান্ত্বনা মাদায়েনকে বাঁচাতে পারবে না! কখনো কখনো আমার সন্দেহ হয় যে, ইহুদীদের যে চরিত্র সেই চরিত্র বলে আপনি আমাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছেন। এর দ্বারা হয়তো আপনার উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানরা মাদায়েন কব্জা করে নেবে আর আপনারা মাদায়েনের ধনভাণ্ডার নিয়ে পালাবেন!'

ঃ 'না শাহেনশাহ!' – ইহুদী পাদ্রী বললো– 'আমি কোন সান্ত্বনা দিতে আসিনি। আমি শুধু একটি হুকুম নিতে এসেছি। সর্বশেষ যে জিনিসটা আমার প্রয়োজন তা হলো, তিন চার দিনের চেয়েও কমবয়সী একটি নবজাতক শিশু। শহরে আমার লোকজন লাগিয়ে রেখেছি। এই মাত্র আমাকে জানানো হলো, গত রাতে এক মহিলার গর্ভে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে। সেই বাচ্চা এখন আমাকে জোগাড় করে দিন। এর দুই দিন পর আমার জাদুর ক্রিয়া কি হয় তা দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইলো।'

ইয়াযদগিরদ তখনই হুকুম দিয়ে দিলো, গত রাতে যে বাচ্চাটি এখানে ভূমিষ্ঠ হয়েছে তাকে এনে পাদ্রীকে দিয়ে দাও। বাচ্চার মা বাবা যদি পয়সা চায় তবে যা চাইবে তারও

বেশি পয়সা দিয়ে দেবে। যদি পয়সার বিনিময়েও দিতে না চায় তবে সোজা উঠিয়ে নিয়ে এসে পাদ্রীকে সোপর্দ করবে। বাচ্চার মা বাবা যদি বেশি রকমের বাড়াবাড়ি করে তাহলে ওদেরকে কোতল করে দেবে।

হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে ইয়াযদগিরদের মুহাফিজ বাহিনীর চার ঘোড়সওয়ার সেই আতুড় ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলো এবং বাদশার হুকুম শোনালো তাদেরকে। মা এক ঝটকায় তার বাচ্চাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলো। মাকে বলা হলো, বাচ্চার যত মূল্য চাইবে এরও অতিরিক্ত আরো কিছু দেয়া হবে।

ঃ 'না–না' বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে চিৎকার করে বললো– 'এটা আমার প্রথম সন্তান। আকাশ থেকে নক্ষত্র ছিড়ে এনে দিলেও আমি আমার সন্তানকে দিতে পারবো না।'

মুহাফিজরা ঠাণ্ডা চোখে বাচ্চার পিতার দিকে তাকালো। পিতাও তার বাচ্চাকে দিতে অস্বীকার করলো। মুহাফিজদের পায়ে পড়ে অনুনয় করতে লাগলো, আমাদের ওপর এই জুলুম করবেন না।

ঃ 'তার কাছ থেকে বাচ্চাটি ছিনিয়ে নাও' – মুহাফিজ কমান্ডার নির্দেশ দিলো।

এক সিপাহী বাচ্চার মার বুক থেকে বাচ্চাটিকে কেড়ে নিলো। মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে বাচ্চাটি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলো। তাই দুর্বল শরীর নিয়ে মার দাঁড়ানোর শক্তি ছিলো না। তবুও মা দাঁড়িয়ে তার বাচ্চাকে নিতে গেলো। সিপাহী জোরে এক ধাক্কা মারলো। মা পড়ে গেলো, আর উঠতে পারলো না। তার স্বামী তাকে ধরে উঠালো। ততক্ষণে বাচ্চাকে নিয়ে তারা চলে গেলো। পেছনে রয়ে গেলো সন্তানহারা মায়ের বুক ফাটা চিৎকার। ঘরের দরজার দিকে মা বার বার দৌড়ে যাচ্ছিলো। আর তার স্বামী তাকে বুকে জড়িয়ে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলছিলো, এটা বাদশার নির্দেশ। যার বিরুদ্ধাচরণ করার সাহস রুস্তমও করতো না।

মাঝ রাতের দিকে নদীর পারের বিলের কাছে যে বিরান জায়গাটি ছিলো সেখানে পাদ্রী মেয়েটিকে নিয়ে বসে। প্রতিদিনের মতো মেয়েটি কালো আলখেল্লায় আবৃত ছিলো। অন্যান্য দিন পাদ্রী মেয়েটিকে কুটিরের ভেতরে বসাতো। সে রাতে মেয়েটিকে কুটিরের বাইরে বিলের ধারে নিয়ে বসালো। তারপর মেয়েটির কোলে বাচ্চাটিকে রাখলো।

প্রতিদিনের মতো পাদ্রী মেয়েটিকে সম্মোহন করে তাকে প্রশ্ন করছিলো, মেয়েটি জবাব দিচ্ছিলো। সেই জবাব মতে পাদ্রী তার জাদুর মন্ত্র জপে যাচ্ছিলো। এটাই ছিলো তার জাদুর শেষ ধাপ। মন্ত্র পাঠ শেষ হলে পাদ্রী সেখান থেকে উঠে কুটিরের ভেতরে চলে গেলো। কুটির থেকে পাদ্রী যখন বেরোলো তখন তার হাতে শোভা পাচ্ছিলো চকচকে একটি ছুরি। সম্ভবতঃ তার জাদুর এ পর্যায়ে নবজাতকের রক্তের প্রয়োজন ছিলো কিংবা মেয়েটির প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে বলে তাকেই শেষ করে দেয়ার মতলবে ছিলো পাদ্রী। ছুরিটির দিকে চোখ পড়তেই মেয়েটির গলা দিয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এলো।

ঃ 'ভয় পেয়ো না মেয়ে'–পাদ্রী বড় আদুরে গলায় বললো–'এই ছুরিকে ভয় পেয়োনা।'

ইহুদী পাদ্রী যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো এর পেছনেই ছিলো বিলের পানি। কি মনে করে পাদ্রী একটু পিছিয়ে গেলো। আচমকা পাদ্রীর পা ধরে কে যেন টান মারলো। মেয়েটি আরেকবার চিৎকার করে উঠলো এবং কুটিরের দিকে দৌড় লাগালো। দৌড়াতে দৌড়াতে পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলো, পাদ্রীর শুধু হাত দুটি নড়তে দেখা যাচ্ছে পানিতে। সে স্পষ্ট দেখেছিলো, ইহুদীর পাটি একটি কুমীর কামড়ে ধরে তাকে পানির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

পানি থেকে ইহুদীর মরণ চিৎকার বেরিয়ে এলো একটু পরেই। সেই আওয়াজে পাদ্রীর যুবক শিষ্যও কুটির থেকে দৌড়ে বিলের কাছে এসে তার গুরুকে খুঁজতে লাগলো। সেখানে একটি নয় দুটি কুমীর ছিলো। এক একটা কুমীর দেড় মানুষ সমান বড়। একটা তো তার শিকার পেয়ে চলে গেলো। আরেকটা তার শিকার ধরার চেষ্টায় ছিলো। মেয়েটি পাদ্রীর শিষ্যকে সেখানে দেখে আলতো করে বাচ্চাটি মাটিতে রেখে পেছন দিক দিয়ে দৌড়ে শিষ্যটির কাছে চলে গেলো। তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে ধাক্কা মারলো। সঙ্গে সঙ্গে সে কুমীরের লেজের ওপর পড়লো। কিছুক্ষণের মধ্যে বিলের এ ধারের সমস্ত পানি লাল হয়ে উঠলো। একটু পর পাদ্রী ও তার শিষ্যকে আর দেখা গেলো না।

মেয়েটি বাচ্চাকে তার আলখেল্লার মধ্যে লুকিয়ে সেখান থেকে দৌড়ে পালালো। শহরের দেয়াল সেখান থেকে বেশি দূরে ছিলো না। কিন্তু শহরের দরজা বন্ধ ছিলো। বাকী রাতটুকু সে বন্ধ দরজার গায়ে পিঠ লাগিয়ে বসে রইলো। বাচ্চাটি ছিলো ভারী শান্ত। একটুও কান্নাকাটি করলো না।

সকাল হলে শহরের দরজা খুললো। মেয়েটি শহরে ঢুকে সোজা তার বাড়িতে গিয়ে উঠলো। মেয়েটির বাবা এই ভেবে ঘাবড়ে গেলো যে, তার মেয়েকে শাহী হুকুমের মাধ্যমে শাহী মহলে নিয়ে গিয়েছিলো। তার মেয়ে নিশ্চয় পালিয়ে এসেছে। হায় হায় এবার তার হতভাগী মেয়েকে ধরে নিতে সরকারী সিপাহীরা চলে আসবে। এর থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হলো মেয়েকে শাহী মহলে নিয়ে পৌছে দেয়া।

বাপ তার মেয়ে ও মেয়ের কোলের বাচ্চাটিকে নিয়ে শাহী মহলে গিয়ে পৌছলো। দারোয়ানকে সব খুলে বললে সে ইয়াযদগিরদকে জানালো। ইয়াযদগিরদ তখনই ওদেরকে ডেকে পাঠালো। ইয়াযদগিরদের কাছে গিয়ে মেয়েটি ইহুদী পাদ্রী ও তার শিষ্যের কি পরিণাম হয়েছে তার সব খুলে বললো।

ঃ 'তোমাকে দিয়ে সে করতোটা কি?' – ইয়াযদগিরদ মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো– 'তোমার ওপর কি কোন জাদু ক্রিয়া চালাতো সে?'

ঃ 'না শাহেনশাহ!' – দুই ইহুদী এখন কুমীরের পেটে হজম হচ্ছে, তার ব্যাপারে সত্য বললেই কি মিথ্যা বললেই বা কি– এই ভেবে মেয়েটি বললো– 'এরা দু'জন আমার সঙ্গে পালা করে খারাপ কাজ ছাড়া আর কিছুই করতো না। আমার মনে হয় বাচ্চাটিকে

সে নিয়ে গেছে আপনাকে এই ধোঁকা দেয়ার জন্য যে, সে আসলেই জাদু করছে। বাচ্চাটিকে হয়তো সে পানিতেই ফেলে দিতো। কিন্তু কুদরত উল্টো তাকেই পানিতে ফেলে দিলো। তারা এখন কুমীরের পেটে।'

সেখানে তখন নাওরীনও ছিলো পুরানও ছিলো।

ঃ 'বাচ্চাটিকে কোথা থেকে এনেছিলে?' – ইয়াযদগিরদের মা সব শুনে বড় কাতর গলায় জিজ্ঞেস করলো– 'এই জুলুম করিসনা রে বেটা! কোন মার আহাজারীর শিকার হোসনে। আমিও এক মা। তুই এক বিশাল রাজ্যের সম্রাট। তারপরও তোকে নিয়ে আমি কম কাঙ্গালিপনা করিনি। তুইও বেশ বিব্রত হতিস। কিন্তু এক মায়ের আহাজারি ও মাতম তুই বুঝবি কি করে?'

ঃ 'ইহুদীদের ফাঁদ থেকে বের হও ইযদী!' – পুরান বললো– 'আমি জানি ইহুদীরা জাদুতে অনেক দক্ষ। কিন্তু এও জানি, জাদু করতে এতো দীর্ঘ সময় লাগে না। এই বাচ্চাটি যে মায়ের, তার কাছে ফিরিয়ে দাও। এক মায়ের মাতমের অভিশাপকে ভয় করো। সেই বাস্তবকে মেনে নাও, যার আচলে হাজারো বজ্রাঘাত নিয়ে কালো মেঘের মতো আমাদের মাথার ওপর ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে। নিজেকে নিজে এমন ধোঁকা দিয়ো না। যেখানে তীর ও তলোয়ারের কারিশমা চলে সেখানে জাদুর কারিশমা তো নস্যি। তুমি কি আরবদের তলোয়ার চালানো সম্পর্কে জ্ঞাত নও?

ইয়াযদগিরদ এসব কথার কোন উত্তর দিলো না। নীরবে সব শুনে গেলো। তাদের কথা শেষ হলে তখনই তার মুহাফিজ বাহিনীর কমান্ডারকে ডেকে নির্দেশ দিলো বাচ্চাকে যে মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে এনেছিলে তার কোলে ফিরিয়ে দাও। মেয়েটির কোল থেকে কমান্ডার বাচ্চাকে নিয়ে নিলো। ক্ষুধায় বাচ্চাটি চিৎকার করে কাঁদছিলো। ইয়াযদগিরদ মেয়েটিকে তার পিতার কাছে সোপর্দ করে বললো, আপনি একে নির্ভয়ে নিয়ে যান।

এক মা তার একদিনের জীবিত সন্তানকে হারিয়ে বুক ভেঙে কাঁদছিলো। তার স্বামী তাকে নির্বাক চোখে দেখছিলো আর এমন নিয়তির জন্য নিজেকে নিজেই গাল দিচ্ছিলো। হঠাৎ তাদের দরজার কড়া নড়ে উঠলো। বিরক্ত মুখে স্বামী দরজা খুলে দিলো। যে কমান্ডারটি বাচ্চাটি ছিনিয়ে নিয়েছিলো সে দরজায় দাঁড়িয়েছিলো তখন। সে ঘরের ভেতরে ঢুকলো। তার হাতে বাচ্চাকে দেখে মা উঠে উদ্ভ্রান্তের মতো তার দিকে ছুটে গেলো এবং এক ঝটকায় বাচ্চাটিকে নিয়ে তার তুলতুলে শরীরে, নাকে, মুখে, হাতে, পায়ে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগলো আর বলতে লাগলো, মানিক আমার! সোনা আমার! আর কেউ তোকে আমার কোল থেকে নিতে পারবে না। সূর্যদেবও না।

ঃ 'শাহেনশাহে ফারেস বাচ্চাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন' – কমান্ডার বললো।

ঃ 'মায়ের বুকের ছাতি থেকে যে বাদশাহ্ একদিনের শিশুকে ছিনিয়ে নিতে পারে সে বাদশার বাদশাহী বেশি দিন টিকবে না গো – বেশি দিন টিকবে না' – এ যেন হাজারো মজলুমের আহাজারী এক মায়ের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো।

ঃ 'এদিকে যত ইহুদী আছে, সবগুলোকে বন্দী করে কয়েদখানায় ভরে রাখো' – সেদিনই ইয়াযদগিরদ এই হুকুম জারী করলো।

*'সূর্যের পূজারীরা! তোমরা সেই সূর্যের কিরণ যিনি আমাদের মাবুদ– উপাসক! তোমরা সেই প্রখর জ্যোতি, যারা দুশমনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই ভস্ম করে দেয়। কিন্তু কোথায় গেলো তোমাদের আত্মমর্যাদাবোধ। ...সারা দুনিয়া তোমাদেরকে ভয় পেতো, আতংকে কম্পমান থাকতো, আজ তোমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় তাড়িয়ে বেড়ানো মেষপালের মতো এই কেল্লায় বন্দী হয়ে পড়েছো'...*

মাদায়েনে ইহুদীদের সংখ্যা হাতে গোনার চেয়েও কম ছিলো। মাত্র কয়েকটি ঘর জুড়ে ছিলো তাদের বসবাস। বড় একটি বাড়ির প্রশস্ত একটা কামরা উপাসনার জন্য নির্ধারিত ছিলো। গত রাতে ইহুদীরা সব সেই উপাসনালয়ে একত্রিত হয় এবং সেই ইহুদী জাদুকরের জাদু সম্পর্কে আলোচনা করে। ইহুদী জাদুকরের নাম ছিলো শামউন জিব্রীল। আর তার শিষ্যের নাম ছিলো আবু যুমাইর। বৈঠকে সর্ববর্ষীয়ান এক ইহুদী পাদ্রীও ছিলেন।

ঃ 'আমি দেখছিলাম, শামউন এ কাজে অসফল হতে যাচ্ছে' – বর্ষীয়ান পাদ্রী বললেন– 'তা ছাড়া আমিও জাদুবিদ্যা সম্পর্কে কিছু জানি। তাকে আমি এজন্য সাবধান করে দিয়েছিলাম তুমি যে জাদু করতে যাচ্ছো এর মধ্যে বড় ধরনের ক্ষতির আশংকা রয়েছে। তা উল্টেও যেতে পারে। তুমি একটি যুবতী মেয়ে ও নবজাতক শিশুর প্রাণ নিচ্ছো। এতে যদি তোমারই প্রাণ চলে যায় আমি আশ্চর্য হবো না। ...আমার কথা শুনে সে এমন করে হেসে উঠেছিলো যেন আমি এক নির্বোধ ও অবুঝ শিশু।'

ঃ 'মান্যবর শামউনের সাথে আমারও কথা হয়েছে'– আরেক ইহুদী বললো– 'তিনি বলছিলেন, আমাদের পয়গম্বর মূসা (আ) নীল দরিয়ার পানি রোধ করে তার অনুসারীদের নিয়ে নদীর ওপর দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন। ফেরআউনের ফৌজ তাকে ধাওয়া করতে এসে পুরো বাহিনী ডুবে মরে। আমি আমার কাজের জন্য দাজলার একটি তীর নির্বাচন করেছি। ইয়াযদগিরদের ফৌজ নৌকা ও পুলের সাহায্যে মাদায়েনে ঢুকে পড়বে, আর মুসলমানরা তাদেরকে ধাওয়া করার জন্য যখন দাজলা পার হতে যাবে তখনই তাদের পুরো লশকর দাজলায় ডুবে যাবে, তাদের কেউ বাঁচতে পারবে না।

ঃ 'সে আমার সঙ্গে একথা বললে আমি তাকে বুঝাতাম' – বর্ষীয়ান পাদ্রী বললেন– 'সেটা খোদার হুকুম ছিলো যে, মূসা (আ) নীল দরিয়া অতিক্রম করে যাবেন আর ফেরআউন তার বাহিনী নিয়ে ডুবে যাবে...এখানে মূসা (আ) কে? ফেরআউনইবা কে? আমরা মুসলমানদের শত্রু বলে মুসলমানরা তো আর ফেরআউন হয়ে যায়নি। ফেরআউনী কর্মকাণ্ড তো এসব অগ্নিপূজারীদের মধ্যেই দেখা যায়। তাদের রাজরাজড়ারা এই নির্দেশ জারী করে রেখেছে যে, তাদের দরবারে কেউ গেলে প্রথমে সিজদা করতে হবে। মুসলমানরা তো আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামনে মাথা নত করে না, না কারো রাজত্ব তারা স্বীকার করে...আমরা মুসলমানদের ধ্বংস করে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাই। কিন্তু আমরা চাই বলেই তো আর তাদের শক্তি কমে যাবে না। তারা তো বিজয়ের পর বিজয়ের স্বাদ নিতে নিতে এ পর্যন্ত চলে এসেছে।'

ঃ 'এটা কিসের শক্তি?' – এক ইহুদী জিজ্ঞেস করলো – 'সেটা জানতে পারলে তো আমরা ওদেরকে দুর্বল করে দিতে পারতাম।'

ঃ 'এটা ধর্মের শক্তি' – বর্ষীয়ান পাদ্রী বললেন– 'এবং বিশ্বাসের শক্তি...খোদার ওপর বিশ্বাস এবং নিজেদের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস। নিজের প্রতি বিশ্বাস থাকে তারই যার কর্মপদ্ধতি, কর্ম কৃতিত্ব ভোরের শুকতারার মতো প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল থাকে। তাদের এই বিশ্বাস ও অক্লান্ত ধারাবাহিকতাকে তারা 'ঈমান' বলে। আমাদের ইহুদীদের ঘরে ঘরে এমন সব মেয়ে আছে যাদের রূপ সৌন্দর্যে জাদুর কারিশমা আছে। যে কোন বাদশার রাজত্ব উল্টিয়ে দেয়ার জন্য আমাদের ওরকম একটি মেয়েই যথেষ্ট। কিন্তু আবার সেই মেয়েই একজন মামুলি মুসলমানের বিশ্বাসকে টলাতে পারে না। কারণ তাদের ওপর আরেক কুদরতের কারিশমা আর দ্যুতি ছড়িয়ে আছে।'

ঃ 'আচ্ছা মান্যবর!' – আরেক ইহুদী জিজ্ঞেস করলো– 'মুসলমানদের সমর্থনে আপনি এসব বলছেন না তো?'

ঃ 'তাদের সমর্থনে কিছু বলার প্রয়োজন নেই' – বর্ষীয়ান পাদ্রী বললেন– 'আমি একটি বাস্তব সত্য তুলে ধরছি। ...আর বন্ধুরা শোন! আমি আরেকটা ব্যাপার অনুভব করছি...মুসলমানরা দৈহিক শক্তির জোরে এ পর্যন্ত পৌঁছেনি। একটু চিন্তা করো। ভেবে দেখো, আমরা যদিও ইসলামকে অমান্য করি তারপরও আমাদের মানতে হবে, মুসলমানদের কাছেও জাদু আছে। আর তা আমাদের জাদুর চেয়ে অনেক শক্তিশালী অনেক তীব্র। আমরা কি কোন চেষ্টাটা করিনি? তারপরও তাদের অগ্রযাত্রা রুখতে পারিনি। হয়তো আর রুখতেও পারবো না। শামউন আমার কথা মানেনি। আমার তো সাংঘাতিক ভয় হচ্ছে।'

ঃ 'ইয়াযদগিরদ ও তার ফৌজের ব্যাপারে আপনি কি হতাশ হয়ে পড়েছেন?'

ঃ 'কেন তোমরা কি অবস্থা দেখতে পাচ্ছো না?' – বর্ষীয়ান পাদ্রী বললেন– 'ইয়াযদগিরদের ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই। আমাদের উদ্দেশ্য মুসলমানদের পরাজয় তরান্বিত করা। আমি বলছি শামউন বড় ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে।'

ঃ 'আপনি কি তাকে রুখতে পারতেন না?'

ঃ 'রুখতে পারতাম' – বর্ষীয়ান পাদ্রী জবাব দিলেন– 'কিন্তু সে এখন তার এই কাজ শেষ করতে বাধ্য হয়ে পড়েছে। ইয়াযদগিরদকে সে আশ্বস্ত করেছে যে, সে এমন জাদু তৈরী করছে যা মুসলমানদের ধ্বংস করে দেবে। ইয়াযদগিরদ অধৈর্য হয়ে এর জন্য অপেক্ষা করছে। তার জাদু যদি ব্যর্থ হয় ইয়াযদগিরদ শামউনকে জীবিত ছাড়বে না।'

বর্ষীয়ান পাদ্রীর কথা যেন তাদের সবার পছন্দ হলো না। আচমকা সবাই এক সুরে বলতে লাগলো, মান্যবর শামউন আনাড়ী কেউ নন। তিনি বুঝে শুনেই ঝুঁকি নিয়েছেন।

❖ ❖ ❖

ইহুদীদের সেই বৈঠকের শেষ পর্যায় চলছিলো। ওদিকে দজলার পারে শামউন জিব্রীল ও তার শিষ্য আবু যুমাইর কুমীরের পেটে ততক্ষণে হজম হয়ে গিয়েছিলো। বুঝে শুনে সে যে ঝুঁকি নিয়েছিলো সে কাজ তার হয়ে গিয়েছিলো।

পরদিন একই সময় ইহুদীদের ঘরে ঘরে দরজায় কড়াঘাত পড়লো। দরজা খুলতেই শাহী বাহিনীর সিপাহীরা ঘরে ঢুকে পড়লো। তারা প্রত্যেক ঘরে যাকে পেলো তাকেই পাকড়াও করলো। তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রৌঢ়া মহিলা ছিলো। আর দু'জন ছিলো যুবতী মেয়ে। যাদের রূপ দেখে সিপাহীদেরই অজ্ঞান হওয়ার অবস্থা হলো। তাদের সবাইকে কয়েদখানার দিকে নিয়ে গেলো।

ঃ 'আমাদের অপরাধ কি?'

এ প্রশ্নের উত্তরে তারা পিঠে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো। ধাক্কাতে ধাক্কাতে ওদেরকে নিয়ে যাচ্ছিলো সিপাহীরা।

ঃ 'দাঁড়াও' – সিপাহীদের কমান্ডার বললো– 'আমরা দেখি শাহেনশাহে ফারেসের পছন্দের জিনিসও কয়েদখানায় নিয়ে যাচ্ছি...এই দুই সুন্দরীকে মহলে পাঠিয়ে দাও। শাহেনশাহ্ যদি এদেরকেও কয়েদ করতে বলেন তখন এদেরকে নিয়ে এসো।'

দুই সিপাহীকে কমান্ডার হুকুম দিলো। মেয়ে দুজনকে মহলে নিয়ে যাও এবং শাহেনশাকে জিজ্ঞেস করো, তাদের ব্যাপারে আপনার হুকুম কি?

সিপাহীরা মেয়ে দু'জনকে যখন দল থেকে পৃথক করলো। তারা মোটেও আপত্তি করলো না। তবে ফিসফিস করে তাদের লোকদের সাথে কি যেন বললো তারা। এক বৃদ্ধও তাদেরকে কি যেন বলছিলো। কমান্ডার সেটা লক্ষ্য করে ধমক দিয়ে এদেরকে দূরে সরিয়ে দিলো।

ইয়াযদগিরদ চরম অস্থির হয়ে তার কামরায় টহল দিচ্ছিলো। কামরায় তার মা ও পুরান তার এই অবস্থা দেখছিলো।

ঃ 'ইহুদীদের কয়েদখানায় কয়েদ করে তোমার লাভটা কি হবে?' – পুরান বললো।

ঃ 'এই ইহুদীরা যেমন ধোঁকাবাজ তেমনি ধূর্ত' – ইয়াযদগিরদ তার টহল থামিয়ে গালিচার ওপর জোরে পদাঘাত করে বললো – 'ঐ বুড়ো আমাদের ধোঁকা দিয়েছে। আমরা তাদেরকে কয়েদখানায় ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অতিষ্ঠ করে মারবো।'

ঃ 'একটি কথা বলো ইযদী!' – পুরান বললো– 'এই ধোঁকা সেই বৃদ্ধ ইহুদী দেয়নি আমাদের। এটা আমাদের নিজেদের ত্রুটি যে, আমরা নিজেরাই আমাদের নিজেদেরকে ধোঁকা দিচ্ছি। তুমি নিজেকে ধোঁকা দিয়ে হয়তো নিশ্চিন্ত হতে পারবে। কিন্তু ইযদী! বাস্তবতাকে তুমি তোমার রিপুর তাড়না ও বিক্ষিপ্ত খেয়ালে বিচার করতে পারবে না। হুঁশে আসো ইযদী! বাস্তবকে সামনে রাখো। মুসলমানরা বাহারশীর অবরোধ করে রেখেছে। যদি আমরা এই শহর তাদের হাতে ছেড়ে দিই তাহলে মাদায়েনও তাদের হাতে চলে যাবে। তখন আমাদের সবই শেষ হয়ে যাবে।'

ঃ 'আমার কথা শোন বেটা ইযদী!' – ইয়াযদগিরদের মা নাওরীন বললো– 'আমি তো শুধু এতদিন স্রেফ এক আবেগী মা ছিলাম। আমাকে সবসময় এই চিন্তাই কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিলো যে, কবে না জানি আমার বেটা আমার কোল ছেড়ে মৃত্যুর কোলে চলে যায়। কিন্তু আজ যখন মুসলমানরা মাদায়েনের দরজায় পৌঁছে গেছে তখন আমার মধ্যে এই জযবা এই অনুভূতি জেগে উঠেছে যে, তোর মতো আমার যদি একশটি পুত্র সন্তানও হতো তাহলে তাদের সবাইকে আমি পারস্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য উৎসর্গ করে দিতাম। ...মন শক্ত কর বেটা! এটা তোর সাম্রাজ্য। তুই-ই এটার রক্ষক। এটা আমার স্বামীর রাজ্য। একে রক্ষার জন্য আমিও লড়াই করবো...তাই এই জাদুর ধোঁকা থেকে বেরিয়ে আয়।'

ঃ 'এটা মানসিক দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয় ইযদী!' – পুরান বললো– 'অবস্থা কখনো এমন উল্টে যায় যে, মানুষ তখন আর কুলকিনারা পায় না কিছু। ঘাবড়ে গিয়ে তখন সে জাদু বা অলৌকিক কিছুর আশ্রয় নিতে চায়। আমি এটা মানি যে, আমরা গণক ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি বেশ স্বস্তি অনুভব করি। রুস্তম আমাদের এই বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করে দিয়ে গেছে। সে নিজেই কুষ্ঠি চালিয়ে নিতো। প্রথমে সে বলেছিলো, নক্ষত্রের চক্র পারস্যের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। এরা সালতানাতে ফারেসের পতনের দুঃসংবাদ দিচ্ছে। তার বড় আহমকি ছিলো, সে তার এই ভবিষ্যদ্বাণী সারা ফৌজে ছড়িয়ে দিয়েছিলো। এতে ফৌজের মধ্যে ভয় ঢুকে যায়। আর এখন তুমি ইহুদীদের জাদুর আশ্রয় নিচ্ছো। পরিণামও তো দেখছো। আর এই জাদু তার নিজেরই প্রাণ কেড়ে নিয়েছে।'

ঃ 'কিছু একটা বলো আমাকে' – ইয়াযদগিরদ পরাজিত গলায় বললো– 'আমাকে বুঝিয়ে বলো আমার এখন কি করার আছে। ফৌজ তো এখনো বিক্ষিপ্ত।'

ঃ 'বাহারশীরকে মজবুত করো' – ইয়াযদগিরদের মা বললো– 'সেটা তো আমরা আগেই করে রেখেছি। আমার কথার অর্থ হলো এই শহরকে এত শক্তিশালী করো যে, মুসলমানদের এই অবরোধই যেন শেষ অবরোধ হয় এবং ক্লান্ত হয়ে তারা ফিরে যায়।'

ঃ 'পেছন থেকে তো ওদের ওপর হামলা করা যায়' – পুরান বললো।

ঃ 'হামলা কে করবে?' – ইয়াযদগিরদ জিজ্ঞেস করলো এবং নিজেই জবাব দিলো– 'বাইরে আমাদের ফৌজ আছে সত্যি। কিন্তু তারা তো ফৌজ নয়। দৌড়ে পালানো এবং আশ্রয় খোঁজা কোন ফেরারী যেন তারা। কোন জেনারেলও নেই তাদের সঙ্গে।'

ঃ 'লোকদেরকে কি আমরা একাট্টা করতে পারি না?' নাওরীন জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'না মা না' – ইয়াযদগিরদ ঝাঁঝালো গলায় বললো– গোয়েন্দারা আমাকে বাইরের অবস্থা জানিয়ে গেছে। মুসলমানরা এসব এলাকার সমস্ত লোককে ধরে নিজেদের যিম্মায় নিয়ে নিয়েছে। সবচেয়ে বড় ধোঁকা যেটা আমরা খেয়েছি, সেটা হলো, সব আমীর ও জায়গীরদাররা মুসলমানদের সাথে হাত মিলিয়েছে। তাদের এলাকার লোকদেরকে তারা মুসলমানদের হেফাজতে ছেড়ে দিয়েছে। তারা শুধু মুসলমানদের অনুগতই হয়নি, বরং

সবধরনের সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে। আমাকে বলা হয়েছে, ঐ সব উমারারা মুসলমানদের অগ্রযাত্রা এত সহজ করে দিয়েছে যে, তাদের পথে যত খাল-বিল নদীনালা পড়েছিলো তারা সেগুলোর ওপর পুল বানিয়ে দিয়েছে। এসব লোকদের আমার বাপদাদারা জায়গীর দান করেছিলেন। আজ সেই জায়গীর দ্বারাই তারা মুসলমানদের হাত শক্তিশালী করছে। যদি বুস্তাম ও শহরযাদকে আমার হাতের সামনে পেতাম তাহলে ওদেরকে যমীনে অর্ধেক গেড়ে মানুষখেকো কুকুর ওদের ওপর ছেড়ে দিতাম।'

ঃ 'সেটা অনেক পরের কথা বেটা!' – নাওরীন বললো– 'এখন মাদায়েন বাঁচানোর কথা বলো'।

ঃ বাস্তব যেটা সেটা বলো ইযদী! – পুরান বললো– 'আগে অবস্থার দিকে তাকাও। ...এটা তুমি ভালো একটা কাজ করেছো, বাহারশীরের উপকূল থেকে সব নৌকা মাদায়েনের উপকূলে নিয়ে আসার হুকুম দিয়েছিলে। শুধু একটি মাত্র পুল আছে। এই পুল মুসলমানদের কোন কাজে আসবে না। কারণ এটা মাদায়েনের মাঝখান থেকে বাহারশীরের মাঝখান পর্যন্ত লম্বালম্বি টানানো। এই পুল মুসলমানরা কেবল তখনই ব্যবহার করতে পারবে যখন তারা বাহারশীর দখল করে নেবে। তাই বাহারশীরে আরো ফৌজ পাঠাও।'

ঃ 'তীরন্দায ও বর্শাধারী বেশি করে করে পাঠাও' – নাওরীন বললো – 'এত বেশি পাঠাও যে, মুসলমানরা যদি শহরের দেয়ালের কাছে ঘেঁষে তখন যেন তাদের ওপর তীর বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়।'

ঃ 'আমি শুনেছি মুসলমানদের কাছে মিনজানীক (পৌরাণিক কামান)ও আছে' – ইয়াযদগিরদ বললো– 'এটা এমন এক হাতিয়ার যা আমাদের কাছে নেই। না তা প্রতিহত করার মতো কোন অস্ত্র আছে আমাদের।'

ঃ 'আরেকটি কথা কেন বলছো না ইযদী!' – পুরান বললো – 'মুসলমানদের কাছে আরেকটি হাতিয়ার আছে যা আমাদের কাছে নেই।'

ঃ 'সেটা কি?'

ঃ 'জযবা-মনোবল' – পুরান বললো– 'আমরা মুসলমানদেরকে ডাকাত, মরুদস্যু, ছিনতাইকারী আরো কত কিছুই না বলি। কিন্তু তাদের মধ্যে লড়াইয়ের যে অসীম জযবা ও বিজয়ের দৃঢ়তা রয়েছে তা এত মজবুত যে, আমাদের হাতি তা ভাঙ্গতে পারবে না। আমাদের ফৌজ এই জযবা ও দৃঢ় মনোবল থেকে বঞ্চিত। আমার মনে হয়েছে মুসলমানরা লড়াইকে ইবাদত মনে করে। কিন্তু এখন আর আমাদের ফৌজে এই অনুভূতি তৈরির সময় নেই।'

ঃ 'আহ!' – ইয়াযদগিরদ ছাদের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট ধ্বনি করে বললো– 'আজ আমি আমার পূর্বপুরুষদের অভিশাপ দেবো। তারা ফৌজের মধ্যে এই জযবা এই মনোবল তৈরী না করে লোভ আর পাপের মোহ তৈরী করে গেছে। যারা চাটুকার ছিলো তাদের চাটুকারিতার মূল্য আদায় করেছে। জায়গীর বন্টন করেছে। তারপর ফৌজের

মধ্যে এই সংস্কৃতি চালু করেছে যে, যারা বীরত্বের সঙ্গে লড়বে তাদেরকে চোখ ধাঁধানো পুরস্কার দেয়া হবে। আমাদের পূর্ব পুরুষরা দরবারী আর তোষামোদে দলের সৃষ্টি করেছে আর দিরহাম দীনার ও অলংকারের মাল বন্টন করে দিয়েছে। এর পরিণাম দেখে নাও, মাত্র কয়েক হাজার মুসলমান আমাদের এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্যকে খুনের দরিয়ায় এমন করে ভাসিয়ে দিয়েছে যেমন উচ্ছাসী প্লাবন খড়কুটা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের দরবারী তোষামোদে জেনারেল, উমারা ও জায়গীরদাররাও তো কম দেখায়নি। অনারবের ঝাণ্ডা যখন ধুলোয় লুটাতে যাচ্ছে তারা তখন আরবের ঝাণ্ডার নীচে গিয়ে সমবেত হয়েছে এবং তাদের সিপাহসালারদের পায়ে চুমু খাচ্ছে...আমি একা, তলাহীন ঝুরি হয়ে রয়ে গেলাম। এই সর্বগ্রাসী তুফানকে রুখতে পারবো কিনা জানি না আমি।'

ঃ 'হ্যাঁ ইযদী!' – পুরান বললো– 'আমরা এই তুফান রুখে দেবো। নিজেকে এমন একা ভেবো না। বাহারশীরকে আরো মজবুত করো।'

এ সময় প্রহরী ভেতরে এসে জানালো, বাইরে এক মুহাফিজ দু'টি মেয়ে নিয়ে এসেছে। সে বলছে, এরা ইহুদী মেয়ে।

ঃ 'ঐ দিকে বসাও' – ইয়াযদগিরদ বললো– 'আমি আসছি'।

সেটা ছিলো ইয়াযদগিরদের খাস কামরা। দুই ইহুদী মেয়ে সেই কামরায় বসে ফিসফিসিয়ে কথা বলছিলো। তারা এটা জানতো যে, তাদের সঙ্গে কি ব্যবহার করা হবে। তারা এজন্য ঠিক করে নিচ্ছিলো ইয়াযদগিরদের সাথে কি বলবে।

ঃ 'এই বাদশাহ থেকে আমাদের প্রতিশোধ নিতে হবে' – এক মেয়ে আরেক মেয়েকে বললো– 'সে আমাদের ধর্মীয় নেতাকে অপমান করেছে। আমাদের সম্মানিত সব ইহুদীকে কয়েদ করেছে।'

ঃ 'কিন্তু কোন অপরাধে'! – দ্বিতীয় মেয়ে বললো– 'মান্যবর শামউন ও আবু যুমাইর তো তাদের জন্যই কিছু একটা করছিলো।'

ঃ 'জানা যাবে' – প্রথম মেয়েটি বললো।

এ সময় ইয়াযদগিরদ কামরায় ঢুকলো। মেয়ে দু'টি দাঁড়িয়ে গেলো। তারপর হাঁটু মুড়ে বসে মাথা ঝুঁকিয়ে দিলো।

ঃ 'উঠ' – ইয়াযদগিরদ বললো– 'ওপরে উঠে বসো। ...তোমরা দু'জন তো ইহুদী জাতির হীরা। আমি তোমাদের রূপের তারিফ না করে থাকতে পারবো না। কিন্তু তোমাদের পাদ্রী মহাশয় আমাকে যে ধোঁকা দিয়েছে, এর দ্বারা আমার মনে ইহুদীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছে।'

ঃ 'আমরা সৌভাগ্যবান যে, আপনার দরবার পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছি' – তাদের একজন রাঙা ওষ্ঠ জোড়ায় হাসি ধরে বললো– 'জানিনা আমাদের মান্যবর পাদ্রী আপনাকে কি ধোঁকা দিয়েছে। আমরা অক্ষম দুটি নারী। আপনাকে আমরা আর কি ধোঁকা দেবো?

ঃ 'আমাকে যারা ধোঁকা দিয়েছে তারা শাস্তি পেয়েছে' – ইয়াযদগিরদ বললো– 'তোমাদের সবচেয়ে বড় পাদ্রী শামউন ও তার সঙ্গী কুমীরের পেটে চলে গেছে। শামউন আমাকে নিশ্চয়তা দিয়েছিলো যে, সে এমন জাদু তৈরী করবে যে, মুসলমানদেরকে ধ্বংস করে পারস্যের বেদখল অঞ্চলগুলো আমাদের হাতে ফিরে আসবে। কিন্তু আমি জানতে পারলাম, সে এক যুবতী মেয়েকে সঙ্গে রেখে তার সঙ্গে কুকর্ম ছাড়া আর কোন কিছুই করতো না। মুসলমানদের ধ্বংসকারী নিজেই কুমীরের খোরাক বনে গেলো। শেষ পর্যন্ত মেয়েটি একটি নবজাতক শিশুকে উদ্ধার করে আমার কাছে এসে বলে যায়, শামউন তার সাথে কি আচরণ করেছে।'

ঃ 'কিন্তু শাহেনশাহ! আপনি এর শাস্তি সেসব ইহুদীকে কেন দিচ্ছেন যারা মান্যবর শামউনকে এই বলে বাঁধা দিতো যে, তিনি যেন এ কাজে জড়িয়ে না পড়েন। কারণ, এতে ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছুর সম্ভাবনা কম।'

ঃ 'তাহলে এর অর্থ হলো, তোমরা জানতে যে' – ইয়াযদগিরদ বললো– 'শামউন জাদু করছে'।

ঃ 'হ্যাঁ, শাহেনশাহ!' – দ্বিতীয় মেয়েটি বললো– 'আমরা সব জানতাম। কিন্তু আমরা এ নিয়ে কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলাম। আপনি যদি নারাজ হয়ে যান'।

ঃ 'সব খুলে বলো, আমি শুনতে চাই' – ইয়াযদগিরদ বললো।

ঃ 'তাহলে তো আমাদের বলতেই হয়। যে ইহুদীদের আপনি বন্দী করেছেন তাদের কয়েকজনই মাত্র জানতেন যে, মান্যবর শামউন মুসলমানদের ধ্বংসের বন্দোবস্ত করছেন। আমাদের অন্য দুই মান্যবর পাদ্রী তাকে এই বলে বাধা দিচ্ছিলেন যে, এই জাদু এতই বিপদজনক যে, যদি এটা সঠিক লক্ষ্য বস্তুতে গিয়ে না পৌঁছে তাহলে জাদুকরকেই এই জাদু ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু মান্যবর শামউন পুরো জোর দিয়ে বলতেন, তিনি তার জাদুতে ব্যর্থ হবেন না। এখন আপনার কাছ থেকে জানতে পারলাম, মান্যবর শামউন ও তার সঙ্গী আবু যুমাইরকে কুমীর খেয়ে ফেলেছে। আর যে মেয়েকে তিনি এই কাজে ব্যবহার করতেন সে আপনার কাছে এসে সব জানিয়ে গেছে। তাহলে আমাদের বুযুর্গ পাদ্রীদের কথাই ঠিক হলো যে, এই জাদু জাদু চালনাকারীকেই শেষ করে দেয়।'

ঃ এখন আমরা আরেকটি বিপদের আশংকা করছি' – দ্বিতীয় মেয়েটি বললো– 'সেটা হলো, এই জাদুর প্রভাব আপনার সালতানাতেও অনেক বড় বিপদ ডেকে আনবে। আমরা আমাদের বর্ষীয়ান ধর্মীয় নেতাদের কাছ থেকে যে কথা শুনেছি, এর দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, মাদায়েন ও বাহারশীরে প্রচুর হত্যাকাণ্ড ঘটবে। এরপর এই দুই শহর আপনার কাছ থেকে বেদখল হয়ে যাবে।'

এই দুই মেয়ের বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিলো যে, ইয়াযদগিরদ দারুণ ঘাবড়ে গেলো এবং ভীত চোখে মেয়ে দুটির দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই বলতে পারলো না। মেয়ে দুটি এই প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলো।

ঃ 'আপনি অবশ্য বেঁচে থাকবেন' – এক মেয়ে বললো– 'শহরকে বাঁচাতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু যখনই দেখবেন এটা সম্ভব নয়, আপনার পুরো শাহী খান্দান নিয়ে মাদায়েন থেকে বেরিয়ে যাবেন এবং অন্য কোন শহরে আশ্রয় নিয়ে ফৌজ তৈরী করবেন। এরপর জবাবী হামলা চালিয়ে আপনার বিজয় ছিনিয়ে নেবেন। তখন আপনি অবশ্যই বিজয়ী হবেন।'

ঃ 'এই নির্দোষ লোকদের আপনি ছেড়ে দিন' – দ্বিতীয় মেয়েটি বললো– 'পরে যেন এমন না হয় যে, তাদের কোন অভিশাপে আপনার এমন কোন ক্ষতি হয়ে গেলো যা থেকে আপনি বাঁচার জন্য মরিয়া।'

ইয়াযদগিরদ যেমন একজন সম্রাট ছিলো, তেমনি আবেগপ্রবণ এক যুবক ছিলো এবং হাজারো দুশ্চিন্তায় ছিলো অস্থিরচিত্তও। এত বড় বোঝা তার ওপর ছিলো যে, মনে হতো এর ভারে তার শরীরের রক্ত প্রবাহই থেমে যাবে। মুহূর্তের জন্য সে কোথাও স্বস্তি পাচ্ছিলো না। ঐ মেয়ে দুটির স্বর্ণঝরা রূপ আর মধুবর্ষণা বাচনভঙ্গি তাকে এমন নেশাগ্রস্ত করে তুললো যে, পালানোটাই শেষ অবলম্বন হিসেবে বেছে নিলো। রাতভর মেয়ে দুটি ইয়াযদগিরদের সঙ্গেই ঘুমালো। সকালে প্রথম হুকুম জারী করলো যে, সমস্ত ইহুদীকে মুক্ত করে তাদের ঘরে পৌঁছে দেয়া হোক।

এরপর ইয়াযদগিরদ তার মা ও পুরানকে এই ফয়সালা শুনিয়ে দিলো যে, বাহারশীরকে বাঁচানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাবে। যদি সম্ভব না হয় তবে মাদায়েন থেকে তার পুরো খান্দান নিয়ে বেরিয়ে যাবে। মাদায়েনের পরে তখনো বড় বড় কয়েকটি শহর ও উপশহর ইরাকের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ইয়াযদগিরদ সেগুলোর যে কোন একটাতে যেতে পারতো।

সাদ (রা) বাহারশীর অবরোধ করলেও সেই অবরোধ পূর্ণ ছিলো না। কারণ শহরের অধিকাংশই ছিলো দাজলার ওপর দাঁড়িয়ে। শহরের দেয়ালে তীরন্দায ও বর্শাধারীরা এমন ঘন হয়ে দাঁড়ানো ছিলো যেন মাটির দেয়ালের ওপর মানুষের দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। মুসলমানরা এর কাছে ধারে ভুলেও ঘেঁষতো না। সাদ (রা) প্রায় প্রতিদিনের খবরই উমর (রা)কে পয়গামের মাধ্যমে জানাতেন। বাহারশীরকে যেদিন তিনি অবরোধ করে নেন সেদিনই তিনি উমর (রা)কে পয়গাম পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মাদায়েনে যেদিন জাদুর মাধ্যমে মুসলমানদের ধ্বংসের চেষ্টা চলছিলো সেদিন মদীনা থেকে উমর (রা) এর পয়গাম ছিলো। তাতে লেখা ছিলো ঃ

... 'আর তুমি তো দেখেছো, আল্লাহর পথে উৎসর্গকারীদেরকে আল্লাহ্ হতাশ করেন না। মদীনায় ও সারা আরবে এমন কোন মুসলমান আছে যে তোমার বিজয় ও সফলতার জন্য দুআ করেনি? তোমার এত বড় অসুখ থেকে সুস্থ হয়ে উঠা, উঠে লড়াই করা এবং এত দূর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া এই সত্যেরই প্রকৃষ্ট দলীল যে, যে আল্লাহর সঙ্গে তার কৃত ওয়াদা পালন করে আল্লাহও তার ওয়াদা পূর্ণ করেন। কে না জানে তোমার ও অন্য সব মুজাহিদদের দৈহিক অবস্থা কতটা ভঙ্গুর! কিন্তু মনের শক্তির এত জোর থাকে

যে, সে মৃত দেহকেও সটান দাড় করিয়ে দেয়...পারস্যের দরজায় পৌঁছে গেছো তোমরা। অগ্নিপূজারীরা সহজে তোমাদেরকে সেই দরজা দিয়ে ঢুকতে দেবে না। এখন বুদ্ধি খাটিয়ে তোমাদের অনেক কাজে অগ্রসর হতে হবে। এই যুদ্ধে এটাই তোমাদের প্রথম অবরোধ। এরপর হয়তো আরো অবরোধে যেতে হবে তোমাদের। এখন তোমরা মিনজানীক ব্যবহার করো। শহরের ওপর এত পাথর বর্ষণ করো, যাতে শহর দেবে যায়। দুশমন হয়তো বাইরে বের হয়ে তোমাদের ওপর হামলা করতে পারে। এ অবস্থায় তোমাদের পেছনের দিকে লক্ষ্য রেখো। যাদেরকে তোমরা মুক্ত করে দিয়েছো তারা তোমাদের জন্য বিপদ বয়ে আনতে পারে। তাদের কেউ যদি তোমাদের সাথে প্রতারণামূলক কোন আচরণ করে তাহলে বেঁচে থাকার অধিকার থেকে তাকে চিরবঞ্চিত করে দেবে। ...নারী ছাউনী তুমি অনেক দূরে ছেড়ে এসেছো। এত দূরে ওদেরকে রেখো না। আরো কাছাকাছি নিয়ে এসো ওদের।'

প্রায় দুই মাস কেটে গেলো অবরোধের। এর একটি কারণ হলো, শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত মজবুত ছিলো এবং দেয়ালে ফাটল ধরানোর জন্য দেয়ালের কাছে ঘেঁষাও আত্মহত্যার নামান্তর ছিলো। আরেকটা কারণ হলো, সাদ (রা) এতটা সময় চাইছিলেন যাতে যখমী সৈন্যরা সুস্থ হয়ে উঠে। এই দুই মাসে অনেক যখমীই লড়াইয়ের উপযুক্ত হয়ে উঠেছিলো। উমর (রা) এর হুকুম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাদ (রা) তার ফৌজকে হুকুম দিলেন মিনজানীকের জন্য পাথর একত্রিত করো। প্রায় অর্ধেক ফৌজ অবরোধের স্থানে রইলো। আর অর্ধেক ফৌজ পাথর আনার জন্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

আশেপাশের এলাকার লোকেরা যখন দেখলো মুসলমানরা পাথর একত্রিত করছে তারাও বাইরে বেরিয়ে এলো এবং পাথর তোলার জন্য এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লো। তারা ঘোড়া ও গরুর গাড়িও নিয়ে এলো। একদিনেই তারা পাথরের বিরাট এক স্তূপ তৈরী করে ফেললো।

ওদিকে বাহারশীরে মাদায়েন থেকে সব ধরনের সাহায্যই পৌঁছতে লাগলো। পুরান বাহারশীরে গিয়ে সেখানকার লোকদের জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে উস্কে দিচ্ছিলো।

শহরের লোকেরা যখন দেখলো, তাদের সাথে তাদের ফৌজও আছে এবং ফৌজের জযবাও আকাশচুম্বী, সাথে সাথে মাদায়েন থেকে সব ধরনের প্রয়োজনীয় জিনিসও পাচ্ছে তারা তখন তাদের জযবাও বেড়ে গেলো। তারা মহা উৎসাহ উদ্দীপনায় তাদের ফৌজের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শহরের প্রতিরক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়লো।

দু' একদিন পর হঠাৎ করেই শহরের ওপর পাথর পড়তে শুরু করলো। দেয়ালের ওপর যে তীরন্দায ও বর্শাধারীরা ছিলো তারা ভাবতেও পারেনি দুনিয়ায় কখনো এমন করে পাথর বর্ষণও দেখতে হবে। এই আচমকা পাথর বর্ষণে কয়েকজন ফারসী সৈন্য আহত হলো আর দু'একজন মারাও পড়লো। তাদেরকে হুকুম দেয়া হলো, তারা দেয়ালের ওপর না দাঁড়িয়ে বসে বসে যেন পাহারা দেয়। মিনজানীক তাদের জন্য আশ্চর্য ও অদ্ভুত ধরনের এক হাতিয়ার ছিলো, যা তারা ইতিপূর্বে আর দেখেনি।

ইয়াযদগিরদ খবর পেয়ে তার মুহাফিজ বাহিনী নিয়ে দৌড়ে পুল পার হয়ে বাহারশীরে পৌঁছলো। মিনজানীক ছোট ছিলো। এটা দিয়ে ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করা যেতো। ইয়াযদগিরদ পাথরের বর্ষণ দেখে লোকজনকে যার যার ঘরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলো। নিজে এক প্রান্তের দেয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে মিনজানীক দেখলো। এটা প্রতিহত করার মতো কোন কিছু তার কাছে ছিলো না। শহরের জেনারেল ও হাকিমকে ডেকে আলোচনায় বসলো। কিভাবে এই মিনজানীকের মোকাবেলা করা যায়।

ঃ 'একটাই মাত্র পথ আছে' – শহরের জেনারেল বললো– 'যেখানে মিনজানীক আছে সেখানে আচমকা কিছু সৈন্য পাঠিয়ে দিন। তারা প্রচণ্ড হামলা চালাবে সেখানে। প্রচণ্ড হামলার কারণে মুসলমানরা মিনজানীক টেনে নিয়ে যেতে পারবে না। তখন আমাদের লোকেরা সেটা টেনে শহরে নিয়ে আসবে। এই একটা মিনজানীক দেখে আমরা আরো মিনজানীক বানিয়ে নেবো।'

এই পরামর্শটি ইয়াযদগিরদের বেশ ভালো লাগলো। হুকুম দিলো, তার সামনেই যেন কিছু সৈন্য বাইরে বের করে হামলা করা হয়। তখনই কিছু সৈন্য তৈরী করা হলো। ওদেরকে জরুরী কিছু উপদেশ দেয়া হলো। ইয়াযদগিরদ তাদের হিম্মত আরো মজবুত করার জন্য বড় জোশপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে তাদেরকে উত্তেজিত করে তুললো।

শহরের একদিকের দুটি লাগোয়া দরজা ছিলো। হঠাৎ দরজা দুটি একসঙ্গে খুলে গেলো। ভেতর থেকে তলোয়ার ও বর্শা উঁচিয়ে ঘোড়সওয়াররা এমনভাবে বেরোতে লাগলো যেন নদীর বাঁধ ভেঙে তরঙ্গের জোয়ার বয়ে যায়। মুসলমানরা এই হামলা আশা করেনি। ফারসী ঘোড়সওয়ারদের রুখ ছিলো সেদিকে যেদিকে দুটি মিনজানীক এক সাথে বসানো ছিলো।

মুসলমানরা অবরোধে নিয়োজিত থাকার কারণে তাদের ঘোড়সওয়াররা তৈরী ছিলো না। ঘোড়াগুলো পৃথক স্থানে বাঁধা ছিলো এবং সেগুলোর ওপর জিনও বাঁধা ছিলো না। অবশ্য পদাতিকরা মুহূর্তেই তৈরী হয়ে গেলো। আর তাদের সঙ্গে ক'কা, আসেম, তুলাইহা ও হাশেম ইবনে উতবার মতো জানবায মুজাহিদরাও ছিলেন। ঘোড়া প্রস্তুত নেই বলে তারা কোন পরওয়া করলেন না। পদাতিকদের নিয়ে ঘোড়সওয়ারদের মোকাবেলা করতে লাগলেন।

মুজাহিদরা বাহারশীরের ঘোড়সওয়ারদের ঘিরে নেয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারসিকদের তারা পুরোপুরি ঘিরতে পারলো না। কারণ, মুজাহিদরা পূর্ণ ঘেরাওয়ের জন্য যেই দেয়ালের কাছে গেলো, ওমনিই তাদের ওপর তীর বর্ষার বর্ষণ শুরু হয়ে গেলো। কিছু মুজাহিদ যখমীও হয়ে গেলো। এজন্য ঘেরাও ভাঙ্গতে হলো।

ফারসী ঘোড়সওয়ারদের ফিরে যাওয়ার চিন্তাও করতে হচ্ছিলো এবং এজন্য তারা সে পথও খুঁজছিলো। ওদিকে আবার শহরের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিলো। পারসিকরা তাই লড়ছিলো এই অস্থিরতা নিয়ে। মুজাহিদরা দারুণ দক্ষতায় ঘোড়সওয়ারদের আক্রমণ প্রতিহত করলো এবং প্রথম সুযোগেই কয়েকজনকে ফেলে দিলো। তারপর তারা এদিকে মন দিলো যে, এক ফারসী সওয়ারও যেন ফিরে যেতে না

পারে। কিছুক্ষণ ময়দান বেশ উত্তপ্ত রইলো। অন্য দিকের মুসলিম সৈন্যরা এদিকে আসতে চাইলে সাদ (রা) একথা ভেবে তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন যে, শহরের ভেতর থেকে যদি আরো ঘোড়সওয়ার বেরিয়ে আসে তাহলে মুসলমানদের অবস্থান তখন বিগড়ে যাবে।

মুসলিম সৈন্যরা এত দীর্ঘ অবরোধে লড়াইবিহীন বসে থাকার কারণে তাজা দম ছিলো। এজন্য ফারসী সওয়ারদের ওপর তারা এমন বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো যে, প্রায় অর্ধেককেই সেখানে থেকে যেতে বাধ্য করলো। আর বাকীরা শহরের দিকে পালিয়ে গেলো। তারা পালানোর সময় মুসলিম তীরন্দাযরা তীর চালালো। এতে তাদের কয়েকজন তীরের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলো।

এরপর আবার মিনজানীক পাথর বর্ষণ শুরু করে দিলো। ক্রমেই পাথর বর্ষণের মাত্রা যত বাড়তে লাগলো শহরের ওপর ততই ভয়ের কালো মেঘ গাঢ় হতে লাগলো।

এরপর এটা রুটিন হয়ে দাঁড়ালো। প্রতিদিন হঠাৎ করে দরজা খুলে যেতো এবং পারসিকদের দু'একটি দল এসে হামলা চালাতো। তুমুল লড়াইয়ের পর যে সওয়াররা বেঁচে থাকতো তারা ফিরে যেতো। এসব হামলায় বেশি ক্ষতি হচ্ছিলো পারসিক ঘোড়সওয়ারদের। অবরোধ থেকে মুসলমানদের হটানোর এই পদ্ধতি পারসিকদের দিন দিন ক্ষতিই বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। কিন্তু ইয়াযদগিরদের হুকুম ছিলো, হামলা অব্যাহত রাখতে হবে। ইয়াযদগিরদের এটা আসলে শেষ চেষ্টা ছিলো। সে এদিকে ভ্রুক্ষেপ করছিলো না, তার কতটা লাভ বা ক্ষতি হচ্ছে। সে এটাও দেখছিলো না, অনবরত এই ক্ষতি তার ফৌজের মনোবল ভেঙে দিচ্ছে।

ইয়াযদগিরদ একদিন তার বাবা খসরু পারভেজকে স্বপ্নে দেখলো। স্বপ্নে কিসরা পারভেজ তাকে বললো, তোমার ফৌজ থেকে এমন বাহাদুর সেনা কর্মকর্তা, অফিসার ও সৈন্যদের নির্বাচন করো যারা নিজ দেশের জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। তাদেরকে শহরের বাইরে এই বলে হামলা করার জন্য পাঠাও যে, মুসলমানদের লাশ ফেলে ফেলে ময়দান পূর্ণ করার পর তারা ফিরে আসবে, না হয় আর ফিরবেই না।

ইয়াযদগিরদ একদিন গণক বিদ্যায় পারদর্শী এক জ্যোতিষীকে দিয়ে কুষ্ঠি বের করে একটি বিশেষ দিন নির্ধারণ করলো। সেদিন মুসলমানদের ওপর হামলা করলে নিশ্চিত বিজয় আসবে এবং বাহারশীর ও মাদায়েন বেঁচে যাবে। জ্যোতিষী ইয়াযদগিরদকে বলেছিলো, সে যেন সব পাপ কাজ ছেড়ে দেয় এবং কোন মেয়ের সঙ্গে সহবাস না করে।

সেদিন পুরানও ইয়াযদগিরদকে আরো কিছু বলেছিলো। পুরান বলেছিলো মুসলমানদের ওপর আচমকা এমন হামলা চালাতে হবে, যাতে তাদের পা উপড়ে যায়। নিজের ফৌজকে আরো উত্তেজিত করে তুলো। তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলো। তারপর তাদেরকে বলো, যে নিজেকে সবচেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ও বাহাদুর মনে করে সে যেন হামলার জন্য তৈরী হয়ে যায়।

ঃ 'শোন ইযদী!' – পুরান আরো বললো– 'ভুলে যেয়ো না, এই সালতানাতের উমারা ও জনপ্রতিনিধিরা তোমাকে এজন্য মসনদে বসিয়েছিলো যে, তুমি সালতানাতে ফারেসকে আরব থেকে বাঁচাবে। আমি শুধু তোমার জন্য সিংহাসন ত্যাগ করেছিলাম। রক্তের শেষ বিন্দুটুকুও বইয়ে দাও। ফৌজের শেষ সৈন্যটিও যেন রক্তের দাম নিয়ে ফিরে। দাজলার পারে আরবদের লাশের স্তূপ লাগিয়ে দাও...চলো এখন বাহারশীর।'

সেদিনই ইয়াযদগিরদ ইহুদী মেয়ে দু'টিকে ছেড়ে দিলো এবং তার হেরেমের সব মেয়েকে দূরে সরিয়ে দিলো যাদেরকে তার ইচ্ছামতো ব্যবহার করতো। শাহী ভোগবিলাস সব ত্যাগ করলো। মা নাওরীন ও পুরানকে নিয়ে বাহারশীর চলে এলো।

বাহারশীর পৌঁছতেই তার সামনে পুরো ফৌজকে সমবেত করা হলো। ইয়াযদগিরদ ঘোড়ায় সওয়ার ছিলো। নাওরীন ও পুরানও ঘোড়ায় বসেছিলো।

ঃ 'সূর্যের পূজারীরা!' – ফৌজকে লক্ষ্য করে উঁচু আওয়াজে বললো– 'তোমরা সেই সূর্যের কিরণ যিনি আমাদের মাবুদ-উপাসক। তোমরা সেই প্রখর জ্যোতি, যারা দুশমনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই ভস্ম করে দেয়। কিন্তু কোথায় গেলো তোমাদের আত্মমর্যাদাবোধ... সারা দুনিয়া তোমাদের ভয় পেতো, আতংকে কম্পমান থাকতো। আজ তোমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় তাড়িয়ে বেড়ানো মেষপালের মতো এই শহরে বন্দী হয়ে পড়েছো। তোমরা কি এতই কাপুরুষ হয়ে গেলে! তোমাদের কি এতটুকু অনুভূতি নেই যে, তোমরা নিজেদের কুমারী মেয়েদের, বোনদের, স্ত্রীদের মুসলমানদের হাতে সোপর্দ করে এসেছো। তাদেরকে মুসলমানরা দাসীবাদী করে রেখেছে। ...আর দেখো আমাদের দেশের গর্ব যারা, সেই কৃষক ভাই–যারা মাটি থেকে সোনা উঠাতো–আজ তাদের রক্ত পানি করা সোনার ফসল মুসলমানরা বসে বসে খাচ্ছে।'

ইয়াযদগিরদ বলে যাচ্ছিলো। পুরান তখন তার ঘোড়া ইয়াদগিরদের ঘোড়ার পাশে নিয়ে হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে বললো ঃ

'যদি তোমাদের পৌরুষ, তোমাদের আত্মমর্যাদাবোধ মরে গিয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের কুমারী মেয়েদের জন্য ও তোমাদের বোনদের জন্য আমি লড়বো। শাহেনশাহে ফারেসের বৃদ্ধা মাও লড়বেন। আমরা দু'জন মিলে ফৌজ তৈরী করবো। তারপর তোমরা দেখো, মুসলমানরা কেমন করে তড়পে তড়পে শেষ হয়ে যায়।

সারা ফৌজে নীরবতা নেমে এলো। পুরানের কথায় তারা যেন দিশেহারা হয়ে পড়লো।

ঃ 'শাহেনশাহে ফারেসের মা ও তার বোন ময়দানে নামলে কি তোমাদের পৌরুষে তা সইবে?' – পুরান আরো আবেগপূর্ণ গলায় বললো– 'ভেবে দেখো, মাদায়েনও যদি বেদখল হয়ে যায় তখন তোমরা কোথায় যাবে? সূর্যদেব যদি রেগে যান তাহলে তোমরা জ্বরে পুড়ে মাটি হয়ে যাবে। তোমরা মরবেও না বাঁচবেও না। অলস কুঁড়েদের মতো পোকামাকড় হয়ে মানুষের কাছে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। জানো তো কুঁড়েদের কেউ ভিক্ষা দেয় না।...

পুরান তার বক্তৃতা শেষ করার আগেই নাওরীন তার ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এলো।

ঃ 'আমি আমার একমাত্র ইয়াতীম সন্তানকে সালতানাতে ফারেসের রক্ষার জন্য উৎসর্গ করছি'–নাওরীন বড় আবেগপূর্ণ আওয়াজে বললো– 'তোমরা মহিলাদের মতো ঘোমটা পরে ঘরের কোনায় বসে যাও। আমি আর পুরান ফৌজ তৈরী করে লড়াই করবো, আর তোমরা শহরের দেয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে দেখবে...

ঃ 'না'–হঠাৎ ফৌজ থেকে একটি আওয়াজ উঠলো– 'না... আমরা এতটা আত্মমর্যাদাবোধহীন নই...লড়াই-ই-তো আমাদের কাজ।'

ঃ 'যা হওয়ার তা হয়ে গেছে' – আরেকটি আওয়াজ উঠলো– 'এখন মুসলমানরা এখান থেকে এক কদমও আর সামনে এগুতে পারবে না।'

এই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই সারা ফৌজে হুল্লোড় পড়ে গেলো। আসমান যমীন ফাটিয়ে শ্লোগান উঠতে লাগলো। তাদের শ্লোগান এমন রূপ নিলো যে, ঘোড়াগুলো চিঁহি চিঁহি রব তুললো। ফৌজ তাদের শেষ লড়াই লড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো।

সাদ (রা) তখন কয়েকজন সালার নিয়ে শহরের দেয়ালের কিছু দূর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে টহল দিচ্ছিলেন। শহরের হৈ চৈ বাইরেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিলো। এই আওয়াজ শুনে সাদ (রা) ঘোড়া থামিয়ে দিলেন। সালাররাও থেমে দাঁড়ালেন।

ঃ 'হৈ চৈ শুনতে পাচ্ছো?' – সাদ (রা) সালারদের জিজ্ঞেস করলেন– 'এই যে ওরা কি বলে যেন শ্লোগান দিচ্ছে। এর মানে বুঝতে চেষ্টা করো।'

ঃ 'তাদের জেনারেলরা তাদের উৎসাহ যোগাচ্ছে' – এক সালার বললেন।

ঃ 'উৎসাহ তো তারা যুগিয়েই যাচ্ছে' – সাদ (রা) বললেন– 'কিন্তু আজকের এত হাঙ্গামার আওয়াজ বলছে, শহরে তাদের শাহেনশাহ এসেছে...আর আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, এরা বাইরে এসে আরেকবার হামলা করবে এবং এই হামলা হবে অত্যন্ত তীব্র। এর জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।'

ঃ 'তাদের আসতে দাও' – এক সালার তার সঙ্গীদের উদ্দেশে বললেন– 'আমরা আবার তাদের ওপর মিনজানীক ব্যবহার করবো।'

শহরের ভেতর যেমন হঠাৎ করে শোরগোল উঠেছিলো তেমনি হঠাৎ করেই সবাই নীরব হয়ে গেলো। এখন শুধু ইয়াযদগিরদ বলে যাচ্ছিলো।

ঃ 'মুসলমানদেরকে এখানেই শেষ করতে হবে এবং এর একমাত্র পথ হলো' – ইয়াযদগিরদ বলে যাচ্ছিলো– 'বাইরে বের হয়ে তাদের ওপর এমন শক্ত হামলা চালাতে হবে যা আগে কখনো করা হয়নি। এই হামলার জন্য এমন জানবায প্রয়োজন যারা নিজেদের প্রাণের কোন পরোওয়া করে না। যাদের অন্তরে ইরাক ও পারস্যের তীব্র ভালোবাসা আছে। আমার স্বেচ্ছাসেবক জানবায প্রয়োজন এবং এমন কিছু অফিসারও প্রয়োজন যারা সিপাহীদের কাতারে গিয়ে লড়তে রাজী। এমন কেউ থাকলে এগিয়ে আসো।'

সারা ফৌজ তখন এমন আবেগে টগবগ করছিলো যে, পুরো ফৌজই এগিয়ে এলো। ফৌজে সেই সিপাহীরাও ছিলো যারা দেয়ালের ওপর মোতায়েন ছিলো। ইয়াযদগিরদের হুকুমে তাদেরকেও নিচে ডাকা হয়েছিলো।

সিদ্ধান্ত হলো, পুরো ফৌজকে দিয়ে হামলা করানো এখন ঠিক হবে না। বাছাই করা জানবায সৈন্যদের নিয়ে হামলা চালাতে হবে। জেনারেলদেরকে বলা হলো, দেশের জন্য যারা লড়তে পাগল প্রায় এ ধরনের অফিসার ও সিপাহীদের নির্বাচন করো। তারপর এমন এক ফৌজ প্রস্তুত করা হলো যাদের মধ্যে এমন কমান্ডারাও আছে, যারা রণকৌশলে অত্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ বলে প্রসিদ্ধ ছিলো। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসাতে পরদিন সকালের জন্য হামলা মুলতবী করা হলো।

পরদিন সকালের সূর্য তখনো স্পষ্ট হয়নি, হঠাৎ শহরের সবগুলো দরজা এক সঙ্গে খুলে গেলো এবং বাঁধভাঙ্গা বন্যার মতো ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক সৈন্যরা বেরোতে লাগলো। সাদ (রা) গতকালের শহরের ভেতরের হৈ হুল্লোড় শুনেই বলে দিয়েছিলেন, এটা পরবর্তী হামলার প্রস্তুতির হাঙ্গামা। এক সালার তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, হামলাকারীদের ওপর মিনজানীক ব্যবহার করা হোক। সাদ (রা) এই পরামর্শ সানন্দে গ্রহণ করলেন। রাতেই মিনজানীকগুলো এমনভাবে রাখা হলো যে, দেখা গেলো প্রতিটি দরজা বরাবর একটা করে মিনজানীক রাখা হয়েছে। আর বাকী মিনজানীকের রুখ ওপরের দিকে না করে কিছুটা নিচের দিকে তাক করা।

শহর থেকে যখনই ফৌজ বেরোতে লাগলো তাদের ওপর একযোগে পাথর বর্ষণ শুরু হয়ে গেলো। মিনজানীকগুলো ছোট ছিলো। তাই ছোট ছোট পাথরই ছোড়া যেতো। তাই বলে এত ছোট নয় যে, তা দিয়ে বিপক্ষের কোন ক্ষতিই হচ্ছিলো না। দশ কেজি বা এই পরিমাণ ওজনের পাথর তো অবশ্যই ছোড়া যেতো। একজন মানুষকে এর চেয়ে কম ওজনের পাথর দিয়েও কাবু করা যায়। মিনজানীক থেকে ছোড়া পাথর যার গায়ে লাগতো দারুণভাবে ঘায়েল হয়ে যেতো। ঘোড়াগুলোও এত ওজনী পাথরের আঘাত সইতে পারছিলো না। মিনজানীক থেকে ছোড়া পাথরগুলো কামানের গোলার মতো গিয়ে ফারসীদের গায়ে লাগছিলো।

যখন এভাবে পাথর বর্ষণ শুরু হলো পাথরের আঘাতে গড়িয়ে পড়া সওয়াররা দরজার পথ বন্ধ করে দিলো। কিছু কিছু ঘোড়াও পড়ে রইলো। আর কিছু লাফিয়ে উঠে পিছন দিকে সরে গেলো। ভেতর থেকে তাই বাকী ফৌজের বের হওয়ার রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা তৈরী হয়ে গেলো। তাদের হুকুম দেয়া হলো, গড়িয়ে পড়া মানুষ ও ঘোড়ার ওপর দিয়ে যেন বাইরে বের হয়। এই হুকুমে তারা নিজেদের সঙ্গীদের পায়ে পিষে-মাড়িয়ে বাইরে বের হতে লাগলো।

পাথর নিক্ষেপের ধারাবাহিকতা দ্রুততর করা যাচ্ছিলো না। কারণ মিনজানীকে পাথর রাখা ও তা ছোড়ার জন্য সময় লাগতো কিছু। তবুও পারসিকদের ক্ষতি কম হলো না। শহরের ফৌজের এই সওয়াররা ও পদাতিকরা তারপরও দারুণ সাহসিকতার

পরিচয় দিলো। তারা কোন কিছুর পরওয়া না করে জানবাজী রেখে বাইরে এসে আক্রমণ করতে লাগলো। কিন্তু তাদের হামলায় যে প্রাণ থাকার কথা ছিলো সেটা ছিলো না।

ইয়াযদগিরদ, তার মা ও পুরানকে দেয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছিলো। পারসিকদের ঝাণ্ডা তাদের হাতে ছিলো। সাদ (রা) তাদের হাতের ঝাণ্ডা দেখলেন।

ঃ 'খোদার কসম!' – সাদ (রা) উঁচু আওয়াজে ঘোষণা করলেন– 'এই ঝাণ্ডাটি দেয়ালের বাইরে নামিয়ে আনতে হবে। এমন তীরন্দায আছে যার তীর সে পর্যন্ত পৌছবে!'

সাদ (রা) তার ঘোড়ার গায়ে খোঁচা লাগিয়ে দিলেন এবং তার মুহাফিজদের নিয়ে সেখানে গিয়ে পৌছলেন যার বিপরীত দিকের দেয়ালে ইয়াযদগিরদ দাঁড়িয়ে ছিলো। সেখান থেকে ইয়াযদগিরদের অবস্থানের দূরত্ব এত বেশি ছিলো যে, সে পর্যন্ত তীর পৌছানো সম্ভব ছিলো না। কয়েকজন তীরন্দায সেদিকে এগিয়ে গিয়ে তীর চালাতে লাগলো। কিন্তু তীর দেয়ালের নিচের দিকে লেগে ফিরে এলো। দেয়ালের ওপর তীর নিক্ষেপের জন্য তীরন্দাযরা যখন আরো সামনে অগ্রসর হলো তখন তারা দেয়ালের ওপরের তীরন্দায ও বর্শাধারীদের আওতায় পৌছে গেলো এবং যখমী হতে শুরু করলো।

ঃ 'এদেরকে পিছু হটিয়ে নিয়ে এসো' – সাদ (রা) হুকুম দিলেন– 'আমরা কোন ক্ষতির সম্মুখীন না হয়ে এই শহর দখল করতে চাই। একটি মিনজানীকের রুখ ওদিক করে পাথর নিক্ষেপ করতে থাকো।'

সঙ্গে সঙ্গে একটি মিনজানীক টেনে এনে পাথর ঢালা শুরু হয়ে গেলো। ইয়াযদগিরদ মিনজানীক নিয়ে এই তৎপরতা দেখে তৎক্ষণাৎ নাওরীন ও পুরানকে নিয়ে সেখান থেকে পেছনে সরে গেলো। কিছুক্ষণ পরেই তাকে দেয়ালের আরেক দিকে দেখা গেলো। বুঝা গেলো ইয়াযদগিরদও আজ জানবাজি রেখে তার হামলাকারী সৈন্যদের অনবরত চিৎকার করে উৎসাহ দিয়ে যাবে। কিন্তু তার এই চিৎকার ও উৎসাহব্যঞ্জক বাক্যগুলো বিফলে যাচ্ছিলো। একে তো পাথর বর্ষণের গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজে চারদিকের কিছুই শোনা যাওয়ার অবস্থা ছিলো না। তারপর ফারসী জেনারেল থেকে নিম্নস্তরের সিপাহী পর্যন্ত সবার মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিলো যে, মুসলমানদের পরাজিত করা সম্ভব নয়। অনবরত পাথর বর্ষণ আর তার বিকট আওয়াজ তাদের ভয় আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলো।

আবেগে উত্তেজনায় শ্লোগান দেয়া যায়। কিন্তু রণাঙ্গনে শ্লোগান কোন কাজে লাগে না হয় যদি জযবা ও মনোবল দৃঢ় না হয়, তখন রণাঙ্গনে তেজস্বী ঘোড়া ও উন্নত অস্ত্রশস্ত্রও কাজে লাগে না। পারসিকদের ভরসা ছিলো ওদের অসংখ্য হাতির ওপর। হস্তিবাহিনী যে মুসলমানদের স্রেফ পিষে মারবে এটা তারা শতভাগ বিশ্বাস করতো। কিন্তু মুসলমানদের হাতে যখন তাদের হাতিগুলো লাশ হয়ে গেলো এবং অনেকগুলো পানিতে ঝাঁপিয়ে মরলো তখন থেকেই তাদের মধ্যে মুসলমানদের ভয় ও আতংক স্থায়ী বাসা করে নেয়। এই ভয় ও আতংকই তাদেরকে কোথাও জমে দাঁড়াতে দেয়নি। বীরত্ব, দুর্বার সাহস, লড়াইয়ের দক্ষতা ও যুদ্ধকৌশলে পারদর্শী অফিসার ও সিপাহী তখন

ফারসী ফৌজে কম ছিলো না। আজ যে তারা লড়ছিলো তাতেও তারা যথেষ্ট জানবাজি রেখে লড়ছিলো। যে কারণে তাদের হামলাও ছিলো প্রচণ্ড। তবুও তারা মুসলমানদের সামনে দাঁড়াতে পারলো না।

উভয় ফৌজ যখন সম্মুখ যুদ্ধে তুমুল লড়াই শুরু করে দিলো তখন মিনজানীক থেকে পাথরবর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হলো। পারসিকরা সৈন্যের পরিমাণ বাড়িয়ে মুসলমানদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করতে লাগলো। তাদের চাপ এত তীব্র ছিলো যে, কয়েকবারই তারা মুসলমানদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে ফেললো। কিন্তু মুসলমানরা তাদের তিন চারবারের চাপ সামলে নিয়ে নিজেরা চাপ সৃষ্টি করলে ফারসীদের লড়ার মানসিকতা টুটে যেতে লাগলো। ফারসীরা লড়ছিলো আবেগ উত্তেজনায় বলীয়ান হয়ে। কিন্তু মুসলমানদের সালাররা কাজ নিচ্ছিলেন বুদ্ধি খাটিয়ে।

এক জায়গায় মুসলমানরা এমনভাবে পেছনে সরতে লাগলো যেন তারা বাধ্য হয়ে পিছু হটছে। পারসিকরা তাদের ওপর চাপ বাড়াতে এগুতে লাগলো। একটু পর যখন দেখলো তারা মুসলমানদের ঘেরাওয়ে আটকা পড়েছে তখনই তাদের হুঁশ এলো। তারা বুঝতে পারলো এটা মুসলমানদের একটা চাল ছিলো। পারসিকরা এখন তাদের প্রাণ রক্ষার জন্য লড়তে লাগলো। কিন্তু যে ফাঁদে তারা পা দিয়েছে সেখান থেকে এত সহজে প্রাণ নিয়ে বের হওয়া সম্ভব ছিলো না।

ঘেরাওয়ের বাইরের পারসিকরা যখন তাদের সঙ্গীদের এ অবস্থা দেখলো তারা তখন সতর্ক হয়ে গেলো এবং পেছন দিকে দেখতে লাগলো তাদের পালানোর পথ পরিষ্কার কি না। দেয়ালের ওপর ইয়াযদগিরদ দাঁড়িয়ে দেখছিলো। একটু আগে সে তার সৈন্যদের চিৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছিলো। কিন্তু লড়াইয়ের নতুন অবস্থা দেখে তার মুখ বন্ধ হয়ে গেলো। একবার তার মা ও পুরানের দিকে মুখ তুলে তাকালো। তার চেহারায় হতাশার গভীর ছাপ তখন দেখা যাচ্ছিলো। লড়াই থেকে তার চোখ ফিরিয়ে সে আস্তে আস্তে চলে যেতে লাগলো। দেয়ারের ভেতরের দিকে চোখ পড়তেই সে যন্ত্রণায় কেঁপে উঠলো। এমন দৃশ্য দেখলো যা তার সহ্যের বাইরে ছিলো। তার আহত সৈন্যরা খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকছিলো। অনেক অক্ষত ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক সৈন্যও বাইরে থেকে পালিয়ে ভেতরে আসছিলো। পুরান ও নাওরীনও তার কাছে চলে এলো। ইয়াযদগিরদ তাদের দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নামিয়ে নিলো। তারপর ধীরে ধীরে নিচে নেমে গেলো।

সালার যাহরা ইবনে হাওয়াইয়া এক ফারসী ফৌজের বর্ম পরেছিলেন। যাহরা ও হাশেম ইবনে উতবার সঙ্গে লড়াইয়ে হেরেই পারসিকরা বাহারশীরে ঢুকে শহরের সব দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলো এবং যাহরা ও হাশেম ইবনে উতবা বাহারশীর অবরোধের সূচনা করেন। সাদ (রা) তার ফৌজ নিয়ে এসে পুরোদমে অবরোধে যোগ দেন।

এই বর্মটি যাহরা কাদিসিয়ার যুদ্ধেও ব্যবহার করেছিলেন। এজন্য বর্মের গায়ে অসংখ্য তলোয়ার, তীর ও বর্শার আঘাতের চিহ্ন ছিলো। এসব আঘাতে যাহরা অক্ষত

থাকলেও বর্মের কয়েকটি কড়া ভেঙ্গে গিয়েছিলো। বাহারশীরের ফৌজরা যখন হামলা করলো তখনো যাহ্‌রার গায়ে এই ভাঙ্গা বর্মটি ছিলো। তার সঙ্গীরা তাকে বললো, বর্মটি বাদ হয়ে গেছে। একে পাল্টিয়ে ফারসীদের আরো কয়েকটি বর্ম আছে, সেখান থেকে একটা পরে নাও।

ঃ 'আরে ইবনে হাওয়াইয়া!' – তার এক সঙ্গী তাকে বললো– 'এই বর্ম তো তীর রুখতে পারবে না!'

ঃ 'আমি এত সৌভাগ্যবান হলাম কবে' – যাহ্‌রা আনন্দিত গলায় বললেন– 'আমার ভাগ্য এত ভালো নয় যে, অন্যকে ছেড়ে দুশমনের তীর আমার দিকে ছুটে আসবে।'

শাহাদাতের এই তীব্র বাসনাই মুসলমানদের আসল শক্তি ছিলো। আল্লাহ্‌র পথে তারা প্রাণ বিসর্জন দেয়াকে পরম সৌভাগ্য ও দুর্লভ সুযোগ মনে করতো। যাহ্‌রার অতৃপ্তির কথা যেন আল্লাহ্‌ শুনতে পেলেন। হঠাৎ একটি তীর যাহ্‌রার পাঁজরে এসে বিঁধলো। তীরটি পাঁজরে বিপদজনকভাবে এসে ঢুকলো।

ঃ 'ইবেন হাওয়াইয়া!' – তার এক সঙ্গী তাকে বললো– 'একটু দাঁড়াও। তোমার তীরটি খুলে দিচ্ছি। তারপর পেছনের নিরাপদ ছাউনীতে চলে যেয়ো।'

ঃ 'নারে ভাই! এটি যেখানে গেঁথেছে সেখানেই থাকতে দাও। আমি ততক্ষণই জীবিত থাকবো যতক্ষণ এটি আমার দেহে থাকবে' – যাহ্‌রা ব্যথা চাপা দিয়ে বললেন।

চার-পাঁচ জন মুজাহিদ এগিয়ে এসে তীরটি খুলে দিতে চাইলো। কিন্তু যাহ্‌রা তার সিদ্ধান্তেই অটল থাকলেন। পাঁজরে তীর নিয়ে তিনি পারসিকদের একটি দলের ওপর আক্রমণ করে বসলেন। এই দলের নেতৃত্বে ছিলো পারস্যের প্রভাবশালী জেনারেল শহরবারায। যাহ্‌রা তার হাতের ঝাণ্ডা দেখে ফেললেন। কয়েকজন মুজাহিদ নিয়ে আচমকা শহরবারাযের আশেপাশের সেনা বেষ্টনীর ওপর হামলা চালালেন। সেনা বেষ্টনী ভেঙে গেলো। যাহ্‌রা শহরবারাযকে তলোয়ারের এক আঘাতে ওপারে পাঠিয়ে দিলেন।

এতে ফারসী জেনারেলের ঝাণ্ডা পড়ে গেলো। ফারসী জেনারেল মারা যাওয়াতে ও তার হাত থেকে ঝাণ্ডা পড়ে যাওয়াতে পারসিকদের মধ্যে পালাও পালাও অবস্থা ছড়িয়ে পড়লো। সবাই শহরের দরজার দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর যাহ্‌রা তার পাঁজরের তীরটি নিয়ে শহীদ হয়ে গেলেন।

সবশেষে দেখা গেলো ইয়াযদগিরদের এই হামলাও ব্যর্থ হয়েছে। যে জানবায ও বাছা বাছা সৈন্যদের নিয়ে হামলাকারী ফৌজ প্রস্তুত করা হয়েছিলো তার অল্প কিছু সংখ্যক ফৌজই শহরে ফিরে যেতে পেরেছিলো। বাকী সব বাইরে মরে পড়ছিলো বা যখমী ছিলো, যারা অনুনয় বিনয় করে মুসলমানদেরকে বলছিলো, তাদের প্রাণে না মেরে জীবন ফিরিয়ে দিতে। মুসলমানরা তাদেরকে সযত্নে উঠিয়ে নিয়ে শুশ্রূষায় মনোযোগ দিলো।

বাহারশীরকে মুসলমানদের হাত থেকে বাঁচানো অনেকটা অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো।

❖ ❖ ❖

পরদিন শহরের একটি দরজা খুলে গেলো। পাঁচ ছটি ঘোড়সওয়ার বাইরে বেরিয়ে এলো। সামনের ঘোড়সওয়ারের পোষাক দেখে মনে হচ্ছিলো সে কোন শাহী খান্দানের কেউ হবে বা সে কোন বড় অফিসার। তার পাশের সওয়ারটি একটি সাদা ঝাণ্ডা উচিয়ে এগিয়ে আসছিলো। বুঝাই যাচ্ছিলো, তারা সমঝোতা বা সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আসছে। তার সাথে আরবী অনারবী সব ভাষায় পারদর্শী এক দোভাষীও ছিলো। ঘোড়সওয়ার আরেকটু এগিয়ে এসে থেমে গেলো। দোভাষী এগিয়ে এলো।

ঃ 'শাহেনশাহে ফারেস ইয়াযদগিরদের দূত এসেছে' – দোভাষী আরবীতে বললো– 'আরবী সিপাহসালারের সাথে তিনি সাক্ষাত করতে চান। তিনি শান্তি ও বন্ধুত্বের পয়গাম নিয়ে এসেছেন।'

সাদ (রা) এর ভাতিজা হাশেম ইবনে উতবা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি সেদিকে এগিয়ে গেলেন।

ঃ 'আমরা শাহেনশার দূতকে আন্তরিক সংবর্ধনা জানাচ্ছি। আমার সঙ্গে আসুন।'

হাশেমও ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন। তিনি দূতকে সাদ (রা) এর তাঁবুতে নিয়ে গেলেন। সাদ (রা) সেখানে ছিলেন না। তিনি তার ফৌজের সাথে ছিলেন। অবরোধ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তাকে সংবাদ দেয়া হলো, শাহে ফারেসের দূত এসেছে। তিনি তখনই তাঁবুর দিকে হাঁটা দিলেন। দূত এবং দোভাষী মাটির ওপর বিছানো চাটাইয়ের ওপর বসা ছিলো। দূতের দেহ ছিলো বেশ মাংসল। সাদ (রা) কে তাঁবুতে ঢুকতে দেখেই মোটাসোটা সম্মানার্থে দাঁড়াতে গেলো। কিন্তু স্থূল শরীরের কারণে তার উঠতে কষ্ট হচ্ছিলো।

ঃ 'থাক থাক উঠার দরকার নেই' – সাদ (রা) দূতের কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে বসিয়ে বললেন– 'তোমাদের জেনারেলরা ময়দানেও তখত, কুরসী ও গালিচা নিয়ে আসে' – একথা বলে সাদ (রা) দূতের সাথে হাত মেলালেন। তারপর একটু দূরে বসে পড়লেন– 'তোমাদের রুস্তমের বিরাট রাজকীয় তখতটি আমাদের হেফাজতে আছে। এর ওপর বসে সে তার ফৌজ পরিচালনা করতো। তার গালিচা, শাহী কুরসী, এমনকি তার দরবারের সাজসজ্জার সব মনোহরী জিনিসই এখন আমাদের কব্জায়। কিন্তু আমরা এই চাটাইয়ের ওপর বসেই স্বস্তি বোধ করি... তোমাদের অবশ্য কষ্ট হবে। কিন্তু আমরা এই সাদাসিধা জীবন ছাড়তে পারবো না।'

ঃ 'যে সম্মান দেখিয়ে আপনি আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এতে আমি এমন অভিভূত হয়েছি যে, আমি মাটিতে বসে আছি না রেশম কোমল গালিচায় বসে আছি তা বুঝতে পারছি না' – দূত সহাস্যে বললো– 'সর্বপ্রথম শাহেনশাহে ফারেস ইয়াযদগিরদের সালাম কবুল করুন। তারপর শাহেনশার একটি প্রস্তাব ভেবে দেখুন। আশা করি আপনি এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। এটা আমাদের শাহেনশার উদারতা ও মহানুভবতা যে, তিনি তার অর্ধেক সালতানাত আপনাকে দিয়ে দিচ্ছেন।'

ঃ 'তোমাদের শাহেনশার পুরো পয়গাম শোনাও।'

ঃ 'শাহেনশাহে ফারেসের ফয়সালা হলো' – দূত বললো– 'আমাদের সালতানাতের যে এলাকাগুলো আপনারা নিয়ে নিয়েছেন সেগুলো আপনার এবং দজলার ওপারের এলাকা পারস্যের।'

ঃ 'অর্থাৎ শাহেনশাহ দজলাকে আরব ও আজমের মাঝখানে বিভাজন সীমানা নির্ধারণ করতে চান' – সাদ (রা) জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ 'হ্যা, ঠিক এরকমই' – দূত বললো– 'শাহেনশাহ ফয়সালা করেছেন। শুধু আপনার সম্মতি দরকার। বাহারশীর আপনাদের হবে মাদায়েন আমাদের। শাহেনশাহ চান না আরো রক্ত ঝরুক।'

ঃ 'তোমাদের শাহেনশার চাওয়া না চাওয়ার পাবন্দ নই আমরা' – সাদ (রা) বললেন– 'এখন শাহেনশাকে আমাদের ফয়সালা মেনে নিতে হবে। যেদিন আমরা বাহারশীর এসেছিলাম সেদিন যদি তোমাদের শাহেনশাহ এই প্রস্তাব করতেন, ভেবে দেখা যেতো। বাহারশীর বাঁচাতে তোমরা কি না করেছো। দুই দিন আগে কি প্রচণ্ড হামলা করিয়েছিলেন তোমাদের শাহেনশাহ। এটা তার শেষ আঘাত ছিলো। তা ব্যর্থ হয়ে গেছে। এখন মাদায়েন বাঁচাতে অর্ধেক সালতানাত দিতে চাচ্ছেন...না সম্মানিত দূত! তাকে বলো আমরা এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারবো না।'

ইয়াযদগিরদের দূত অনেক চেষ্টা করলো। অনেক কিছু বললো। অনেক অর্থসম্পদ ও স্বর্ণালংকার দেয়ার প্রস্তাব করলো। সাদ (রা) সব ফিরিয়ে দিলেন।

ঃ 'ঠিক আছে তাহলে আপনার শর্তগুলো বলুন' – দূত বললো– 'শাহেনশাহ এখনই যুদ্ধ বন্ধ করতে চান।'

ঃ 'শর্ত বা প্রস্তাব পেশের সময় চলে গেছে' – সাদ (রা) বললেন– 'আমরা আমাদের শর্ত পেশ করেছিলাম। তোমাদের শাহেনশাহ আমাদের প্রেরিত দূতকে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও শ্রদ্ধেয় দূতের মাথায় মাটিভর্তি টুকরী রেখেছিলেন। তোমাদের রুস্তম বলেছিলো, খোদা না চাইলেও আরব ধ্বংস করে দেবো। যুদ্ধের ফয়সালা তোমাদের শাহেনশাই করেছিলেন। এখন যুদ্ধের ফলাফল তার তো মেনে নেয়া উচিত।'

ঃ 'আমি আশ্চর্য হচ্ছি, আপনার মতো এমন বিচক্ষণ সিপাহসালার এত বড় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছেন!'

ঃ 'সম্মানিত দূত!' – সাদ (রা) বললেন– 'আমি এর চেয়ে বড় প্রস্তাবও গ্রহণ করতে পারতাম না। আমাদের খলিফার পরিষ্কার নির্দেশ–মাদায়েন জয় করতেই হবে। আমি আমার খলীফার নির্দেশ পরিবর্তনের দুঃসাহস দেখাতে পারবো না।'

একথা বলে সাদ (রা) দূতকে বিদায় করে দিলেন।

❖ ❖ ❖

ইয়াযদগিরদের দূত চলে যেতেই সাদ (রা) সালারদের ডেকে নির্দেশ দিলেন, শহরের ওপর পাথর বর্ষণ আগের চেয়ে আরো তীব্র করে দাও।

পুরো লশকরে একথা ছড়িয়ে গেলো যে, শাহেনশাহে ফারেস যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব দিয়ে বিনিময়ে দজলা পর্যন্ত এলাকা সাদ (রা)কে দিতে চেয়েছে। তারপর সাদ (রা) যখন শহরের ওপর পাথর বর্ষণ বাড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন তখন পুরো লশকর গর্জে উঠলো।

ঃ 'আমাদের গন্তব্য মাদায়েন'।

ঃ 'না, মাদায়েনেরও পরে আমাদের যেতে হবে।'

ঃ 'আমরা আমাদের শহীদদের রক্তের পুরো মূল্য শোধ করবো।'

শ্লোগানের আওয়াজ যখন উঁচু থেকে উচ্চতর হচ্ছিলো সাদ (রা) এর চেহারা আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠলো। তিনি ঘোড়া দৌড়ে পুরো অবরোধস্থল ঘুরতে লাগলেন।

ঃ 'আমার কথার সমর্থনই তোমাদের সুরে ঝংকৃত হলো' – সাদ (রা) কয়েক জায়গায় ঘোড়া থামিয়ে মুজাহিদদের বললেন– 'আমি শাহে ফারেসের দূতকে এই জবাব দিয়েই ফিরিয়ে দিয়েছি যে, আমরা আর কোন শর্ত ও বিনিময় প্রস্তাব মেনে নেবো না... বন্ধুরা আমার! তোমাদেরকে আমি এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি, শহীদানের সঙ্গে আমি অকৃতজ্ঞতার আচরণ করবো না। আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশও এটাই যে, মাদায়েন জয় করতে হবে।'

মুজাহিদদের শ্লোগান শুনে সাদ (রা) এর উদ্দীপনায় নতুন মাত্রা যোগ হলো এবং সাদ (রা) এর দৃঢ়তা দেখে মুজাহিদদের মনোবলে নতুন প্রাণের সঞ্চার হলো। এটা ছিলো ইচ্ছা শক্তি, এটাই ছিলো আত্মিক শক্তিমত্তা। যাকে অবলম্বন করে মুসলিম ফৌজ মাদায়েন জয় করার কঠিন সংকল্প ব্যক্ত করছিলো। অথচ তখনো তারা বাহারশীর জয় করতে পারেনি।

প্রায় বছরখানেক এই অবরোধ স্থায়ী হলো। এর মধ্যে উমর (রা) একবার কিছু সেনাসাহায্যও পাঠিয়েছিলেন। যখমী মুজাহিদরাও সুস্থ হয়ে লড়ার উপযুক্ত হয়ে গিয়েছিলো।

সাদ (রা) যে গুপ্তচর নিয়োগ করেছিলেন তারা তাদের কাজ ঠিকই করে যাচ্ছিলো। একদিন এক গোয়েন্দা খবর দিলো, বাহারশীর ও মাদায়েনে গোপন কিছু তৎপরতা চলছে। মনে হচ্ছে বাহারশীর থেকে ফৌজ অন্যত্র সরানো হচ্ছে।

আরো কয়েকদিন পর সালাররা সাদ (রা) কে জানালো, দেয়ালের ওপর যে তীরন্দাযরা সবসময় প্রহরায় থাকতো তাদের সংখ্যা কিছুটা কমে গেছে।

ঃ 'হ্যাঁ আমিও দেখেছি এটা' – সাদ (রা) বললেন– 'আমি অপেক্ষায় আছি, এই সংখ্যা যদি আরো অনেক কমে যায় তাহলে আমরা দরজা ভেঙে শহরে ঢুকতে চেষ্টা করবো বা রশির সাহায্যে শহরের দেয়ালে চড়তে চেষ্টা করবো।'

❖ ❖ ❖

আরো কয়েক দিন পর এক রাতে মুজাহিদদের মধ্যে শোরগোল উঠলো। সালাররা এতে জেগে উঠলেন। সাদ (রা) এরও চোখ খুলে গেলো। তিনি তাঁবুর বাইরে চলে এলেন। তিনি দেখলেন দজলার ওপর আকাশ রক্তিমবর্ণ ধারণ করেছে। কিন্তু দজলার এদিকটায় শহরের দৈর্ঘ এত বেশি ছিলো যে, সামনে গিয়ে দেখার উপায় ছিলো না ওখানে কি হচ্ছে। লাল জ্বলজ্বলে আলোর কারণ তখনই বুঝা গেলো যে, আগুন লেগেছে। কিন্তু বুঝা যাচ্ছিলো না, আগুন কোন একটি ঘরে লেগেছে না অনেকগুলো ঘরে লেগেছে।

সাদ (রা) এর মনে হলো, পারসিকরা শহরে আগুন দিয়েছে। আর আগুন তখনই লাগানো হয় যখন শহর খালি করা হয়। তার নির্দেশে দুই ঘোড়সওয়ার পাঠানো হলো। তারা নদী-তীরের অনেকখানি এলাকা ঘুরে এলো। যেখান থেকে নদীর তীরবর্তী শহরের অংশ দেখা যায়।

ঃ 'তারা পুল জ্বালিয়ে দিয়েছে।' – ঘোড়সওয়াররা এসে সিপাহ্সালারকে বললো– 'পুলের সবটাই জ্বলছে।'

ঃ 'আমাদের জন্য তারা মাদায়েনের পথ বন্ধ করে দিয়েছে' – সাদ (রা) বললেন– 'যাক, সকালে দেখা যাবে বাহারশীরে আর কি রইলো। হয়তো আমরা শূন্য শহরই দেখতে পাবো।'

সকাল হলে বাহারশীরে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন যেটা দেখা গেলো সেটা হলো, শহরের দেয়ালে একজন তীরন্দাযও পাওয়া গেলো না। সাদ (রা) এর নির্দেশে এক জায়গায় দেয়ালের ওপর দড়ি ফেলে তিন চার মুজাহিদ ভেতরে চলে গেলো। তাদের হেফাজতের জন্য অনেক তীরন্দায নিচে তীর নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। যাতে দড়ি বেয়ে যারা ওপরে উঠছে, কোন ফারসী যদি তাদের ওপর তীর বা বর্শা নিক্ষেপ করে তাহলে তাদের ওপর তীর বৃষ্টি শুরু করা যায়।

মুসলিম সৈন্যরা ওপরে চলে গেলো এবং দেয়ালে দাঁড়িয়ে পুরো শহরের ওপর চোখ বুলালো।

ঃ 'শহর মনে হয় একেবারে খালি' – এক সৈন্য চিৎকার করে বললো।

'এটা ধোঁকাও হতে পারে' – সাদ (রা) বললেন– 'সাবধানে থেকে নিচে নেমে শহরের দরজা খুলে দাও।'

কিছুক্ষণ পর একটি দরজা খুলে গেলো। সাদ (রা) ক'কাকে হুকুম দিলেন তার বাহিনী নিয়ে যেন শহরে ঢুকে যায়। ক'কা তার বাহিনীকে ডেকে নির্ভয়ে শহরে ঢুকে পড়লেন এবং পুরো শহরে ছড়িয়ে পড়লো সবাই। তারা শহরের অন্যান্য দরজাগুলোও খুলে দিলো। পুরো লশকর শহরে ঢুকে পড়লো এবং শহরের আনাচে কানাচে গিয়ে খুঁজতে লাগলো কোন ফারসীকে পাওয়া যায় কিনা। ঘরগুলোর ভেতর গিয়ে দেখা গেলো সবগুলো জন মানুষ শূন্য। প্রতিটি ঘরেই গিয়ে ভারী আসবাবপত্র পাওয়া গেলো। যেগুলো লোকেরা নিয়ে যেতে পারেনি। পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছিলো, মূল্যবান সব জিনিস ও ধনসম্পদ তারা সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।

পুরো শহর থেকে শুধু এক বৃদ্ধকে পাওয়া গেলো। যে নিজেই বাইরে বের হয়ে এলো। তাকে সাদ (রা) এর সামনে নিয়ে যাওয়া হলো।

ঃ 'আরে আপনি কেন শহরে রয়ে গেলেন?' – সাদ (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন– 'আপনি কি বলতে পারেন এরা কোথায় এবং কেন চলে গেছে?'

ঃ 'এটা বলার জন্যই আমি বাইরে বের হয়েছি' – বৃদ্ধ আরবীতে উত্তর দিলো– 'আমি এখানে থাকলেই বা তোমাদের কি ক্ষতি করতে পারবো? সবাই বলেছিলো তুমিও চলো। এখানে থাকলে মুসলমানরা তোমাকে মেরে ফেলবে। আমি বললাম, আমি এখন বেঁচে থেকে করবোইটা কি। ...এই ঘরটি ছেড়ে যেতে বড় দুঃখ পাচ্ছিলাম। এই ঘর আমার বাপ-দাদারা বানিয়েছিলো। এতেই তারা তাদের জীবন কাটিয়ে দিয়েছিলো। আমার দুই যুবক ছেলে ফারসী ফৌজে যোগ দিয়ে দু'জনেই নিহত হয়েছে। আমার দুই যুবতী মেয়ে আছে। ওদেরকে মাদায়েন পাঠিয়ে দিয়েছি। এটা একটা প্রথা যে, বিজয়ী দল বিজিত এলাকার নারীদের নিজেদের ভোগ-সম্পত্তি মনে করে। আমি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, হত্যা করতে চাইলে হত্যা করে দাও।'

ঃ 'না মান্যবর!'– সাদ (রা) বললেন– 'আমরা নিরস্ত্র, বৃদ্ধ, শিশু ও নারীদের ওপর হাত উঠাই না। আমরা লুট টুটও করি না। কেন আপনি কি দেখছেন না, আমার লোকেরা ঘরে ঘরে ঢুকে খালি হাতে ফিরে আসছে। যে পর্যন্ত আমি নির্দেশ না দেবো কেউ কোন ঘরের কোন জিনিস ছুঁয়েও দেখবে না...আমাদের বলুন, এই শহর কি করে খালি করা হলো?'

ঃ 'দু'দিন আগে মাদায়েন থেকে হুকুম এলো, রাতে রাতে শহর খালি করে দেয়া হবে,' – বৃদ্ধ বললো– 'লোকেরা মাত্র দু'রাতে শহর খালি করে দিলো। আমি দেখছিলাম, তারা অতি মূল্যবান জিনিসগুলো নিয়ে যাচ্ছে। ভারী জিনিসগুলো রেখে যাচ্ছে। লোকেরা চলে গেলে ফৌজও চলে গেলো। গত রাতে আমার ছাদে গিয়ে দেখলাম, পুলটি ধাও ধাও করে জ্বলছে। এই পুলে আমার কৈশোরের কত স্মৃতি জড়িয়ে ছিলো। আমি ধীরে ধীরে নদীর তীর পর্যন্ত গেলাম। পুলের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত আগুন লাগানো হয়েছিলো। তারপর দেখলাম, নদীর এই তীরে যে অসংখ্য ছোট বড় নৌকা বাঁধা ছিলো আমাদের ফৌজ সেগুলো মাদায়েনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।'

ঃ 'সেখানে কি একটি নৌকাও নেই?'

ঃ 'একটিও নেই। নদীর এই তীর ধরে যত দূরেই যাওনা কেন একটি নৌকাও পাবে না তোমরা। তুমি সিপাহসালার। নিশ্চয় বুঝতে পারছো নৌকাগুলো কেন নিয়ে যাওয়া হলো এবং পুলই বা কেন জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। নদীর অবস্থাও দেখে নাও। এখানে নদী তুলনামূলক কম চওড়া বলে গভীরও অনেক। তাই পানির তোড়ও দেখো কেমন ভয়ানক। কোন বিখ্যাত সাতারুও এখান দিয়ে নদী পার হওয়ার কথা কল্পনা করবে না।... তবে আমি আমার পোড় খাওয়া অভিজ্ঞতা থেকে এতটুকু বলতে পারি, বিজয় একদিন না একদিন তোমাদেরই হবে।'

ঃ 'সেটা কিভাবে সম্ভব?' – সাদ (রা) জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ 'কারণ তোমরা ছিনতাই রাহাজানী করতে আসোনি' – বৃদ্ধ বললো– 'এটাও জানি আমি, আমাদের শাহেনশাহ তোমাদের অর্ধেক সালতানাত দিতে চেয়েছিলেন। তোমরা এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছো।'

ঃ 'কিন্তু আমাদের লশরকে নদীর ওপারে নিয়ে যাবো কি করে?' – সাদ (রা) অনুরোধের সুরে জিজ্ঞেস করলেন– 'কোন কিশতীও নেই, পুলও নেই... আপনি কি নদী পার হওয়ার কোন উপায় বলে দিতে পারেন না?'

সাদ (রা) তার কাছে পথের সন্ধান চাচ্ছিলেন। তিনি বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করেছিলেন এমন কোন স্থান আছে যেখানে নদীর পাটের চওড়া অনেক কিন্তু গভীরতা কম। বৃদ্ধ এমন কোন জায়গার সন্ধান জানতো না। বৃদ্ধ শুধু এতটুকু বললো, অনেক দূরে দূরে নদী নিচের দিকে নেমে গিয়ে কয়েকটি অংশে ভাগ হয়ে যায়। কিন্তু সেটাও অনেক দূর ছিলো এবং ওসব এলাকা বিষাক্ত প্রাণীর অভয়ারণ্য।

সাদ (রা) তার সালারদের ডেকে নদীতীরের দেয়ালের ওপর নিয়ে গেলেন সবাইকে। এর অপর তীরে ছিলো মাদায়েন শহর। সেখান থেকে মাদায়েনের শান শওকত তারা দেখতে লাগলেন। এই প্রথম তারা মাদায়েনকে অনেক কাছ থেকে দেখছিলেন। সালারদের একজন ছিলেন যরার ইবনে খাত্তাব। তিনি গভীর চোখে মাদায়েন দেখছিলেন।

ঃ 'আল্লাহু আকবার' – যরার ইবনে খাত্তাব শ্লোগানের আওয়াজে বললেন– 'এটা নিশ্চয় কিসরার সেই শুভ্র দুর্গ যার ওয়াদা আল্লাহ ও তার রাসূল (স) তোমাদের সঙ্গে করেছিলেন।'

ঃ 'আর এটাই সেই জায়গা' – সাদ (রা) বললেন– 'যেখানে কিসরা পারভেজ রাসূলুল্লাহ (স) এর সত্যের আহবানমূলক পয়গামটি ছিঁড়ে ফেলে উড়িয়ে দিয়েছিলো।... বন্ধুরা আমার! এখন ভাবনার বিষয় হলো এই নদী কি করে পার হওয়া যায়? নদীর অবস্থা দেখো। কেমন শো শো আওয়াজে বয়ে যাচ্ছে। এমন প্রবল তরঙ্গের উত্তাল নদী আমি খুব কমই দেখেছি। ঢেউয়ের কি প্রবল টান দেখেছো? কেউ কি এতে নামার সাহস করবে কখনো?'

ঃ 'সাহস করতেই হবে' – আসেম ইবনে উমর বললেন– 'পারসিকরা দজলাকে তাদের অস্ত্র বানিয়ে নিয়েছে। তারা ঠিকই চিন্তা করেছে, এই উম্মাতাল নদীতে পৃথিবীর কোন ফৌজ কখনো নামবে না, যেখানে না আছে পুল না আছে কিশতী। কিন্তু আমার কথা হলো, শাহেনশাহ ফারেসের সালতানাত এই নদীই রক্ষা করবে– তার এই ভাবনা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে হবে।'

ঃ 'তুমি কি আমাদেরকে এই নদী সাঁতরে পার হতে বলছো'? – সাদ (রা) বললেন– 'আমাদের মধ্যে কেউ মূসা নবী নয় যার জন্য আল্লাহর হুকুমে নীল দরিয়া তার প্রবাহ থমকে দিয়েছিলো।'

ঃ 'হ্যাঁ সিপাহ্সালার!' – আসেম ইবনে আমর বললেন– 'ইচ্ছায় যদি পুণ্য থাকে এবং অন্তরে যদি আল্লাহর নাম থাকে তাহলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষও অলৌকিক কিছু করে দেখিয়ে দিতে পারে।'

সাদ (রা) এ কথার কোন উত্তর দিতে পারলেন না। তিনি গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। একটু পর হেঁটে হেঁটে দেয়াল থেকে নেমে সেই কামরায় গিয়ে বসলেন যেখানে ফারসী জেনারেলরা বসতো। একজনকে ডেকে বললেন, সমস্ত গোত্র সরদারকে ডাকো। লোকটি চলে যাচ্ছিলো। তিনি আবার তাকে ডেকে বললেন,

ঃ 'পুরো লশকরকে বাইরের ময়দানে একত্রিত করো।'

অল্প সময়ের মধ্যেই পুরো লশকর সমবেত হয়ে গেলো। সাদ (রা) বাইরে বের হলেন। গোত্র সরদাররা নিজ নিজ গোত্র-বাহিনীর সামনে দাঁড়ানো ছিলো। সাদ (রা) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে লশকরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ঃ 'শাহেনশাহে ফারেস এই নদীকে নিজের ঢালস্বরূপ বানিয়ে নিয়েছেন' – মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে সাদ (রা) বললেন– 'আমি লক্ষ্য করেছি মাদায়েনের দেয়ালে দাঁড়িয়ে কিছু লোক আমাদেরকে ইংগিত করে হাসছে। তারা আমাদেরকে বিদ্রূপ করছে, আমরা আর এগুতে পারবো না। আমাদের ওপর ফরজ হয়ে গেছে দুশমনের এই বিদ্রূপের জবাব দেয়া। কিন্তু কিশতীগুলো দুশমনের কব্জায়। তারা যখনই ইচ্ছা আমাদের ওপর হামলা চালাতে পারবে। আমরা নদী পার হতে পারছি না। কিন্তু আমাদের নদী পার হতেই হবে। যুদ্ধের ময়দানে তোমরা কুদরতের অনেক কারিশমা দেখিয়েছো। এখন এই নদী পার হওয়ার মুজিযা তোমাদের দেখাতে হবে। কারণ, আমরা এমন এক জায়গায় পৌঁছেছি যেখানে মূলতঃ আমরা এক প্রকার বন্দী অবস্থায় আছি। এটা অবশ্যই হতে পারে যে, যেসব আমীর উমারা ও জায়গীরদাররা আমাদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলো, তারা প্রয়োজনীয় লোক জমা করে আমাদের প্রতি আনুগত্যের কথা ভুলে যেতে পারে এবং পেছনে থেকে আচমকা হামলা চালাতে পারে....আমি এমন কথা বলবো যা শুনে হয়তো বলবে, এমন কথা বলতে পারি না।'

ঃ 'হে আমীরে লশকর!' – মুসলিম ফৌজ থেকে একটি উত্তেজিত আওয়াজ ভেসে এলো – 'সে কথা আপনার মুখ দিয়ে বের করার আগে আমাকে একটি কথা বলতে দিন...মহান আল্লাহ্ আমাদের গন্তব্যের ও আমাদের ভাগ্যের ফয়সালা করে ফেলেছেন। আমরা সাঁতরেই নদী পার হবো।'

সিপাহসালার, সালার, এমনকি প্রতিটি সৈন্যের মুখে তখন এমন গভীর এক প্রাপ্তি আর আত্মবিশ্বাসের ঝলক ঝলমল করছিলো যেন তারা এই স্থূল দুনিয়ার গন্ডি ছেড়ে আরো অনেক উর্ধ্বে বা স্বপ্নের জগতে বিচরণ করছে। যেখানে পার্থিবতার মতো পলকা কোন ব্যাপারই স্থায়ী হয় না। এই এক আওয়াজই সবার মুখে শোভা পেতে লাগলো– 'সাঁতরেই আমরা নদী পার হবো– আমরা সাঁতরেই নদী পার হবো।'

সাদ (রা) বাস্তবপ্রিয় সিপাহসালার ছিলেন। তিনি নীরবে লশকরের শ্লোগানমুখর আওয়াজ শুনছিলেন। তারপর তিনি হাত উঠিয়ে সবাইকে শান্ত হতে বললেন।

ঃ 'শুধু নদী পার হলেই চলবে না আমাদের' – সাদ (রা) বললেন– 'নদী সম্মুখ তীরে রয়েছে হাজার হাজার ফারসী ফৌজ। শহরের যে দেয়াল নদী সংলগ্ন এর ওপর অসংখ্য তীরন্দায ও বর্শাধারী প্রস্তুত রয়েছে। তোমরা নদীতে নেমে যে কোন মূল্যে যদি নদীর সম্মুখ তীরে পৌছে যাও, তাহলে তীর বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। নদী পার হওয়ার জন্য তো আমিও কম মরিয়া নই।'

ঃ 'এটা আপনার হুকুম নয় সিপাহসালার!' – আসেম ইবনে আমরের বাহিনী থেকে এক সৈন্য গর্জে উঠলো– 'নদী পার হওয়া আল্লাহর হুকুম। আল্লাহর হুকুমই আমরা পালন করবো।'

ঃ 'আমরা আল্লাহর হুকুমই পালন করবো' – সারা লশকরে এই সুরেরই প্রতিধ্বনি উঠলো– 'আমরা অবশ্যই নদী পার হবো।'

জযবায়, আবেগে, উত্তেজনায় সাদ (রা) এর চেহারা লাল হয়ে উঠলো। তিনি সমবেত ফৌজকে এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত দেখলেন।

ঃ 'এই ত্যাগ আর বাহাদুরির পুরস্কার তোমাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই দেবেন' – সাদ (রা) বড় আওয়াজে বললেন– 'এখন আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছি, সেই লোকটা কে, যে কিছু সৈন্য নিয়ে নদীতে নেমে যাবে। যদি এমন কেউ নদী পার হতে প্রস্তুত হয়, তারা যেন নদীর ঐ পারের তীরবর্তী দুশমনদের বাঁধা দিয়ে রাখে।'

আসেম ইবনে আমর হাত উঠালেন এবং ঘোড়ায় খোঁচা লাগিয়ে সবার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

ঃ 'ঘোড়সওয়ারদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি নদীতে নামবো'–আসেম ঘোষণা করলেন।

তার ঘোষণা শেষ হতেই ছয়শ ঘোড়সওয়ার এগিয়ে এলো। সবাই এক সাথে বললো, আসেম ইবনে আমরের সাথে আমরা নদীতে নামবো।

নদীর দিকে শহরের যে দরজা ছিলো সেটা খুলে দেয়া হলো। সাদ (রা) এর ইশারায় আসেম এই ছয়শ ঘোড়সওয়ার নিয়ে শহরের বাইরে নদীর তীরে গিয়ে দাঁড়ালেন। নদী তীরে দাঁড়িয়ে আসেম ইবনে আমর ঘোড়সওয়ারদের উদ্দেশে বললেন–

ঃ 'বন্ধুরা আমার! নদীর অবস্থা দেখে নাও। এমন যেন না হয় যে, নদীর মাঝামাঝিতে গিয়ে একথা বলে পিছু হটতে শুরু করলে যে, হায় হায় আমরা এ কি করলাম। নিজেদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলাম। যেখানে নিশ্চিত মৃত্যুর আশংকা রয়েছে সেখানে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি না আমি। যারা স্বেচ্ছায় তোমাদের মধ্যে নদীতে নামতে চাও আমার সঙ্গে তারা এসো। আর যারা আসবে না তাদের ব্যাপারে আমার কোন অভিযোগ নেই।'

ছয়শ ঘোড়সওয়ারের মধ্য থেকে মাত্র ষাটজন ঘোড়সওয়ার এগিয়ে এলো। আসেম তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ঃ 'তোমরা এই সামান্য পানিকে ভয় পাচ্ছো'? – একথা বলে আসেম কুরআনের একটি আয়াত পড়লেন ঃ "সে পর্যন্ত কেউ মরবে না যে পর্যন্ত না আল্লাহর হুকুম হবে। একটি সময় তিনি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।"

আসেম কারো জবাবের অপেক্ষা না করে ঘোড়া ঘুরিয়ে আল্লাহু আকবার নারা লাগিয়ে ঘোড়া নদীতে নামিয়ে দিলেন। তার পিছু পিছু ষাটজন ঘোড়সওয়ার তাদের ঘোড়া নদীতে নামিয়ে দিলো। এরা কয়েক কদম এগুনোর পর যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিলো তারাও ঘোড়া নদীতে নামিয়ে দিলো। ঘোড়াগুলো একটুও ইতস্তত করলো না বা ভয় পেলো না। সওয়ারীদের নিয়ন্ত্রণেই রইলো সেগুলো। সেগুলোর পা নদীর তলানি পাচ্ছিলো না। কারণ নদীর তীরেই বেশ গভীরতা ছিলো পানির।

তাদের পেছনে সবাই নির্বাক – একেবারে বোবা বনে দাঁড়িয়ে রইলো। যেন আকাশ ও পৃথিবীর সব স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো। চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র সব তাদের কক্ষপথের রাস্তা ভুলে গিয়েছিলো। এটা ছিলো তাদের আত্মহত্যার পথে এগিয়ে চলা।

সাদ (রা) ও তার সালাররা শহরের দেয়ালে দাঁড়িয়ে এই অভাবিত দৃশ্য দেখছিলেন। সবাই যেন নিঃশ্বাস নিতে ভুলে গিয়েছিলেন।

ঃ 'ঐ যে দেখো' – সম্মুখ তীর থেকে এক ফারসী জোরে জোরে বললো– 'আরবরা পাগল হয়ে গেছে।'

এটা তো পাগলামীই ছিলো। এক দঙ্গল মানুষের পাগলামী... ছয়শ ঘোড়সওয়ার তীব্র উন্মাতাল খরস্রোতা নদীতে ঘোড়ায় চড়ে এগুচ্ছিলো। দজলার উত্তরে ছিলো আজারবাইজান। সে দেশের পুরো অঞ্চল ছিলো বরফে মোড়ানো। সেখানকার বরফগলা কনকনে পানি দজলাকে আরো ভয়ংকরী করে তুলেছিলো। যে কারণে নদী কখনো শান্ত হতো না। সবসময় তার ক্রুদ্ধ গর্জন শুনিয়ে যেতো।

ওদিকে নদীর ওপারে পারসিকরা হাসতে হাসতে একজন আরেকজনের ওপর গড়িয়ে পড়ছিলো আর বলাবলি করছিলো, পাগল হয়ে গেছে মুসলমানরা, তাই মরার জন্য নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাহলে তো এখনই লড়াই খতম হয়ে যাবে। কিছু ফারসী রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে বিস্ফারিত চোখে হাঁ করে দেখছিলো। এতো আমাদের মতোই মানুষ। কেমন করে এরা সিপাহসালারের হুকুমে ডুবে মরার জন্য নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো!

ঘোড়াগুলো নদীতেও শৃংখলিতভাবে সাঁতরে এগিয়ে যাচ্ছিলো। নদীর উত্তাল ঢেউয়ের তালে তালে সেগুলো একবার ওপরে উঠছিলো আরেকবার নিচে নামছিলো। সওয়ার নির্ভয়ে নিঃসংকোচে ওদেরকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলো। যেন নদীই তাদেরকে দুলুনি দিচ্ছিলো সখ্যতার খাতিরে। কিন্তু দূর থেকে দর্শকদের মনে হচ্ছিলো, এটা নিশ্চিত আত্মহত্যার তৎপরতা।

ফারসী ফৌজের যে দলটি নদীর ওপারে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, তাদের সাথে এক জেনারেল ছিলো। মাদায়েন প্রতিরক্ষার দায়িত্ব এই জেনারেলের ওপর ছিলো। নাম ছিলো তার খারযাদ। 'খারযাদ' মানে গাধার বাচ্চা। তার কাজও নির্বোধের মতোই মনে হচ্ছিলো। মুসলিম ঘোড়সওয়াররা যখন নদীর মাঝখানে পৌঁছে গেল এবং একজনও ডুবলো না তখন সে যে হুকুম দিলো তা আহমকি ছাড়া কিছুই নয়।

মুসলমানদের রুখার এবং তাদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার সহজ পথ তো ছিলো নদীর তীর থেকে তাদের ওপর তীর বৃষ্টি শুরু করা। কিন্তু তার মাথায় যা ধরলো সে সেই পথই অবলম্বন করলো।

ঃ 'সূর্যের বেটারা!' – খারযাদ তার দলকে হুকুম দিলো– 'আরবরা যেন একথা না বলে আজমীরা কাপুরুষ। তোমরাও ঘোড়া নদীতে নামিয়ে দাও এবং ঐ আরবদের কেটেকুটে নদীতে ডুবিয়ে দাও।'

অসংখ্য ফারসী ঘোড়সওয়ার তাদের ঘোড়া নদীতে নামিয়ে দিলো এবং তলোয়ার ও বর্শা উঁচিয়ে এগুতে লাগলো। বনক্ষেত্র হয়ে গেলো এখন তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ নদী। কিন্তু মুসলমানদের সালার আসেম ইবনে আমর তার মাথা ঠান্ডা রাখলেন। আসেম শুধু নির্ভীক যোদ্ধাই ছিলেন না, রণকৌশল সম্পর্কে তার বিচক্ষণতাও কম ছিলো না।

ঃ 'তীরন্দায ভাইয়েরা!' – আসেম ফারসীদের এগিয়ে আসতে দেখে তার দলের তীরন্দাযদের নির্দেশ দিলেন– 'তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাদেরকে প্রতিহত করো। তীর ওদের ঘোড়ার চোখে লাগাতে চেষ্টা করো।'

দজলার এই বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ মুজাহিদদের ঘোড়াগুলোকে উঠিয়ে উঠিয়ে আছড়ে ফেলছিলো। সওয়াররা নিজেদের বড় কষ্টে সামলাচ্ছিলো। এ অবস্থায় মুসলমানরা একদিকে নিজেদের ঘোড়া নিয়ন্ত্রণে রাখতে হিমশিম খাচ্ছিলো অন্যদিকে ধনুকে তীর ভরে ফারসী ঘোড়সওয়ারদের ঘোড়াগুলোর চোখ তীরের নিশানা বানাচ্ছিলো।

কয়েকটি ফারসী ঘোড়ার চোখে গিয়ে তীর বিদ্ধ হলো। কিছু ফৌজের গায়েও গিয়ে লাগলো। ব্যবধান খুব বেশি ছিলো না। তাই তীরন্দাযদের তীর হয় ঘোড়ার চোখে বা শরীরে অথবা সওয়ারের দেহে বিঁধতো। ফারসীদের ঘোড়াগুলো যেন সাঁতরাতে ভুলে গেলো। তারা নিজেদেরকে নদীর বুকে ছেড়ে দিলো। সওয়াররাও তীর খেয়ে খেয়ে নদীতে পড়তে লাগলো। খারযাদের প্রতিরোধ তৎপরতা বড় করুণভাবে ব্যর্থ হলো।

মুসলমানদের ঘোড়াগুলো নদী চিড়ে, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গকে পায়ে পিষে সামনে এগুতে লাগলো। নদী-তীর তখনো দূর ছিলো।

তখনই একথা ছড়িয়ে পড়লো, ফারসী জেনারেল খারযাদের এই তৎপরতা আহমকি কাজ ছিলো। তীর থেকে তীর বর্ষণের বদলে সে তার সৈন্যকে নদীতে নামিয়ে দিয়েছিলো। জানা নেই খারযাদ কি আসলেই নির্বোধ ছিলো কি না। আসলে আল্লাহ যখন চান অমুক কাজটা হয়ে যাক তিনি তখন এমন অবস্থার সৃষ্টি করেন যে, সেই

কাজটি হয়ে যায়। মহান আল্লাহ্ দেখলেন তার ও তার রাসূলের নামকে সুউচ্চ করার জন্য এই মুজাহিদরা তাদের জানবাজি রেখেছে, তিনি তখন তার দুশমনের এক জেনারেলকে নির্বোধ ও অন্ধ করে দিলেন।

ফারসী জেনারেল খারযাদ যখন তার সওয়ারদের নদীতে নামালো তখন মুজাহিদদের আরেক সালার ক'কা ইবনে আমর সাদ (রা) এর হুকুম ছাড়াই তার বাহিনীকে উত্তেজিত করে তুললেন।

ঃ 'খোদার কসম! মাদায়েনের ওপর চড়াও হওয়ার যিম্মাদারী একা আসেমের নয়। ঐ যে দেখো, ফারসী ঘোড়সওয়াররা নদীতে নামছে।'

ক'কা তার ঘোড়ার গায়ে খোঁচা দিয়ে ঘোড়া নিয়ে নদীতে নেমে পড়লেন। তার পেছন পেছন ছয়শ ঘোড়সওয়ার নেমে পড়লো। আল্লাহু আকবারের নারা ধ্বনিতে নদীর তরঙ্গও যেন ছলকে উঠলো।

এদের দেখাদেখি লশকরের সমস্ত ঘোড়সওয়ার নদীতে ঘোড়া নামিয়ে দিলো। সাদ (রা) পদাতিক সৈন্যদের তার সাথেই রাখলেন। কেউ কেউ আবেগে নদীতে লাফিয়ে পড়তে চাইলো। সাদ (রা) তাদেরকে শান্ত রাখলেন।

কয়েক হাজার ঘোড়া নদীতে সাঁতরে যাচ্ছিলো। অসংখ্য ঘোড়া আর মানুষের চাপে নদীর পানি যেন লুকিয়ে পাতালে চলে যেতে চাচ্ছিলো। অপর তীরে যে ফারসী ফৌজ মোকাবেলার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলো, তাদের তীরান্দায় বাহিনীকে মুসলমানদের তীর খেয়ে ডুবে যাওয়ার দৃশ্য দেখে তাদের জানের পানি শুকিয়ে গেলো। মুসলমানদের সমস্ত ঘোড়সওয়ার যখন নদীর পানি চিড়ে এগুতে লাগলো, ফারসীদের মধ্যে তখন রব উঠলো–

'দেওয়াঁ আমাদান্দ দেওয়াঁ আমাদান্দ'

'দৈত্য আসছে, দৈত্য আসছে... আসছে।'

আরো আওয়াজ উঠলো– 'আমরা জ্বিন জাতির সঙ্গে লড়তে পারবো না। পালাও পালাও। জলদি পালাও। জ্বিনদের মোকাবেলা কোন বেওকুফে করবে?'

আসেম ইবনে আমর তার দল নিয়ে নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে তাদেরকে বাঁধা দেয়ার কেউ ছিলো না। জেনারেল খারযাদ তার ফৌজ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো। কয়েকজন লোক তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো। আসেম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তারা কেন না পালিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছে। উত্তরে ওরা বললো যে, তারা নৌকাগুলোর মাঝিমাল্লা ও জেলে। আসেম তাদেরকে হুকুম দিলেন, বাহারশীরের তীরে নৌকাগুলো নিয়ে যাও এবং অবশিষ্ট মুসলিম ফৌজকে নৌকা করে এপারে নিয়ে এসো।

পদাতিক মুজাহিদরা সাদ (রা) এর সঙ্গে পালা করে নৌকা করে নদী পার হয়ে গেলো। মিনজানীক ও অন্যান্য জিনিসপত্র পরে নৌকা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো।

এখন কাজ ছিলো মাদায়েন শহর অবরোধ করা। কিন্তু শহরের লোকেরা ও গুপ্তচররা জানালো, মাদায়েনও প্রায় শূন্য। শাহেনশাহ ইয়াযদগিরদ ও তার খান্দানদের সঙ্গে নিয়ে চলে গেছে। শহরে একজন ফৌজও এখন নেই।

সাদ (রা) শহরে প্রবেশ করলেন। এমন অভিজাত ও গভীর সৌন্দর্যে ভরা শহর দেখে তিনি কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। সাদ (রা) দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং উঁচু আওয়াজে কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

"কত মনোলোভা উদ্যানরাজি, ঝর্ণা, সবুজ শস্যক্ষেত্র, রূপময় অভিজাত অন্দর এবং নেয়ামতের ভাণ্ডার ছেড়ে তারা চলে গেছে। ভোগ বিলাসের রঙময় জীবন তারা যাপন করতো, এভাবেই আমি আরেক জাতিকে তাদের উত্তরাধিকার করেছি। তাদের জন্য না আকাশ কেঁদেছে, না যমীন কেঁদেছে, না তাদেরকে কোন সুযোগ দেয়া হয়েছে।"

নদী পার হওয়ার সময় পারসিকদের ছোড়া তীরের আঘাতে 'তায়' গোত্রের এক মুজাহিদ শহীদ হয়।

কিন্তু আজ ইয়াযদগিরদ ও তার খান্দান কোথায়?

***"এই দুনিয়ার সীমানা মাদায়েনে এসেই শেষ হয়ে যায়নি ইযদী! এবং পারস্য সাম্রাজ্যও মাদায়েন পর্যন্ত এসে খতম হয়ে যায়নি। তুমি যদি এভাবে মনোবল ভেঙে সাহস হারিয়ে বসে পড়ো তাহলে তো পুরো আরব আজমের ওপর চেপে বসবে।"***

আসেম ইবনে আমর যখন তার ঘোড়সওয়ারদেরসহ নদীতে নেমে পড়েছিলেন তখন মাদায়েনের দেয়ালের ওপর অনেক ফারসী দাঁড়িয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিলো। তারা নিশ্চিত ধরে নিয়েছিলো মুসলমানরা নদীর বিক্ষুব্ধ ঢেউয়ের তোড়ে ডুবে যাবে বা খড়কুটার মতো ভেসে যাবে। পারসিকদের এই ধারণা তখনো ভিত্তিহীন ছিলো না। মুসলমানরা কুদরতের এক কারিশমা দেখাতে চেষ্টা করছিলো। বাহ্যত যা অসম্ভব মনে হচ্ছিলো।

মাদায়েনের দেয়ালের ওপর লোকদের ভীড় থেকে পৃথক হয়ে একটি লোক ঠাঁয় দাঁড়িয়েছিলো। তার ঠোঁটে সামান্যতম হাসির রেশও ছিলো না। চেহারায় বুদ্ধিমত্তার ছাপ ছিলো। কিন্তু তার বুদ্ধিধর চেহারা হতাশার আলো আঁধার ঢেকে দিয়েছিলো।

নেকাবে আবৃত এক মহিলা তার দিকে দ্রুত সরে এলো।

ঃ 'এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস ইযদী!' – মহিলা তাকে জিজ্ঞেস করলো– 'এভাবে কেন ভেঙে পড়ছিস?'

ঃ 'তুমি কেন চলে যাওনি মা!'–সে বললো–'সবাই চলে গেছে। তুমিও এখুনি চলে যাও।'

ঃ 'তোকে ছেড়ে আমি একা একা কি করে যাই?'

মহিলার দিকে সে অসহায় চোখে শুধু তাকালো, বললো না কিছু।

সাধারণ পোষাকে ছদ্মবেশ ধারণ করে এই ছিলো ইয়াযদগিরদ – শাহেনশাহে ফারেস। আর মহিলা ছিলো তার মা।

বাহারশীর থেকে ফারসী ফৌজ মাদায়েন চলে গেলে ইয়াযদগিরদের হাত থেকে যেন আশার ঝুলন্ত আচলটি খসে পড়লো। হতাশা আর দুশ্চিন্তা তাকে এমন চেপে ধরলো যে, এই যৌবনেই তাকে বৃদ্ধ দেখাচ্ছিলো।

বাহারশীর যখন মুসলমানরা কব্জা করে নিলো ইয়াযদগিরদ তখন তার পরিবার ও সব আত্মীয়-স্বজনকে মাদায়েন থেকে কিছু দূরের এক শহর হালওয়ানে পাঠিয়ে দিলো। আর নিজে শাহী মহলে রয়ে গেলো। তার জন্য তার মাও চলে যেতে বাধ্য হলো।

ঃ 'তুই এমন হতাশ হয়ে পড়ছিস কেন ইযদী!' – নাওরীন তাকে বড় আদুরে ও আশ্বস্ত গলায় বললো– 'মুসলমানরা তো ডুবে মরার জন্য নদীতে নেমেছে। তাদের ঘোড়াগুলো কি এই উন্মত্ত বিক্ষুব্ধ নদীর ভয়ংকর কবল থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে?'

ঃ 'তাদের ঘোড়া তাদেরকে এই মরণ বিপদ থেকে বের করতে পারবে না' – ইয়াযদগিরদ বললো– 'কিন্তু জযবা আর যুদ্ধ জয়ের অদম্য স্পৃহা তো ঘোড়ার মধ্যে থাকে না, থাকে তার পিঠে বসা সওয়ারের মধ্যে। ঘোড়ার কথা বলো না। কথা হচ্ছে সওয়ার নিয়ে। ....কোথায় আমাদের সওয়াররা? ওরা পিছনে পালাতে চাইছিলো, এজন্য তাদের ঘোড়া পালিয়ে এলো?'

ঃ 'আসল ধোঁকাবাজ আমাদের জেনারেলরা' – নাওরীন দাঁতে দাঁত পিষে বললো– 'কাপুরুষ, চরিত্রহীন, ভোগী এবং পালানোর ব্যাপারে সবগুলোই আগে আগে। খারযাদকে আমি অন্যের চেয়ে ভালো মনে করতাম। কারণ সে রুস্তমের ভাই।'

ঃ 'আর আমার খারযাদের ওপর এজন্যই কোন ভরসা নেই যে, সে রুস্তমের ভাই' – ইয়াযদগিরদ বললো– 'তোমার কি মনে নেই মা, রস্তমকে আমি কি করে ধাক্কাতে ধাক্কাতে কাদিসিয়া পাঠিয়েছিলাম? মাসের পর মাস সে নষ্ট করেছে। মুসলমানরা তা থেকে ফায়দা উঠিয়েছে' – ইয়াযদগিরদ আচমকা নীরব হয়ে গেলো। তার চোখের দৃষ্টি তখন নদীতে যেন হাবুডুবু খাচ্ছিলো। মুসলমানদের ঘোড়াগুলো পৌঁছে গিয়েছিলো প্রায় নদীর মাঝ বরাবর। ইয়াযদগিরদ ভীত গলায় বললো– 'ঐ যে দেখো মা! তুমি বলেছিলে ওরা নদীতে ডুবে মরার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এখন কি দেখতে পাচ্ছো? এমন ক্রুদ্ধ নদীর তুফান বইয়ে দেয়া বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের আঘাত খেয়েও আরবী ঘোড়াগুলো ঢেউয়ের নিচে চলে গেছে? ওরা নদী পার হবেই। ওরা যদি ডুবে যেতো তাহলে অনেক আগেই ডুবতো।'

ঃ 'খারযাদ তো আমাকে নিশ্চয়তা দিয়েছিলো, মুসলমানদেরকে সে নদীতেই ধ্বংস করে দেবে' – নাওরীন বললো– 'সে বলেছে, বাহারশীরের পরাজয়কে বিজয়ের গৌরবে বদলে দেবে।'

ইয়াযদগিরদের ঠোঁটে ব্যঙ্গাত্মক হাসি ফুটে উঠলো।

❖ ❖ ❖

ইয়াযদগিরদ যখন তার মার সঙ্গে মাদায়েনের দেয়ালে দাঁড়িয়ে মুসলমানদের ঘোড়াগুলোকে নদীতে নামতে দেখছিলো, সাদ (রা) তখন আরেক প্রখ্যাত সাহাবী সালমান ফারসী (রা) এর সঙ্গে নদীর অপর তীরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

ঃ 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' – আল্লাহই বান্দার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি সর্বোত্তম অভিভাবক' – সাদ (রা) বললেন– 'খোদার কসম! আল্লাহর যেসব নেক বান্দারা তারই পথে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে তাদেরকে তিনি অবশ্যই বিজয় ও সাহায্য দান করবেন। আমি নিশ্চিত এবং এটা আমার বিশ্বাস, আল্লাহ তার দ্বীনকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন এবং দুশমনকে পরাজিত করবেন। তবে হ্যাঁ, শর্ত হলো মুসলিম ফৌজে এমন কোন পাপ বা সীমালংঘন স্থায়ী হতে পারবে না, যা তাদের নেককে খেয়ে ফেলে।'

ঃ 'খোদার কসম! ইবনে ওয়াক্কাস!' – সালমান ফারসী (রা) বললেন– 'তোমার ভাবতে হবে না, যেভাবে মহান আল্লাহ তাদের জন্য স্থলভাগের সব সংকট দূর করে দিয়েছেন, তেমনি এই কঠিন বিপদসংকুল নদীকে– জলভাগের সব স্থানকে নির্বিঘ্ন করে দেবেন। শপথ সেই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণটি রয়েছে, যেভাবে তারা অক্ষত অবস্থায় নদীতে নেমেছে অক্ষত ও সুস্থ প্রাণ নিয়ে নদীর ঐ তীরেও পৌঁছে যাবে।'

মুসলমানদের ঘোড়া তখন মাঝ নদী পার হয়ে গিয়েছিলো। মাঝ নদীতেই নদী সবচেয়ে ভয়ংকর ছিলো। সেখান থেকে ঘোড়াগুলো নিরাপদে যখন পার হয়ে গেলো, সবাই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

এই পারস্যেরই অধিবাসী ছিলেন সালমান ফারসী (রা)। ইসলাম গ্রহণের পর তার অধিক সময় রাসূলুল্লাহ (স) এর দুর্লভ সান্নিধ্যে কাটে।

কুরাইশরা মক্কার আশেপাশের বিধর্মী গোষ্ঠীকে নিয়ে যখন মদীনা হামলার পরিকল্পনা করলো, সালমান ফারসী (রা) তখন মদীনাতেই ছিলেন। মুসলমানদের তখন না সৈন্যবল ছিলো, না লোকবল ছিলো। অথচ কুরাইশরা বিরাট এক বাহিনী নিয়ে মদীনা দখল করতে আসছিলো। এমন কঠিন মুহূর্তে সালমান ফারসী (রা) এর একটি পরামর্শ ঘটিতব্য অনিবার্য এক ইতিহাসকে পাল্টে দিলো। রাসূলুল্লাহ (স)কে তিনি পরামর্শ দিলেন, মদীনার আশে পাশে যদি মোটামুটি প্রশস্ত পরিখা খনন করা হয় তাহলে তারা মদীনায় ঢুকতে পারবে না।

মুসলমানরা তখন পরিখা বিষয়ে কিছুই জানতো না। রাসূল (স) সালমান ফারসী (রা) এর পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং তার দিকনির্দেশনায় পরিখা খনন কর্ম শুরু করে দিলেন।

মুসলমানরা প্রমত্ত জযবা ও আবেগে উদ্বেলিত হয়ে খুব অল্প সময়েই মদীনার আশেপাশে পরিখা খনন করে ফেলে। তারপর পরীক্ষা করা হলো এর ওপর দিয়ে ঘোড়া লাফিয়ে পার হতে পারে কিনা। এত প্রশস্ত পরিখা পার হওয়া কোন ঘোড়ার পক্ষেই সম্ভব ছিলো না। কুরাইশরা মার মার কাট কাট করে এসে পরিখার বাইরে থমকে দাঁড়ালো।

অনেক চেষ্টা করেও পরিখা অতিক্রম করতে পারলো না। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) তখনো মুসলমান হননি। কুরাইশ সেনাপতি তিনিই ছিলেন। কুরাইশরা এক মাস পর্যন্ত মদীনা অবরোধ করে রাখলো। এক রাতে প্রচণ্ড ঝড় উঠলো। কুরাইশদের সৈন্যশিবির তছনছ করে দিলো। পরিশেষে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে কুরাইশরা ফিরে গেলো।

সেই সালমান ফারসীই সাদ (রা)কে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলছিলেন, মুজাহিদরা নদী পার হবেই। শেষ পর্যন্ত তাই হলো।

ইয়াযদগিরদ শহরের দেয়াল থেকে নিচে নেমে গেলো। নাওরীনও তার সঙ্গে সঙ্গে নামলো। নিচে দুটি ঘোড়া প্রস্তুত ছিলো। ইয়াযদগিরদ ও তার মা ঘোড়ায় চড়ে বসলো এবং মহলের দিকে না গিয়ে শহরের ছোট একটি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো। মাদায়েন থেকে দূরের এক শহরের দিকে পা বাড়ালো। পেছন ফিরে একবারও মাদায়েনের দিকে তাকালো না। তার মা বারবার পেছন দিকে ফিরে তাকাতে লাগলো। চোখের পানি তার বাঁধ মানছিলো না।

এই খান্দানের জন্য সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সময় সেটা ছিলো যখন ইয়াযদগিরদ জানতে পেরেছিলো বাহারশীর মুসলমানরা দখল করে নিয়েছে। ইয়াযদগিরদ তার বেঁচে যাওয়া ফৌজকে পুল ও নৌকা দিয়ে মাদায়েনের দিকে পালাতে দেখেছিলো। ইয়াযদগিরদ তখন তার মহলে গেলো। তার মা নাওরীন, পুরান ও শাহী খান্দানের বিশিষ্ট লোকদের ডেকে পাঠালো। আরো দুই জেনারেলকেও আসার নির্দেশ দিলো। একজন ছিলো মেহরান আরেকজন ফায়রুযান। বাহারশীর হারানোর বিষাদ তাদের সবার চোখে মুখে লেপ্টে ছিলো।

এটা সেই রঙ্গমহল ছিলো যেখানে আমোদ প্রমোদের সুরাপাত্র ঢেলে নর্তকীরা উদ্দাম নৃত্যে মেতে উঠতো। শাহেনশাহ মহলের যেখানেই থাকতো, উপচে পড়া রূপ নিয়ে ষোড়ষীরা রূপের সুধা ঢেলে দেয়ার জন্য শাহেনশাকে ঘিরে রাখতো। তাদের রাঙা ওষ্ঠ থেকে ঝরে পড়া হাসির মুক্তাদানা মাহফিলের ঔজ্জল্য দ্বিগুণ করে তুলতো। মদভর্তি পেয়ালা সেই মহলের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলো। কিন্তু সেদিন সবাই নির্বাক হয়ে বসে রইলো। কোন ষোড়ষীর সেখানে যাওয়ার অনুমতি ছিলো না। মদের সোরাহীগুলো মদশূন্য হয়ে যেন হাহাকার করছিলো। তাদের দেখে মনে হচ্ছিলো, একে অপরের দিকে তাকাতেও যেন তারা ভয় পাচ্ছে।

ঃ 'সূর্যদেবের অভিশাপ পড় ক তোমাদের জেনারেলদের ওপর' – ইয়াযদগিরদ মেহরান ও ফায়রুযানের দিকে তাকিয়ে ঘরের নিস্তব্ধতা ভাঙ্গলো– 'তোমাদের কোন জেনারেলই কোন ময়দানে দাঁড়াতে পারেনি। বাহারশীরকে বাঁচানোর জন্য তোমাদেরকে আমি আর কত সাহায্য দিতে পারতাম! খারযাদ সব ধ্বংস করে দিলো।'

ঃ 'আমরা এখনো জীবিত আছি শাহে ফারেস!' – মেহরান বললো– 'দাজলা আমাদের দুশমনের সামনে এমন এক বাঁধার সৃষ্টি করবে, যা তাদেরকে বাহারশীর থেকে আর এগুতে দেবে না। ওখান থেকে ফৌজও ফিরে আসছে। ঐ তীরের সব ছোট বড় নৌকা এপারে এনে পুলে আগুন দেয়া হবে'।

ঃ 'তারপর কি হবে' – ইয়াযদগিরদ যেন ভেংচি কাটলো।

ঃ 'আমরা আমাদের পুরো ফৌজকে একাট্টা করবো' – মেহরান বললো– 'এবং খুব দ্রুত বড় এক লশকর প্রস্তুত করে সেখান থেকে নদী পার করানো হবে যেখানে পানি কম।'

ঃ 'মেহরান!' – ইয়াযদগিরদ বললো– 'তুমি আমার পিতার বয়সী। যে অভিজ্ঞতা তুমি অর্জন করেছো তা থেকে আমি নিশ্চিত বঞ্চিত। কিন্তু যে অভিজ্ঞতা আমার আরবদের লড়াই দেখে হয়েছে, আমার চোখ খুলে দেয়ার জন্য তা যথেষ্ট। আমি তোমাদেরকে এত বড় ফৌজ দিয়েছিলাম পারস্যের অধিবাসীরা যা কখনো দেখেনি। তোমাদের হাতির বহরও দিয়েছিলাম। আমি তোমাদেরকে যুদ্ধের যে সরঞ্জাম দিয়েছিলাম আরবরা তা স্বপ্নেও কোনদিন দেখেনি।... আমাদের অনেক জেনারেল মারা গেছে, আমার এতে সামান্যতম আফসোস নেই। তুমিও যদি নিহত হও আমার সামান্যতম দুঃখবোধ হবে না। যে জেনারেলরা হাতেগোণা কিছু সৈন্যের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে এসেছে তাদের আত্মহত্যাই তো করা উচিত।

ঃ 'শাহেনশাহে ফারেস! আমাদের আকেটি সুযোগ দিন' – মেহরান অনুনয় করলো।

ঃ 'আমার ফয়সালা শুনে নাও' – ইয়াযদগিরদ বললো– 'একটা সময় ছিলো যখন আমরা বলতাম, আরবদের ইরাকের সীমানার বাইরে তাড়িয়ে দেবো আমরা। রুস্তম বলতো, পুরো আরবকে ধ্বংস করে সে মদীনা কব্জা করে নেবে এবং ইসলামকে চিরতরে খতম করে দেবে। তারপর সেই সময় এলো, আমরা অসংখ্য সৈন্য নিয়ে কাদিসিয়ার ময়দানে মুসলমানদের পিষে মারার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম'...

'তোমরা জানো, তারপর কাদিসিয়ায় কি হয়েছে। আরবকে ধ্বংসকারী রুস্তম নিজেই খতম হয়ে গেলো। আমাদের লশকর এমন করে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো যেমন করে তুফানে শুকনো খড়কুটা উড়ে যায়। তারপর আমরা বললাম, আরবদের বাহারশীর পর্যন্ত পৌঁছতে দেবো না। কিন্তু এখন সে সময় এসে গেছে যে, মাদায়েনও হয়তো বাঁচাতে পারবো না।'

ঃ 'একথা বলোনা ইযদী!' – ইয়াযদগিরদের মা ছটফটে গলায় বললো– 'মাদায়েনের দিকে কেউ চোখ উঠিয়েও দেখার সাহস করবে না।'

ঃ 'তুমি চুপ থাকো মা!' – ইয়াযদগিরদ বললো– 'নিজেদের জেনারেল ও ফৌজের কাপুরুষতা দেখে আমাকে এই নির্বুদ্ধিতার পথেও যেতে হলো যে, অর্ধেক সালতানাত আমি আরবদের পেশ করে এই আবেদন করি যে, দজলার ঐ তীর পর্যন্ত যেন তারা থাকে, সামনে না এগোয়। তোমরা জানো, যে আরবদের আমরা ঘৃণা করতাম, তারা আমাদের এক বড় প্রস্তাব অবজ্ঞা ভরে প্রত্যাখ্যান করলো...মাদায়েনকেও আমরা বাঁচাতে পারবো না। নিজের প্রাণই কেবল বাঁচাতে পারবো। বাঁচাতে পারবো দৈহিক ইযযত-

সম্মান। আমার এখন ফয়সালা হলো, শাহী খান্দানের সবাই দ্রুত এখান থেকে বেরিয়ে হালওয়ান গিয়ে ঘাঁটি বানাবে।'

ঃ 'আমরা আমাদের ফৌজ নিয়ে এখানে থাকবো' – মেহরান বললো।

ঃ 'এখানে কেউ থাকবে না' – ইয়াযদগিরদ বললো– 'মাদায়েন খালি করে দেয়া হবে। বাহারশীরের তীরে একটি ভাঙ্গা নৌকাও রাখা হবে না। পুলটি আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হবে। একজন ষোড়ষী বা নর্তকীও আমাদের সঙ্গে যাবে না। শাহী চাকচিক্য ও ভোগবিলাসের সবকিছু মাদায়েনেই থাকবে, ফৌজ মাদায়েনে থাকবে না।'

ঃ 'না শাহেনশাহে ফারেস!' – ফায়রুযান বললো– 'ফৌজ মাদায়েনেই থাকা উচিত। মুসলমান দজলার এপারে আসতে পারবে না।'

ঃ 'মুসলমান দজলার এপারে আসবেই' – ইয়াযদগিরদ জোর গলায় বললো– 'ওরা আসবেই। আমার ভেতরে কেউ বলছে, আরবের এই মুসলমানরা যখন এ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে দজলাও ওরা অতিক্রম করবে। তাদের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস না থাকলে আমার অর্ধেক সাম্রাজ্য ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহণ করতো তারা।'

ইয়াযদগিরদ মাদায়েন ছেড়ে গিয়ে পুরোপুরি তৈরী হয়ে মুসলমানদের সঙ্গে আবার লড়াইয়ে নামতে চাইছিলো। শুধু মাত্র প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে মাদায়েন থেকে এভাবে মাথা হেট করে বের হওয়া শাহী খান্দানের জন্য সাধারণ কোন ঘটনা ছিলো না। পুরান এমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলো যে, সে কথা বলতেও ভুলে গিয়েছিলো। লোপ পেয়ে গিয়েছিলো তার সাধারণ বুদ্ধিও। নাওরীনের চেহারা সাদা ফ্যাকাসে– কয়েকদিনের বাসি মৃতের চেহারা ধারণ করেছিলো। সালতানাতে ফারেসের সে ছিলো প্রথমে রাণী পরে সম্রাট জননী। আর ছিলো তার একমাত্র সন্তান, সালতানাতে ফারেসের মূল্য দিয়েও যাকে সে সুস্থ নিরাপদ দেখতে উদগ্রীব ছিলো।

অসংখ্য ষোড়ষী কন্যা ছিলো, যাদের রূপের মাধুর্য নিয়ে যে কোন দেশ গর্ববোধ করতে পারতো। তাদেরকে পেছনে ছেড়ে যাওয়া হচ্ছিলো। শাহী খান্দানের সবাই যখন মহল থেকে সে বের হয়ে গেলো এরা তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে চোখের পানি ফেলছিলো।

মহল খালি করে সবাই শহরের বাইরে চলে গেলো। শুধু ইয়াযদগিরদ ও তার মা রয়ে গেলো। ইয়াযদগিরদ যখন মুসলমানদের দজলা পার হতে দেখলো, তার মাকে নিয়ে মাদায়েন থেকে বের হয়ে গেলো।

সাদ (রা) তার সাথীদের নিয়ে মাদায়েনের মহলের দিকে রওয়ানা হলেন। তার চেহারায় কেমন অবিশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছিলো। বিশ্বাস হচ্ছিলো না, এমন সুন্দর শহর – যার প্রতিটি ইট বালু ধূলিকণাও অতি মূল্যবান– তা মুসলমানদের পায়ে লুটিপুটি খাচ্ছে। আরবের মরুর কর্কশ পাথুরে জমির ঘর্ষণে যারা বেড়ে উঠেছে স্বপ্নেও তারা কখনো এমন জান্নাত সদৃশ শহর দেখেনি। প্রতিটি দালান অট্টালিকা যেন দুনিয়ার সব সম্পদ ব্যয়ে নির্মিত হওয়ার প্রদর্শনী দিচ্ছিলো। শহরের চারপাশে, ভেতরে, এমনকি অলিগলির মধ্যেও সবুজাভ অগণিত উদ্যানের ছড়াছড়ি ছিলো।

সাদ (রা) সাথীদের নিয়ে কয়েক মাইলব্যাপী মহলের এলাকায় প্রবেশ করলেন। মহলের আশেপাশে দূরদূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত রঙবেরঙের ফল ফুলে, আশ্চর্য ধরনের দুর্লভ সবুজ শ্যামল বৃক্ষে ছাওয়া বাগ-বাগিচার অপূর্ব সমাহার বেহেশতের কাল্পনিক দৃশ্যের অবতারণা করেছিলো। এগুলো ছিলো অগ্নিপূজারীদের বিলাসী মন ও সূক্ষ্ম রুচির পরিচায়ক।

তারা যখন মহলে প্রবেশ করলো তাদের পা থেমে গেলো। দ্বিতল ত্রিতল সমান উঁচু উঁচু আলীশান দরজাগুলোয় নিপুণ হাতের খোদাই করা এমন শিল্পিত কারুকাজ ছিলো যে, মনে হচ্ছিলো না তা কোন মানুষের শিল্পকর্ম, মনে হচ্ছিলো প্রকৃতির অবারিত শিল্পকলার অকৃপণ দান। মহলের প্রতিটি কামরায় এমন সব আসবাবপত্র, ফার্নিচারে সাজানো ছিলো, যার সৌন্দর্য উপমা তখন আরব্য বিখ্যাত কবিদের মাথায়ও খেলছিলো না। দরজায় জানালায় ঝুলছিলো মিহি রেশমের ভারী পর্দা। সোনার কারুকাজে সুসজ্জিত শয়নকক্ষগুলোতে যেই উঁকিঝুকি দিলো তার চোখ কপালে উঠলো।

সাদ (রা) যখন মহলের মূল প্রাসাদ অংশে গেলেন যেখানে রাজরাজড়াদের দরবারকক্ষ ছিলো– তিনি তখন থমকে দাঁড়ালেন। তার মুখ দিয়ে প্রথমে কোন কথা সরলো না। যেন তিনি খুব ভয় পেয়েছেন। তার বিশ্বাস হচ্ছিলো না আরবের চটপট শক্ত চাটাই বিলাসীদের ভাগ্যে স্বর্গচ্যুত এই শাহীমহল ও দুনিয়া উপচে পড়া এই ধনসম্পদ লেখা রয়েছে।

ঃ 'সবাই অযু করে নাও' – তিনি তার সাথীদের বললেন– 'সর্বপ্রথম তোমাদের প্রভুর কৃতজ্ঞতায় নফল নামায পড়ে নাও।

সবাই নফল নামায পড়লো। সাদ (রা) আট রাকআত নফল পড়লেন। সিজদার সময় তার চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা নামলো। এরপর তিনি প্রথম যে হুকুম দিলেন, তাহলো এখানে যত আরব আছে – মুসলমান হোক বা খ্রিষ্টান হোক – সবাইকে তাদের স্ত্রী সন্তানসহ মাদায়েন নিয়ে এসো এবং নিজেদের পছন্দ মতো বাড়িতে যেন তারা স্থায়ী হয়ে যায়। তবে এখানকার কোন অধিবাসী থেকে থাকলে কেউ যেন তাদেরকে বিরক্ত না করে।

যে শহর থেকে তার অধিপতি – বাদশাহ নিজ খান্দান ও পুরো ফৌজ নিয়ে পালিয়ে যায় সেই শহরে প্রজারা কি করে থাকতে পারে। শহরবাসী তো আগ থেকেই মুসলিম আতংকে আক্রান্ত ছিলো। মুসলমানরা ঘোড়ার পিঠে বসে যখন নদী পার হচ্ছিলো শহরবাসী তখন শহর কেল্লায় দাঁড়িয়ে দেখছিলো। তাদের জেনারেল খারযাদ যখন মুসলমানদের প্রতিহত করার জন্য তার ঘোড়সওয়ারদের নদীতে নামিয়ে দিলো এবং তারা মুসলমানদের তীর খেয়ে টপাটপ নদীতে ডুবতে লাগলো তখন শহরবাসীর সর্বশেষ আশার প্রদীপটিও নিভে গেলো। তারপর তারা মুসলমানদের মাদায়েনের তীরে পৌঁছতে দেখলো এবং নিজেদের ফৌজকে ভূতে পাওয়া মানুষের মতো 'দৈত্য আসছে দৈত্য আসছে' বলে উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে দেখলো। পুরো শহরে জঙ্গলে আগুন লাগার মতো ছড়িয়ে পড়লো এই আরবরা মানুষ নয় – জ্বিনজাতি।

শহরের লোকেরা নিজেদের স্ত্রী সন্তান নিয়ে এবং সব অর্থসম্পদ পেছনে ফেলে শহর থেকে বের হয়ে গিয়েছিলো। মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে যাদের সঙ্গে তাদের স্ত্রী সন্তান ছিলো সাদ (রা) তাদেরকে একটি করে বাড়ি দিয়ে দিলেন। অধিকাংশ মুসলিম পরিবার ছিলো হীরায়। কিছু ছিলো ফৌজের সঙ্গে অন্যান্য বিজিত শহরে।

ফৌজের কিছু অংশ সাদ (রা) পলায়নরত ফারসী ফৌজের পিছু ধাওয়ার জন্য পাঠালেন। ইয়াযদগিরদকে গ্রেফতারের ব্যাপারে তিনি আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু গোয়েন্দা মাধ্যমে জানতে পারলেন, অনেক আগেই ইয়াযদগিরদ হালওয়ান পৌছে গেছে।

মুসলমানদের ঘোড়াগুলো এই উন্মত্ত নদী সাঁতরে পার হয়ে ভীষণ ক্লান্ত ছিলো। ঘোড়াগুলোর গা তখনো স্যাঁতসেতে ছিলো। মুসলমানরা তবুও সেগুলো নিয়ে ফারসীদের পিছু ধাওয়া করতে ছুটতে লাগলো। মাদায়েনের ফৌজ বিক্ষিপ্ত হয়ে পালাচ্ছিলো। শহরের লোকেরাও তাদের দলে ভিড়ে গিয়েছিলো। আর কিছু লোক যাচ্ছিলো ঘোড়া ও গরুর গাড়িতে করে।

ফৌজের কোন সিপাহী হোক বা শহরবাসী কেউ হোক মুসলমানদের দেখেই লুকোতে বা পালাতে চেষ্টা করতো। 'লুকোতে বা পালাতে চেষ্টা করলে কোতল করে দেয়া হবে' – এভাবে সতর্ক করে দেয়ার পর প্রত্যেকেই আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়তো। মুসলমানরা প্রত্যেকেই, বিশেষ করে ঘোড়া বা গরুর গাড়িতে করে যারা যাচ্ছিলো তাদেরকে অনুসন্ধান করে মূল্যবান জিনিসপত্র, সোনা রুপা, হীরা জওহারাত ও অলংকারাদি পৃথক করে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে নিচ্ছিলো।

মাদায়েন বিজয় করে মুসলমানরা যে পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা মালে গণীমত পেলো তা তাদের কল্পনার বাইরে ছিলো। আবার সেগুলো বণ্টনের ব্যাপারে যে সততা ও সুবিবেচনার পরিচয় দিলো তা আরো বিস্মিত ও অভিভূত হওয়ার মতো ব্যাপার।

শুধু মাদায়েন থেকে পলায়নরত ফৌজের ও শহরবাসীর এক অংশ থেকে যে মালে গনীমত পাওয়া গেলো তার ফিরিস্তি দিতে আলাদা একটি বইয়ের দরকার। মাদায়েন ছিলো বড় বড় সব ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালী জায়গরিদারদের শহর। সেখানকার একটি সাধারণ ঘরেও সোনা রুপার অঢেল ব্যবহার চলতো। পিছু ধাওয়ার সময় তাদের কাছ থেকে হাজার হাজার বাক্সভর্তি অলংকারাদি, দুর্লভ ধরনের হীরা ও কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেলো।

কয়েকটি ঘোড়ার গাড়ি খুব দ্রুত চলতে দেখা গেলো। একটার পিছু নিলেন ক'কা ইবনে আমর। গাড়িতে শুধু চালক ছিলো। ক'কার ঘোড়া যখন গাড়ির একদিকে চালকের কাছাকাছি পৌছলো, চালক তলোয়ার বের করেই ক'কাকে আঘাত করলো। ক'কা একদিকে সরে গিয়ে আঘাত থেকে বেঁচে গেলেন এবং তলোয়ার কোষমুক্ত করলেন। গাড়ি দুটি ঘোড়ার সাহায্যে চলছিলো। ক'কা এগিয়ে গিয়ে একটি ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেললেন। এই ঘোড়াটি থেমে যাওয়াতে দ্বিতীয় ঘোড়াটিও থেমে গেলো। চালক এবার

গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে হামলা করলো। ক'কা ঘোড়ার ওপরেই ছিলেন। তিনি সোজা চালকের গায়ে ঘোড়াটি উঠিয়ে দিলেন। কিন্তু চালক আসলে চালক ছিলো না অভিজ্ঞ সৈন্য ছিলো। ঘোড়ার আক্রমণ থেকে চমৎকারভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে নিলো। তবে পরের বারের আক্রমণ থেকে আর বাঁচতে পারলো না। তবুও একে কাবুতে আনতে ক'কার বেশ কয়েকবার জায়গা বদল করতে হলো।

ক'কা তারপর গাড়ির ভেতরে কি আছে দেখলেন। তালা বন্ধ করা বড় বড় কতগুলো বাক্স ছিলো ভেতরে। সেগুলো খুলে বেশ মূল্যবান কিছু তলোয়ার ও বর্ম পাওয়া গেলো। বুঝা যাচ্ছিলো এগুলো কোন বাদশার। তলোয়ারের বাটগুলো ছিলো হীরায় মোড়ানো। মূল দস্তাগুলোও কয়েক হাজার দীনারের ছিলো।

পরে শাহী মহলের চাপরাশরা জানালো, এই বর্মগুলোর একটি খসরু পারভেজের। আরেকটি রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের। হিরাক্‌ল পারসিকদের কাছে পরাজিত হয়েছিলো। তলোয়ারগুলোর কিছু ছিলো পারস্যের বিভিন্ন বাদশার। আর কিছু ছিলো অন্যান্য দেশের বাদশাদের যারা পারস্যের কাছে পরাজিত হয়েছিলো।

ঘোড়ার গাড়িতে বর্ম ও তলোয়ার ছাড়াও অনেকগুলো ঢাল ছিলো। এর মধ্যে খাঁটি সোনার ঢাল ছিলো বেশ কয়েকটা। অন্যান্য ঢালগুলোতেও সোনা বা হীরার মনোমুগ্ধকর কারুকাজ ছিলো। এগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য ছিলো কয়েকশ কোটি টাকা।

অর্থাৎ এই ঘোড়ার গাড়িতে করে বিরাট এক ধনভাণ্ডার চলে যাচ্ছিলো। ক'কা দুই মুসলিম ঘোড়সওয়ারকে ডেকে বললেন, ঘোড়ার লাগাম ধরে নিয়ে যাও এবং মাদায়েনের মহলে সিপাহসালারের কাছে এগুলো সোপর্দ করো।

ইসমত ইবনে খালিদ যববী একজন উচ্চপদস্থ মুজাহিদ ছিলেন। তিনি আরেকটি ঘোড়ার গাড়ি আটক করলেন। এতে শাহী মুহাফিজ বাহিনীর তিন মুহাফিজ সওয়ার ছিলো। তারা কোন ঝামেলা ছাড়াই গাড়িতে রাখা জিনিসপত্র ইসমত ইবনে খালিদকে দিয়ে দেয়। এগুলো ছিলো দুটি বড় বড় বাক্সপেট্রা। মুহাফিজদের দ্বারাই তিনি একটি বাক্স খোলালেন। এর ভেতর থেকে যা বেরিয়ে এলো তা দেখে আরবের এই মুসলমান এমন এক ধাক্কা খেলো যে, তার চোখ বিস্ফারিত এবং মুখ হাঁ হয়ে গেলো।

সেটা ছিলো স্বর্ণনির্মিত একটি ঘোড়ার মূর্তি। এর ওপর জিনসহ সবকিছু ছিলো রুপার কাজে তৈরী। এক সওয়ারও ছিলো এর ওপর বসা। সেটিও খাঁটি রুপার। সওয়ারের মাথায় যে মুকুটটি ছিলো সেটার পুরোটাই হীরার তৈরী। এর চারদিকে অতি মূল্যবান পাথর জড়ানো ছিলো। যেগুলো থেকে রঙবেরঙের আলো ঠিকরে বেরোচ্ছিলো। বাস্তব কোন ঘোড়ার তুলনায় এই স্বর্ণনির্মিত ঘোড়াটি দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে অর্ধেক ছিলো।

দ্বিতীয় বাক্স থেকে রূপার তৈরী একই সাইজের একটি উটনী বের হলো। এর লাগাম ইত্যাদি সব ছিলো সোনার। সোনার পাশে ইয়াকুত (পদ্মরাগমনি) পাথরের নকশা ছিলো। পিঠে বসা ছিলো পা থেকে মাথা পর্যন্ত স্বর্ণে তৈরী এক সওয়ার।

এগুলো সাদ (রা) এর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

শাহী খান্দান মাদায়েন থেকে বের হওয়ার সময় এক জেনারেলকে হুকুম দিয়ে গিয়েছিলো, এসব জিনিস হালওয়ানে শাহী খান্দানের হাতে পৌঁছে দিতে। হুকুমে এটাও বলা হয়েছিলো, পথে যদি এসব জিনিস নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এর মুহাফিজদের কোতল করে দেয়া হবে। এজন্য সেই তিন মুহাফিজ ইসমত ইবনে খালিদকে বললো, তাদেরকে যুদ্ধবন্দী করা হোক।

পালিয়ে যাওয়া লোকজন থেকে আরো অনেক মূল্যবান জিনিস ও স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেলো।

মাদায়েনের অধিকাংশ ঘরই খালি ছিলো। কয়েকটি ঘর থেকে পাওয়া গেলো সোনা রুপার অনেকগুলো পাত্র। স্বর্ণের কারুকাজ করা অগণিত রেশমী কাপড়, দু' পাট্টা, চাদর, বড় বড় মাথায় দেয়ার রুমাল আরো অনেক জিনিস পাওয়া গেলো।

সাদ (রা) মহলেই তার থাকার ব্যবস্থা করলেন। সালমাও তার কাছে চলে এসেছিলো। সাদ (রা) হুকুম দিলেন মহলের সব মূল্যবান ও দুর্লভ জিনিস এক জায়গায় যেন একত্রিত করা হয়। মাদায়েনের এই মহলে ফেরআউনের যুগ থেকে নিয়ে খসরু পারভেজ পর্যন্ত শত বছর আগের রাজা বাদশাহদের তলোয়ার, মুকুট, পোষাক পরিচ্ছদ, ব্যবহৃত আসবাবপত্র এবং দুর্লভ জিনিস সম্বলিত একটি জাদুঘরও ছিলো।

শাহী খান্দানের উচ্চপদস্থ দু'জন আমলা পাকড়াও করা হলো। কোনটা কি এবং কার তারা এসব খুলে বললো প্রত্যেকটার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও জানালো। অন্যান্য দেশের রাজা বাদশাহদের অনেক উপহার উপঢৌকনও ছিলো। চিনের রাজা, হিন্দুস্তানের রাজা দাহির, কায়সারে রুম, নুমান ইবনে মানযার, সিওয়াশ ও বাহরাম এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম। তাদের উপঢৌকনে বর্ম ও ঢালও ছিলো। এসব জিনিসে স্বর্ণই ব্যবহার করা হয়েছিলো বেশি।

রাজা দাহিরের পূর্বপুরুষরা পারস্য সম্রাটদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতো। পারসিক ফৌজে হাতিবহর উপহার দিয়েছিলো রাজা দাহির। হাতির সঙ্গে হাতির মাহুত ও হাতি দেখাশোনার লোকও পাঠিয়ে দিয়েছিলো। মুসলমানদের হাতে সেসব হাতি কাদিসিয়ার ময়দানে ইতিহাসের খাতায় লেখা হয়ে যায়।

মাদায়েনের মহলের অতি সাধারণ জিনিসেও স্বর্ণের ব্যবহার ছিলো। এতে মনে হচ্ছিলো, পারস্যে অসংখ্য স্বর্ণখনি আছে। অথচ পারস্যের প্রাকৃতিক কোন স্বর্ণখনি ছিলো না। পারস্য সম্রাটরা নিজ হাতেই এই স্বর্ণখনি নির্মাণ করেছিলো। এই সম্পদের পাহাড় তাদের বংশানুক্রমে গড়ে উঠেছিলো। কিন্তু এতে প্রজাদের ঘাম আর রক্তের পরিমাণই ছিলো বেশি, যা তারা প্রজাদের কাছ থেকে কর হিসেবে ওদের হাড়মজ্জা থেকে নিংড়ে বের করতো। আশেপাশের দুর্বল রাজ্যে হামলা করেও আরো অনেক সম্পদ তারা হাতিয়ে নেয়। রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়ে অঢেল সম্পদ তারা হাতিয়ে নেয়। এসব ধনভাণ্ডারই পারস্য সম্রাটদের ফেরআউন বানিয়ে দিয়েছিলো। সেই ফেরআউনরা তাদের শেষ পরিণামের প্রহর গুণছিলো। তাদের এই অঢেল সম্পদ, সোনা, রূপা, হীরা,

জওহারাত, ও টাকা পয়সার অঢেল ভাণ্ডার এমন এক জাতির হাতে অর্পিত হলো, যাদের নিরেট বিশ্বাস হলো এসবের মালিক একমাত্র আল্লাহ। প্রতিটি মুসলমানের এতে সমান অধিকার রয়েছে। যতটুকু অংশ ইসলামী সাম্রাজ্যের অধিপতি খলীফার ততটুকু অংশই একজন সাধারণ নাগরিকের।

মহলে অসংখ্য গালিচা ছিলো। এর মধ্যে ষাট ফিটের 'বাহার' নামক একটি গালিচা ছিলো। হেমন্তকালীন সন্ধ্যায় এই গালিচা ব্যবহার করা হতো। রাজা বাদশারা এর ওপর বসে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ষোড়ষী নর্তকীদের অর্ধনগ্ন দেহের নৃত্য দেখতো। আর বাছাই করা রূপসীরা তাদের মদীর দেহ বল্লরী ও সুরাভর্তি মদ এগিয়ে দিতো।

পুরো গালিচায় সালতানাতে ফারেসের মানচিত্র অংকিত ছিলো। মানচিত্র অংকিত হয়েছিলো সোনা-রুপা ও হীরা-মোতি দিয়ে। মানচিত্রের ভেতরে সোনা ও চুনি দিয়ে ঝর্ণা এবং উদ্যানের দৃশ্য নৈসর্গের নানান আবহ সাজানো মনোরম আঁকা ছিলো। আর গালিচার চার পাশের প্রান্ত সীমায় স্বর্ণালী বর্ণের বৃক্ষ অংকিত ছিলো। বৃক্ষের ডালপালা স্বর্ণের, পত্রগুচ্ছ রেশমের এবং ফলফুল জওহারের।

পুরো মালে গনীমত যখন একত্রিত করা হলো সাদ (রা) নির্দেশ দিলেন, প্রথমে খলীফার বায়তুল মালের অংশ পৃথক করা হোক।

ঃ 'বন্ধুরা আমার!'–সালার ও সরদারদের উদ্দেশ্যে সাদ (রা) বললেন– 'মদীনাবাসীর জন্য আমরা কেন এমন জিনিস পাঠাবো না যা দেখে তারা পেরেশান হয়ে যাবে!'

ঃ 'অবশ্যই অবশ্যই' – সাদ (রা) এর সমর্থনে কয়েকটি আওয়াজ উঠলো– 'সবচেয়ে মূল্যবান ও আশ্চর্য করার মতো জিনিসটি আমীরুল মুমিনীনকে পাঠানো হোক।'

ঃ 'এই যে দেখো গালিচাটি'–সাদ (রা) বললেন– 'আমার জন্য এটি একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে প্রত্যেকেরই হক আছে। কিন্তু প্রত্যেককে এর প্রাপ্য কি করে দেয়া যাবে? এর অগণিত হীরা, পান্না, চুনি, ও স্বর্ণের কারুকাজগুলো পৃথক করে বণ্টন করা কি তোমরা পছন্দ করবে? এটা কি ভালো হয় না যে, এত সুন্দর একটি জিনিসকে নষ্ট না করে একে বায়তুল মালের একটি অংশ করে মদীনায় পাঠিয়ে দিলাম?'

ঃ 'হ্যাঁ, সিপাহসালার!' – হাশেম ইবনে উতবা বললেন– 'এর চেয়ে উত্তম পদ্ধতি আর হতে পারে না। এই গালিচাও নষ্ট হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যাবে এবং মদীনাবাসীর জন্যও এটা এক দুর্লভ উপহার হবে।'

সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, এই গালিচা বায়তুলমালের অংশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়া হোক।

মদীনায় মালে গনীমত পৌছলো এবং উমর (রা) তা বণ্টন করে দিলেন। কিন্তু এই গালিচা সেখানেও একটি ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। কিভাবে এটা বণ্টন করা হবে এই ফয়সালায় আসা অসম্ভব ছিলো।

ঃ 'আমাকে ফয়সালা দাও' – উমর (রা) বললেন– 'এই গালিচা আমি কি উপায়ে বণ্টন করবো!'

ঃ 'বিজয়ী সিপাহসালার এটা আপনাকে দিয়েছেন' – কেউ একজন বললো– 'মুজাহিদীনদের পক্ষ থেকে এটা আপনার জন্য উপহার।'

ঃ 'হ্যাঁ আমীরুল মুমিনীন!' – আরেকজন বললো– 'এটা শুধুই আপনার। অন্য কারো অংশ নেই এতে।'

এ কথার সমর্থনে আরো কয়েকটি আওয়াজ উঠলো।

ঃ 'না' – উমর (রা) বললেন– 'খোদার কসম! আমি সেই জিনিস কখনো নিতে পারবো না, যার অংশীদার অন্য কেউ...আমি ফয়সালা করতে অপারগ যে, কিভাবে এটা বন্টন করা হবে...আলী! তুমি কি কোন সিদ্ধান্ত জানাবে না?'

ঃ 'ইবনুল খাত্তাব!' – হযরত আলী (রা) বললেন– 'আল্লাহ আপনাকে জ্ঞান দিয়েছেন। এটা অভিজ্ঞান, মূর্খতা নয়। আল্লাহ আপনাকে বিশ্বাসের শক্তি দিয়েছেন। এটা প্রত্যয়, সন্দেহ বা বিশ্বাসহীনতা নয়। আপনার জ্ঞানের আলোতে ভাবুন, চিন্তা করুন। নিজের চিন্তা-বিশ্বাস নিয়ে সন্দেহ পোষণ করবেন না...দুনিয়ায় সেই জিনিসই আপনার ইচ্ছায় কাউকে দিয়ে দেবেন, আপনি ব্যবহার করে যা পুরনো করে ফেলবেন অথবা যা খেয়ে আপনি শেষ করে ফেলবেন। এটা এমন এক গালিচা যা আপনি কাউকে দিতে পারছেন না, যা আপনি পরিধান করে ছিঁড়তে পারবেন না এবং খেয়েও শেষ করতে পারবেন না। এই দুনিয়ায় আপনি একদিন থাকবেন না, এই গালিচাটি রয়ে যাবে। আর এটা এমন লোকের মালিকানায়ও যেতে পারে, যে এর অধিকারী বা যোগ্য নয়। এটা এতই মূল্যবান জিনিস যে, এর মালিকানার দাবী উঠাতে পারে অনেকে। তারপর এটি ফেতনা ফাসাদ ও বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আজ আপনি ঈমানদার ও আমানতদার– সৎ ও সততার বিশ্বাসে একজন খাঁটি মানুষ। কে বলতে পারে, আপনার পরের লোকেরাও এমন সৎ ও সততায় বিশ্বাসী হবে? স্বর্ণ আর অলংকারাদি ভাই ভায়ের জন্য শত্রুতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ...এই গালিচাকে বন্টন করে দিন ইবনে খাত্তাব!'

ঃ 'খোদার কসম! ইবনে আবী তালিব!' – উমর (রা) আলী (রা)কে বললেন– 'তুমি একদম সত্য কথাগুলো বলেছো, এই গালিচা বন্টিত হবে।'

উমর (রা) এর হুকুমে তখনই গালিচা থেকে সোনা রুপার সূতা, খচিত হীরা ও দুর্লভ পাথর এবং পান্না, চুনি ও মোতি ইত্যাদি পৃথক করে ফেলা হলো। তারপর এগুলো বন্টন করে দেয়া হলো।

উমর (রা)-এর এই সিদ্ধান্তের জন্য হয়তো কেউ বলতে পারে, এমন দুর্লভ, সুন্দর অপরূপ একটি জিনিসকে এমন অবমূল্যায়িত করা হলো? আরবের মুসলমানদের রুচিবোধ তখন বুঝি সৌন্দর্য বুঝতো না! কিন্তু আসলে মুসলমানের কাছে তখন বস্তুর সৌন্দর্যের চেয়ে ভেতরের সৌন্দর্যই বড় ব্যাপার ছিলো। তারা এমন কোন জিনিসের অস্তিত্ব রাখতে চাইতেন না যা পরবর্তী মুসলমানদের মধ্যে দুনিয়ার মোহ সৃষ্টি করবে। যেখানেই এমন আশংকা জেগেছে সেখানেই তারা মনের বিরুদ্ধে হলেও, নিজের অভিরুচির বিপরীতে হলেও কঠিন বাস্তবতার পথে পা বাড়িয়েছেন।

❖ ❖ ❖

মুসলিম সৈন্যের অনেকেই অনেক কিছু উদ্ধার করেছে। কিন্তু কেউ কোন কিছুই ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করেনি। সবকিছুই সিপাহসালারের কাছে এনে জমা করেছে। ক'কা ইবনে আমর ও ইসমত ইবনে খালিদ যে ধনভাণ্ডার উদ্ধার করেন তা থেকে দু'একটি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে নিলে মুসলমানদের এমন কি হতো। তারা সবগুলোই যদি কোথাও লুকিয়ে ফেলতেন কেউ দেখতোও না, জানতোও না। কিন্তু তারা কিছুই স্পর্শ করেননি। সিপাহসালারের পায়ের সামনে এনে হাজির করেছেন সব। ক'কা বিভিন্ন রাজা বাদশাদের সোনা রুপা ও হীরাখচিত তলোয়ার, বর্ম ও ঢাল ইত্যাদি উদ্ধার করেছিলেন।

ঃ 'ইবনে আমর!' – সাদ (রা) ক'কাকে বললেন– 'এগুলোর মধ্যে যেটা তোমার পছন্দ হয় সেটা নিয়ে নাও।'

অঢেল সোনা, চান্দি, হীরা ও অতিমূল্যবান সব জিনিস থেকে যা ইচ্ছা তাই নিতে পারতেন ক'কা, তার কাছে রোম সম্রাট হিরাক্ল এর তলোয়ারটি ভালো তিনি শুধু সেটাই নিলেন।

এক মুজাহিদ দুর্লভ ধরনের হীরায় ঠাসা ছোট একটি বাক্স উদ্ধার করে আনলো। ততক্ষণে একজন তহশীলদার নিযুক্ত করা হয়েছিলো। যে মালে গনীমতের হিসাব রাখছিলো। তাকে সাহায্যের জন্য কয়েকজন মুজাহিদ তার সঙ্গে ছিলো।

সেই মুজাহিদ বাক্সটি তহশীলদারের কাছে নিয়ে দিলো। তহশীলদার বাক্সটি খুলেই সভয়ে এক ঝটকায় মাথা অন্যদিকে সরিয়ে ফেললো। যেন ভেতরে কোন সাপ ফণা তুলে আছে। তার সঙ্গীরাও চমকে দু' এক কদম পেছনে সরে গেলো।

ঃ 'তুমি কি জানো এই বাক্সে কত টাকার জিনিস আছে?' – তহশীলদার মুজাহিদকে জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'আমি কিভাবে বলবো? কোন দিন কি আমি এসব দেখেছি না কল্পনা করেছি! আমি শুধু জানি এটা একটা ধনভাণ্ডার।'

ঃ 'শোন তাহলে, এ পর্যন্ত আমাদের কাছে যত হীরা, মুক্তা, জওহার ও অলংকারাদি এসেছে এটার সমতুল্য আর একটাও নেই' – তহশীলদার বললো।

ঃ 'এর থেকে তুমি কিছু নাওনি তো?' – সহযোগী এক তহশীলদার বললো।

ঃ 'আল্লাহ সাক্ষী' – মুজাহিদ আকাশের দিকে আঙ্গুল তুলে বললো– 'যদি একটা বিষয় না বাধ সাধতো তাহলে তো আমি এই বাক্সই এখানে নিয়ে আসতাম না... তাই আমি এখান থেকে কিছুই গ্রহণ করিনি।'

ঃ 'সেটা কি?'

ঃ 'তা আমি বলবো না' – মুজাহিদের চোয়াল শক্ত হয়ে গেলো– 'এটা তোমাদেরকে বললে তোমরা সবাই আমার প্রশংসা শুরু করে দেবে। প্রশংসা তো শুধু আল্লাহরই প্রাপ্য। আমি আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করছি। আল্লাহ আমাকে যে প্রতিদান দেবেন তাতেই আমি আনন্দিত।'

তহশীলদার সেই মুজাহিদকে বিদায় করে দিয়ে বাক্সটি সাদ (রা)-এর কাছে দিলো। বাক্সটি খুলতেই সাদ (রা) এর চেহারায় বিস্ময় ছড়িয়ে পড়লো। তহশীলদার সেই মুজাহিদের কথাও সাদ (রা)কে জানালো, যে বাক্সটি নিয়ে এসেছিলো। সে পর্যন্ত আরো কয়েকজন মুজাহিদ বড় ধরনের মালে গনীমত উদ্ধার করেছিলো এবং অসামান্য সততায় সেগুলো তহশীলদারের কাছে সোপর্দ করেছিলো।

ঃ 'খোদার কসম! এই ফৌজের সবাই আমীন – আমানতদার' – 'সাদ (রা) অভিভূত গলায় বললেন– 'যদি বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের বিশেষ মর্যাদা না থাকতো তাহলে আমি বলতাম, আমার ফৌজ মর্যাদায় বদর যোদ্ধাদের সমান।'

ঃ 'খোদার কসম!' – প্রখ্যাত এক সাহাবী মুজাহিদ দলের সরদার জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) তখন বললেন– 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। কাদিসিয়ার মুজাহিদদের মধ্যে আমি এমন একজন মুজাহিদও পাইনি, যে আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী। আমরা তিনজনের প্রতি অভিযোগ করেছিলাম, তারা দুনিয়ার প্রতি মোহগ্রস্ত। এরা ছিলো, তুলাইহা, আমর ইবনে মাদী কারাব ও কায়েস ইবনে মাফশূহ। কিন্তু তাদের নৈতিকতা ও সততারও কোন উপমা পাওয়া যাবে না।'

অবরোধ চলাকালীন সময়ে কয়েকবারের ব্যবধানে মদীনা থেকে কিছু কিছু করে সেনাসাহায্য এসেছিলো। অবরোধের পর দেখা গেলো মুসলিম ফৌজের সংখ্যা ষাট হাজার। এই ষাট হাজার সৈন্যের মধ্যেই মাদায়েন থেকে প্রাপ্ত মালে গনীমত বণ্টন করা হয়। টাকার হিসাবে প্রত্যেক সৈন্য পায় বার হাজার দীনার করে (বর্তমানে কয়েক কোটি টাকা)।

এরপরও মালে গনীমতের বিশেষ একটা অংশ রয়ে গিয়েছিলো। কিছু মুজাহিদ এমন নির্ভীক বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিলো, যা শুধু অসাধারণই ছিলো না অবিশ্বাস্যও ছিলো। পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে অতিরিক্ত কিছু দেয়া হলো। এটা আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা) এর নির্দেশ ছিলো, বন্টনের পর মালে গনীমত যদি বেঁচে যায়, সেগুলো ঐসব মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দেবে, যারা সর্বাধিক বীরত্ব দেখিয়েছে। কিছু মুজাহিদ ফারসী জেনারেলদের প্রতিরক্ষা বেষ্টনী ভেঙে তাদেরকে কোতল করেছিলো। এদের বীরত্ব আরো বিশেষভাবে বিবেচিত হলো।

মালে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ মদীনায় পাঠানোর জন্য আগেই পৃথক করে রাখা হয়েছিলো। এক গোত্র সরদার বশীর ইবনে বাসাসিয়ার নেতৃত্বে তা মদীনা অভিমুখে পাঠানো হলো। তার হেফাজতের জন্য মুজাহিদদের ছোট একটি দলও পাঠানো হলো। এতে কাফেলা বেশ বড় হয়ে গিয়েছিলো।

সাদ (রা) মাদায়েন বিজয় ও মালে গনীমতের বিস্তারিত তালিকা লিখে উমর (রা) এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। একটা কথা তিনি বিশেষ করে লিখে দিয়েছিলেন, মুজাহিদরা মালে গনীমত উদ্ধার করে তহশীলদারের কাছে বুঝিয়ে দেয়ার ব্যাপারে অবিশ্বাস্য আমানতদারীতার পরিচয় দিয়েছে।

মালে গনীমতের কাফেলা মদীনা থেকে কিছু দূরে থাকতেই মদীনাবাসী তা জানতে পারে। মদীনার প্রায় সবাই এ খবর পেয়ে যে রাস্তা ধরে কাফেলা আসছিলো সে রাস্তার মাথায় গিয়ে ভীড় করলো। বিজয়ী মুজাহিদদের সম্বর্ধনা দেয়াই তাদের উদ্দেশ্য ছিলো। দূর থেকে কাফেলার মুজাহিদদের যখন তারা দেখতে পেলো মুজাহিদদের এক নজর দেখার জন্য লোকজন ভেঙে পড়লো। মালে গনীমতের দিকে তাদের দৃষ্টি ছিলো না, তাদের দৃষ্টি ছিলো মুখের দিকে। কাফেলা যখন মদীনায় প্রবেশ করলো, চারদিক থেকে বিজয়ধ্বনি আকাশ বাতাস কাপিয়ে তুললো। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় প্রত্যেকের চোখেই তখন চিক চিক করছিলো অশ্রুবিন্দু।

মালে গনীমত উমর (রা) এর কাছে পৌঁছলে তা খোলা হলো। সাদ (রা) লিখেছিলেন, এই মালে গণীমত দেখে যে কেউ বিস্ময়বোধ করবে। তারপরও উমর (রা) যখন তা দেখলেন, তিনি পলকহীন অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তিনি তার হাঁ করা মুখ বন্ধ করতেও ভুলে গেলেন। সেখানে যারা ছিলো সবার ওপর নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

ঃ 'খোদার কসম!' – উমর (রা) হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে বললেন– 'সন্দেহ নেই এরা অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের আমানতদার ও ন্যায়নিষ্ঠ লোক, যারা এসব জিনিস না জানি কোথায় কোথায় প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে গিয়ে উদ্ধার করেছে এবং সিপাহসালারের কাছে সোপর্দ করেছে।'

ঃ 'ইবনুল খাত্তাব! এতে আর বিস্মিত হচ্ছেন কেন? – আলী (রা) উমর (রা) কে বললেন– 'আপনি ন্যায়নিষ্ঠ ও উজ্জ্বল চরিত্রের অধিকারী বলে আপনার দেশের নাগরিক সমাজও সৎ। যদি আপনার নিয়ত ঠিক না হতো, তাহলে আমাদের নিয়তও গোলমালে হতো।'

ঃ 'আমি কিস্‌রার এই রাজকীয় পোষাক, তলোয়ার এবং এই যুদ্ধবর্ম সবাইকে দেখাতে চাই' – উমর (রা) ঘোষণা করলেন।

পারস্য সম্রাটদের পোষাক, তলোয়ার, ঢাল ও বর্মসহ অন্যান্য জিনিস প্রদর্শনের জন্য একটি মেলার আয়োজন করা হলো। মদীনার আশেপাশের এলাকায় ঘোষণা করে দেয়া হলো, মদীনায় এসে যেন লোকেরা এসব জিনিস এক নজর দেখে যায়। মেলায় লোকজন ভেঙে পড়লো। মেলায় লোকজন যতক্ষণ থাকতো তাদের বিস্ময়ের ঘোর তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। লোকেরা সবচেয়ে বেশি তাজ্জব হতো পারস্য সম্রাটদের সোনা রুপা ও হীরক খচিত পোষাকের স্তূপ দেখে – এমন মানুষও দুনিয়ায় আছে যারা এসব পোষাক ব্যবহার করে।

সবাইকে আনন্দ দেয়ার জন্য উমর (রা) দারুণ একটা কাজ করলেন। সুরকা ইবনে জুশাম নামক মদীনার এক বিশালাকার লোককে ডেকে কিসরা পারভেজের রাজদরবারের পোষাকটি পরালেন। তার কোমরে ঢাউস তলোয়ারটি ঝুলিয়ে দিলেন। মাথায় রাখলেন আলো ঠিকরে বের হওয়া মুকুটটি। তারপর সুরাকাকে বললেন ঃ

ঃ 'একটু পেছন দিকে হাঁটো।'

সুরাকা দু' তিন কদম পিছন দিকে সরলো।

ঃ 'এগোও'।

সুরাকা এগোলো।

ঃ 'হে আল্লাহ! তোমারই কুদরতের কারিশমা!' – উমর (রা) কিছুটা আবেগ ভেজা গলায় বললেন– 'বনু মুদলাজ গোত্রের এক আরবী – আর তার দেহে কিসরার এই পোষাক... হে সুরাকা! এমন দিনের কথাও বুঝি লেখা ছিলো যেদিন তোমার দেহ শাহী পোষাকে আবৃত হবে! তোমার ক্ষণিকের এই সাজসজ্জাই তো তোমার জন্য ও তোমার গোত্রের জন্য গর্বের বিষয় হয়ে থাকবে।'

উমর (রা) আরো কয়েকজন স্থূলকায় লোককে অন্যান্য দেশের রাজা বাদশাহদের পোষাক পরিধান করালেন এবং তাদের দিকে গভীর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। লোকজনের চোখে যেন জাদুর ঘোর ছিলো।

ঃ হে আল্লাহ!' – উমর (রা) উভয় হাত আকাশের দিকে উঠিয় ধরা গলায় বললেন– 'তুমি তো এতো ধনসম্পদ তোমার রাসূল (স) কে দাওনি। অথচ তিনি আমার চেয়ে তোমার কাছে কতো বেশি প্রিয় ছিলেন। তিনি তোমার মাহবুব ছিলেন। তুমি তো তোমার রাসূল (স) এর প্রথম খলীফা আবুবকর (রা)-কেও এত ধনসম্পদ দাওনি। তিনিও তো তোমার কাছে আমার চেয়ে অনেক বেশি প্রিয় ছিলেন। আমাকে কেন তুমি এত বড় পুরস্কারে ভূষিত করলে? আমিতো এর উপযুক্ত ছিলাম না... হে আমার মাবুদ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, ব্যাপার এমন তো নয় যে, তোমার মহান সত্তা আমাকে কোন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করতে চাচ্ছেন! পরওয়ারদিগার! আমাকে এমন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করো না।'

এসব বলতে বলতে প্রথমে তো উমর (রা) এর চোখ ঝাপসা হয়ে উঠলো। এরপর পানি গড়াতে লাগলো। তারপর এমন ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন যে, উপস্থিত সবার চোখে পানি চলে এলো। বর্ষীয়ান কয়েকজন এগিয়ে এসে তাকে বিভিন্ন কথা বলে সামলে নিলো। ধীরে ধীরে তিনি নিজের প্রতি নিজের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেলেন।

যে উমরের সামনে শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামও ভেবেচিন্তে কথা বলতেন। যার প্রখর ব্যক্তিত্বের কারণে সবাই তাকে সমীহ করে চলতো। যার আলোকিত চরিত্র মাধুর্য সবাইকে তার প্রতি সশ্রদ্ধ করে তুলেছিলো। তাকে আজ এমন শিশুর মতো কাঁদতে দেখে মরুর কঠিন প্রাণগুলোও গলে গলে যেতে লাগলো।

ঃ 'আল্লাহর কাছে সবাই আশ্রয় প্রার্থনা করো' – উপস্থিত ভীড়ের দিকে লক্ষ্য করে বললেন– 'এত অফুরন্ত সম্পদ, বেহিসাব নেয়ামতরাজি এবং এত প্রাচুর্যতা ভেল্কির মতো মনে হচ্ছে। এমন ভেল্কি যাতে শয়তানের অশুভ প্রভাব আছে। প্রত্যেকেই এর দিকে আকর্ষিত হয়। যে এর মোহে পড়ে সে নিজেকে বড় বুদ্ধিমান মনে করে। কিন্তু সে বুঝে না তার মধ্যে যতটুকু বুদ্ধি ছিলো, বিদ্যা ছিলো তাও চলে গেছে এবং তার আত্মিক শক্তি ও যোগ্যতা সব শূন্যে উড়ে গেছে....হে আরবরা! এই

সোনা দানা, ধনদৌলত মানুষকে মনুষত্বের স্তর থেকে আছড়ে ফেলে। নিজেদের কাছে ততটুকুই রাখো যার দ্বারা তোমাদের প্রতিটি প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায় এবং তোমাদের কারো মুখোপেক্ষী না হতে হয়। আসল সম্পদ তো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন.... এটাও ভেবে নাও। সাসানীয় সাম্রাজ্যের এই ধনদৌলত তোমাদেরকে আল্লাহ্ কোন পরীক্ষার জন্যই হয়তো দান করেছেন!'

ঃ 'সাসানীয় অধিপতির এই ধনদৌলতে এত ভীত হবেন না ইবনে খাত্তাব!' – আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) উমর (রা)কে বললেন– 'এটা বিজয়ী মুজাহিদদের উপযুক্ত প্রাপ্য।'

ঃ 'খোদার কসম!' – উমর (রা) বললেন– 'সূর্যাস্তের পূর্বেই আমি এই সম্পদের স্তূপ বন্টন করে দিতে চাই। আমার চোখের সামনে এগুলো বেশিক্ষণ রাখতে পারবো না।'

তাই করলেন তিনি, কিছু তার ইচ্ছায় আর কিছু সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শে সব মাল বন্টন করে দিলেন এবং সূর্যাস্তের পূর্বেই তা বন্টন শেষ হলো। যেসব শহীদের নাম তার পর্যন্ত পৌছেছিলো, তাদের পরিবারকে অতিরিক্ত কিছু অংশ দেয়া হলো।

সাদ (রা) মাদায়েনের মহল থেকে পারস্য সম্রাটদের শাহী আসন উঠিয়ে সেখানে মিম্বর স্থাপন করেন এবং কিসরার দরবার প্রাসাদকে মসজিদ বানিয়ে নেন। এই শাহী প্রাসাদে প্রথম যে নামাজ পড়া হয় সেটা ছিলো জুমার নামাজ। সাদ (রা) যেদিন সেই প্রাসাদে প্রবেশ করেন কাকতালীয়ভাবে সেদিনও জুমার দিন ছিলো। এরপর থেকে এখানে জামাতসহ প্রত্যেক নামায আদায় শুরু হয়ে যায়।

মুজাহিদরা যখন শাহী মহলে প্রবেশ করছিলো তখন এক মুজাহিদ লক্ষ্য করলো দরজায় ফারসীতে কি যেন লেখা রয়েছে। মুজাহিদের কৌতূহল হলে সে এক ফারসীকে জিজ্ঞেস করলো এতে কি লেখা রয়েছে। ফারসী এর অর্থ করলো ঃ 'বাদশার দরবারে সেই উপস্থিত হতে পারবে যার কাছে জ্ঞান-বুদ্ধি ও সম্পদ রয়েছে।' সেই মুজাহিদ এর নিচে আরবীতে লিখে দিলোঃ

'যার কাছে বিদ্যা, বুদ্ধি ও অর্থ সম্পদ আছে বা এগুলোর যেকোন একটা আছে শাহী দরবারে তার উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।' অর্থাৎ দরবারে আসবে শুধু অসহায় অভাবগ্রস্ত বা বিপদগ্রস্তরা।

কিসরার প্রাসাদে যখন নামায আদায় হচ্ছিলো হালওয়ানে তখন ইয়াদগিরদ এক নিদারুণ সময় কাটাচ্ছিলো। কারো সঙ্গে সে কোন কথা বলতো না। প্রায়ই একা নির্জন কামরায় শুয়ে বসে সময় কাটাতো। মনে হচ্ছিলো শুধু তার শাহেনশাহীই নয় বরং তার জীবন থেকেই হতাশ হয়ে গেছে। কামরায় কখনো তার মা নাওওরীন কখনো পুরান যেতো। তাদেরকেও বলে দিতো, তাকে যেন দয়া করে একা থাকতে দেয়া হয়।

মা নাওরীন ছেলের এ অবস্থা দেখে দিন-রাত কেঁদে কেঁদেই কাটাতো। নাওরীন জানতো তার ছেলেকে কিসে খেয়ে যাচ্ছে।

ইয়াযদগিরদকে শুধু একটি আশাই বাঁচিয়ে রেখেছিলো। সে গভীর ভাবতো, পরাজয়কে এখন আর বিজয় রূপান্তর করা সম্ভব না। কিন্তু যেভাবেই হোক যুদ্ধ বন্ধ ও মুসলমানদের সামনে এগুনোর পথ বন্ধ করা এখনো সম্ভব। সে তার এক প্রতিনিধি মাদায়েনে এই প্রস্তাব দিয়ে পাঠালো যে, দজলাকে আরব ও আজমের মধ্যে সীমান্তরেখা নির্ধারণ করে যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়া হোক।

ঃ 'তোমাদের বাদশাহ ইয়াদগিরদের মাথা কি বিগড়ে গেছে?'- সাদ (রা) ইয়াদগিরদের দূতকে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন- 'তিনি কি ভুলে গেছেন এর পূর্বেও তিনি এই প্রস্তাব একবার পেশ করেছিলেন এবং আমি তার অর্ধেক সালতানাতের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিলাম। তারপর এখন যখন আমরা মাদায়েন যুদ্ধ করে জয়ী করেছি এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করে দিয়েছি, তখন এতো পরিশ্রম ও জানবাজী রেখে যা অর্জন করেছি তা আমার কোন নির্বুদ্ধিতা ও আহমকির কারণে তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবো.... শোন তোমাদের শাহেনশাহকে বলে দিয়ো, তার পিতা আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যের পয়গামকে এমনভাবে পদদলিত করেছিলেন কোন মুসলমান তা সহ্য করতে পারেনি। আমাদের পরবর্তী উত্তরসূরীরাও তা বরদাশত করতে পারবে না।'

ইয়াদগিরদের দূত হতাশ হয়ে পরাজিত মনে ফিরে গেলো।

এই হতাশা পুরো হালওয়ানে কালো মেঘের ঘনঘটা হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। ইয়াদগিরদের মতো রাজাধিরাজরা সামান্য দুঃখে ভারাক্রান্ত হতো, অভিমানে ফুলে উঠতো, রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রূপসীরা, গায়িকারা এবং নর্তকীরা নাচ দিয়ে, গান দিয়ে, মদ ও যৌবনের ভেজা রসে তার দেহমন আপ্লুত করে দিতো। কিন্তু আজ ইয়াদগিরদের পাশে কেউ নেই। তার যত ষোড়ষী-রূপসী অন্দোরমহলে ছিলো সব তো মাদায়েনে রেখে এসেছিলো। এর মধ্যে কিছু পালিয়ে গিয়েছিলো। আর কিছু মহলেই রয়ে গিয়েছিলো। তারা নিজেদেরকে মুসলমানদের সামনে পেশ করে। সাদ (রা) তাদেরকে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। তিনি তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে, মহলে তারা যে ব্যবহার পেতো সেই রকম ব্যবহার কেউ আর কখনো তাদের সঙ্গে করবে না। যথা নিয়মে তাদেরকে স্ত্রীর মর্যাদায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

ইয়াযদগিরদ শুধু নারীই বর্জন করেনি মদও ছেড়ে দিয়েছিলো।

ঃ'ইযদী'- একদিন পুরান দু'হাতে জড়িয়ে ইয়াযদগিরদের মাথা তার বুকের সঙ্গে লাগিয়ে পরম স্নেহে বললো-'আমি জানি তোমার বুকের বিষাক্ত সাপটি তোমাকে কুড়ে কুড়ে দংশন করছে। কিন্তু কোন যুবা পুরুষ এমন করে তার বুকের দুঃখ পুষে রাখতে পারে না। তোমার মতো আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে। আমার ভেতরেও কম তোলপাড় হচ্ছে না।'

ইয়াযদগিরদ মাদায়েন এসেছিলো সদ্য যুবা বয়সে পা দিয়ে। তার মা তাকে বুকে লুকিয়ে শহর থেকে দূরের অজানা কোন পল্লীতে নিয়ে গিয়ে কোমল হাতে বড় করে তোলে। মায়ের আচলের নিচে থেকে তার গায়ে বাস্তব জীবনের কোন অভিজ্ঞতার ছোঁয়া লাগেনি কোন দিন। যুদ্ধ পরিকল্পনা তো দূরের কথা, যুদ্ধের সাধারণ কলাকৌশল সম্পর্কেও তার কোন অভিজ্ঞতা ছিলো না। এসব ভেবে পুরানের মনটিও যেন ভেঙে পড়লো এবং সেই ইয়াযদগিরদকে এক শিশুর মতো তার বুকে জড়িয়ে ধরলো। ইয়াযদগিরদও হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো।

ঃ 'দুনিয়ার সব মাদায়েন পর্যন্ত গিয়েই শেষ হয়ে যায়নি'– পুরান বললো- এবং সালতানাতে ফারেস ও মাদায়েনেই শেষ হয়ে যায়নি। তুমি যদি এভাবে মনোবল ভেঙে বসে পড়ো তাহলে পুরো আজম আরবরা গ্রাস করে নেবে।'

ঃ নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য কান্না আসে পুরান!'– ইয়াযদগিরদ বললো- 'আজ আমার সেদিনের কথা মনে পড়ছে যখন মাদায়েনের শীর্ষস্থানীয় লোকেরা আমার মায়ের সম্মতির বিরুদ্ধে আমাকে মাদায়েন নিয়ে এসেছিলো এবং তুমি আমার জন্য সিংহাসন ত্যাগ করেছিলে। তারা সবাই এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিলো যে, আমি আরবদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে পারস্যের সেই দাপট, মর্যাদার সেই শীর্ষ চূড়াটি ছিনিয়ে আনবো। কিন্তু আমি ব্যর্থ হয়েছি। এই বিশাল সাম্রাজ্যের ইতিহাস আজ আমার মনে পড়ছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা ইরাকে হামলা চালিয়ে এত বড় সবুজ-শ্যামল ও সোনা ফলানো রাজ্য পারস্যের অন্তর্ভুক্ত করেছে। আমরা ছিলাম সাসানীদের গর্বিত সন্তান। সারা দুনিয়ার ওপর আমাদের যুদ্ধ শক্তির প্রতাপ ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। সামানীয়দের সামনে এক সময়ের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তি রোমকরা দাঁড়াতে পারেনি। গ্রীকরা মাথা তুলতে পারেনি। অথচ সেই আমরাই অতি সাধারণ এক জাতির কাছে সালতানাতে পারস্যের সব কিছু বিসর্জন দিয়েছি। অথচ সেই জাতির না আছে কোন অতীত। না আছে কোন ইতিহাস। না আছে এমন ঐতিহ্য যা গর্ব করার মতো।'

ঃ 'আমরা তো এখনো মরে যাইনি ইযদী!'- পুরান বললো 'আমাদের কাছে ফৌজ আছে। সব সরঞ্জাম মজুদ আছে।'

ঃ 'আমার রুস্তমের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মনে পড়ছে'– ইয়াযদগিরদ পরাজিত গলায় বললো-' সে বলতো সালতানাতে ফারেসের পরিণাম বড় খারাপ হবে। সম্ভবতঃ সে ঠিকই বলতো।

ঃ রুস্তম মরে গেছে- পুরান ঝাঁঝালো গলায় বললো–'তার ভবিষ্যদ্বাণীও মরে গেছে।– এসব সে তার নিজের সম্পর্কে বলতো যে, তার পরিণাম খুব খারাপ হবে। আসলেই তার বড় খারাপ পরিণাম হয়ে ছিলো। তুমি এই পরিণাম থেকে বাঁচতে চেষ্টা করো।'

ঃ কিন্তু কিভাবে?'–ইয়াযদগিরদ অসহায়ভাবে বললো– 'ফৌজ কোথায়? আমাদের কাপুরুষ জেনারেলরা কোথায় ....? কিছু মরেছে। আর বাকীরা সব পালিয়ে বেড়াচ্ছে।'

ঃ ফৌজও আছে জেনারেলও আছে'– পুরান দৃঢ় গলায় বললো–'সবাই এখন জলুলায়। .... মেহরান, ফায়রুযান, খারযাদ আরো সবাই সেখানে ফৌজ একত্রিত করে সংগঠিত করে তুলছে।'

ঃ 'না পুরান'- ইয়াযদগিরদের কণ্ঠে ঘৃণা ঝরে পড়লো–' ওদেরকে আরবদের ভয় তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। যুদ্ধের ময়দান থেকে পলাতক জেনারেল এরা। ওদের ওপর কি করে ভরসা করবো। আরেকটি পরাজয়ের আঘাত আমি সইতে পারবো না।'

ঃ 'তুমি কি এটা ভেবে বসে আছো যে, আরবরা মাদায়েনেই বসে বসে আরাম করবে'– পুরান রাগতস্বরে বললো–'যেখানেই তুমি যাবে তারা সে পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তুমি কি তাদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াবে? পালিয়ে যাবেই বা কোথায়? আমাদের জেনারেলরাও তোমার মতো কাপুরুষ নয়। তুমি ডরপুক হয়ে গেছো ইযদী। পুরো সালতানাতকে তুমি আরবদের হাতে দিয়ে দম নিবে।'

ঃ 'আমাকে কেন তুমি একা থাকতে দাও না?'– ইয়াযদগিরদ ক্ষিপ্ত গলায় বললো।

ঃ 'তুমি একাই থাকো'– পুরানও উত্তেজিত হয়ে উঠলো– আমি লড়ে যাবো। জেনারেলদের সঙ্গে আমি কথা বলে ফেলেছি। জলুলাকে আমরা বড় শক্ত ঘাঁটি বানাবো। জেনারেলরা জলুলার এমন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে যে, মুসলমানরা সেখানে মাথা কুটতে কুটতে খতম হয়ে যাবে।'

পুরান ক্রুদ্ধ হয়ে বাইরের দিকে পা বাড়ালো।

ঃ 'দাঁড়াও পুরান!'

পুরান দাঁড়িয়ে পড়লো এবং পেছনে ফিরে তাকালো।

ঃ 'জলুলা আমাকেও নিয়ে চলো'– ইয়াযদগিরদ অনুনয় করলো।

পুরান তখনই ইয়াযদগিরদকে নিয়ে জলুলা রওয়ানা হয়ে গেলো।

মাদায়েন থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরের এক শহর জলুলা। সাদ (রা) মাদায়েনে তার ফৌজ নিয়ে অবস্থান করছিলেন। হালওয়ান ও জলুলায় তিনি গুপ্তচর লাগিয়ে রেখেছিলেন। এসব গুপ্তচরদের মধ্যে স্থানীয় লোকও ছিলো যারা দীর্ঘ দিন ধরে ইরাকে বসবাসরত। এক দিন দুই গোয়েন্দা এলো।

ঃ 'জলুলায় পারসিকরা বিরাট এক ফৌজ সংগঠিত করেছে'– গোয়েন্দারা সাদ (রা) কে বললো- 'রুস্তমের ভাই খারযাদ এমন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করেছে যা মুসলিম সৈন্যদের জন্য বড় সংকট হয়ে দেখা দেবে। শহরের আশেপাশে এমন গভীর ও প্রশস্ত পরিখা খনন করা হয়েছে যে, কোন শক্তিশালী ঘোড়া লাফিয়ে এর অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। শহর থেকে বাইরে বের হওয়ার জন্য কিছু জায়গা ছেড়ে রাখা হয়েছে। সে জায়গা ও পরিখার আশেপাশে লোহার আংটা দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। এর দ্বারা শহরে আসা যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।'

ঃ 'শহরের ভেতরের অবস্থা কি?'– সাদ (রা) জিজ্ঞেস করলেন–'ফৌজ ও জেনারেলদের পরিকল্পনা লোকেরা কিভাবে নিয়েছে? আগের মতো কি তাদের ওপর ভীতি কাজ করছে না?'

ঃ 'ইয়াযদগিরদ ও পুরান সেখানে পৌঁছে গেছে'– এক গোয়েন্দা বললো- 'তারা ফৌজকে এমন উত্তেজিত ও গরম করে তুলেছে যে, শহরের লোকেরাও ফৌজে ভর্তি হয়ে গেছে। কাদিসিয়া ও মাদায়েন থেকে যারা পালিয়েছিলো জলুলা গিয়ে তারা একত্রিত হয়েছে। জেনারেলদের বক্তৃতা শুনেছি আমরা, তারা তাদের ফৌজ ও শহরের লোকদের বলেছে আমরা এখানে জমে লড়াই করলে মুসলমানরা অবরোধে বসে বসেই দুর্বল হয়ে যাবে। এখানেও যদি আমরা পিঠ দেখাই আমাদের যুবতী মেয়ে ও স্ত্রীদের কোথাও আশ্রয় মিলবে না। মুসলমানদের সঙ্গে আমরা বড় শক্তি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবো। ওদেরকে যদি আমরা পরাজিত করতে পারি তাহলে সালতানাতের যেসব এলাকা মুসলমানরা কব্জা করে নিয়েছে তা আমাদের হাতে চলে আসবে এবং এখানকার লোকেরা আমাদেরকে তাদের মাথায় উঠিয়ে রাখবে। বিজয় যদি মুসলমানদেরও হয় তাহলেও পারসিকরা আমাদের ওপর এই অভিযোগ আরোপ করবে না যে, আমরা লড়াই করিনি।'

ঃ 'ইয়াযদগিরদ তো জলুলাতেই আছে!'

ঃ 'না আমীরে লশকর!'– এক গোয়েন্দা বললো– 'পুরানের সঙ্গে সে জলুলা এসেছিলো, পুরান বড় আবেগদীপ্ত মহিলা। লোকজনের ঘরে ঘরে গিয়ে মহিলা ও কম বয়সী ছেলে মেয়েদেরও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তুলছে। তার বলায় এমন এক জাদুর প্রতিক্রিয়া আছে, যেই শুনে সে অগ্নিতপ্ত হয়ে উঠে। ....ইয়াযদগিরদ হালওয়ান চলে গেছে। জলুলায় এই পরিমাণ খাদ্যশস্য, মিষ্টি পানি এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করা হয়েছে, যা ফৌজ ও শহরবাসীর কয়েক বছর চলে যাবে।'

ঃ 'আমীরে লশকর!'– আরেক গোয়েন্দা বললো– 'জেনারেল ও ফৌজের প্রত্যেক সদস্য শপথ করে বলেছে, মুসলমানদের জলুলার দেয়ালের বাইরে খতম করে তাদের লাশ পরিখার মধ্যে নিক্ষেপ করে মাটি চাপা দেয়া হবে।'

ঃ 'পালিয়ে যাওয়া ফৌজ এখনো ফিরে আসছে?'

ঃ 'হ্যাঁ আমীরে লশকর! তারা নিজেরা তো আসছেই এবং তাদেরকে খুঁজে খুঁজে আনা হচ্ছে। জলুলার অধিবাসীরা শহরের বাইরে এসে তাদেরকে মন খুলে সংবর্ধনা দিচ্ছে। তারপর অন্যের কাছ থেকে যে শপথ নেয়া হয়েছে তাদের থেকে সেই শপথ নেয়া হচ্ছে। মাদায়েন থেকে পালিয়ে যাওয়া সাধারণ লোকেরা জলুলায় তাঁবুতে থাকছে। লড়াইয়ের জন্য তারা এখন প্রস্তুত। প্রত্যেকেই আহত সিংহের মতো ফুসছে। অনেকে তলোয়ার চালনা ও তীরন্দাবী রপ্ত করছে।'

মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ ছিলো, পারসিকদের এত ফৌজ মারা যাওয়ার পরও জলুলার স্থানীয় ফৌজ মুসলমানদের চেয়ে তিন গুণ বেশি ছিলো।

সাদ (রা) একদিন ছদ্মবেশ ধারণ করে জলুলা চলে যান এবং পরিখা ও লোহা দ্বারা তৈরী প্রতিবন্ধক অবস্থা দেখে আসেন।

❖ ❖ ❖

সাদ (রা) পারসিকদের এই নতুন প্রস্তুতির বিস্তারিত খবর লিখে উমর (রা)-কে জানালেন। তিনি আরো লিখলেন, সম্ভবত ঃ এটাই পারসিকদের শেষ প্রতিরোধ ব্যবস্থা। এখন তারা শেষ লড়াই লড়তে যাচ্ছে।

উমর (রা) পয়গাম পাঠ করে ফিরতি পয়গাম লিখলেন, বারহাজার সৈন্যসহ হাশেম ইবনে উতবাকে জলুলা পাঠিয়ে দাও। এতে সৈন্যব্যূহের সম্মুখভাগে থাকবে কাকা ইবনে আমর। ডান ব্যূহে ঘশআর ইবনে মালিক, বাম ব্যূহে আমর ইবনে মালিক এবং পেছনের অংশে থাকবে আমর ইবনে মাররাহ।

উমর (রা) আরো কিছু নির্দেশ দিয়ে জোর ভাষায় লিখলেন, এক সঙ্গে পুরো সেনাবাহিনী জলুলা কোনভাবেই পাঠানো যাবে না। মাদায়েনের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা অত্যন্ত মজবুত করতে হবে। জলুলা থেকে আমাদের সেনাদলকে পিছুও সরতে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে মাদায়েনকে বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়বে। এই সংকটের মুখ আগেই বন্ধ করে রাখতে হবে।

উমর (রা)-এর হুকুম পেয়েই জলুলার জন্য বার হাজার সৈন্য প্রস্তুত করে চারটি অংশে সেনা বাহিনী সংগঠিত করে দিলেন এবং সালার নির্ধারিত করে দিলেন। এরপর সবাইকে বললেন জলুলায় তারা কি ধরনের প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে পারে।

ঃ 'আর মনে রেখো আমার ভাই-পুত্র!'– সাদ (রা) তার ভাতিজা হাশেম ইবনে উতবাকে বললেন–' বড় কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে যাচ্ছো তুমি। আমাদের খান্দান ও গোত্র পরাজয় ও ব্যর্থতা এই শব্দ দুটোই জানে। কখনো আমরা এর সম্মুখীন হইনি। যদি তুমি ব্যর্থই হও, জীবিত ফেরার দরকার নেই তোমার লাশ দেখার ইচ্ছা আমার হবে না তখন।'

ঃ 'সেনাসাহায্য পাবো এমন আশা কি করতে পারি?' হাশেম জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ তোমার দিকে আমি সব সময় নজর রাখবো'– সাদ (রা) বললেন- 'তোমার যখন সেনা সাহায্যের প্রয়োজন হবে আমি নিজেই বুঝতে পারবো এবং সময়ের আগেই তুমি সেনাসাহায্য পেয়ে যাবে। .... ক'কা ইবনে আমরের মতো বীর যোদ্ধা তোমার সাথে আছে। অন্যান্য যেসব সালার তোমার নেতৃত্বে যাচ্ছে তারাও আমীরুল মুমিনীনের বাছাই করা। তাদের কেউ তোমাকে ধোঁকা দিবে না। এমন যেন না হয় যে, তুমিই তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে পালালে ............ এটাও শুনে রাখো। অগ্নিপূজারীরা শপথ করেছে তারা আমাদেরকে পরিখার বাইরেই লাশ করে পরিখার গর্তে ফেলে দিবে।'

ঃ পারসিকদের সঙ্গে তো আমি দীর্ঘদিন ধরেই লড়ে আসছি'– হাশেম বললেন–'যদি আমি কাদিসিয়া ও বাহারশীরের লড়াইয়ে কাপুরুষতা করে না থাকি তাহলে জলুলাতেও কাপুরুষ হবো না। আচ্ছা এখনইকি রওয়ানা হয়ে যাওয়া উচিত নয়?

ঃ 'হ্যারে ভাতিজা!'– সাদ (রা) তার কাঁধে হাত রেখে বললেন- 'আল্লাহ হাফেজ। তুমি সর্বত্রই তোমার সঙ্গে আল্লাহ আছেন বলে অনুভব করতে পারবে।'

❖ ❖ ❖

হাশেম ইবনে উতবার লশকর ফজরের নামাজ পড়ে রওনা হয় এবং কোথাও না থেমে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে চলে সূর্যাস্তের পূর্ব নাগাদ জলুলা গিয়ে পৌঁছে। হাশেম ও তার সালারদের জলুলার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যদিও বলে দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু তারা সেখানে যা দেখলো তাতে তাদের দুশ্চিন্তার অন্ত রইলো না। জলুলা অবরোধ করা তো দূরের কথা শহরের দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছানোও সম্ভব না। পরিখা ছাড়া আসা যাওয়ার যতটুকু জায়গা ছিলো তাও লোহার বড় বড় আংটা দিয়ে ও তার দিয়ে ঘেরাও করা।

শহরের দেয়ালে দাঁড়িয়ে ফৌজ ও শহরের লোকজন হো হো কর হাসছিলো এবং নানান ধরনের মন্তব্য করছিলো।

হঠাৎ শহরের একটি দরজা খুলে গেলো এবং অস্ত্র হাতে সৈন্যরা পরিখার পথ দুটিতে এসে লোহার আংটাযুক্ত তার খুব দ্রুত সরিয়ে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গেই শহরের দরজা দিয়ে শত শত ঘোড় সওয়ার বাঁধভাঙ্গা বন্যার মতো রাস্তা দুটি দিয়ে বাইরে এসে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এমন অতর্কিত হামলার জন্য মুসলমানরা প্রস্তুত ছিলো না। তারপরও তারা ঘুরে দাঁড়িয়ে মোকাবেলা করতে লাগলো।

ঃ ওদের ফিরে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দাও'- ক'কার গলা দিয়ে বার বার এই আহ্বান গর্জনের মতো শোনা যেতে লাগলো।

মুজাহিদরাও 'ওদের রাস্তা বন্ধ করে দাও'– শ্লোগান তুলতে লাগলো। মুসলমানদের পক্ষে এই ব্যাপারটা বেশ কাজ এগিয়ে দিলো যেন। ফারসী সওয়াররা 'মারো ও পালাও' কৌশলে হামলা করে মুসলমানদের যতটুকু ক্ষতি করা যায় তা করে ফিরে যাওয়ার জন্য এই হামলা চালিয়েছিলো। ওদের কানে যখন 'ফিরে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দাও' এই শ্লোগান পৌঁছলো তখন তারা সামনে বাড়ার পরিবর্তে পেছনে সরার দিকে মনোযোগ দিলো। এবার তারা জীবিত ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো।

মুসলমানরা ওদের পথ বন্ধ করতে না পারলেও তীরন্দাযরা ওদের যথেষ্ট ক্ষতি করলো। পারসিকদের ফিরে যাওয়ার পথটি ছিলো সংকীর্ণ। সাওয়াররা কে কার আগে যাবে সেই চেষ্টা করতে গিয়ে এত সরু পথে ফেসে গেলো। এই সুযোগে তলোয়ার ও বর্শা দিয়ে মুজাহিদরা ওদেরকে ভালো বিপদে ফেললো। কিছু মারা গেলো কিছু আহত হলো। মুসলমানদের ক্ষতি ছিলো মামুলি।

খুব দ্রুত আবার পথটি লোহার আংটাযুক্ত তার দিয়ে বন্ধ করে দিলো। মুজাহিদরা মৃত ফারসীদের পরিখায় ফেলতে লাগলো। আহত ঘোড়াগুলোও পরিখায় ফেলে দিলো।

মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ছিলো মাত্র বার হাজার। অথচ জলুলা এত বড় শহর ছিলো যে, তা অবরোধ করার জন্য বার হাজার সৈন্য একেবারেই অপ্রতুল। ভেতর থেকে হামলা করার সময় মুজাহিদরা যখন এক সঙ্গে তা প্রতিহত করতে যেতো তখন এমনিতেই অবরোধ ভেঙে যেতো। শহরের এক দিকে পাহাড় ছিলো। সেদিকে অবরোধের কোন পথ ছিলো না। বরং পারসিকরাই এ থেকে ষোল আনা ফায়দা উঠাচ্ছিলো। সেদিক থেকে

শহরে একটি পথ তৈরী ছিলো। এটি জলুলা থেকে হালওয়ানে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিলো। হালওয়ান থেকে এ পথে সেনাসাহায্য ও রসদ পৌঁছতো জলুলায়। প্রথম হামলায় জলুলার যত ফৌজ মারা গেলো, হালওয়ান থেকে এর চেয়ে দ্বিগুণ ফৌজ পাঠিয়ে দেয়া হলো।

এটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়ালো। দু'একদিন পরপর জলুলা থেকে কিছু সওয়ার বের হতো এবং প্রথমবার যেভাবে হামলা করেছিলো সেভাবে হামলা করে চলে যেতো। তারা হামলা করতে এলেই কিছু সওয়ার ও পদাতিক সৈন্য নিহত বা আহত হয়ে পেছনে রয়ে যেতো, আর বাকীরাও ফিরে যেতো।

সাদ (রা) মুসলিম সৈন্যের আহতদের মাদায়েন নিয়ে যাওয়ার ও তার স্থলে তা জাদম সৈন্য পাঠানোর ব্যবস্থা রেখেছিলেন। মাদায়েন থেকে তারা ঘোড়া ও গরুর গাড়ির সুবিধা পেয়েছিলো। এর মধ্যে দুই মাস কেটে গেলো। পুরান তার এই রুটিন অব্যাহত রেখেছিলো যে, জলুলায় ফৌজ একত্রিত করে বড় জোশপূর্ণ বক্তৃতা করতো। এতে পারসিকদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরী হতো এবং তাদের জযবাও জেগে উঠতো। শহরের লোকেরাও এতে উত্তেজিত হয়ে উঠতো।

এই দুই মাসে জলুলাবাসীর এত ক্ষতির সম্মুখীন হতে হলো যে, শহরবাসীর জন্য তা মেনে নেয়া সম্ভব ছিলো না। ফারসী ফৌজের সঙ্গে শহরবাসীরাও বাইরে এসে মুসলমানদের ওপর হামলা করতো এবং মারা যেতো বা যখমী হয়ে মুসলমানদের হাতে বন্দী হতো। পারসিকরা তাদের আহত সৈনিকদের ফেলেই চলে যেতো। মুসলমানরা তাদেরকে শুশ্রূষার জন্য মাদায়েন পাঠিয়ে দিতো এবং যুদ্ধবন্দী হিসাবে কয়েদ করে রাখতো।

পুরান একদিন তার রুটিন মাফিক শহরে টহল দেয়ার জন্য বের হলো। এক জায়গায় একদল মহিলা তাকে ঘিরে ধরলো। এই প্রথম পুরান কিছু বলার মওকা পেলো না। মহিলারা তাকে দেখতেই হৈ চৈ শুরু করে দিলো। ক্রমেই তা হাঙ্গামার রূপ নিলো। মহিলারা যেন ভুলে গিয়েছিলো পুরান পারস্যের সম্রাজ্ঞী ছিলো বা বর্তমান সম্রাটের সতালো বোন হওয়ার কারণে তার মর্যাদা একজন সম্রাজ্ঞীর মতোই এবং এটাই সেই শাহী খান্দান যারা মানুষ হত্যাকে মাছি মারার মতো মনে করে।

ঃ'পুরান! তুমি মা হলে সেসব মায়ের বুক ফাটা আর্তনাদের কথা বুঝতে যাদের টগবগে যুবক ছেলেগুলোকে শহরের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে তুমি হত্যা করেছো।'

ঃ তুমি তো বিয়ে করো নি। তুমি বিধবা হলে তখন ......

ঃ 'তোমার তো কোন ভাই মরেনি এই যুদ্ধে পুরান!'

ঃ তুমি সম্রাজ্ঞী, তোমার কিসের চিন্তা, আমাদের ধনদৌলত তো আমাদের ছেলেরাই ছিলো যাদেরকে তুমি হত্যা করিয়েছো।'

মহিলাদের এই শোরগোল আহাজারীর রূপ নিলো। তাদের কারো সন্তান, কারো ভাই, কারো পিতা এবং কারো পুরো খান্দান পুরানের জোশপূর্ণ আহ্বানে ফৌজে শামিল হয় এবং বিগত দু' মাসে ফৌজের সঙ্গে মিলে শহরের বাইরে গিয়ে মুসলমানদের ওপর হামলা করে আর মারা পড়ে।

ঃ তোমরা কি তোমাদের দেশের জন্য কোন ত্যাগ স্বীকার করতে চাও না?'– বড় কষ্টে পুরান মুখ খোলার সুযোগ পেলো– 'তোমরা কি জানো না, মুসলমানরা এই শহর দখল করে নিলে তোমাদের সব যুবতী মেয়েদের এই হিংস্র মুসলমানরা দাসী বাঁদীতে পরিণত করবে?'

ঃ তাহলে তুমি তোমার ভাইকে কেন বের করছো না?'– এক মহিলা বললো- 'এই দেশ এই সাম্রাজ্য আমাদের নয়। এটা ইয়াযদগিরদ ও তার খান্দানের দেশ। এটা কাপুরুষ আর ভোগবিলাসে উন্মত্ত ফৌজের দেশ। আমাদের সন্তানদের রক্তের দাম দিয়ে তোমাদের খান্দান ভোগবিলাসে মত্ত থাকে?'

অবস্থা ক্রমেই বিদ্রোহের দিকে এগোলো, অথচ তখন শত্রুকর্তৃক শহর অবরোধ ছিলো। মারা গিয়েছিলো ফৌজের উল্লেখযোগ্য অংশ। জোরজবরদস্তি করে অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করাও কম বিপদের ছিলো না। পুরান দেখছিলো মহিলাদের মতো পুরুষরাও এবার সেখানে ভীড় করছে। তাদের অনেকে মাদায়েনের পরাজয় নিয়েও পুরানকে বিদ্রূপ শুরু করলো।

পুরান দমে যাওয়ার পাত্রী ছিলো না। কিন্তু আজ তার মুখ কেউ যেন শিষা দিয়ে আটকে দিয়েছিলো। তবুও শেষ পর্যন্ত সান্ত্বনামূলক কিছু কথা তার মনোমগ্ধকর ভাষায় বলার পর সবাই কিছুটা শান্ত হলো। কিন্তু পুরান নিজে এমন ঝাকি খেলো যে, সেখান থেকে ঘোড়ায় চড়ে ফিরে আসার সময় তার মাথা উঠাতে পারছিলো না, বুকের ওপর তা ঝুলে রইলো।

সব জেনারেলকে তারপর এক জায়গায় ডেকে বললো, তারা যেন সবাই হালওয়ান পৌছে। নিজেও হালওয়ান চলে গেলো।

মেহরান, ফায়রুযান এবং খারযাদ তার পেছন পেছন হালওয়ান পৌছলো। তাদেরকে পুরান ইয়াযদগিরদের কাছে নিয়ে গেলো।

ঃ 'মনে হচ্ছে জলুলার পরাজয়ও আমাদের ভাগ্যে লিখে দেয়া হয়েছে'– পুরান বললো- 'আজ জলুলার মহিলারা আমাকে এমন বিদ্রুপ করেছে, তুমি শুনলে দজলায় ডুবে মরার জন্য বেরিয়ে পড়তে। কিন্তু দজলায় ডুবে মরার অধিকার থেকেও আজ আমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে।'

ঃ 'আচ্ছা, তোমরা জেনারেলরা কি বলতে পারো আমাদের ফৌজে কোন জিনিসটার কমতি আছে'– ইয়াযদগিরদ তার জেনারেলদেরকে জিজ্ঞেস করলো।

ঃ'মনোবলের'- মেহরান জবাব দিলো– 'আরবদের সংখ্যা মাত্র দশ বার হাজার। কিন্তু তাদের মনোবল আকাশচুম্বী, পরাজয়ের চেয়ে তারা মরে যাওয়া শ্রেয় মনে করে। একের পর এক বিজয়ও তাদের মনোবল আরো উচ্চতায় নিয়ে গেছে। আমাদের ফৌজের ওপর মুসলমানদের ভয় বদ্ধমূল হয়ে গেছে। ওরা যখন দজলা পার হলো ঘোড়ার পিঠে বসে তখন আমাদের ফৌজ নিশ্চিতভাবে মেনে নিলো, মুসলমানরা অশরীরি জিন ভূত বা তাদের কাছে কোন জাদু আছে। আমরা তাদেরকে অনেক বুঝিয়েছি। মুসলমানদের মধ্যে অলৌকিক কোন শক্তি নেই। কিন্তু আমাদের সৈন্যরা তাদের সামনে পড়লে পালানোর পথ আগে দেখে নেয়।'

ঃ 'শাহেনশাহে ফারেস!'– ফায়রুযান বললো- 'আসলে মুসলমানরা তাদের ধর্ম বিশ্বাসে অত্যন্ত অটল।'

ঃ 'এসব কথা বলার সময় নেই আমাদের কাছে'- পুরান বাধা দিয়ে বললো- 'আমি তোমাদেরকে এই রায় দেয়ার জন্য ডাকিনি যে, কার ধর্মবিশ্বাস অটল আর কার টলমটল। তোমাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি, আমরা জলুলার অবরোধ ভেঙে মুসলমানদের যদি পিছু না হটাই, শহরের লোকেরা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠলে আমাদের ফৌজের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। শহরের দরজা খুলে তারা বাইরে বেরিয়ে যাবে এবং পরিখার পথ থেকে প্রতিবন্ধকগুলো সরিয়ে দেবে। .... তুমিও ভেবে দেখো ইয়দী! আমাদের কিছু একটা করা উচিত এবং খুব দ্রুত।

ঃ 'এটা আমি আগেই ভেবে রেখেছি'– মেহরান বললো 'আমাদের পুরো ফৌজ নিয়ে একযোগে মুসলমানদের ওপর হামলা করতে হবে, অবরোধের পঁচাত্তর দিন চলে গেছে, আমরা অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি। আমার শতভাগ আত্মবিশ্বাস আছে। একজন মুসলমানকেও আমি জীবিত ফিরে যেতে দেবো না। হামলার সময় পুরো ফৌজ আমি এক সঙ্গে ব্যবহার করবো না। এক দল ক্লান্ত হয়ে পড়লে ধীরে ধীরে পিছু হটতে শুরু করবে এবং বাকী অর্ধেক ফৌজ শহরে প্রস্তুত থাকবে। তারা বাইরে এসে লড়াইয়ে নতুন মাত্রা যোগ করবে। এখন আর এত কম সংখ্যক সৈন্য নিয়ে বিক্ষিপ্ত হামলা অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়।'

ঃ 'কত দিনের মধ্যে এই হামলা শুরু করা যাবে?'–ইয়াযদগিরদ জিজ্ঞেস করলো।

ঃ' তিন চারদিন পর'– মেহরান বললো- 'আমিও ফায়রুযান ফৌজ নিয়ে বাইরে বের হবো, আমরা সঙ্গে থাকলে ফৌজও জমে লড়াই করবে।'

ঃ 'ঠিক আছে যাও। এখনই তৈরী শুরু করে দাও।'

তিনদিনের মধ্যে প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গেলো।

জলুলা অন্য জায়গা থেকে আসা ও পালিয়ে যাওয়া সৈন্যে ভরে গিয়েছিলো। ইয়াযদগিরদ, নাওরীন ও পুরান এই তিন দিন অনবরত জযবাদীপ্ত বক্তৃতা দিয়ে সবাইকে উস্কে দেয়ার কাজ চালিয়ে গেলো।

ঃ 'এখন পালিয়ে কোথায় যাবে?'- একথা তাদের তিনজনের মুখেই লেগেছিলো- 'ইরাকের আরেক প্রান্তসীমার কাছে আমাদেরকে পৌছে দিয়েছে। তোমরা মুসলমানদের হাতের মুঠোয় চলে এসেছো। এখন মহিলা ও কিশোরদেরও লড়তে হবে। এজন্য যদি তোমরা প্রস্তুত না থাকো তাহলে মুসলমানদের দাস-দাসী হওয়ার জন্য তৈরী হয়ে যাও।'

মাদায়েনের বড় বড় ব্যবসায়ী, সম্পদশালী জায়গীরদাররা আগেই পালিয়ে জলুলায় চলে এসেছিলো। তাদের অধিকাংশের ধনভাণ্ডারই রয়ে গিয়েছিলো। জায়গীর ও জমিদারদের মাইলের পর মাইল জমি- যা সোনা রুপা ফলাতো, যেগুলোর নিচে গুপ্তধনও ছিলো সেসব তো মুসলমানদের দখলে চলে গিয়ে ছিলো। এসব হারিয়ে তারা কাঙাল হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু সাধারণ লোকেরা তা জানতো না।

তাদের একজন ঘোষণা করলো, যে সৈন্য বা শহরের যে কেউ অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে লড়বে তাকে থলে ভর্তি সোনা রুপা পুরস্কার দেয়া হবে।

সঙ্গে সঙ্গে আরেক জায়গীরদার ঘোষণা করলো, বীর বাহাদুর লড়াকুকে তার জায়গীরের একটা অংশ দেয়া হবে।

এভাবে সব ব্যবসায়ী ও জায়গীরদাররা বীর লড়াকুদের লোভনীয় পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা দিলো। ইয়াযদগিরদ, নাওরীন ও পুরানের আগুনতপ্ত বক্তৃতার সাথে সাথে এই অভাবনীয় পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা ফৌজ ও শহরের লোকদের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করলো। কমবয়সী ছেলেরাও লড়াইয়ের জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিলো। মহিলারা ঘোষণা করে দিলো, মুসলমানরা যদি শহরে ঢুকে পড়ে তাহলে তারা শহরের অলিগলিতে ও নিজেদের ঘরে থেকে লড়াই চালিয়ে যাবে। কোন মুসলমানকে জীবিত ফিরতে দেয়া হবে না বা তারা নিজেরাই বাধ্য হয়ে মারা যাবে।

সেটা ছিলো এক তুফান। যা আগুনের ঘূর্ণনে টগবগ করতে করতে অবরোধকারী বার হাজার মুসলিম সেনাদলকে খড়কুটার মতো উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলো।

পারসিকদের হামলায় আহত বা শহীদদেরকে মাদায়েন নিয়ে যাওয়া হতো এবং সেখানে তাজাদম সৈন্য চলে আসতো। মুসলমানদের সংখ্যা এভাবে বার হাজার সবসময় পূর্ণ থাকতো। তীরন্দায ও বর্শাধারী সৈন্যও মুসলমানদের কমছিলো না। আর জলুলায় যে সৈন্য প্রস্তুত করা হয়েছিলো তা এক লাখেরও বেশি ছিলো।

যেদিন অবরোধের আশি দিন পূর্ণ হলো সেদিনই শহরের দরজা খুলে গেলো। কিন্তু লোক এসে পরিখার রাস্তা থেকে লোহার বেষ্টনী সরিয়ে ফেললো। বিশাল এক সেনা তরঙ্গ মুসলমানদের দিকে ধেয়ে এলো। এটা ছিলো মানুষ ও ঘোড়ার প্রলয়ংকরী ঝড়, কেউ ভাবতেও পারছিলো না এর সামনে মাত্র বার হাজারের একটি দল কি করে টিকতে পারবে? উপরন্তু এই হামলাও ছিলো অতর্কিত।

ঃ 'ওদেরকে পরিখার দিকে দাবিয়ে রাখো'- সালার হাশেম ইবনে উতবার এই আওয়াজ মুসলিম সৈন্যদের কানে কানে পৌছে গেলো।

ফারসী ফৌজে নতুন জোশ ও জযবা দেখা যাচ্ছিলো। কিন্তু তারা বেশি এগুতে চাচ্ছিলো না। কারণ তাদের ফিরে যাওয়ার চিন্তাত ছিলো।

ফারসীরা হামলা শুরু করার একটু পরেই এক বিশাল ঝড় উঠলো। মুসলমানরা এই ঝড় থেকে দারুণ ফায়দা উঠালো। তারা এমন কঠিন হামলা চালালো যে, পারসিকরা টপাটপ পরিখায় পড়তে লাগলো এবং প্রায় অর্ধেক ফৌজ ধ্বংস হয়ে গেলো। এমন এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হলো যে, উভয় পক্ষেরই বর্শাগুলো ভেঙে গেলো। তুনীরের তীর খতম হয়ে গেলো। তলোয়ার দিয়ে রক্তের বন্যা বইতে লাগলো। এত বিশাল ফারসী বাহিনীর মধ্যে মুজাহিদদের দেখাই যাচ্ছিলো না, মুজাহিদরা তবুও পারসিকদের পরিখার দিকে দাবিয়ে রাখার কৌশল প্রাণপণ ধরে রাখলো। আর এতে পারসিকরা পিছু হটতে হটতে পরিখায় পড়তে লাগলো। অনেক পদাতিক সৈন্য নিজেদের পায়ের তলায় পড়ে পিষ্ট হতে লাগলো।

ফারসীদের ফিরে যাওয়ার উপায় রোধ করার জন্য ক'কা একবার পরিখার পথগুলো বন্ধ কর দিলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ তার নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারলো না।

মনে হচ্ছিলো, কাদিসিয়ার চেয়েও এখানকার লড়াই আরো বেশি রক্তক্ষয়ী। এত বড় ফৌজ নিয়েও পারসিকরা সুবিধা তো করতে পারলোই না বরং অধিক দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। পারসিকরা এসেছিলো একযোগে এবং লড়ছিলোও এক যোগে। মুজাহিদরা তাদেরকে ছড়িয়ে পড়তে দিলো না, এতে তারা একজনের সঙ্গে আরেকজন ফেসে যেতে লাগলো। অধিক জায়গা নিয়ে লড়ার সুযোগ পাচ্ছিলো না তারা। আরেকটি দুর্বলতা ছিলো, তারা ফিরে যাওয়ার চিন্তা নিয়ে লড়ছিলো। অথচ ফেরার রাস্তা কমতো ছিলোই আবার তা ছিলো অতি সরু।

তাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিলো, বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করার ও মৃত্যুর শপথ করার পরও তাদের ওপর থেকে মুসলমান ভীতি কমেনি। ইয়াযদ গিরদ, নাওরীন ও পুরানের রক্ত আগুন করা বক্তৃতার কথা ময়দানে এসে তারা ভুলে গেলো। অথচ মুসলমানরা নারা আর শ্লোগানের মাধ্যমে বার বার একে অপরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলো আমীরুল মুমিনীরের হুকুম এই বার হাজার সৈন্য নিয়েই দুশমনকে পরাজিত করতে হবে।

দুপুরে পেছনের দিকে পারসিকরা ফিরে যেতে লাগলো। তাদের ফিরেও যাওয়ার সময়ও মুজাহিদরা হামলা অব্যহত রাখলো। শেষ ফারসীটিও যখন পরিখার ওদিকে চলে গেলো। মুসলিম শিবিরে আযানের আওয়াজ শোনা গেলো। সালার হাশেম ইবনে উতবা ঘোষণা করে দিলেন নামায পড়া হবে যুদ্ধকালীন পদ্ধতির নামায।

ঃ আল্লাহর মুজাহিদ বাহিনী!– নামাযের পর ক'কা তার বাহিনীকে জিজ্ঞেস করলেন– তোমরা কি ভয় পাচ্ছো?

ঃ 'ভয় না, আমরা ক্লান্ত'– এক মুজাহিদ বললো- 'যদি আরেকবার ওরা এমন হামলা করে তবে তা জাদম ফৌজ হামলা করবে।'

ঃ'হ্যাঁ ঠিক বলেছো'– ক'কা বললেন– 'আরেকবার আগের মতো হামলা হলে আমরা সামান্য পিছু হটে ওদের ওপর হামলা চালাবো এবং তাদেরকে সে পর্যন্ত ছাড়বোনা, যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের ও তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেন। এবার ওরা এলে ওদেরকে বাধা না দিয়ে ওদের মধ্যে ঢুকে পড়ে শহরের দিকে পেছনে চলে যাবে।'

ক'কার কথা তখনো শেষ হয়নি শহরের দরজা খুলে গেলো। আরেকবার পারসিকদের হামলার ঝড় শুরু হলো। প্রথম হামলার চেয়ে এই হামলা আরো প্রচণ্ড ছিলো।

আরেকবার আকাশ বাতাস ধুলোয় ধূসরিত হয়ে উঠলো।

ঃ মুজাহিদ ভায়েরা, মুসলমানরা! তোমাদের কমান্ডার পরিখার বেষ্টনীর ভেতর চলে গেছে। সামনে এগোও তোমরা। পথ পরিষ্কার।'–উঁচু আওয়াজে এই আহ্বান শোনা গেলো।

ক'কা তখন কয়েকজন মুজাহিদ নিয়ে পরিখার দুটি পথ দখল করে নেন এবং এই ঘোষণা করান।

পারসিকরা এই আহ্বান শোনার পর পেছনে পালানোর জন্য উন্মাদ প্রায় হয়ে গেলো। কিন্তু রাস্তা তখন মুসলমানদের দখলে। অন্যান্য রাস্তাগুলোও ততক্ষণে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। পারসিকরা দিশেহারা হয়ে ঘোড়াসুদ্ধ পরিখায় পড়তে লাগলো।

এরপর যা কিছু হলো তাহলো মুসলমানদের হাতে পারসিকদের গণহারে হত্যা। অনেক ফারসী পরিখা টপকানোর জন্য ঘোড়া নিয়ে লাফিয়ে উঠলো। কিন্তু পরিখার মাঝখান পর্যন্ত কেবল পৌছতে পারলো তারা। পরিখার ভেতরে অসংখ্য ঘোড় সওয়ার ছাড়া দিগ্বিদিক ছুটতে লাগলো আর ফারসীদের খুরের আঘাতে পিষ্ট করতে লাগলো।

প্রায় এক লাখ ফারসী এই লড়াইয়ে মারা পড়লো, যারা বেঁচে গেলো তারা শিবিরে যেতে পারলো না। অন্য দিক দিয়ে হালওয়ানের দিকে পালিয়ে গেলো।

হঠাৎ ক'কার নজরে পারসিকদের অন্যতম জেনারেল মেহরান পড়লো, সে তার মুহাফিজ বাহিনীর কিছু সওয়ারের সঙ্গে পালাচ্ছিলো। ক'কা তার পিছু ধাওয়া করলেন এবং খানকীন নামক স্থানে গিয়ে পাকড়াও করলেন। তার মুহাফিজ সওয়াররা তাকে ছেড়ে আগেই পালিয়েছিলো। ক'কার সঙ্গে মেহরান মোকাবেলায় নামলো। কিন্তু ক'কাতো শুধু হত্যা করতেই জানতো, নিহত হতে তাকে কেউ শেখায়নি।

জেনারেল ফায়রুযান পালিয়ে হালওয়ানে চলে গেলো। মুজাহিদরা জলুলায় ঢুকে পড়লো, ততক্ষণে ক'কার বাহিনী হালওয়ান পর্যন্ত পৌছে গেছে।

*'খোদার কসম! শুনে নাও আজমের মেয়ে, তোমার মতোই এক বাহাদুর আরবের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে দেবো, আর তোমাদের কারো সঙ্গেই সেই ব্যবহার করা হবে না যা কোন বিজয়ী দল বিজিত শহরের নারীদের সঙ্গে করে থাকে। আমরা এই স্থূল দেহ নয়, দেহের ভেতরে স্পন্দিত হৃদয়টিকে মুঠোয় পুরে নিই। এটাই আমাদের ঈমান, বিশ্বাস ও ধর্ম। আর এটা আসমানী তোহফাও, যা আমরা তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি।'*

এই ঘোড়সওয়ারের গতি অত্যন্ত প্রচণ্ড ছিলো। এত প্রচণ্ড যে, মনে হচ্ছিলো ঘোরা লাফিয়ে উঠে লাগামহীন হয়ে সওয়ারের কাবুতে আসছে না। মাদায়েনের দেয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে এক মুজাহিদ তাকে দেখতে পেলো।

ঃ 'জলুলা থেকে এক সওয়ার আসছে'- মুজাহিদ চিৎকার করে বললো- 'ঘোড়া মনে হয় লাগামছাড়া হয়ে গেছে।'

ঃ 'জলুলা থেকে এক সওয়ার আসছে'-নিচে দাঁড়ানো আরেক মুজাহিদ ঘোষণা করলো- 'সিপাহ সালারকে খবর দাও।,

সাদ (রা) তার ভাতিজা হাশেম ইবনে উতবাকে বার হাজার সৈন্য দিয়ে জলুলায় পাঠানোর পর থেকে দারুণ অস্থির ছিলেন। প্রতিদিন ফজর নামাযের পর শহরের দেয়ালে দাঁড়িয়ে জলুলা থেকে মাদায়েনে আসার পথের দিকে কোন কাসেদের প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে-চেয়ে থাকতেন। তিনি নিজে জলুলা যেতে না পেরে অনুতাপ প্রকাশ করতেন। আমীরুল মুমিনীন তো নিশ্চয় আমার চেয়ে অনেক উপযুক্ত সিদ্ধান্তই নিয়েছেন এই বলে নিজেকে প্রবোধ দিতেন।

এই কয়দিন সবসময়ই সেনাসাহায্য ও রসদ প্রস্তুত রেখেছেন। জলুলা থেকে যতজন যখমী ও শহীদের লাশ আসতো সঙ্গে সঙ্গে সমপরিমাণ সৈন্য জলুলায় রওয়ানা হয়ে যেতো। রসদের যেসব ঘোড়া বা গরুর গাড়ি সেখান থেকে খালি আসতো তৎক্ষণাৎ রসদপূর্ণ হয়ে জলুলায় রওয়ানা হয়ে যেতো।

আশি দিন প্রতীক্ষার একাশি দিনের দিন তার কানে পৌছলো জলুলা থেকে এক সওয়ার আসছে।

তার ঘোড়া সবসময় প্রস্তুত থাকতো। এই খবর পেয়েই দৌড়ে বাইরে বের হলেন এবং ঘোড়ার রেকাবে পা না রেখে লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন। জলুলা পথের দরজা দিয়ে মাদায়েন থেকে বের হয়ে গেলেন। ঘোড় সওয়ার তখনো কিছুটা দূরে ছিলো সাদ (রা) উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটালেন।

ঃ বলো বলো, সেখান থেকেই বলো'- সাদ (রা) তার কাছে যাওয়ার আগেই তাড়া দিলেন- 'কি খবর নিয়ে এসেছো?'

ঃ 'শুভ বিজয় সিপাহসালার!'- ঘোড়সওয়ার জবাব দিলো 'আমরা জলুলায় ঢুকে পড়েছি'। সওয়ার সাদ (রা) এর কাছে চলে এলো। সাদ (রা) ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিলেন এবং উভয় ঘোড়া পাশাপাশি দুলকি চালে মাদায়েনের দিকে ছুটে চললো।

ঃ 'থেমো না, – সাদ (রা) সওয়ারকে বললেন- 'ঐ যে দেখো মাদায়েনের দেয়ালে লোক ভীড় করে তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।'

ঃ 'খোদার কসম'- শহরের কাছে গিয়ে সাদ (রা) দেয়ালের ওপরের ভীড়ের দিকে লক্ষ্য করে বললেন- 'আমার ভাতিজা তার অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে।'

মাদায়েনের মুজাহিদরা আনন্দে সিজদায় পড়ে গেলো। মুজাহিদদের স্ত্রীরাও বাইরে বেরিয়ে এলো এবং বিজয় সঙ্গীত গেয়ে আনন্দ উদযাপনে শরীক হয়ে গেলো।

সাদ (রা) কাসেদাকে তার সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন এবং শেষ দিনের লড়াইয়ের বিস্তারিত বিবরণ শুনলেন।

ঃ 'আপনার জলুলায় পৌঁছা খুবই জরুরী'- কাসেদ সাদ (রা)-কে বললো- অগ্নিপূজারীরা তো হালওয়ানে পালিয়ে গেছে। মনে হয় তারা জবাবী হামলা করে জলুলা অবরোধ করে নিবে। সরদার ক'কা ইবনে আমর হালওয়ান পৌঁছে গেছেন। আপনার সেখানে এখুনি পৌঁছা আরো জরুরী একারণে যে, জলুলায় মাদায়েনের মতো বড় অংকের মালে গনীমত রয়েছে।

সাদ (রা) প্রথমে উমর (রা) এর কাছে জরুরী বিজয়ের সংবাদ ও পারসিকদের জবাবী হামলার আশংকার কথা জানিয়ে পয়গাম লিখলেন। আরো লিখলেন পারসিকদের সমস্ত মনোবল খতম হয়ে গেছে। এখন তাদের পিছু ধাওয়ার অনুমতি দিন। তাদেরকে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ দেয়া যাবে না। এতটুকু সময় পেলে তাদের বিক্ষিপ্ত ফৌজকে একত্রিত করে সাধারণ লোকদেরও ফৌজী বানিয়ে নেবে। তারা এখন হালওয়ানে। খুব দ্রুত হালওয়ান অবরোধ করা উচিত।

জলুলা মাদায়েনের মতো বড় শহর না হলেও মাদায়েনের মতোই বহু মূল্যের মালে গনীমত পেলো এবং পরিমাণও বেহিসাব। শাহী খান্দানের কয়েকজন কর্মচারী জলুলায় রয়ে গিয়েছিলো। তারা বললো, এসব মালামাল ও স্বর্ণমুদ্রা শাহী মহলের আমলারা মাদায়েন থেকে নিয়ে এসেছিলো এবং জায়গীরদার ও ব্যবসায়ীরা সঙ্গে করে অনেক সোনাদানা ও নগদ টাকা পয়সা নিয়ে এসেছিলো। জলুলা অবরোধের শেষের দিকে শহরের লোকদের ইয়াযদগিরদ ও জেনারেলরা এই সুসংবাদ শোনাতে থাকে যে, তারা অবরোধ ভেঙে দিয়েছে এবং মুসলমানদের এমন ক্ষতির সম্মুখীন করেছে যে, ওরা যে কোন সময় পালিয়ে যাবে।

শহরের দেয়ালের ওপর কোন শহরবাসীর যাওয়া নিষিদ্ধ ছিলো। এজন্য অবরোধের ব্যাপারে শহরবাসী কিছুই জানতো না। তারা নিশ্চিন্ত হয়ে শহরে ঘুরে ফিরে খেতে লাগলো এবং নিজেদের মূল্যবান জিনিসপত্র, সোনাদানা যার যার মতো হেফাজত করে লুকিয়ে রাখলো। কিন্তু একদিন তারা হঠাৎ টের পেলো, মুসলমানরা পরিখার ভেতর দিকে পৌঁছে গেছে এবং তাদের ফৌজ মুসলমানদের হাতে বড় করুণাভাবে কচু কাটা হচ্ছে।

তারপরই মুসলমানরা শহরে ঢুকতে লাগলো এবং যেসব ফারসী ফৌজ শহরের ভেতরে ছিলো তারা পালাতে লাগলো। দেয়ালের ওপর যেসব তীরন্দায ও বর্শাধারী ছিলো তারা গায়েব হয়ে যেতে লাগলো। শহরে হুলস্থুল বেধে গেলো এবং এই খবরও ছড়িয়ে পড়লো, শাহেন শাহে ফারেস ইয়াযদগিরদ তার শাহী খান্দান নিয়ে রাতের বেলা পালিয়ে হালওয়ান চলে গেছে।

ঃ 'কোথায় শাহেনশাহ? যিনি আমাদেরকে বলতেন পারস্যের জন্য জানবাযী রাখো।

ঃ 'পুরান কোথায় গেলো? যে বলতো, সালতানাতে পারস্যের জন্য দেহের শেষ বিন্দু রক্তও বিসর্জন দেবে।'

ঃ 'শাহেনশার মাকে ডাকো, যে তার ছেলেকে বাঁচিয়ে নিয়ে গেছে।'

ঃ 'পালাও, সবাই পালাও। আমাদের জেনারেল আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে।'

জলুলায় কেয়ামতের দৃশ্যের অবতারণা হলো। জায়গীরদার, উমরা ও ব্যবসায়ীরাসহ সবাই নিজেদের জান, নিজেদের যুবতী মেয়ে ও যৌবনাতী স্ত্রীদের এবং শিশু সন্তানদের বাঁচানোর চিন্তায় দিক বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাতে লাগলো। নারী ও শিশুরা চিৎকার জুড়ে দিলো। পলায়নরত ফৌজের ঘোড়ার খুরধ্বনি কানে আরো তালা লাগিয়ে দিলো। কতক ফারসী নিজেদের বাচ্চা কাচ্চা দলে পিষে মেরে নিজেরা পালিয়ে গেলো। অনেকে আবার নিজেদের শাহেনশাহ ও তাদের জেনারেলদের তুলো ধুনা করছিলো। তাদের এ অবস্থা না হলে নিজেদের শাহেনশাহর বিরুদ্ধে তারা নিশ্চিত বিদ্রোহ করে বসতো। কিন্তু জান নিয়ে পালানোরও ফুরসত ছিলো না তখন।

কেয়ামতের এই বিভীষিকায় নিজেদের পৈতৃক প্রাণ ও পরিবার নিয়ে পালানো ছাড়া কেউ কিছু ভাবতে পারছিলো না। যাদের কাড়ি কাড়ি সোনা দানা, হীরা জওহারাত ও অলংকারাদি ছিলো তারা সেসবের কথা ভুলে গেলো এবং কোনরকম প্রাণ নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে গেলো। শহরের বাইরে তারা যে দৃশ্য দেখলো তা তাদের চলার শক্তিও যেন কেড়ে নিলো। শহরের বাইরে তখন বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পারসিকদের অসংখ্য রক্তাক্ত ও বঙ্গভৎস লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিলো।

মুজাহিদদের পুরো দল শহরে প্রবেশ করার আগেই শহর খালি হয়ে গেলো। তারপরও কিছু লোক রয়ে গেলো। এর মধ্যে শিশু, বৃদ্ধ, রোগী ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খেটে খাওয়া মজুর শ্রেণীর লোক ছিলো, যারা আমীর উমারাদের ঘরে নওকরী করে প্রতিদিনের জীবিকা অর্জন করতো। তাদের যুবতী ও বাড়ান্ত মেয়ে এবং তাদের স্ত্রীরাও রয়ে গিয়েছিলো।

ঘরগুলোর তল্লাশী শুরু হয়ে গেলো, অধিকাংশ ঘরই খালি ছিলো। কিছু কিছু ঘরে সোনা-রূপা ও হীরা জওহারাতের অগণিত থলে পাওয়া গেলো। কয়েক ঘরে ষোড়ষী কিছু মেয়ে পাওয়া গেলো। তাদের অভিভাবকরা পালানোর সময় তাদেরকে নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলো। তল্লাশীর সময় এরা নিজেরাই বেরিয়ে এলো।

কয়েকটি মেয়ে তাদের ইজ্জতের ওপর যাতে হাত না দেয়া হয় একথা বলে কাঁদতে শুরু করলো, কিন্তু অধিকাংশ মেয়েই মুজাহিদদের সামনে এসে দাঁড়ালো এবং তাদের ফৌজ ও দেশের পুরুষদের কাপুরুষ বলে গালিগালাজ করতে লাগলো। কেউ কেউ কাষ্ট হাসি হেসে উৎফুল্ল প্রকাশ করলো যে, তাদের কাপুরুষ স্বামীরা মরে গেছে। সাদ (রা) জলুল পৌঁছলে তাদের সবাইকে একত্রিত করা হলো।

ঃ 'আমি তোমাদের চেহারায় ভয়ের ছাপ দেখছি'– সাদ (রা) দোভাষীর মাধ্যমে মেয়েদের উদ্দেশ্যে বললেন - 'এবং আমি তোমাদের চোখের নিচে শুকিয়ে যাওয়া অশ্রুর রেখা দেখতে পাচ্ছি। তোমরা এখন সেই জাতির হেফাজতে আছো যারা নারীদের সম্মান ও অসুস্থদের শুশ্রূষা করতে জানে। তোমাদের সঙ্গে সে আচরণ করা হবে না বিজয়ী বাহিনী যা করে থাকে বিজিত এলাকার নারীদের সঙ্গে।'

ঃ 'হে আরবী সিপাহসালার!'– ছিপছিপে গড়নের টুকটুকে একটি মেয়ে নির্ভীক আওয়াজে বললো 'আমরা কাপুরুষদের স্ত্রী, বোন বা মেয়ে। এর চেয়ে বুযদিলি আর নির্লজ্জতা কি হতে পারে যে, তারা তাদের সন্তানদের ছেড়ে পালিয়ে গেছে! তোমাদের পূর্ণ অধিকার আছে আমাদের ওপর। তোমরা পাষণ্ড পুরুষের মতোই আমাদেরকে ব্যবহার করো। আমাদের পুরুষরা জানতে পারবে, মুসলমানরা তাদের নারীদের ইজ্জত নিয়ে খেলা করছে। মাটির খেলনা মনে করে আমাদের শরীর ভেঙে চুড়ে শেষ করে দাও। তোমরা বিজয়ী, তোমরা বীর বাহাদুর। তোমাদের দ্বারা আমরা লুণ্ঠিত হতে পারলেও নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করবো।'

ঃ খোদার কসম! শুনে নাও আজমের মেয়ে!'– সাদ (রা) বললেন– 'তোমার মতোই এক বাহাদুর আরবের সঙ্গে তোমাকে বিয়ে দিয়ে দেবো। আর তোমাদের কারো সাথেই সে আচরণ করা হবে না যা কোন বিজয়ী দল বিজিত শহরের নারীদের সঙ্গে করে থাকে। আমরা এই স্থূল দেহ না, দেহের ভেতরের স্পন্দিত হৃদয়টিকে মুঠোয় পুরে নিই। এটাই আমাদের ঈমান, বিশ্বাস এবং ধর্ম। আর এটা আসমানী তোহফাও, যা আমরা তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি।'

ঃ 'তারপর আমাদেরকে নিয়ে কি করা হবে?' –এক ষোড়ষী মেয়ে জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'তোমাদের সবাইকে আমাদের স্ত্রীদের কাছে সোপর্দ করবো'– সাদ (রা) বললেন- 'তারপর তোমাদেরকে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়া হবে। আমাদের আমীরুল মুমিনীন তোমাদেরকে দেখবেন এবং পত্রপাঠ তোমাদেরকে বিয়ে করানো হবে, তোমাদের কাউকে কারো রক্ষিতা করে রাখা হবে না।......... নাকি তোমাদেরকে তোমাদের ঐসব পুরুষের কাছে ফিরিয়ে দেয়াটা পছন্দ করবে। যারা তোমাদেরকে ফেলে রেখে পালিয়ে যাবে। আজ যেমন তারা তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফেলে রেখে চলে গেছে, কাল হয়তো আবার তোমাদেরকে রোমকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে।

ঃ 'না না'- সমস্বরে আর্তনাদ উঠলো–'এমন নিষ্ঠুরতা করো না। আমাদের পুরুষের কাছে আমরা আর ফিরে যেতে চাই না। ..... সূর্যদেবের সব গজব আর অভিশাপ পড়ুক ঐসব আত্মমর্যাদাহীন বুযদিল পুরুষদের ওপর .... তোমরা যদি আমাদের ধোঁকা না দিয়ে থাকো আমরা তোমাদের কাছেই থাকবো। .. তোমাদের ধর্ম যদি সত্য হয় তবে তার সত্যতার ব্যাপারে আমাদেরকে খুলে বলো।'

ঃ 'আমরা তো ইরাক ও পারস্যের কত শত শহর জয় করেছি'– সাদ (রা) বললেন– 'সেসব শহরের লোকেরা অন্যান্য শহরে আসা যাওয়া করে, তোমরা কি কখনো শোননি, মুসলমানরা কোন মেয়ের ইজ্জত নিয়ে ছিনি মিনি খেলে না!'

ঃ 'না' আমরা দুঃখিত, এমন কথা আমরা শুনিনি।'

সাদ (রা) হুকুম দিলেন, এদেরকে মহিলা ছাউনীতে রেখে আসো এবং মালে গনীমত নিয়ে যাওয়ার সময় এদেরকেও সম্মানের সঙ্গে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়া হবে।

❖ ❖ ❖

জলুলার মহলে মালেগনীমত একত্রিত করা হলো। সাদ (রা) সেখানে গেলেন। সোনা দানা ছাড়াও জলুলায় মালেগনীমত হিসাবে গৃহপালিত পশু উট, ঘোড়া, গরু, দুম্বা এত বেশি প্যাওয়া গিয়েছিলো যে, প্রত্যেক সওয়ার নয়টি করে ঘোড়া পেয়েছিলো, সাদ (রা) উমর (রা) এর নির্দেশ মতে মালেগনীমত বন্টন করে দিলেন। উমর (রা) কখনো এটা দেখেননি যে, খুমুস অর্থাৎ মালেগনীমতের এক-পঞ্চমাংশ যা বায়তুলমালের প্রাপ্য তা কম এসেছে না বেশি। তিনি শুধু দেখতেন ঘর থেকে শত শত ক্রোশ দূরের ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সব রণাঙ্গনে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গকারী যোদ্ধারা যেন এতটুকু অংশ পায় যার দ্বারা তাদের সন্তানরা নিজ পায়ে দাঁড়ানো পর্যন্ত কারো মুখাপেক্ষী না হয়।

বায়তুল মালের অংশ ও জলুলা থেকে উদ্ধারকৃত মেয়েদের যিয়াদ বিন আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়া হলো।

পথিমধ্যে যিয়াদের কাফেলা এমন এক জায়গায় ছাউনী ফেলল যার চারদিকে ধূ ধূ মরু। দূর দিগন্ত পর্যন্ত কোন জন মানুষের চিহ্ন নেই। কাফেলার সঙ্গে আহার পানীয়ের কোন অভাব ছিলো না। না হয় এই মরুর শত শত মাইল পাথর খুড়েও পানি পাওয়ার আশা ছিলো না। রাতের খাবারের পর যিয়াদ তার সঙ্গীদের নিয়ে গল্প করতে বসলেন এবং সবাই গল্পে মেতে উঠলো।

ঃ 'বন্ধুরা!'– যিয়াদ বললেন–'এটা সেই এলাকা যেখান থেকে কোন ব্যবসায়ী কাফেলার নির্বিঘ্নে যাওয়ার মতো সৌভাগ্য হয়নি। ডাকাতরা এসব কাফেলার সবকিছু লুটে নিতো। অথচ কতবারই তো মালেগনীমত নিয়ে কাফেলা এখান দিয়ে নির্বিঘ্নে চলে গেছে। এখন যদি ডাকাতরা আসে তাহলে তারা এতো এতো মাল পাবে যা স্বপ্নেও কখনো তা দেখার কল্পনা করেনি।'

ঃ 'হ্যাঁ' যিয়াদ!- যিয়াদের এক সঙ্গী বললো- 'ওরা এলে আমাদেরকে লুটে নিতে পারবে। কারণ তারা মোটামুটি এক ফৌজের রূপ করে আসে। তাদের মোকাবেলায় আমরা সংখ্যায় খুবই কম।'

ঃ 'এখন আর তারা আসবে না'– এক প্রৌঢ় মুজাহিদ বললো- কেন জানো?.... আরবের এসব লোক আগে বড় কষ্ট করে গায়ে খেটে রুটি রোজগার করতো, তারপর তাদের উপোস থাকতে হতো। তারপর তারা ইয়ামান, সিরিয়া ও আরবদের বাণিজ্য কাফেলা লুটতে শুরু করলো। দীর্ঘ দিনের কষ্ট আর পরিশ্রম ছাড়া অল্প পরিশ্রমেই তাদের পরিবারের সবার পেট ভরাতে পারতো খুব ভালো করে। সিরিয়া ও পারস্য থেকে যখন মালে গনীমত পৌছতে লাগলো তখন থেকে এ অঞ্চলের ডাকাত কমে আসছে। তোমরা হয়তো জানো না, অনেক ডাকাত মুসলমান হয়ে মুজাহিদদের দলে শামিল হয়ে সিরিয়া ও পারস্যের রণাঙ্গনে যুদ্ধের জন্য চলে গিয়েছিলো। সততা ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে তারা প্রভূত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করে। যা দিয়ে তরা ভদ্রস্থ ও স্বচ্ছন্দ জীবনে ফিরে যায়।'

ঃ 'তোমার একথা মানতে পারলাম না'– আরেক মুজাহিদ বললো- 'একবার যারা ডাকাত হয় সারা জীবনই তারা এ কাজ করে যায়। জিহাদে অংশগ্রহণ তো অকল্পনীয় ব্যাপার।'

ঃ 'না আমার বন্ধু!'– প্রৌঢ় মুজাহিদ বললো– 'ডাকুও মুজাহিদ হতে পারে। এই যে আমি এক মুজাহিদ আগে ডাকাতি করে বেড়াতাম। আমার গোত্রের লোকদের পেশাই ছিলো ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানী। এখন আমার গোত্রে একজনও ডাকাত নেই। সবাই ময়দানে লড়ছে .... উমর (রা) যখন খলীফা হলেন দস্যুদের রাজত্ব খতম হয়ে গেলো, তিনি সারা আরবে এমন কঠিন প্রশাসন কায়েম করলেন যে, ডাকাত ধরতে পারলেই হাত পা কেটে দেয়া হতো। অনেক ডাকাতই মুসলমান হয়ে গেলো। আমিও হলাম। তারপর যুদ্ধে এসে দেখলাম, একজন সালার সদলে গণীমতের যতটুকু অংশ পায় আমার মতো পাপিষ্ঠরাও ততটুকুই পায়, যার পূর্ব জীবনের সঞ্চয়– অন্ধকার ছাড়া কিছুই ছিলো না। তারপর আর অসহায় ব্যবসায়ীদের কাফেলা ছিনতাই করার প্রয়োজন কি? মানুষ যখন তার প্রাপ্য অধিকারটুকু পেয়ে যায় তখন কেন সে ডাকাতি আর অবৈধ রুটি রুজির পথ বেছে নেবে?'

মরুর যেসব অঞ্চল দস্যুকবলিত ছিলো এসব অঞ্চলে জিহাদের সুবাতাস বইবার পর থেকে দস্যুমুক্ত হয়ে যায়। মানুষকে যখন জীবনের পবিত্র লক্ষ্য ও উঁচু কোন পথের সন্ধান দেয়া হয় তখন সে নিজেই পাপের পথ ছেড়ে সরল পথ অবলম্বন করে। যে কোন রাজ্যের, যেকোন দেশের শাসকরা যদি প্রজাদেরকে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে শুরু করে এবং তাদেরকে লোভনীয় সব পুরস্কারেও ভূষিত করে তারা কখনো ঈমানের আলোয় আলোকিত হবে না, পাপ ও অন্ধকারের জীবন ছাড়তে পারবে না। শাসক ও নেতারা যদি ব্যক্তি জীবনে ও সমাজজীবনে পবিত্র জীবন চরিত্রের অধিকারী হয় এবং লোকদের এক মহান লক্ষ্যের সন্ধান দেয় সেখানে আর মধুর সুরের ওয়াজ আর জালাময়ী বক্তৃতার প্রয়োজন হয় না। তারা নিজেরাই অনুসরণীয় এক বলিষ্ঠ জাতি সত্ত্বায় পরিণত হয়। তারপর তাদের কদম সফলতা আর অগ্রসরতার পথ আপনিই খুঁজে নেয়। পেছন দিকে আর ফিরে যায় না।'

কাফেলা যখন মদীনায় পৌঁছলো সেখানেও জলুলার মতো জয়ধ্বনি আকাশ -বাতাস মুখরিত করে তুললো। হযরত উমর (রা) স্বয়ং এগিয়ে গিয়ে যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে সম্বর্ধনা দিলেন এবং কাফেলার রুখ মসজিদে নববীর দিকে করে দিলেন। সেখানে পৌঁছার পর সমস্ত মাল মসজিদে নববীর চাতালে রাখা হলো।

মাদায়েন থেকে যখন মালেগনীমত এসেছিলো তখন যেমন উমর (রা)সহ মদীনার প্রত্যেকের চোখই বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছিলো, বিস্ময়ে সবার মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিলো। এখন জলুলা থেকে আগত মালেগনীমত দেখার পরও সবার একই প্রতিক্রিয়া হলো। তারা যখন জলুলা থেকে উদ্ধার করা ফারসী মেয়েদের দেখলো তখন চোখের পলক পর্যন্ত ফেলতে ভুলে গেলো। তারা নিশ্চিত হলো পারস্য শুধু অর্থ-সম্পদের ভাণ্ডারেই সমৃদ্ধ নয়। রূপের ভাণ্ডারেও পারস্য দুনিয়ার সেরা। এদের মধ্যে শাহী খান্দানেরও কিছু মেয়ে ছিলো, যাদের দেখে সৃষ্টিকুলের এমন কেউ নেই, যে মহান স্রষ্টার সৃষ্টির নৈপুণ্যের কথা স্বীকার করবে না।

উমর (রা) এসব মেয়েদের সেখানে পাঠিয়ে দিলেন যেখানে উদ্ধারকৃত মেয়েদের তত্ত্বাবধান করা হয়।

এশার নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিলো। আযান হলো, উমর (রা)-এর ইমামতিতে এশার নামায আদায় করা হলো। নামাযের পর মালেগনীমতের বাক্সগুলো খোলা হলো। রাতের চেরাগদান ও মশালের কম্পিত আলো নানান সাইজের হীরক খণ্ড ও দুর্লভ পাথরে পড়ে তা থেকে লাল, নীল সবুজ আলোর বিচ্ছুরণ ঘটছিলো। সোনা রূপার স্তূপ পাশেই রাখা ছিলো। কিন্তু এসবের সামনে স্বর্ণালী আর রূপালী জ্যোতির বিচ্ছুরণ ম্লান মনে হচ্ছিলো। চোখ ধাঁধানো এই আলোর দিকে কেউ বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারছিলো না। এসব ছাড়া বহু মূল্যের অগণিত জিনিসের স্তূপ মসজিদে নববীর অনেকখানি জায়গা দখল করে রেখেছিলো।

খোদার অফুরন্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করে উমর (রা) প্রায় কেঁদে ফেললেন।

ঃ'আমীরুল মুমিনীন!'– আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) তখন বললেন– এতো কৃতজ্ঞতা আর চরম আনন্দের সময় আর আপনার চোখে পানি!'

ঃ 'হ্যাঁ ইবনে আউফ'– উমর (রা) বললেন– 'আমি অবশ্যই এই আনন্দ ও নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করছি। সম্পদের এই সমুদ্র দেখে আমার চোখে পানি আসেনি বা এজন্যও নয় যে, এগুলো আমাকে বন্টন করে দিতে হবে। বরং যে জাতিকে আল্লাহ্ সম্পদে সয়লাব করে দেন সে জাতির কোমল মন ধীরে ধীরে হিংসা-বিদ্বেষে পাথর হয়ে যায়। মনে রেখো ইবনে আউফ! যে জাতির মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ চর্চিত হয় সে জাতি প্রকৃত সম্মানের জীবন থেকে বঞ্চিত থাকে। সম্পদ মানুষকে ভোগ ও উগ্র সুখের জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং আমল ও জিহাদের শক্তিতে মরচে ধরিয়ে দেয়। একারণেই ভ্রাতৃত্ববোধ, পরমত সহিষ্ণুতা ও পরের দুঃখে কাতর হওয়ার অনুভূতি মরে যায়। এক ঘেয়ে সুখ ও কষ্টহীন আরামের জীবন মানুষের মধ্যে দুর্বলতা ও কপটতার জন্ম দেয়। জন্ম দেয় অন্যকে অবিশ্বাস করার প্রবণতা। আর মানুষ তো মানুষের দুশমন হয় এই চিন্তা থেকেই যে, তার কাছে আমার চেয়ে বেশি, আমার কাছে তার চেয়ে কম। ..... খোদার কসম! সকালের আলো ফোটার আগেই আমার চোখের সামনে থেকে সম্পদের এই স্তূপ দূর করে দিতে চাই।'

ঃ 'এগুলো বায়তুল মালে রেখে দেয়া হোক আমীরুল মুমিনীন!'– কেউ পরামর্শ দিলো। আরো কয়েকজন একথার সমর্থন জানালো।

ঃ 'না'– উমর (রা) দৃঢ় গলায় বললেন– 'বায়তুল মালের ছাদের নিচে রাখার আগে আমি এই মাল বন্টন করে দিতে চাই।'

সেখানে উপস্থিত সাহাবাগণ চাচ্ছিলেন না তাড়াহুড়া করে কিছু করা হোক। এতে কেউ তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা ছিলো। তারা উমর (রা)কে রাজী করালেন, বন্টন সকালে করাই উপযুক্ত সময়।

ঃ 'হ্যাঁ আমীরুল মুমিনীন!'– এক সাহাবী বললেন– 'এটা বণ্টনের উপযুক্ত সময় নয়। আমরা তো এখনো রণাঙ্গনের কাঙ্ক্ষিত বিবরণই শুনিনি। আমাদের মুজাহিদরা এত শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে পর পর দুটি শহর কি করে জয় করলো তা শোনাই কি এখন সবচেয়ে উপযুক্ত বিষয় নয়?'

উমর (রা) যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে জলুলা বিজয়ের বিস্তারিত বর্ণনা শুনেছিলেন। এসব কথা তো তিনি নিজেই সবাইকে শোনাতে পারতেন। কিন্তু তিনি যিয়াদকেই শোনাতে বললেন। যিয়াদ উমর (রা) এর সামনে এভাবে বক্তৃতার মতো করে বলতে ঘাবড়াচ্ছিলেন। উমর (রা) তাকে আবার বললেন। যিয়াদ যেহেতু নিজেই লড়াইয়ে ছিলেন তাই তিনিই খুঁটিনাটি সব বলতে পারতেন। তাই উমর (রা) তাকে আবারো অভয় দিলে তিনি কিছুটা সাহস পেলেন।

ঃ 'আমীরুল মুমিনীন!'– 'আমি যদি কারো সামনে কিছু বলতে ভয় পাই সে আপনাকেই পাই। ভয় পাই এজন্য যে, আপনার পবিত্র অভিব্যক্তি ও সমুচ্চ মর্যাদার প্রভাব না জানি আমার যবান স্থবির করে দেয়। তারপর ভাবলাম আপনাকে যেহেতু শোনাতে পেরেছি অন্যদের কেন শোনাতে পারবো না।'

এই অগাধ শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় ছাড়াও যিয়াদের মধ্যে একটা সংকোচ কাজ করছিলো। আরবরা সাধারণ কথাবার্তায় কাব্যভাষায় কথা বলতো। উপমা উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করতে খুবই স্বাচ্ছন্দবোধ করতো। অবশ্য শিক্ষিত লোক ছাড়া অন্যরা এভাষায় কথা বলতে পারঙ্গম ছিলো না। কাব্যভাষায় কথা বলার সময় ছন্দের ব্যবহার প্রয়োগ তাদের জন্য অনায়াসলব্ধ ছিলো। সাধারণ ভঙ্গিতে কথা বললে তাকে রুক্ষ ও রসকষহীন মনে করা হতো।

যিয়াদ একারণেই সংকোচবোধ করছিলেন। কারণ সেখানে এমন অনেক সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন যাদের কথার ভঙ্গি ও ধরন অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও মনোলোভা ছিলো। উমর (রা) তো এ বিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। যিয়াদ যুদ্ধের ঘটনা ও জলুলা অবরোধের বিস্তারিত বলতে শুরু করলেন। তার বলার ভাষায় এমন অলংকার ও শব্দ চয়নের মাধুর্যতা ছিলো যে, উমর (রা) তার অজান্তেই বলে ফেললেন ঃ

'খোদার কসম! এ এক অসাধারণ বাককুশলী, ভাষার এক জাদুকর।'

ঃ 'আমীরুল মুমিনীন'– যিয়াদ উমর (রা) এর মতো এত বড় বক্তার প্রশংসা পেয়ে সাহসী হয়ে উঠলেন এবং বললেন– 'আমাদের মুজাহিদরা ময়দানে যে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছে, তা আমার ভাষায় নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।'

যিয়াদ পুরো ঘটনা শুনিয়ে দিলেন। এটাও শোনালেন, ক'কা ইবনে আমর পারসিকদের পিছু ধাওয়া করে হালওয়ান পর্যন্ত পৌঁছেছেন।

এরপর লোকজনের ভীড় আস্তে আস্তে কমে গেলো। মালেগনীমত সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হলো আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) ও যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)কে। ফজর নামাযের পর উমর (রা) সব বণ্টন করে দিলেন।

❖ ❖ ❖

মদীনা থেকে মাদায়েন বা জলুলায় পয়গাম পৌঁছা বেশ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার ছিলো। সাদ (রা) পয়গামের মাধ্যমে উমর (রা) এর কাছে জলুলা থেকে অগ্রসর হয়ে হালওয়ান অবরোধের অনুমতি চেয়েছিলেন। এক মাসেও সেই পয়গামের জবাব পৌঁছেনি। উমর (রা) এর অনুমতি ছাড়া সাদ (রা) এক কদমও নড়তে রাজী ছিলেন না, কিন্তু সেখানকার অবস্থা এমন আকার ধারণ করলো যে, উমর (রা) এর পয়গাম পৌঁছা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে কয়েক হাজার মুজাহিদের জীবন চলে যাওয়ারই আশংকা ছিলো।

ক'কা ও তার বাহিনীর অসাধারণ বীরত্বই এই আশংকার সূত্রপাত করেছিলো। খুব সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে পারসিকদের ধাওয়া করতে করতে ক'কা হালওয়ান পৌঁছে ছিলেন। এই সামান্য সৈন্যবহর নিয়ে হালওয়ানের মতো শহর অবরোধ করা সম্ভব ছিলো না। কিন্তু ক'কার ফিরে আসারও ইচ্ছা ছিলো না, হালওয়ান থেকে তিন মাইল দূরে কসরে শিরীর' কাছে তিনি ছাউনি ফেললেন।

সাদ (রা)কে যখন এই সংবাদ দেয়া হলো তিনি তখন ক'কাকে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া সমীচীন মনে করলেন না। এতে একে তো ক'কার বাহিনীর মনোবল ভেঙে যেতো। দ্বিতীয়তঃ তারা ফিরে এলে পারসিকরা একে পিছু হটা মনে করতো এবং ভাবতো, সৈন্যসংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে মুসলমানরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। এটা ভেবে তারা জলুলায় জবাবী হামলাও করতে পারতো।

সালারদের সঙ্গে পরামর্শ করে সাদ (রা) ক'কা ইবনে আমরকে সেনা সাহায্য পাঠিয়ে দিলেন।

ইয়াযদগিরদ তখন ছিলো হালওয়ানে। জলুলার পরিণাম সম্পর্কে তখনো ইয়াযদগিরদ কোন খবর পায়নি। শেষ দিন লড়াই শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর জলুলা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো। ফৌজের অবস্থা তার কাছে টালমাটাল মনে হচ্ছিলো। তবুও তার মনে টিপটিপ করে প্রত্যাশার বাতি জ্বলছিলো– এই ফৌজই মুসলমানদের পিছু হটিয়ে দেবে।

জলুলা থেকে ফিরে আসার পর ইয়াযদগিরদের মানসিক অবস্থা বিগড়ে গিয়েছিলো। কখনো সে রাগে ক্রোধে ফেটে পড়তো, কখনো কথা বলতে শুরু করলে বলেই যেতো। শ্রোতারা তাদের শাহেনশার পাগলের প্রলাপ শোনাটাও নিজেদের ফরজকর্ম মনে করতো। কখনো কখনো একেবারে নির্বাক হয়ে যেতো, ছাদের ওপরের ঝুলন্ত টিকটিকির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো। যেন টিকটিকির গতিবিধ লক্ষ্য করাই তার শাহেনশাহীর প্রধান কর্তব্য। যখন সে সিংহাসনে বসেছিলো তখন মাত্র ষোল বছরের কচি যুবক। এখন প্রায় একুশ বছরের শক্ত সমর্থ পুরুষ। এখন আর তাকে অপরিণত বয়স্ক ও অনভিজ্ঞ বলা যেতো না।

হালওয়ানের মহলে ইয়াযদগিরদ উদাসীনতার প্রতিমূর্তি হয়ে বসেছিলো। তার সামনে অর্ধেক খালি হয়ে যাওয়া মদের পাত্র ছিলো। তার মদ পানের ধরন দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো, সে আর পূর্ণ চেতনে নেই। তার জীবনের এত বড় ঘটনা মদের বন্যায় ভাসিয়ে দিতে চাইছিলো। বাস্তবের মুখোমুখি হতে সে ভয় পাচ্ছিলো। তার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার ছিলো না তার মা ও পুরানের। বলা ও শোনার মতো তার জীবনে আর কোন কথা ছিলো না। তার মার শুধু এখন একটাই চাওয়ার ছিলো তার বেটা বেঁচে থাকুক। মাদায়েনের পর জলুলাই ছিলো সর্বশেষ শক্তিশালী দুর্গ। তাও হাত থেকে ছুটে যাচ্ছিলো।

বাইরে থেকে কোন মৃদুপদ শব্দ এলেও ইয়াযদগিরদ চমকে উঠে সেদিকে তাকাতো। জলুলার পরিণাম শোনাই তার একমাত্র প্রতীক্ষার বিষয় ছিলো। আরেক বার সে মদের বোতল উঠিয়ে পাত্রে মদ ঢালতে লাগলো। পুরানের আর সহ্য হলো না। এক টানে তার হাত থেকে মদের বোতলটি নিয়ে নিলো।

ঃ 'আর না ইযদী!'– পুরান বললো–'এটা মাতলামির সময় নয়। সজাগ থাকার সময় রে ভাই সজাগ থাকার সময়।'

ইয়াযদগিরদ পুরানের দিকে ঘোলা দৃষ্টিতে তাকালো। তার চোখে ছিলো রাজ্যের হতাশা আর মাতলামি। পুরান মদের বোতলটি নামিয়ে রাখলো।

ঃ 'মিথ্যা আশা দিয়ে আমাকে আর কতদিন সজাগ রাখবে, পুরান'– ইয়াযদগিরদ পরাজিত গলায় বললো–'যদি এই আশায় বসে থাকো যে, জলুলা থেকে কোন সুসংবাদ আসবে তাহলে এটা তোমার উচ্চাশা ছাড়া আর কিছুই হবে না।

এসময় দারোয়ান ভেতরে এলো, ইয়াযদগিরদ তার দিকে এমন করে তাকালো, যেন মৃত্যুর ফেরেশতা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

ঃ জেনারেল ফায়রুযান এসেছেন।'

ঃ 'ভেতরে পাঠিয়ে দাও'–ইয়াযদগিরদ জড়ানো গলায় বললো।

দারোয়ান উল্টো পায়ে বের হয়ে গেলো।

ফায়রুযান ভেতরে এসে ঢুকলো। শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করতে গিয়ে হাঁটু ভেঙে ফরশের ওপর বসে পড়ে মাথা নোয়াতে গেলো।

ঃ 'সোজা হয়ে দাঁড়াও'- ইয়াযদগিরদের গলা দিয়ে গর গর শব্দ বেরোলো– 'কি খবর নিয়ে এসেছো? তোমার চেহারা বলছে ভালো খবর আনোনি।'

ফায়রুযান যে খবর মুখে উচ্চারণ করতে ভয় পাচ্ছিলো তা তার চোখের অশ্রুই বলে দিলো।

ঃ মেহরান কোথায়?'

ঃ 'খানকীনের কাছে মারা গেছে'– ফায়রুযান ভেজা আওয়াজে বললো- 'আরবী সওয়ার আমাদের পেছন পেছন আসছিলো।'

ঃ 'আর তুমি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছো!'–ইয়াযদগিরদ উন্মাদের মতো বললো।

ঃ 'শাহেনশাহে ফারেস!'– ফায়রুযান নির্ভীক গলায় বললো– 'আপনি আমাকে এমন একটি ঘটনার কথা বলুন যে, একা একা একজন বা দু'জন জেনারেল মিলে কোন যুদ্ধ জয় করেছে। যদি বলতে পারেন আমার মাথা আপনার তলোয়ারের নিচে দিয়ে দেবো। আপনার তলোয়ার দিয়ে আমার দেহ থেকে ধর পৃথক করে দেবেন। আজ আমি এমন কথা বলতে চাই যা শাহী দরবারে এজন্য বলতো না কেউ যে, শাহেনশার ক্রোধের আগুন তাকে জ্বালিয়ে দেবে।'

ঃ আর এজন্যই আমরা অধপতনে যাচ্ছি'– ইয়াযদগিরদ এবার সজাগ আওয়াজে বললো–'আমি তোমাদের সবাইকে অনুমতি দিয়ে রেখেছিলাম তোমরা যা বলতে চাও তা নির্দ্বিধায় বলবে। আমি সবসময় সর্বাবস্থায় সত্য শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। এটা তোমাদের বুযদিলি আর বদ নিয়তির প্রকাশ ছিলো যে, তোমরা তোষামোদের ভাষা ছাড়া কথা বলতে পারতে না। এজন্য তোমরা আমাকে বাস্তব কথা কখনো বলোনি ..... বলো এখন। যতো তিক্ত আর হতাশ হওয়ার মতো কথাই হোক না বলো। আমি সব শোনবো এবং মেনেও নেবো। জলদি বলো।'

ঃ 'শাহেনশাহে মুআযযম!'– ফায়রুযান বললো–'সবচেয়ে প্রথম ও খারাপ খবর হলো আমরা জলুলায় হেরে গেছি। আমাদের এক লাখের কিছু বেশি ফৌজ মারা গেছে।'

ঃ 'মুসলমানরা কি অনেক সেনাসাহায্য পেয়েছিলো?'– ইয়াযদগিরদ জিজ্ঞেস করলো– আরবরা কি মিনজানীক দিয়ে শহরের ওপর পাথর বর্ষণ করেছিলো?'

ঃ 'না শাহেনশাহ!'– ফায়রুযান বললো– 'প্রথম দিনের মতোই আরবদের সংখ্যা দশ বার হাজার ছিলো। তারা এবার মিনজানীকও ব্যবহার করেনি।'

ঃ তারপর কি হলো?'

ঃ 'শাহেনশাহ! শেষ হামলা আমরা পুরো শক্তি দিয়ে করেছিলাম। আরবদের চেয়ে আমরা দশগুণ বেশি ছিলাম। আমাদের দশজনের ভাগে মাত্র একজন আরব ছিলো। এসব তো আপনি জানেনেই। কিন্তু আমাদের ফৌজ যখন পরিখার রাস্তা দিয়ে বের হলো আরবরা সেই পরিখার পথগুলো দখল করে নিলো। এর পরই আরবদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হলো পরিখা তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। এটা শুনতেই আমাদের ফৌজ সামনে না গিয়ে এবং আরবদের ওপর হামলা করার পরিবর্তে পরিখার ওপারে যাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো।'

ঃ 'আমি বুঝে গেছি'– ইয়াযদগিরদ এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো– 'ঐ দুর্ভাগাদের মনে আরবদের যে ভীতি বাসা বেঁধে ছিলো আমরা তা তাড়াতে পারিনি।'

ঃ 'তারপর যা হলো তা আমাদের ফৌজেরগণ হত্যা'–ফায়রুযান বললো– আমাদের ফৌজ অন্ধের মতো পিছু হটতে লাগলো, অসংখ্য সওয়ার ঘোড়াসহ পরিখায় পড়ে ঘোড়ার নিচে চাপা পড়েছে। এ অবস্থায় আরবদের মনোবল তো বাড়বেই। সে ছিলো এক কেয়ামতের বিভীষিকা। ফৌজ দিক বিদিক ছুটছিলো।

আমাদের গলা ফাটানো চিৎকার করে সাহস জোগানো, নির্দেশ দেয়া সব ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিলো। ফৌজ যখন দেখলো পরিখার ওপারে যাওয়া সম্ভব নয়। বিক্ষিপ্ত হয়ে শহরের বাইরে দিয়েই পালাতে লাগলো। আরবরা পিছু ধাওয়া করে ছুটলো এবং আমাদের আরো ক্ষতির সম্মুখীন করলো।

ঃ 'তোমার কি আরো কিছু বলার আছে'– ইয়াযদগিরদ জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'হ্যাঁ শাহেনশাহ'– ফায়রুযান জবাব দিলো– 'শেষের দিকে জলুলার লোকেরা প্রায় বিদ্রোহ করতে বসেছিলো। জলুলা এখন পুরো খালি। তারা যে গালি গালাজ করেছে তা আপনাকে বলতে পারবো না আমি, সংক্ষেপে এতটুকু শুনুন, লোকদের বক্তব্য ছিলো, আমাদের জান কুরবান করার সবক দিয়ে বাদশাহ নিজেই যে পালিয়ে গেলো। শাহেনশাহে ফারেস! এসব লোক থেকে আমাদের এখন সামান্যতম সহযোগিতা পাওয়ার আশা পোষণ করা উচিত হবে না।'

ফায়রুযান নির্ভয়ে ইয়াযদগিরদকে জলুলার লোকদের বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া জানিয়ে গেলো এবং শেষে জানালো, লোকজন এখন ফৌজকে ঘৃণা করে। ইয়াযদগিরদ নীরবে সব শুনে গেলো।

ঃ 'আমাদের কাছে কি কোন মুসলমান যুদ্ধবন্দী আছে?'– ইয়াযদগিরদ জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'মনে হয় তিনজন আছে'–ফায়রুযান বললো– 'শাহেনশাহ! বিজয়ী দলের কোন সৈন্য সহজে কি বন্দী হয়ে হাতে আসে? আরবের এসব মুসলমান বন্দী হওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো মনে করে। এই তিন বন্দী যখমী হয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছিলো। উঠে দাঁড়াতেও অক্ষম ছিলো। আমাদের এক ফৌজী অফিসার ওদেরকে হত্যার নির্দেশ দিয়ে দিলে দুই ব্যবসায়ী ওদেরকে বাঁচিয়ে দিলো। তারা বললো, ওদেরকে সুস্থ করে নিজেদের কাছে শৃংখলিত দাস করে রাখবে। তারা ভাগ করে একজন এক বন্দীকে আরেকজন দুই বন্দীকে নিয়ে গেলো। এটা তখনকার কথা যখন আমরা মাদায়েন থেকে বের হয়েছিলাম। আমার মনে হয় তিনজন এত দিনে ঠিক হয়ে গেছে।'

ঃ 'ওদেরকে কি পাওয়া যাবে?'– ইয়াযদগিরদ জিজ্ঞেস করলো– 'আমি ওদেরকে দেখতে চাই।'

ঃ'হ্যাঁ শাহেনশাহ!'– ফায়রুযান বললো- 'ওরা হালওয়ানে থাকলে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো।'

ইয়াযদগিরদ ফায়রুযানকে বিদায় করার আগে বললো, সে যেন বিশ্রাম নেয় এবং সেই দুই ব্যবসায়ীকে দরবারে পাঠিয়ে দেয় যাদের কাছে তিন মুসলমান গোলাম আছে।

ঃ 'শাহেনশাহে ফারেস!'– ফায়রুযান যাওয়ার আগে বললো– 'আরবদের ছোট একটি বাহিনী কসরে শিরীর কাছে পৌঁছে গেছে। মনে হচ্ছে এরা এক্ষুণি ফিরে যাবে না।'

ঃ 'ছোট বাহিনীর ব্যবস্থা করা যাবে।'

❖ ❖ ❖

সেদিন রাতের ঘটনা, ইয়াযদগিরদ রাতের খাবারের পর নিজেকে মদের দরিয়ায় ভাসাচ্ছিলো। ইয়াযদগিরদ একা হলেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতো। এজন্য তার সঙ্গে তার মা আর পুরান থাকতো। তাকে একা রেখে কেউ যেতো না। যেসব অপরূপা সুন্দরীরা রাত-দিন ইয়াযদগিরদকে ঘিরে রাখতো, তাদেরকে মাদায়েন ছেড়ে এসেছিলো। মুসলমানদের কাছে গিয়ে তারা এতদিনে মর্যাদার জীবন ফিরে পেয়েছে। এখন ইয়াযদগিরদের জীবনে নারী বলতে ছিলো শুধু তার মা নাওরীন আর পুরান।

কিছুক্ষণ আগে তাকে সংবাদ দেয়া হয়েছিলো, তিন মুসলমান গোলামকে পাওয়া গেছে। ওদেরকে এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে। এই বন্দী গোলামদের কেন এখানে আনা হচ্ছে নাওরীন ও পুরান একথা তাকে জিজ্ঞেস করলো। তারা ভাবছিলো, এই তিনজনকে নিজের হাতে হত্যা করে মনের দুঃখ কিছুটা হলেও হাল্কা করবে।

ঃ 'আমি ওদেরকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই'– ইয়াযদগিরদ তার মা ও পুরানকে বললো- 'আমি ভেবেছিলাম, জাদু আর সম্মোহন শক্তি ইহুদীদের কাছেই আছে। সেটা আমার জানা হয়ে গেছে। সেই ইহুদী পাদ্রী নদীর তীরে জাদু শুরু করেছিলো এবং নিজেই তার সঙ্গীসহ কুমীরের খোরাক বনে গেছে। এর দ্বারা বোঝা যায় ঐ মুসলমানদের কাছে কোন জাদু আছে, যা ইহুদীদের জাদুর চেয়ে শক্তিশালী। এই জাদু সম্পর্কে তাদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই।'

নওরীন ও পুরানের ইয়াযদগিরদকে নিয়ে যে দুশ্চিন্তায় ছিলো তা এখন চরম আকার ধারণ করলো। তারা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেলো, ইয়াযদগিরদের মাথা একেবারেই বিগড়ে গেছে। কখনো কখনো তারা নিজেরাও চরম পেরেশান হয়ে ভাবতো, মাত্র কয়েক হাজার মুসলমান কি করে এক লাখেরও অধিক ফৌজ ধ্বংস করে দিতে পারে। একজন কি করে দশজনকে রক্তের সাগরে ভাসিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ইয়াযদগিরদ যখন এটা জাদুর পরিণাম বলে ধারণা প্রকাশ করলো তখন এই দুই নারীর দুশ্চিন্তা তাদের মাথাই বিগড়ে দিতে লাগলো। তারা নিশ্চিত হলো, একের পর এক পরাজয় ইয়াযদগিরদের চিন্তাশক্তির ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছে যে, সে পাগল হওয়ার পথে!

মানুষের এটা চিরন্তন স্বভাব যে, যখন সে কোন কাজে ব্যর্থ হয় তখন আসল কারণ বের না করে কাল্পনিক বিষয়ের পেছনে ছুটতে থাকে। পৃথিবীর যত রাজা বাদশাই এই পথে গিয়েছে এবং বাস্তবতা এড়িয়ে গেছে তারা কোন রাজ্যই ধরে রাখতে পারেনি।

কাল্পনিক বিষয়ের পেছনে ছু'টা অগ্নিপূজারীদের এক ব্যাপক ব্যাধি ছিলো। রুস্তম নিজেকে গণক বিদ্যায় পারদর্শী মনে করতো। তার ভবিষ্যদ্বাণী ছিলো, সালতানাতে ফারেসের পরিণাম বড় খারাপ হবে। তার ভবিষ্যদ্বাণী তাকে এতো দুর্বল করে দিয়েছিলো যে, কাদিসিয়ার ময়দানে সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে ভয় পাচ্ছিলো। শেষ পর্যন্ত এই ভয়ই তাকে মৃত্যুর কোলে নিয়ে গেলো।

পারসিকরা সব কাজের আগে কুষ্ঠি যাচাই করতে অভ্যস্ত ছিলো।

ইয়াযদগিরদের মা এবং পুরানও জাদু এবং কুষ্ঠির প্রতি বিশ্বাস রাখতো। কিন্তু ইয়াযদগিরদকে দেখে এই ভেবে তাদের বুক ফেটে যেতো যে, ইয়াযদগিরদ বাস্তবতার মুখোমুখি না হয়ে বিভ্রান্তির কবলে পড়ে আছে। তারা তাকে বড় কিছু বলতেও পারতো না। কারণ ইয়াযদগিরদ এতে খুব রেগে যেতো।

কিছুক্ষণ পর খবর এলো সেই তিন মুসলমান গোলাম এসে গেছে। ইয়াযদগিরদ তাদেরকে ভেতরে আসতে বললো। তিনজনেই ভেতরে এলো। কেউ শাহেনশাহে ফারেসের সম্মানে একটুও মাথানত করলো না।

ঃ 'তোমরা কি জানো না শাহেনশাহে ফারেসের দরবারে এসেছো?'– ইয়াযদগিরদ জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'আমরা জানি'।

ঃ 'তাহলে কি জানো না বাদশার দরবারে এলে মাথানত করতে হয়'– ইয়াযদগিরদ বললো- 'তোমরা সম্ভবতঃ ভুলে গেছো, এখানে তোমরা গোলাম।'

ঃ 'আমরা শুধু আল্লাহর দরবারেই মাথানত করি, আর আমাদের কোন রাজা বাদশাহও নেই।'

ঃ 'আমাদেরকে এখানে জোরজবরদস্তি করে বন্দী করা হয়েছে'– এক বন্দী বললো, আমরা কারো গোলাম নই। শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) এর গোলাম আমরা।'

ঃ 'তোমরা মরুর নির্বোধ জাতি'– ইয়াযদগিরদ বললো– বাদশাহী কি জিনিস তোমরা তার কি জানবে?

ঃ 'ইযদী!'– নওরীন বিরক্ত হয়ে বললো- 'কেন নিজের সময় নষ্ট করছো। ওদেরকে যা জিজ্ঞেস করার তাই জিজ্ঞেস করো।'

তিনজনকে ইয়াযদগিরদ তার সামনে গালিচার ওপর বসালো।

ঃ 'তোমরা ভুলে যাও, আমি বাদশাহ আর তোমরা গোলাম'– ইয়াযদগিরদ বললো– 'আমি তোমাদের থেকে একটি কথা জানতে চাই। যদি সত্যকথা বলো, তিনজনকেই আমি মুক্ত করে দেবো এবং তোমরা তোমাদের ফৌজ ফিরে যাবে।

ঃ আমাদের কাছ থেকে মিথ্যার আশংকা করবেন না'– এক বন্দী বললো– 'আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো আমরা মিথ্যা বলি না।'

ঃ 'তোমাদের মধ্যে কি বিশেষ গোপন কোন শক্তি আছে'?'– ইয়াযদগিরদ বললো- 'আমার কথার অর্থ হলো, তোমাদের সালারদের কাছে নিশ্চয় এমন কোন জাদু আছে যার দ্বারা তোমরা এত অল্প সংখ্যক হয়েও এক লাখের অধিক সৈন্যের ওপর বিজয়ী হতে পারো।'

তিন বন্দী একে অপরের দিকে হতভম্ব হয়ে তাকাতে লাগলো।

ঃ 'হ্যাঁ শাহেনশাহ!'–এক বন্দী বললো- 'আমরা আমাদের একটি শক্তির কথা বলেছি আপনাকে, সেটা হলো আমরা সত্য বলতে পছন্দ করি।'

ঃ 'আমাদের ধর্ম সত্যধর্ম'– আরেক বন্দী বললো– 'এই সত্যধর্ম আপনার কাছে আনা হয়েছিলো। কিন্তু আপনি সত্য থেকে পালিয়েছেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিন। দেখবেন আপনার মধ্যেও জীবন্ত শক্তি অর্জিত হয়েছে।'

ঃ 'তোমাদের এই একটি কথা আমি বুঝতে পারি না'– ইয়াযদগিরদ বললো– 'তোমরা আমাকে ঠিক কথাটি বলছো না। তোমাদেরকে আমি সোজা কথা জিজ্ঞেস করছি। তোমরা বলো, এত বড় ফৌজের ওপর তোমরা কি করে বিজয় লাভ করো?'

ঃ 'আপনার দুর্ভাগ্য হলো, আপনি বাস্তবতাকে স্বীকার করেন না'– এক বন্দী বললো– 'আরেকটি বিষয় হলো, আপনার ফৌজ বুযদিল। এবং এজন্য বুযদিল যে, এই ফৌজের জবাবদিহি করতে হয় আপনার সামনে। কিন্তু আমাদের জবাবদিহি করতে হয় আল্লাহর সামনে।'

ঃ 'না'– ইয়াযদগিরদ বললো- 'আসল ব্যাপার তোমরা লুকাচ্ছো, তোমরা তো আর আকাশ থেকে অবতীর্ণ ফেরেশতা নও। আমি বলবো তোমাদের সঙ্গে কোন জাদুকর আছে।'

ঃ 'হে পারস্যের শাহেনশাহ!- এক কয়দী বললো'- আপনি যদি জাদুর কথা বলেন তবে আমরা সবাই জাদুকর। আমাদের কথা যদি আপনি বুঝতে সক্ষম হন তবে এই জাদুর মালিক আপনিও হতে পারবেন। কিন্তু আপনি সেই আল্লাহকে মানেন না। যিনি তার সত্যপন্থী বান্দাকে এই জাদু দান করেন। তাকে ছাড়া আপনি সূর্য ও আগুনের পূজা করেন। আমাদের মতো সাধারণ মূর্খ লোকেরা পর্যন্ত একথা বুঝতে পারি। কিন্তু আপনার মতো এত বড় সালতানাতের বাদশাহও একথা বুঝতে পারেন না। প্রকৃত সত্য হলো, সূর্য আল্লাহর হুকুমে উদয় হয় অস্ত যায়। আগুনও তাঁর হুকুমে প্রজ্জ্বলিত হয় স্তিমিত হয়। এটা কেন চিন্তা করেন না, সূর্যগ্রহণের সময় সূর্য দৃষ্টিসীমা থেকে হারিয়ে যায়। কিন্তু মহান আল্লাহ কখনো হারিয়ে যান না। এটা ঠিক যে, আল্লাহকে চর্ম চোখে দেখা যায় না। কিন্তু আমাদের চোখ ও হৃদয়ে আল্লাহ সব সময় উপস্থিত থাকেন। আপনার ফৌজ লড়াই করে আপনাকে খুশী করার জন্য। কারণ এই ফৌজকে আপনি বেতন ভাতা ও পুরস্কার দেন। আমরা লড়াই করি আল্লাহকে খুশী করার জন্য। তাঁর কোন প্রত্যক্ষ বেতন ভাতা আমরা পাই না। আমরা পাই আত্মিক প্রশান্তি। আপনার সিপাহীর বেতন ভাতা ও পুরস্কারের জন্য জীবিত থাকতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। আর আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করি এবং নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতে চাই। তার কাছে আমরা খুব তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে চাই।'

ঃ 'আরেকটি কথা আছে শাহেনশাহ!'– আরেক কয়দী বললো- 'আমরা বুকে প্রতিশোধের আগুন নিয়ে লড়াই করি।'

ঃ 'কিসের প্রতিশোধ'- ইয়াযদ আশ্চর্য হয়ে বললো– 'কোন ক্ষতিটা করেছি আমরা তোমাদের যার প্রতিশোধ নিতে এসেছো?'

ঃ 'আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অপদস্থ করার প্রতিশোধ নিতে এসেছি আমরা'– এক কয়েদী জবাব দিলো- 'মাদায়েনের মহলে আমাদের রাসূল

(স) সত্যের পয়গামটি কিসরা পারভেজ বড় নির্দয় হাতে ছিঁড়ে ফেলে এবং দরবার কক্ষে তার টুকরোগুলোই ছড়িয়ে দেয়। আল্লাহর রাসূল (স) এর কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি বলেছিলেন- সালতানাতে ফারেস টুকরো টুকরো হয়ে এভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে এবং এই সালতানাতের বড় মন্দ পরিণাম হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্যই আমরা এসেছি। মহান আল্লাহ যেহেতু এই ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই পূরণ করবেন তাই তিনি আমাদের মধ্যে এমন শক্তি দান করেছেন যে, আমাদের এক একজন আপনার দশ থেকে বিশজনকে হত্যা করে দিতে সক্ষম।'

ঃ 'আরো শুনুন শাহেনশাহ!'– আরেক কয়েদী বললো– 'আল্লাহ আমাদের রাসূল (স) এর ওপর একটি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। আমরা একে কুরআন বলি। এতে মহান আল্লাহ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন, একশজন বিধর্মীর মোকাবেলায় দশজন ঈমানদার হলেও তারা একশজনকে পরাজিত করতে পারবে। আর বিশজন ঈমানদার হলে দুইশ জনকে পরাজিত করবে। আমরা ঈমানদার, আমাদের সবার সম্পর্ক মহান আল্লাহর সঙ্গে। এটাই আমাদের শক্তি, এটাই আমাদের জাদু।'

ইয়াযদগিরদ আর কিছু বলতে পারলো না। কিছুক্ষণ তিন বন্দীর দিকে তাকিয়ে রইলো এবং গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়ে কামরায় পায়চারী করতে লাগলো। তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে তালি বাজালো। দৌড়ে এলো দারোয়ান। ইয়াযদগিরদ তাকে বললো এই গোলামদের মালিকদেরকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও। সেই দুই ব্যবসায়ী নির্দেশ পেয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলো।

ঃ 'এই তিনজনকে মুক্ত করে দাও।'

ব্যবসায়ী দু'জন কিছুই বললো না। শাহেনশার নির্দেশ পালনে তারা বাধ্য ছিলো, তিন বন্দী মুক্ত হয়ে গেলো এবং রাতেই হালওয়ান থেকে বেরিয়ে গেলো।

তিনি যখন কোন জাতির ধ্বংসের ফয়সালা করে দেন তখন তাদের পথপ্রদর্শক, প্রশাসন ও ধর্মীয় নেতাদের বিপথগামীতার সেই স্তরে পৌঁছে দেন যেখান থেকে আলোর পথ দেখা যায় না। যেখান থেকে তারা আর মুক্তালোকে ফিরতে পারে না। সে জাতির বুদ্ধিজীবী, পথপ্রদর্শক ও নেতারা নিজেদেরকে অতুলনীয় জ্ঞানী ও বিচক্ষণতায় শ্রেষ্ঠ মনে করতে থাকে। অথচ তখন তার কথা ও কাজ থেকে আহমকি আর মূর্খতার জঞ্জাল বেরোতে থাকে। শাসকশ্রেণী নিজেদেরকে খোদার আসনে বসিয়ে প্রবোধ পেতে থাকে। কিন্তু সত্য আর বাস্তবতার খোলা পথ থেকে শত হস্ত দূরে থাকে এবং ধ্বংসের শ্বাসরুদ্ধকর পথে গিয়ে মুক্তির পথ খুঁজে বেড়ায়।

ইয়াযদগিরদ সেই তিন মুজাহিদকে জিজ্ঞেস করছিলো তাদের কাছে কোন ধরনের জাদু আছে। অনন্ত বিশ্বাস নিয়ে সে বলছিলো মুসলমান লশকরে অবশ্যই কোন জাদুর খেলা আছে। সেই তিন মুজাহিদ তাকে বলছিলো, হ্যাঁ জাদু আছে তবে সেই জাদু সবারই নাগালের মধ্যে। এরা কেউ বিরাট জ্ঞানী ছিলো না, ফৌজের সালার পর্যায়ের কেউ ছিলো

না এবং কেউ গোত্র সরদারও ছিলো না। মুসলিম ফৌজের সাধারণ সৈন্য ছিলো। কিন্তু তাদের অটল ঈমান এবং আল্লাহার প্রতি সজীব বিশ্বাস তাদেরকে এত উঁচুতে নিয়ে গিয়েছিলো যে, পৃথিবীর পরাশক্তি শাহেনশাহে ফারেসও তাদের পদনখের নাগাল পাচ্ছিলো না।

ইয়াযদগিরদের সব চিন্তা ভাবনা এমন অলীক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, সে মানসিক রোগী হয়ে যায়। পুরান ও নাওরীন তার সঙ্গে না থাকলে তো সেই পাগলই হয়ে যেতো। এই দুই নারী তার মনোবল জোড়া তালি দিয়ে ধরে রেখেছিলো।

ঃ 'ইযদী!'- পরদিন সকালে নওরীন ইয়াযদগিরদকে বললো- 'এখন কি আমাদের এই বাস্তবতাটা মেনে নেয়া ভালো নয় যে, ইরাক সালতানাতে ফারেস থেকে বেরিয়ে গেছে?'

ঃ 'হ্যাঁ ইযদী!'- পুরান বললো- 'আমাদের কাছে এখন আর কিছুই নেই। চেয়ে দেখো আমাদের আর কত ফৌজ আছে এখন। ক'জন জেনারেল আছে। এখন আমাদের ইরাকের সীমানা থেকে বেরিয়ে মূলক পারস্যেই চলে যাওয়া উচিত।

ইয়াযদগিরদের মুখের ভাব এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো যেন এই পরামর্শ তার কাছে বেশ লেগেছে। সে কি যেন বলতে যাচ্ছিলো। তখনই বাইরে থেকে কোলাহল শোনা গেলো।

ঃ 'শাহেনশাহে ফারেস!'- বাইরে থেকে চিৎকার শোনা গেলো- 'আমাদেরকে বলুন আমরা কোথায় যাবো?'

ঃ 'বাইরে বেরিয়ে এসো'।

কোলাহল বেড়ে গেলো। হট্টগোলের রূপ নিলো তা।

তারপর শাহী মুহাফিজদের জোরপূর্বক ভীড় হটানোর শোরগোল শোনা যেতে লাগলো। ইয়াযদগিরদ দৌড়ে বাইরে বের হয়ে এলো। বাইরে মাদায়েন, জলুলা ও হালওয়ান শহরের লোকদের উপচে পড়া ভীড় ছিলো। লোকেরা তাদের জেনারেলের বিরুদ্ধে তো বটেই ইয়াযদগিরদের বিরুদ্ধেও শ্লোগান তুলতে লাগলো। আর মুহাফিজ বাহিনী এলোপাতাড়ি দাঙ্গার মাধ্যমে লোকদের তাড়াতে চেষ্টা করছিলো।

ঃ 'এখুনি এখান থেকে ভাগো তোমরা'- এক কমান্ডার বললো- 'না গেলে কিন্তু তোমাদের ওপর ঘোড়া ছুটিয়ে দেবো।'

ঃ 'দুশমনের মার খেয়ে পালিয়ে আসা ফৌজ তো তাদের প্রজাদেরই পিষ্ট করতে জানে।'

ঃ 'এই হুমকি বাইরে গিয়ে মুসলমানদের দিচ্ছো না কেন?'

ঃ 'আরে মুসলমানদের সামনে যাওয়ার সাহস আছে নাকি এই ডরপুকদের!'

ঃ ' তোমরা কি চাও'? - ইয়াযদগিরদ ভীড়ের সামনে এসে জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'আমাদের নিরাপত্তা'।

ঃ 'আমরা চাই আমাদেরকে যেন ধোঁকায় না রাখা হয়।'

হাজার হাজার লোকের ভীড় থেকে এসব আওয়াজ উঠছিলো। প্রতিটি শব্দই যেন ইয়াযদগিরদের বুকে তীরবিদ্ধ করছিলো আর সে বেঁকে যাচ্ছিলো। যারা তার সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়তে অভ্যস্ত ছিলো তারাই আজ তাকে মাথা নোয়াতে বাধ্য করছে। এই ধাক্কা তাকে জাগিয়ে তুললো এবং সে বাস্তবতাকে মেনে নিতে শুরু করলো।

কিসরার বংশধরদের শাহেনশাহী জীবনে এই প্রথম এক বাদশাহ এমন ভয়াবহ বাস্তবতার সম্মুখীন হলো যে, লোকেরা তাদের প্রজা-নীতির আনুগত্য ভুলে গিয়ে এবং জাতীয়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চেষ্টা করছে। এ অবস্থায় যে কোন শাসক যতই প্রতাপশালী আর অত্যাচারীই হোক না সেই জাতির সামনে তাকে হাঁটু ভেঙে বসতেই হবে।

ইয়াযদগিরদের কাছে দুই জেনারেল দাঁড়ানো ছিলো। একজন ছিলো ফায়রুযান আরেকজন যুবা বয়সের জেনারেল খসরু শানুম।

ঃ 'দেখছো তোমরা?'- ইয়াযদগিরদ দুই জেনারেলকে বললো- 'যে অভিশাপ তোমাদের ওপর পড়ার কথা ছিলো তা পড়ছে আমার মুখের ওপর। তোমরাই বলো এদেরকে কি করে শান্ত করবো? এদেরকে কি সিজদা করবো? না কি আমি নিজেই কমান্ড নিয়ে খানকীনে মুসলমানদের যে দলটি আছে তার ওপর হামলা করবো। আমরা হিম্মত করলে কি এখান থেকেই জবাবী হামলা হতে পারি না?'

লোকজনের ভীড় ক্রমেই বাড়ছিলো এবং মানুষের গলা থেকে যেন বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে পড়ছিলো। এই মাথার মগজ বের করা হট্টোগোলে ইয়াযদগিরদ তার জেনারেলদের সঙ্গে উঁচু আওয়াজে সলাপরামর্শ করছিলো। জেনারেলরা বললো, তারা এখনই হামলা করতে প্রস্তুত। ফায়রুযান বললো, এখনিই হামলা করা উচিত এবং এটা খুবই জরুরী।

ঃ 'এই হামলা তোমরা করবে'- ইয়াযদগিরদ ফায়রুযানকে বললো- 'যত ফৌজ তোমাদের প্রয়োজন তা এখনই প্রস্তুত করে নাও এবং যত তাড়াতাড়ি পারো হামলা শুরু করো। এই সময়ের মধ্যে কথা বলে এদেরকে দেখি শান্ত করতে পারি কিনা। আর আমি চেষ্টা করবো এদের মধ্যে কিছু লোককে লড়াইয়ের জন্য তৈরী করা যায় কিনা।'

ঃ 'শাহেনশাহে ফারেস!'- ফায়রুযান বললো- 'এরা এখন লড়াইযে যেতে রাজী হবে না। এরা প্রত্যেক লড়াইয়ে এবং অবরোধকালে আমাদেরকে নিজেদের যুবক ছেলে সন্তান দিয়েছে। আমি ছোট ছোট সন্তানের পিতাকে লড়াইয়ের ময়দানে দেখেছি। তাদেরকে দিয়ে আমরা বিনা বেতনে শুধু জযবা আর আবেগের বিনিময়ে যুদ্ধ করিয়েছি অথবা পুরস্কারের লোভ দেখিয়েছি। শাহেনশাহ! তারপর কি হলো? আমাদের ফৌজ বেতন ভাতাও নেয়, আমাদের থেকে রুটিও খায় এবং মুফত মদও পান করে। কিন্তু আসল সময় তারাই পালালো এবং মরার সময় এদের সন্তানরা মারা গেলো। তাদেরকে আমরা কি পুরস্কার দিলাম? এরা তাই এখন ফুসে উঠেছে। তখনই এরা আমাদের সঙ্গ দেবে যখন আমরা এদেরকে কিছু করে দেখাবো।'

ঃ 'তাহলে কিছু একটা করে দেখাও'– ইয়াযদগিরদ বললো– 'খানকীনে এখন মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম। হয়তো তারা তাদের বাকী ফৌজের অপেক্ষা করছে। অথবা তারা ফিরেও যেতে পারে। তাদের ফিরে যাওয়া এবং তাদের অবশিষ্ট ফৌজ ফিরে আসার আগে তাদেরকে এখানেই খতম করে দাও।'

ফায়রুযান জেনারেল খসরু শানুমকে সঙ্গে করে চলে গেলো। আর ইয়াযদগিরদ লোকদের শান্ত করতে চেষ্টা করতে লাগলো।

ফায়রুযান সেখান থেকে কিছু দূর যাওয়ার পর এক শাহী কর্মকর্তা তার কানে কানে বললো, মালিকায়ে আলিয়া নাওরীন তাকে ডাকছে। ফায়রুযান খসরু শানুমকে বললো, তুমি কয়েকটি বাহিনীকে হামলার জন্য তৈরী করো। আমি আসছি। নাওরীন জানতে পেরেছিলো ইয়াযদগিরদ আবার মুসলমানদের ওপর হামলা করতে যাচ্ছে।

ঃ 'ফায়রুযান'– নাওরীন ফায়রুযানকে নির্জন এক কামরায় নিয়ে গিয়ে বললো- 'আমরা উভয়ে একে অপরকে জানি। তুমি জানো আমি এক মা এবং এও জানো, আমার ছেলেকে মাদায়েন আনতে আমাকে কেমন বাধ্য করা হয়েছিলো। এটা ছিলো উমারা ও জনসাধারণের দাবী যা আমি পূর্ণ করেছি, কিন্তু আমি এ অবস্থায় মরতে দিতে চাই না যে পরাজিতও হবে, সালতানাতে ফারেসের হাত থেকে ইরাকের মতো এত বড় দেশ ছুটে যাবে এবং আমার ছেলেও মারা যাবে। ইয়াযদগিরদ সবসময়ই পিছুই হটেছে। সবচেয়ে বড় ধোঁকা তাকে দিয়েছিলো রুস্তম। যদি রুস্তম কাদিসিয়ায় পৌছতে এতগুলো সময় নষ্ট না করতো তাহলে হয়তো আমাদের এত বড় পতন ঘটতো না এবং মাদায়েন ও জলুলা হাত থেকে ছুটতো না।'

ঃ 'মালিকায়ে আলিয়া!'– ফায়রুযান বললো এখন সময় বড় কম। আপনার কথা মনে হয় বেশ দীর্ঘ হবে। আরেকটু সংক্ষেপ করলে খুব ভালো হতো। আপনার যা বলার কয়েকটি শব্দে মাত্র বলে ফেলুন। বাকীটা আমি ব্যাখ্যা করে নেবো।'

ঃ 'আসলে যেটা বলতে চাই ফায়রুযান! ইরাক আমাদের হাত থেকে ছুটে গেছে। আমার ছেলের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। আমার আশংকা হচ্ছে, ইয়াযদগিরদ না আবার বেহুঁশ হয়ে লড়াই করতে চলে যায় এবং নিহত হয়। অথবা সে মানসিক ভারসাম্যহীনতার কারণে আত্মহত্যা করে বসে। যদি আমার ইযদী পাগলও হয়ে যায়, আমার এতটুকু সান্ত্বনা মিলবে যে, পাগল হলেও সে তো জীবিত আছে। আমি চাচ্ছি তুমি ইয়াযদগিরদকে হালওয়ান থেকে বেরিয়ে যেতে রাজী করাও। এরপর আমাদের বড় শহর 'রায়' আছে। তাকে আমি রায় নিয়ে যাবো।'

ঃ 'হ্যা' মালিকায়ে আলিয়া!' ফায়রুযান বললো- 'শাহেনশাকে এখান থেকে বের করার এক উপায় আমার জানা আছে। আমি তাঁকে বলবো, লড়াইয়ের ব্যাপারে ফৌজ এখন দ্বিধান্বিত। আমাদের অসংখ্য বিখ্যাত সব জেনারেল মরে গেছে। জেনারেলরা তো লড়াইয়েই মরে। কিন্তু শাহেনশাহ যদি মারা যায় বা দুশমনের কয়েদখানায় চলে যায়

তাহলে 'তো গল্পই শেষ হয়ে গেলো। তখন চরম অপদস্থ হয়ে পুরো সালতানাত ও সমস্ত জাতি ডুবে মরে। আমি শাহেনশাকে বলবো, তিনি যেন সালতানাতের আত্মমর্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখেন এবং এখান থেকে বেরিয়ে যান।'

ঃ 'ফায়রুযান!'– নাওরীন ফায়রুযানকে দুই বাহুতে জড়িয়ে ধরে আবেগ ভেজা কণ্ঠে বললো- 'এই তুমি করো, তারপর বলো তোমার কত পুরস্কার চাই?

ঃ এই কাজই এখন আমি প্রথম করবো মালিকায়ে আলিয়া!'– ফায়রুযান বললো- 'আমি আপনাকে এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, শাহেনশাহকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবো।'

ফায়রুযান সেখান থেকে চলে গেলো।

ইয়াযদগিরদ ফুসে ওঠা জনতাকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরাজয়ের সব দোষ জেনারেলদের ওপর চাপিয়ে এবং কতগুলো আবেগী কথা শুনিয়ে ঠাণ্ডা করে দিলো। লোকজন প্রশান্ত মনে ফিরে গেলো। ইয়াযদগিরদ সেখানে থেকে সেই ছোট মহলে চলে গেলো, হালওয়ানে যা শাহেনশাহের জন্য তৈরী করা হয়েছিলো। লোকদের মনের আগুন তো সে কিছুটা প্রশমিত করতে পেরেছিলো কিন্তু নিজের মনের আগুন ধাউ ধাউ করে জ্বলছিলো।

তার বসে বসে ভাবনার মধ্যেই ফায়রুয়ান সামনে এসে দাঁড়ালো।

ঃ 'ফৌজ কি তৈরী হয়ে গেছে'?– ইয়াযদগিরদ জিজ্ঞেস করলো। 'তোমরা কখন বের হচ্ছো?'

ঃ 'হ্যাঁ শাহেনশাহ! তৈরী হয়ে গেছে'– ফায়রুযান বললো- 'আমি বেরিয়েই যেতাম, কিন্তু জরুরী একটা কথার জন্য থেমে গেলাম।'

ঃ 'এখন কথা বলে সময় নষ্ট করো না ফায়রুযান!'– ইয়াযদগিরদ বললো– 'অনেক কথা হয়েছে। এটা ভুলে যেয়ো না, পারস্যের ওযীর, আমীর ও জনগণ মাদায়েন আমাকে এই স্বপ্ন নিয়ে এনেছিলো যে, সিংহাসনকে ঘিরে কিসরার খান্দানে যে রক্তের হোলি খেলা চলছিলো তা যেন আমি বন্দ করি। এবং এজন্যও যে, কিসরার মসনদে এমন পুরুষেরই বসতে হবে, যে পারস্যকে মুসলমানদের হাত থেকে বাঁচিয়ে ওদেরকে ধ্বংস করে আরবে হামলা চালাবে। কিন্তু ফায়রুযান! যা হয়েছে তা তো তোমার সামনেই আছে। যারা আমাকে একজন ফেরেশতা ভেবে একদিন ডেকে এনেছিলো আজ তারাই আমার সঙ্গে বিদ্রোহ করে আমার মুখে পরাজয়ের কালিমা লেপন করে দিচ্ছে।'

ঃ 'শাহেনশাহে ফারেস।'– ফায়রুযান বললো- 'জয়পরাজয় ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ বা সংশয় নেই যে, এখন আপনার ব্যক্তিসত্ত্বা সালতানাতে ফারেসের মান সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক। এখন জীবনের শেষ বাজীটি ধরে আমরা লড়াই করবো। কিন্তু আপনার হালওয়ান থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত।'

ঃ 'সেটা আবার কেন?'– ইয়াযদগিরদ জিজ্ঞেস করলো– 'এটা কি ভালো হয় না যে, আমি আমার ফৌজ ও প্রজাদের সঙ্গে থাকবো?

ঃ 'না শাহেনশাহ!'– ফায়রুযান বললো- 'লড়বো তো আমরা। হতে পারে আমরা হালওয়ান ছেড়ে দিয়ে বাইরে মুসলমানদের জন্য ফাঁদ পেতে তাদেরকে খতম করে দিলাম। অথবা হালওয়ানের ভেতরে এমন ফাঁদ তৈরী করে রাখবো যে, মুসলমানরা এখান থেকে আর লাশ নিয়ে ফিরতে পারবে না। অবস্থা তখন এমন দাঁড়াবে যে, সেখানে আপনি থাকলে আপনার ও শাহীখান্দানের নিরাপত্তার দিকে আমাদের নজর রাখতে হবে। আপনি আমাদের প্রতি দয়া করুন এবং এই চাপ থেকে আমাদের মুক্ত রাখুন। আপনি এখানে থাকলে আরবরাও আপনার পর্যন্ত পৌছে যেতে পারে এবং আপনাকে হত্যা করতে পারে বা তাদের সঙ্গে করে আপনাকে বন্দী করে নিয়ে যেতে পারে। আর যদি তাই ঘটে তাহলে সালতানাতে ফারেসের অবশিষ্টাংশে ত্রাস ছড়িয়ে পড়বে এবং আরবদের ভীতি পুরো পারস্যে স্থায়ী হয়ে যাবে। আপনি এখান থেকে বেরিয়ে রায় পৌছে যান।'

ইয়াযদগিরদ সে রাতেই তার শাহীখান্দান নিয়ে চুপে চুপে হালওয়ান থেকে বেরিয়ে রায় পৌছে গেলো।

ইয়াযদগিরদকে বিদায় করে দিয়ে ফায়রুযান কয়েকটি বাহিনী তৈরী করে নিলো এবং খসরু শানুমকে খানীকানের কাছে অবস্থানরত মুসলমানদের ওপর প্রচণ্ড হামলার দিক নির্দেশনা দিতে লাগলো। সবাই জানতো, এই হামলার নেতৃত্ব ফায়রুযান দেবে। কিন্তু ফায়রুযান কমাণ্ড পাচ্ছিলো। তার অধীনস্থ এবং একান্ত অনুগত এক অফিসার তাকে জিজ্ঞেস করলো, সে নিজে কেন যাচ্ছে না।

ঃ 'মালিকায়ে আলিয়া তার ছেলেকে জীবিত দেখতে চান'– ফায়রুযান বললো- 'তার কথাতেই আমি শাহেনশাকে রায় পৌছাতে এখান থেকে বের করেছি। শাহী খান্দানই যদি মৃত্যুকে ভয় পায় তাহলে আমি কেন মৃত্যুর মুখে গিয়ে পড়বো? খসরু শানুম আমার অধীনস্থ। তাকে আমি যেখানে ইচ্ছা পাঠাতে পারবো এবং তাকে আমি পাঠাচ্ছিও।'

খসরু শানুমও গোপন সূত্রে এটা জানতে পেরেছিলো, জেনারেল ফায়রুযান লড়াই থেকে বাঁচার জন্য তাকে হামলার জন্য পাঠাচ্ছে। কিন্তু খসরু শানুম তার অধীনস্থ ছিলো বলে এর কোন প্রতিবাদ বা নির্দেশ অমান্য করার সাহস দেখাতে পারেনি। সে ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

খানকীন থেকে সামান্য দূরে ছিলো কসরে শিরী। ক'কা অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে কসরে শিরীর কাছে সেনাসাহায্যের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সাদ (রা) এর কাছে তিনি সংবাদ পাঠিয়েছিলেন, তিনি পিছিয়ে আসার চেয়ে এগিয়ে গিয়ে হালওয়ান অবরোধ করতে চান। পারসিকরা যাতে সামলে উঠতে না পারে এবং হালওয়ান থেকেও বেরিয়ে যেতে না পারে।

ঃ 'আমীরে লশকরকে বলবে'– ক'কা তার কাসেদকে বলেছিলেন– 'হালওয়ানের পরেই ইরাকের সীমান্ত শেষ হয়ে যায়। হাওয়ান আমরা নিয়ে নিতে পারলে পুরো ইরাকই আমাদের হয়ে যাবে। পারসিকরা তাদের মূল পারস্যে চলে যাবে এবং আবু উবায়দা ও খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) আমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হবেন ............. এটাও বলো, পারস্যের বাদশাহ ইয়াযদগিরদ এখন হালওয়ানে। আমি তাকে গ্রেফতার বা হত্যা করতে সবরকম চেষ্টাই করবো। এভাবে আমরা পুরো পারস্যের কোমর ভেঙে দিতে পারবো।'

তখনো মদীনা থেকে সাদ (রা) এর পয়গামের জবাব মাদায়েনে পৌঁছেনি। এদিকে আবার ক'কা সেনাসাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন। সাদ (রা) তার সালারদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। অবশেষে সবাই ফয়সালা করলেন মদীনা থেকে আমীরুল মুমিনীনের হুকুম পৌঁছতে আরো সময় লাগবে। আর ক'কার যুক্তি ও তার ইচ্ছাও প্রত্যাখ্যান করার মতো নয়, বরং প্রত্যাখ্যান করলে মুসলমানদের বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

ওদিকে হালওয়ানে ক'কার ছোট দলটির ওপর হামলা চালানোর আদেশ জারী হয়ে গিয়েছিলো।

সাদ (রা) অনেক চিন্তা করে ক'কার জন্য সেনাসাহায্য পাঠিয়ে দিলেন।

এদিকে খসরু শানুমের নেতৃত্বে হালওয়ান থেকে কয়েক হাজার সওয়ার ফৌজ রওয়ানা হলো।

এদিকে জলুলা থেকেও সেনাসাহায্য পাঠানো হলো এবং সেনাদল রওয়ানা দিয়ে দিলো।

হালওয়ান থেকে কসরে শিরী মাত্র তিন মাইল দূরে ছিলো। কিন্তু জলুলা থেকে কসরে শিরী ছিলো অনেক দূরে। তাই খসরু শানুমের কসরে শিরীতে এক লাফেই পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিলো। আর মুসলিম সেনাদলের অনেক সময়ের প্রয়োজন ছিলো।

ক'কার অবস্থান ছিলো দুশমনের কোলে বসে থাকার মতো। এজন্য তিনি দিনরাত চোখ কান খোলা রাখতেন। অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তিন-চার জন সিপাহী ছদ্মবেশে হালওয়ান পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের কাজ ছিলো হালওয়ান বা অন্য কোন দিক থেকে ফারসী ফৌজ যদি এসে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে খবর দেয়া।

শেষ পর্যন্ত এক মুজাহিদ এসে ক'কাকে জানালো, কসরে শিরী থেকে এক বাহিনী কসরে শিরীর দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের আনুমানিক সংখ্যাও জানা।

ক'কা খবর পেতেই কিছু সৈন্য সামনে যুদ্ধ সাজে প্রস্তুত রাখলেন এবং বাকীদের এলাকার বিভিন্ন ঘরে, দালানে এবং টিলার আড়ালে লুকিয়ে ফেললেন। দুশমন দেখে যাতে বুঝে মুসলমানরা মাত্র এই কজনই আছে।

ক'কা আরেকটি চাল দিলেন। যে সৈন্যদল সামনে দাঁড় করানো ছিলো তাদেরকে তিনি এমনভাবে পিছু হটাতে লাগলেন যেন তারা পালানোর পথ খুঁজছে। ফারসী

সওয়াররা এক সঙ্গেই এলো। ক'কা তার দলকে পালানোর ভঙ্গিতে পিছু হঁটাতে লাগলেন এবং সরতে সরতে খোলা ময়দান থেকে ঘর বাড়ির কাছে চলে এলেন। ঘর বাড়ি আগেই খালি ছিলো।

খসরু শানুম চিৎকার করে আসছিলো– 'ওদেরকে যেতে দিয়ো না ..... ঘোড়ার নিচে পিষে ফেলো। ........... এক একটা ধরে ধরে কুচি কুচি করো।'

পারসিকরা যখন খোলা জায়গা ছেড়ে ঘর বাড়ির কাছে চলে এলো। সেগুলোর ছাদ থেকে সমানে তীর আসতে লাগলো। মুসলমানদের তীরন্দায সৈন্য কম ছিলো। তীরন্দাযরা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তীরন্দাযী করে সেটা পূরণ করে নিচ্ছিলো। তীর মারার জন্য নিশানা নেয়ার প্রয়োজন ছিলো না, কারণ পারসিকরা দলে দলে পিলপিল করে আসছিলো। কোন তীরই লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছিলো না।

এই আচমকা ও অপ্রত্যাশিত তীরের বর্ষণ দেখে পারসিকরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। সামনের সওয়াররা তৎক্ষণাৎ ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো এবং পেছন থেকে ছুটে আসা সওয়াররা তাদের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খেলতে লাগলো। এদিকে যে ঘোড়াগুলোর গায়ে তীর লেগে ছিলো সেগুলো লাগামহীন হয়ে তাদের ফৌজের মধ্যে ভয়াবহ হুলস্থুল বাধিয়ে দিলো। আর পারসিকদের মধ্যে নিশ্চিত এই ভীতি ছড়িয়ে পড়লো যে, মুসলমানদের সংখ্যা তাদের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি।

এ অবস্থায় ক'কা তাদের ওপর হামলা করে বসেন। খসরু শানুম চিৎকার করছিলো। তার সওয়াররা যেন খোলা জায়গা বের করে নেয়। দিক ও স্থান পরিবর্তনের জন্য তারা ডানে বামে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। কিন্তু ডান ও বাম দিক থেকে তাদের ওপর ঐসব সৈন্যরা হামলা করলো যাদেরকে ক'কা কিছু দূরে বিভিন্ন দালানে ও টিলার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

মুসলমানদের সংখ্যা এত কম ছিলো যে, এত বড় বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া মোটেই সম্ভব ছিলো না। ক'কার অসামান্য সাহসিকতার কারণেই মুসলমানরা এত অধিক সংখ্যক ফৌজের সঙ্গে লড়তে নেমেছিলো। অসামান্য নিপুণতা ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ক' কা লড়ছিলেন, যা সহজাত বৈশিষ্ট্য ছিলো তার। তার সেই চালটি যদিও সফল ছিলো, তবুও পারসিকরা সামলে নিলো অল্পক্ষণের মধ্যেই।

ক'কা সাহস হারানোর মতো নেতা ছিলেন না। তার অনবরত উৎসাহ প্রদান সৈন্যদের জযবা বেড়েই যাচ্ছিলো। তবুও ক'কার বাহিনী সফল হবে এমন আলামত দেখা যাচ্ছিলো না। ফারসী জেনারেল খসরু শানুম প্রথম তার সওয়ারদের আগে আগে ছিলো। পরে পিছু হটতে হটতে তার ফৌজের মধ্যে গায়েব হয়ে গেলো। ক'কা তাকে খুঁজছিলেন। কিন্তু তাকে কোথাও দেখা গেলো না।

তুমুল লড়াই চলছিলো। মুসলমানরা প্রায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলো। হঠাৎ ফারসী সওয়ারদের মধ্যে আবার হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেলো। ক'কা কিছুক্ষণ কিছুই বুঝতে পারলেন না। বুঝতে পারলেন তখন যখন পারসিকদের রক্ত গঙ্গা বইতে শুরু করলো

এবং তারা পালাতে শুরু করলো– এটা জলুলা থেকে আগত সেনাদল যা সময়মত পৌঁছেছিলো। তারাও যে সংখ্যায় অনেক ছিলো এমন নয়। কিন্তু তারা যখন দেখলো মুসলমানরা লড়ছে এবং কোণঠাসা হয়ে পড়ছে তখন পারসিকদের ওপর পেছন থেকে ও এক পার্শ্ব থেকে হামলা করে দিলো।

খসরু শানুম প্রথম থেকেই মনোবল হারিয়ে ফেলে ছিলো। ফায়রুযান না এসে তাকে পাঠানো তার পছন্দ হয়নি। সে যখন দেখলো তার সওয়াররা আরেক সওয়ারের গায়ের ওপর গিয়ে পড়ছে, ঘোড়াগুলো একটা অন্যটাকে ধাক্কা মারছে, সংঘর্ষ বাধিয়ে দিচ্ছে এবং যখমী ঘোড়া মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, না হয় লাফাতে লাফাতে অন্যটাকে যখমী করে দিচ্ছে, সে তখন আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে পড়লো।

ফারসী সওয়াররা একে একে রণক্ষেত্র থেকে পালাতে লাগলো এবং বেশি সময় লাগলো না। ময়দানে পারসিকদের লাশ ও যখমীদের পড়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই রইলো না। কিছু যখমী ঘোড়া তখনো দিগ্বিদিক ছুটছিলো। মুসলমানরা সওয়ারহীন ঘোড়া পাকড়াও করতে ও মৃত এবং যখমীদের অস্ত্র উঠাতে শুরু করে দিলো।

হালওয়ান বেশি দূরে ছিলো না। ফায়রুযান শহরের দেয়ালে দাঁড়িয়েছিলো। সে নিশ্চিত ধরে নিয়েছিলো, এই হাতে গণা কয়েকশ মুসলমানকে তার বাহিনী শেষ করে দিয়ে আসছে। কিন্তু দেখা গেলো দু'একটি ঘোড়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। সর্বপ্রথম খসরু শানুম হালওয়ানে প্রবেশ করলো। ফায়রুযান তাকে লড়াই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে খসরু শানুমের মুখ কাঁপতে লাগলো।

এরপর ময়দান থেকে পালিয়ে আসা সওয়াররা শহরে প্রবেশ করতে লাগলো। তাদের মধ্যে অনেকে যখমী ছিলো। তাদের কাপড় ছিলো রক্তে লাল। কারো শরীরে বিদ্ধ তীর ঝুলছিলো। একজনের অবস্থা এমন বীভৎস ছিলো যে, শহরের লোকেরা রীতিমতো ভয় পাচ্ছিলো।

ক'কা তাদের পিছু ধাওয়া করতে গেলেন। কিন্তু শহরের লোকেরা এর আগেই পালাতে শুরু করলো। সেখানে অনেক অক্ষত ফৌজও ছিলো। যারা মাদায়েন ও জলুলা থেকে পালিয়ে এসেছিলো, এসব ফৌজও বিনা লড়াইয়ে পালাতে লাগলো।

হালওয়ানও মুসলমানদের দখলে চলে এলো। ক'কা তখনই দুটি কাজ করলেন। প্রথমে সাদ (রা) এর কাছে হালওয়ান বিজয়ের খবর পাঠালেন। তারপর কয়েকজনকে নির্দেশ দিলেন, শহরের আশে পাশের এলাকায় যেন এই ঘোষণা করে দেয়, যারা ইসলাম গ্রহণ করবে বা নিরাপত্তা কর প্রদান করবে তাদেরকে পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হবে। তাদের মালামাল ও জায়গা জমির ওপর কারো অন্যায় হস্তক্ষেপ চলবে না।

এসব লোকেরা আগেই দেখেছিলো মুসলমানরা ইরাকের যেসব এলাকা জয়ী করে সেখানে শাসন শুরু করেছে, সেখানকার লোকেরা যে শুধু প্রশাসনিক নিরাপত্তাই পাচ্ছে তাই নয়, বরং তারা এখন সত্যিকারের স্বাধীন জীবনের স্বাদ উপভোগ করছে। তারা এই ভয় থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে যে, শাহী আমলারা এখন আর প্রতিদিনের মতো হঠাৎ এসে

ধমকা ধমকি করবে না, মারধর করবে না এবং তাদের রক্ত পানি করা শ্রম দিয়ে উৎপাদিত ফসলের প্রায় সবটাই বিনামূল্যে নিয়ে যাবে না এবং কারো সুন্দরী ও যুবতী মেয়েকে দেখলেই ধরে নিয়ে যাবে না। যাকে ইচ্ছা তাকেই বিনা বেতনে বেগার খাটাতে বা জোর ফরে ফৌজে ভর্তি করাতে নিয়ে যাবে না।

তাদের জানা ছিলো না, মুসলমানদের এই পরমত ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, সুমার্জিত আচরণ ও কোমল ব্যবহার আল্লাহর এক হুকুম। তারা ভাবছিলো এটা মুসলমানদের দয়া আর অনুগ্রহ। মানুষ হয়ে মানুষকে সম্মান করা ও শ্রদ্ধা করার মানবীয় গুণ সম্পর্কে অগ্নিপূজারীরা কিছুই জানতো না। তারা জানতো না, এই সম্মান ও শ্রদ্ধার প্রাপ্তি মানুষের মৌলিক অধিকার এবং ইসলামের মৌলিক বিধানের অন্যতম। যারা ছিলো রাজরাজড়াদের সাবেক প্রজা তারা যখন এই অধিকার প্রাপ্তির স্বাদ পেলো তখন কেউ নিয়ে এলো নিরাপত্তা কর আর অধিকাংশই এলো ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে। কিছু দিনের মধ্যেই লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো।

সাদ (রা) আরো কিছু সৈন্য হালওয়ানে শহরের প্রতিরক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তারপর হালওয়ান বিজয়ের বিস্তারিত বিবরণ লিখে উমর (রা) এর কাছে পয়গাম পাঠালেন।

মদীনা থেকে সাদ (রা) এর পয়গামের জবাব এসে গেলো। সাদ (রা) ভেবেছিলেন, তিনি যে পারসিকদের পিছু ধাওয়া করে আরো অগ্রসর হওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন, উমর (রা) এই হুকুমই দিবেন যে, তোমরা পিছু ধাওয়া অব্যাহত রাখো এবং কোথাও দম নিয়ে বিশ্রাম করো না। কিন্তু উমর (রা) এর দূরদৃষ্টি, বিচক্ষণতা ও চিন্তাশক্তির গভীরতা এত বেশি ছিলো যে, কোন সিপাহসালারের সে পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব ছিলো না।

উমর (রা) সাদ (রা)কে লিখলেন ঃ

'আমি চাই দজলা ও ফুরাতের নদী মাতৃক এলাকা এবং এর পরের পাহাড়ি এলাকার মধ্যবর্তী স্থান প্রতিরোধ সীমান্ত হিসেবে ব্যবহৃত হোক। পাহাড় টপকে পারসিকরা না আমাদের দিকে আসতে পারবে, না আমরা ওদিকে যেতে পারবো। আমাদের জন্য এই নদী মাতৃক সবুজ শ্যামলময় এলাকাই যথেষ্ট। আমার কাছে মালেগনীমত ও বিস্তর দেশ জয় করার চেয়ে মুসলমানদের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অধিক প্রিয়।'

দজলা ও ফুরাতের দক্ষিণের টিলা, মালভূমি ও নলখাড়ায় বিস্তীর্ণ এলাকাও মুসলমানরা নিয়ে নিয়েছিলো। উত্তরে পারস্য (ইরান) ও সিরিয়ার সীমান্তের মধ্যবর্তী এলাকাও মুসলমানদের বিজিত এলাকা ছিলো।

উমর (রা) সাদকে আরো লিখলেন ঃ

'পারসিকরা পিছু হটতে হটতে তাদের মূল ভূখণ্ডে চলে গেছে এবং স্থায়ী প্রতিরক্ষা শক্তি হিসেবে অটল পাহাড় .সারিকে পেয়েছে। মুসলিম সৈন্যরা যদি ওদের ধাওয়া করতে যায় অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারবে না। এখন করণীয় হলো এসব পাহাড় সারিকে ইরাক ও পারস্যের সীমান্ত রেখা হিসেবে নির্ধারণ করা।'

'যদি তোমরা এগিয়ে এসব পাহাড়ের প্রাকৃতিক ফাঁদে আটকে পড়ো তাহলে ইরাকের লোকেরা নির্ঘাত বিদ্রোহের শুরু করে দেবে। এর আগেও যেসব এলাকা আমরা জয় করেছিলাম এবং সেখানকার যেসব জায়গীরদার ও উমারারা অনুগত ছিলো, মুসলিম সৈন্য সেখান থেকে সামনে এগিয়ে গেলে তারা সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তারা আমাদের অনেক গভর্নরকে নির্বিচারে হত্যা করে.........'

'প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মহান আল্লাহর। ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তার এখন দজলা ফুরাতকেও ছাড়িয়ে গেছে এবং সিরিয়াও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। যদিও এসব এলাকা আমাদের অধীনে চলে এসেছে, কিন্তু আসল কাজ হলো এসব এলাকার লোকদের মদীনার অধীনে নিয়ে আসা। যেকোন দেশ জয় করা যায়, কিন্তু দেশের মানুষের মন জয় করা সবচেয়ে কঠিন কাজ। তীর ও তলোয়ার দিয়ে দেশ জয় করা যায় কিন্তু অন্তর জয় তীর তলোয়ার দিয়ে সম্ভব নয়। মানুষের নাগরিক জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করো। তাদেরকে উন্নীত করো মানবিক মর্যাদায় এবং তাদের সামগ্রিক অধিকার তাদেরকে বুঝিয়ে দাও..........'

'ওদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোনরকম হস্তক্ষেপ করবে না। কোন ব্যাপারে বাধ্যবাধকতার পরিবেশ তৈরী করো না। সঙ্গে সঙ্গে এক আল্লাহর দিকে তাদেরকে আকৃষ্ট করো। তবে জোরজবরদস্তি নয়। যুক্তি ও প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতিতে। তোমাদের কাজকর্ম, আচার ব্যবহার যেন তোমাদের বক্তৃতা ও কথামালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় সেদিকে সবসময় সজাগ দৃষ্টি রাখো। তোমাদের প্রতি তাদের সঘনিষ্ঠ আন্তরিকতা যেন বৃদ্ধি পায় এমন কাজ তোমরা নিঃস্বার্থভাবে করে যাও। তারপর তোমরা দেখো মহান আল্লাহ তার দীনকে সমস্ত ধর্মের ওপর বিজয়ী করবেন। ওদের ধর্মীয় নেতারা যতই বলিষ্ঠ হোন না কেন তারা ইসলামের জনপ্রিয়তা ও অপ্রতিরুদ্ধতা রুখতে পারবে না...........'

'বিজিত এলাকায় স্থিতিশীলতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করো এবং সেখানেও প্রশাসনিক ব্যবস্থার এমন সংস্কার সাধন করো যাতে জনগণ নিজেরাই উপলব্ধি করতে পারে তারা এত দিন বঞ্চিতই হয়ে আসছে। আর হ্যাঁ, সবসময় সজাগ থাকবে, এলাকার সরদারগোছের লোকেরা যেন কোথাও বিদ্রোহের সলতে জ্বালাতে না পারে।'

উত্তর ইরাকের দজলার তীরবর্তী তিকরীত নামে একটি শহর ছিলো। ইরাক ও সিরিয়ার সীমান্ত সঙ্গমস্থলে ছিলো সেটা। এটা পড়েছিলো রোমকদের এলাকায়। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও আবু উবায়দা (রা) রোমকদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে সিরিয়া ছাড়া করেন। রোমকরা তাই উত্তর সীমান্তে জবাবী হামলার জন্য একত্রিত হচ্ছিলো।

মুসলিম সেনাবাহিনীতে আরব্য গোত্র বনু তাগলীব ও বনু নামারের খ্রিস্টানরাও ছিলো। একদিন বনু তাগলীবের এক খ্রিস্টান যোদ্ধা সাদ (রা) এর কাছে এলো।

ঃ 'সিপাহ্ সালার! আমি বনু তাগলিবের এক খ্রিস্টান।'

ঃ 'খোদার কসম!'–সাদ (রা) অভিযোগের সুরে তাকে বললেন- 'এখানে তো কোন ভেদাভেদ নেই। তুমি আমাদের সঙ্গে আছো। অতএব তুমি আমাদের ভাই। তুমিও আরবী, আমরাও আরবী। অনারবদের বিরুদ্ধে আমরা সবাই ইস্পাত কঠিন প্রাণ। ধর্ম আলাদা বলে আমাদের জবান তো আর আলাদা নয় ..... কি বলতে এসেছো আরাম করে বলো!'

ঃ 'সিপাহসালার!'– খ্রিস্টান যোদ্ধা বললো- 'আমরা আপনার সঙ্গে যেহেতু আছি আপনি নিশ্চয় আমাদের দিকটা দেখবেন। একটা বিপদ ঘনীভূত হচ্ছে। আপনি নিজেই এটা দেখতে পাবেন। মুসল থেকে একটু দূরে তিকরীত নামক একটি বড় শহর আছে।'

ঃ 'হ্যাঁ জানি'- সাদ (রা) বললেন- তিকরীত রোমীয়দের শহর ... কি আছে ঐ শহরে?'

ঃ 'সেখানে আমাদের ওপর হামলার জোর প্রস্তুতি চলছে'– খ্রিস্টান যোদ্ধা বললো– 'আমার গোত্র বনু তাগলীব' বনু নামার এবং বনু আয়াদের অনেক লোক সেখানে থাকে। তারা রোমকদেরকে আমাদের ওপর হামলার জন্য উস্কে দিচ্ছে। আর রোমকরা তো এমনিই আমাদের ওপর হামলার জন্য মুখিয়ে আছে। ওরা সম্ভবতঃ কোথাও থেকে ধাওয়া খেয়ে তিকরীত একত্রিত হয়েছে।'

ঃ 'আমি জানি'– সাদ (রা) বললেন- 'মুসল আবু উবায়দা ও খালিদ (রা) কব্জা করে নিয়েছেন। তিকরীতে রোমীয়রা যদি একত্রিত হয়ে থাকে তাহলে তারা ওখান থেকে ধাওয়া খেয়েই এসেছে।'

এদিকে কিছু ফারসী মুসলমানদের হাতে পরাজিত হয়ে তিকরীতে পালিয়ে যায়। ওদিকে রোমী সৈন্যরাও মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়ে তিকরীত একত্রিত হয়। যে খ্রিস্টান যোদ্ধাটি সাদ (রা)-এর সঙ্গে কথা বলছিলো, সে এ ব্যাপারে বেশ আস্থা নিয়েই কথা বলছিলো। এর কারণ হলো, তার গোত্রের এক খ্রিস্টান সরদার তিকরীত থেকে ছদ্মবেশে জলুলা ঢুকে পড়ে। সে বনু তাগলীবের সরদার ছিলো। যেসব খ্রিস্টান আরব পারসিকদের বিরুদ্ধে মুসলিম ফৌজে থেকে লড়াই করেছিলো সে জলুলায় এসে তাদের সঙ্গে এসে মিলিত হলো। খ্রিস্টান যোদ্ধারা মালেগনীমত মুসলমান যোদ্ধাদের সমানই পেতো এবং যে যোদ্ধা অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে লড়াই করতো তাকে তো ভিন্ন করে পুরস্কার স্বরূপ আরো অনেক কিছু দেয়া হতোই।

এই খ্রিস্টান সরদার সেসব আরব খ্রিস্টান যোদ্ধাদের সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাব দিলো, তারা যেন মুসলমানদের সঙ্গ ছেড়ে দেয় এবং নিজ নিজ ধর্মের লোকদের সঙ্গে যোগ দেয়। চাই তারা অনাবরীই হোক না কেন। এই সরদার তাদেরকে তিকরীত নিয়ে গিয়ে রোমীয়দের সঙ্গে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াতে চাচ্ছিলো। এই ষড়যন্ত্রে আসল ভূমিকা ছিলো ইহুদীদের। এসব খ্রিস্টান গোত্রকে তিকরীত এনেছিলো ইহুদীরা।

সাদ (রা) ও তার ফৌজের জন্য বড় ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ছিলো এটা। মুসলমানরা বিনা বিশ্রামে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে আসছিলো। যখমী ও শহীদানের কারণে তাদের মূল ফৌজও অনেক্ কমে গিয়েছিলো। আর যারা বাহ্যত অক্ষত ছিলো ক্লান্তিতে তাদের

দৈহিক অবস্থা ছিলো পক্ষঘাতগ্রস্ত রোগীর মতো। এটা তো ছিলো তাদের লাগাতার বিজয়ের কারণে অলৌকিক মনোবলের কারিশমা। তারা লড়ছিলো এই অলৌকিকতার ওপর ভর করে। শারীরিকভাবে তারা সামান্য সফরেরও উপযুক্ত ছিলো না। ইহুদীরা মুসলমানদের এই দৈহিক অক্ষমতার সুযোগ নিতে চাচ্ছিলো।

তিকরীত থেকে আসা খ্রিস্টান সরদারকে সেই মুসলিম ফৌজের যোদ্ধা খ্রিস্টান হতাশ করলো না। অন্যান্য খ্রিস্টান যোদ্ধারাও তাকে আশ্বাস দিলো তারা এখান থেকে পালিয়ে তিকরীত পৌঁছে যাবে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাদের কেউ তিকরীত যেতে প্রস্তুত ছিলো না। সেই সরদার চলে যাওয়ার পর সব খ্রিস্টান যোদ্ধারা একজনকে নির্বাচন করলো, সে যেন গিয়ে সিপাহসালারকে তিকরীত সম্পর্কে সতর্ক করে আসে।

সাদ (রা) তখনই এই ইহুদী ও খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে এবং তিকরীতে হামলার অনুমতি চেয়ে একটি পয়গাম লেখালেন এবং দ্রুতগতির এক কাসেদকে মদীনা পাঠিয়ে দিলেন।

মদীনায় কাসেদ পাঠিয়ে সাদ (রা) দু'তিনজন গোয়েন্দা তলব করলেন। যারা আরবের বংশোদ্ভূত ইরাকী ছিলো। তাদেরকে কিছু দিক নির্দেশনা দিয়ে তিকরীত পাঠিয়ে দিলেন। তারা বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করে তিকরীত রওয়ানা হয়ে গেলো।

কয়েক দিন পর গোয়েন্দাদল সেই খ্রিস্টান যোদ্ধার সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে সাদ (রা)কে নিশ্চিত করলো এবং জানালো, পুরোদমে মুসলমানদের ওপর হামলার প্রস্তুতি চলছে সেখানে। কয়েকদিনের মধ্যেই রোমীয়রা সেখান থেকে কোচ করবে।

ঃ 'খোদার কসম!'- সাদ (রা) বড় জোশপূর্ণ গলায় বললেন- 'আমরা ওদেরকে তিকরীত থেকে বেরিয়ে আসতে দেবো না। এটা ঠিক যে, আমার ফৌজের হাড় গোড় প্রায় ভেঙে চুড়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন এবং আমাদের মনোবলও তাজা–সতেজ।'

সাদ (রা) তার সালার ও লশকরকে সতর্ক করে মোটামুটি তৈরী করে নিলেন। কয়েকদিন পর মদীনা থেকে উমর (রা) এর জবাব এলো।

উমর (রা) লিখলেন, রোমীয়রা আবু উবায়দা (রা) এর ফৌজের কাছে পরাজিত হয়ে সম্ভবতঃ ভেবেছে, যতগুলো এলাকা তারা মুসলমানদের দিয়ে এসেছে, ইরাকে এসে এর সমপরিমাণ বা আরো অধিক এলাকা মুসলমানদের কাছ থেকে নিয়ে যাবে। উমর (রা) জোর দিয়ে লিখলেন, ওদেরকে তিকরীত থেকে বের হওয়ার সুযোগ দেয়া যাবে না। আবদুল্লাহ ইবনে মুতামকে পাঁচ হাজার সওয়ার দিয়ে এখনি তিকরীত পাঠিয়ে দাও।

সাদ (রা) পাঁচ হাজার সওয়ার দিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে মুতামকে তিকরীত অভিমুখে রওয়ানা করিয়ে দিলেন এবং বিদায় কালে আবদুল্লাহ ইবনে মুতামকে শুধু একথা বললেন- 'ইবনে মুতাম, পরাজয়ের কোন সংবাদ আমি সহ্য করবো না।'

আবদুল্লাহ ইবনে মুতাম জবাবে কিছু বললেন না। শুধু তার ঠোঁটে মুচকি হাসি খেলে গেলো এবং আল্লাহ হাফেজ বলে তিনি পেছনে না ফিরে হাঁটতে লাগলেন।

কোথাও ছাউনি না ফেলে কয়েক দিনের মধ্যেই এই লশকর তিকরীতে পৌঁছে গেলো। তিকরীত থেকে তখনো রোমীয় ও খ্রিস্টান বাহিনী হামলার জন্য বের হয়নি। আবদুল্লাহ ইবনে মুতাম তিকরীত অবরোধ করে ফেললেন।

শহরের ভেতরে যে রোমীয়রা ছিলো তারা খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও আবু উবায়দা (রা) এর কাছে মর্মান্তিক মার খেয়ে পালিয়েছিলো এবং এখানে পৌঁছে ছিলো। তাদের ওপর মুসলমানদের ভীতি ছড়িয়ে পড়া স্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো। তারা কল্পনাও করতে পারেনি এই শহর অবরোধ করা হবে। আর মুসলমানদের গোয়েন্দা তৎপরতা যে এতখানি গভীর ও চৌকস তাও তারা ভাবতে পারছিলো না। ধীরে সুস্থে হামলা করে মুসলমানদের পরাস্ত করবে– এই আত্ম প্রসাদে তারা ভুগছিলো। এ কারণে শহরে খাবার ও পানীয় যথেষ্ট পরিমাণে মজুদ করেনি এবং অবরোধকালে যেসব নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দরকার পড়ে তাও শহরে সরবরাহ করেনি।

চল্লিশ দিন পর্যন্ত অবরোধ চলে। এই চল্লিশ দিন মুসলমানরা দিনের বেলায় শহরের প্রবেশদ্বার ভাঙ্গতে এবং রাতে রশি ছুঁড়ে দেয়ালের ওপর চড়তে লাগাতার চেষ্টা করে গেলো। আর প্রতিদিনই ব্যর্থ হলো। তবে মুসলমানদের এই তৎপরতায় শহরের ভেতর মুসলমানদের অজানা ও কাল্পনিক শংকার কালো মেঘ পুঞ্জিভূত হয়ে উঠলো ক্রমেই। শহরবাসীর ওপর এর মন্দ প্রভাব পড়তে লাগলো। ভীতি ছড়িয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক ছিলো। কারণ তাদের কাছে সিরিয়া রোমকদের এবং ইরাকে পারসিকদের পরাজয়ের অব্যাহত খবরই শুধু পৌঁছছিলো না বরং সিরিয়া থেকে পালিয়ে আসা রোমকরা পরাজয়ের গভীর চিহ্ন নিয়ে তাদের মাঝখানেই অবস্থান করছিলো।

রোমীয়রা নিজেদের এবং শহরবাসীর মনোবল বৃদ্ধির জন্য অবশ্য শহরের বাইরে বের হয়ে কয়েকবার মুসলমানদের ওপর হামলা করেছিলো। কিন্তু বাইরে মৃতদের লাশ ও আহতদের ফেলে রেখে পালাতে হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে মুতাম একদিন খুব বিচক্ষণ দুই খ্রিস্টান যোদ্ধাকে ঠিক করলেন। রোমকরা আরেকবার হামলা করতে শহরের বাইরে এলে এরা তাদের দলে এমনভাবে ভীড়ে যাবে যেন এখান থেকে পালিয়ে ওদের কাছে চলে এসেছে। আরবদের মেধা ও বুদ্ধির প্রখড়ত্বের তুলনায় শ্রেষ্ঠ কোন জাতিই তখন পৃথিবীতে ছিলো না। আবদুল্লাহ ইবনে মুতাম সেটাই প্রয়োগ করতে চাইছিলেন। তিনি তাদের দু'জনকে বলে দিলেন শহরের ভেতর গিয়ে প্রকাশ করবে যে, তারা তাদের খ্রিস্টান ভাইদের কাছে ফিরে এসেছে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়ে যাবে। কিন্তু তাদের আসল কাজ হবে, সেখানকার সব খ্রিস্টান গোত্রের সরদারদের সঙ্গে সাক্ষাত করা এবং তাদের সালার আবদুল্লাহ ইবনে মুতামের এই পয়গাম পৌঁছে দেয়া যে, এরা সবাই যদি মুসলমানদের সহযোগিতা করে এবং রোমীয়দের সাথে থেকে গোপনে গোপনে তাদের বিরুদ্ধে চলে যায় তাহলে তারা

মালে গণীমতের ততটুকু অংশই পাবে যতটুকু মুসলমানদর দেয়া হয়। এছাড়া শহরে যত রোমীয় বন্দী ও যত মহিলা এবং দাসী বাদী পাওয়া যাবে তা সকল খ্রিস্টানদের মধ্যে ন্যায় সঙ্গতভাবে বণ্টন করে দেয়া হবে।

আবদুল্লাহ ইবনে মুতাম তার পয়গামে একথাও বলেছিলেন, শেষ পর্যন্ত আমরা একটু বিলম্ব হলেও এই শহর দখল করে নেবো। যদি আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করা না হয় তাহলে এক খ্রিস্টানও বাঁচতে পারবে না, সবগুলোকে গোলাম বানিয়ে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়া হবে।

তিন-চার দিন পর রোমীয়রা আবার হামলা করলো। মুসলমানরা হামলাকারী বাহিনীকে ঘিরে নিতে এবং পেছনে গিয়ে শহরের দরজা দখল করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু রোমীয়রা এত সতর্ক ছিলো যে, তারা দরজা থেকে বেশি এগোতো না।

মুসলমানরা রোমীয়দের ভালোই শিক্ষা দিলো এবং রোমীয়রা অনেক লাশ ও যখমীদের ছেড়ে দূর্গের ভেতর ফিরে গেলো। দুই খ্রিস্টান গোয়েন্দাও কৌশলে শহরে ঢুকে পড়লো।

বনু তাগলীব বনু আয়াদ ও বনু নামারের সরদারদের সঙ্গে তারা গোপনে দেখা করলো এবং আবদুল্লাহ ইবনে মুতামের পয়গাম দিলো। গোয়েন্দা বৃত্তিতে এরা অত্যন্ত বিচক্ষণতার স্বাক্ষর রেখে ছিলো। অন্যের ওপর নিজেদের প্রভাব বিস্তারে এরা বেশ দক্ষ ছিলো। সরদারদের তারা আরো বললো, মুসলমানদের ফৌজে থেকে পারসিকদের বিরুদ্ধে লড়ে মুসলমানদের কাছ থেকে তারা এতো অর্থ সম্পদ পেয়েছে যে, তাদের পরবর্তী কয়েক প্রজন্মের ভরণ পোষণ তা দিয়ে চলে যাবে। আরো অনেক কিছু বলে এবং লোভনীয় কিছু প্রস্তাব করে সরদারদের ভিজিয়ে ফেললো তারা।

একে তো এই দুই গোয়েন্দার কৃতিত্বের কারণে সরদাররা আবদুল্লাহ ইবনে মুতামের প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলো। দিতীয়তঃ তারা এটাও লক্ষ্য করছিলো, ক্রমাগত রোমীয়রা সৈন্য হারিয়ে মনোবলও হারিয়ে ফেলছে। তারপর ছিলো শহরের লোকেরা। চারদিক থেকে কোণঠাসা হয়ে রোমকদের মাথা কামড়ে খাওয়ার জোগার করছিলো।

এক রাতে খ্রিস্টানরা দেখলো, রোমকরা দজলায় অনেকগুলো নৌকা একত্রিত করে তাতে তাদের শত শত বাক্স পেটরা ও বৌবাচ্চাদের তুলে দিচ্ছে। স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিলো নদী পথে তারা পালিয়ে যাচ্ছে।

দুই গুপ্তচর নদীর দিকের খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। সেখান থেকে বের হওয়া তাদের জন্য খুব কঠিন কর্ম ছিলো না। রোমীয়দের সঙ্গে ধরাধরি করে তারাও কিছু মালপত্র নিয়ে নৌকায় তুলে দিলো। সেখানে মালপত্র আনা ও লোকজনের আসা যাওয়ার পথে খুব ভীড় লেগে গিয়ে ছিলো। এই ভীড় ও রাতের অন্ধকারের ফায়দা উঠালো তারা। কেউ টেরও পেলো না। আবদুল্লাহ ইবনে মুতামকে এসে সব জানালো তারা।

ঃ 'তোমাদের দু'জনকে আরেকবার ভেতরে যেতে হবে'– আবদুল্লাহ ইবনে মুতাম দুই গুপ্তচরকে বললেন 'তোমাদের খ্রিস্টান সরদারদের বলবে, তারা যেন কৌশলে নদীর দিকের দরজা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় এবং এদিককার দুটি দরজা খুলে দেয়।'

গুপ্তচর দু'জন আবার নদীর তীরে চলে গেলো। সেখান থেকে ভেতরে ঢোকাও কঠিন ছিলো না। খ্রিস্টান সরদাররা মুসলমানদের সাহায্যে নেমে পড়েছিলো এবং তৈরী করে নিয়েছিলো তারা নিজেদের গোত্রের সবাইকে।

কিছুক্ষণ পরেই খ্রিস্টানরা ভেতর থেকে দরজা খুলে দিলো। আবদুল্লাহ ইবনে মুতাম তার ফৌজকে দু'ভাগে ভাগ করে অর্ধেক শহরের দরজা দিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন আর অর্ধেক পাঠিয়ে দিলেন নদীর তীরের দিকে। শহরে হুলস্থুল পড়ে গেলো। সবাই দিগ্বিদিক পালাতে লাগলো। রোমীরা পালানোর নির্দেশ পেয়ে গিয়েছিলো। এজন্য তারা নদীর দিকের খোলা দরজার দিকে দৌড়াতে লাগলো। তারা নিশ্চিত ছিলো, নৌকা তৈরী আছে যা তাদেরকে দজলা পার করে নিয়ে যাবে।

দরজা দিয়ে যখন তারা বেরোচ্ছিলো তখন তাদের জানা ছিলো না, কত দ্রুত তারা মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছে। মুজাহিদরা তলোয়ার ও বর্শা নিয়ে তাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। রোমীদের দেখতে পেয়েই তলোয়ার ও বর্শা দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করতে লাগলো তাদের। পেছন থেকে খ্রিস্টানরাও তাদের সামনে ফেলে দিতে লাগলো। রাতভর রোমকদের গণহত্যা চললো। সকালে রোমক সৈনিকদের লাশ ছাড়া আর কিছুই দেখার ছিলো না। অবশ্য তাদের নারী ও শিশুরা সম্পূর্ণই অক্ষত ছিলো। কারণ, ইসলামের দৃষ্টিতে এরা ছিলো নির্দোষ। আবদুল্লাহ ইবনে মুতাম খ্রিস্টান সরদারদের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন।

ঃ 'খোদার কসম!'– আবদুল্লাহ ইবনে মুতাম সরদারদের বললেন– 'যে প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে আমি দিয়েছি এর চেয়ে আরো বেশি দেবো তোমাদের। এই সব নৌকায় যে মালপত্রের স্তূপ দেখতে পাচ্ছো তা উঠিয়ে নাও এবং নিজেদের লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দাও। লক্ষ্য রেখো, কারো অধিকার যেন পদদলিত না হয়, শহরের যত মেয়ে আছে সব তোমাদের। তবে তোমাদের কেউ যদি ইসলামী প্রথামত বিয়ে করতে চাও আমি সেমতো বিয়ে পরিয়ে দেবো, না হয় তোমাদের ধর্মীয় প্রথামতোই তাদের সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। সুতরাং কোন মেয়ের সঙ্গে জোরপূর্বক বা অন্যায় কিছু চলবে না। আর বাচ্চাদের এমনভাবে লালন পালন করবে যাতে তাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হয়ে উঠে।'

মুসলমানদের এই মানবিক আচরণে ও দয়ার্দ্রতাপূর্ণ বিধানে তখনই কিছু খ্রিস্টান মুসলমান হয়ে যায়। পরে আরো অসংখ্য খ্রিস্টান ইসলামের শান্তি নীড়ে এসে আশ্রয় নেয়।

পারসিকদের পিছু ধাওয়া করতে বারণ করে উমর (রা) যে দূরদর্শীতার পরিচয় দিয়ে ছিলেন তা আরো পরে অনুভূত হয়েছিলো। সাদ (রা) যদি পারসকিদের ধাওয়া করে গিয়ে পাহাড়াঞ্চলে অভিযান চালাতেন তাহলে তিকরীতে রোমকরা যেমন খ্রিস্টান গোত্রগুলোকে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নিয়েছিলো, তেমনি পারসিকরা ইরাকের বিজিত এলাকার লোকদেরও নিজেদের দলে ভিড়িয়ে সারা ইরাকে বিদ্রোহ ছড়িয়ে দিতে পারতো। তারপর তারা পাহাড়ি এলাকায় ফেসে যাওয়া সাদ (রা) এর লশকরের ওপর পেছন থেকে আক্রমণ করে বসতো।

এর প্রমাণ আর কিছু দিন পর পাওয়া গেলো। ইরাক ও সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় কিরকিয়া নামক এক শহর ছিলো। ফুরাত ও 'খাবুর' নামক আরেকটি ছোট নদীর সঙ্গমস্থলে শহরটি গড়ে উঠেছিলো। সেখানে বিদ্রোহীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলো। সাদ (রা) এই সংবাদ পেতেই হামলার জন্য মদীনার অনুমতি চেয়ে কাসেদ পাঠিয়ে দিলেন।

উমর (রা) নির্দেশ পাঠালেন, আমর ইবনে মালিকের নেতৃত্বে পাঁচ হাজারের এক ফৌজ কিরকিয়া পাঠিয়ে দাও।

আমর ইবনে মালিক সামান্য লড়াইয়ের পরই কিরকিয়া জয় করে নেন এবং হারিস ইয়াযিদকে দুই আড়াই হাজার সৈন্য দিয়ে আরেকটি ছোট শহরের দিকে পাঠিয়ে দেন। কারণ সেখান থেকে হামলার খবর এসেছিলো।

তারপর খবর এলো, 'মাসবাদান' নামক এক শহরে ফারসী ফৌজ বিশাল হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সেখানে যিরার ইবনে খাত্তাবকে পাঠানো হলো। ফারসী ফৌজ শহরের বাইরে বেরিয়ে এলো এবং খোলা ময়দানে চরম রক্তক্ষয়ী লড়াই হলো। ফারসীদের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। যিরার ইবনে খাত্তাবের হাতে ফারসী জেনারেল মারা গেলো।

মুসলমানরা শহরে প্রবেশ করলে শহরবাসী এলোপাথারি পালাতে লাগলো। যিরার ইবনে খাত্তাব শহরের দরজাগুলো বন্ধ করে দিতে বললেন এবং লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন, তাদের কোন ক্ষতি করা হবে না। নিরাপত্তা দেয়া হবে আর শহরের প্রত্যেক নাগরিক থেকে যৎসামান্য নিরাপত্তা কর নেয়া হবে। শহরবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কর পরিশোধ করে দিলো।

দক্ষিণ ইরাকে উমর (রা) পাঠিয়েছিলেন উতবা ইবনে গাজওয়ানকে। তার সঙ্গে সালার ছিলেন ইরফা ইবনে হারছামা বার। তারা বন্দর নগরী ও বৃহৎ শহর আবলা জয় করেন এবং সেখান থেকে কাড়ি কাড়ি সোনা-দানাসহ বিশাল অংকের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করেন।

পারসিকদের বিদায় করে ইরাক বিজয়ের পর কয়েক বছর কেটে গেলো। একদিন জলুলা, হালওয়ান, তিকরীত এবং মুসল থেকে তিন-চার মুজাহিদ মদীনায় এলো এবং উমর (রা) এর সঙ্গে সাক্ষাত করলো।

ঃ 'খোদার কসম!'–উমর (রা) তাদের দেখে বললেন 'তোমাদের চেহারা সূরত মনে হয় বেশ বদলে গেছে। মাদায়েন থেকে কয়েকজন এসেছিলো। তাদের চেহারায়ও আমি পরিবর্তনের ছাপ লক্ষ্য করেছি। তোমাদের আসলে হয়েছে কি?'

ঃ 'এটা সেখানকার আবহাওয়ার প্রভাব আমীরুল মুমিনীন!'

ঃ 'হ্যাঁ আমার মনে পড়েছে'– উমর (রা) বললেন–'হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা) একবার মাদায়েন থেকে আমার কাছে লিখেছিলেন, এখানে মুসলমানরা নিয়মিত পেটের

পীড়ায় ভুগছে, তাদের শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে এবং চেহারাও দিন দিন বিবর্ণ হয়ে পড়ছে। সাদ (রা)কে আমি একবার এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমার মনে পড়েছে, হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা) সাদ (রা)-এর নির্দেশেই আমাকে চিঠি লিখেছিলেন ..... রাখো, আমি এজন্য কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

ইরাক নদী-নালা, সবুজে ভরা গভীর অরণ্য ও নানান বৈচিত্র্যময় বৃক্ষে ছাওয়া অপরূপ পাহাড় সারি-এসব মনোরম দৃশ্যের জন্য বিখ্যাত ছিলো। এ ধরনের অঞ্চলের আবহাওয়া এমনিতেই আর্দ্র হয়ে থাকে। আরবদের জন্য তা উপযুক্ত ছিলো না। মরুর শুষ্ক পরিবেশে থেকে এসব আরবী মুজাহিদরা বড় হয়েছিলো। তাই তারা শত চেষ্টা করেও এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছিলো না। উমর (রা) মুজাহিদদের সুস্থতার ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। তিনি সাদ (রা)কে লিখলেন ঃ

'আরবদের সেই পরিবেশ ও আবহাওয়াই উপযুক্ত যা তাদের উটের জন্য স্বস্তিদায়ক হয়। এমন কোন অঞ্চল খোঁজ করো যেখানে আবহাওয়ার শুষ্কতা ও আর্দ্রতা একরকম হবে। আর এটাও মনে রেখো, মদীনাও সেই অঞ্চলের মধ্যে যেন কোন নদী ও পুলের বাঁধা না থাকে।'

উমর (রা) সেই পয়গামে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন, এমন অঞ্চল খুঁজে বের করতে হবে যেখানে মরুর কিছু শুষ্কতাও থাকবে, আবার স্বচ্ছ ও নির্মল মিষ্টি পানির ঝর্ণাও থাকবে। উমর (রা) এর আরেকটি উদ্দেশ্য ছিলো, যে অঞ্চল নির্বাচন করা হবে সেখানে যদি কোন নদী-নালা বা পুলের প্রতিবন্ধকতা থাকে তাহলে মদীনা থেকে কোন সেনাসাহায্য পাঠানোর প্রয়োজন পড়লে বাড়তি বাধার সম্মুখীন হতে হবে সুতরাং নির্বিঘ্ন যোগাযোগের পথ আছে এমন একটি অঞ্চল মুজাহিদদের জন্য নির্ধারণ করতে হবে।

সাদ (রা) মুসল থেকে আবদুল্লাহ ইবনে মুতাম ও জলুলা থেকে ক'কা ইবনে আমরকে ডেকে এনে উমর (রা) এর পয়গাম শুনালেন এবং তাদের বললেন, তারা যেন কোন অঞ্চল খুঁজে বের করেন। তারা দু'জন তখনই সন্ধান দিয়ে দিলেন, কুফায় এমন একটি জায়গা আছে যা ফুরাতের সংলগ্ন হওয়ার কারণে সবুজ শ্যামল ও এবং মরুভূমিও এর এতো কাছে যে, সেখানকার আবহাওয়ায় খুব বেশি আর্দ্রতা বাড়তে পারে না। সেখানকার পরিবেশও আরবদের জন্য চমৎকার হবে। অন্যান্য সালাররাও এটা সমর্থন করলেন এবং সাদ (রা) সেদিনই কুফায় রওয়ানা হলেন।

তিনি সেখানে উঁচু একটি জায়গা নির্বাচন করে হুকুম দিলেন এখানে মসজিদ নির্মাণ হবে। জায়গা নির্বাচনের জন্য আরবদের বিশেষ এক হিসাব ব্যবস্থা ছিলো। একজন তীরন্দাযকে মসজিদের স্থানে দাঁড় করিয়ে বলা হলো, সে যেন একটা একটা করে চার দিকে চারটা তীর নিক্ষেপ করে। তীরন্দায চারদিকে চারটি তীর নিক্ষেপ করলো। সাদ (রা) বললেন, যেখান পর্যন্ত তীরগুলো পৌঁছেছে এর চারদিকে বাজার, আবাদী ও শহরের গণ্ডি নির্ধারণ করে নাও।

❖ ❖ ❖

মসজিদ নির্মিত হলো। এর ছাদের নিচে যে স্তম্ভগুলো ব্যবহার করা হলো সেগুলো আনা হয়েছিলো কিসরার রাজপ্রাসাদ থেকে। মসজিদ নির্মাণের প্রধান কৌশলী ছিলো এক ফারসী। যারা কিসরার মহল নির্মাণ করেছিলো এই ফারসী ছিলো সেই বংশের একজন। সেই ফারসী মসজিদের কাছে সুরম্য এক দালান নির্মাণ করলো। যার মধ্যে বায়তুল মালের স্থাপত্য অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এই দালানের নাম রাখা হয়েছিলো 'কসরে সাদ'। মুজাহিদীনদের সেখানে নিজেদের পছন্দমতো ঘরবাড়ি বানিয়ে নেয়ার অনুমতি দেয়া হলো। এর আগে সাদ (রা) উমর (রা) কে লিখলেন, হীরা ও ফুরাতের মাঝখানে মুজাহিদদের জন্য জায়গা নির্বাচন করা হয়েছে কুফা। যেখানে আবহাওয়ার শুষ্কতা ও আর্দ্রতা সমান। মুজাহিদরা সেখানে তাঁবু ফেলে থাকতে শুরু করেছে।

ফিরতি পয়গামে উমর (রা) লিখলেন, মুজাহিদদের অবস্থান এতটুকু মজবুত হওয়া উচিত যাতে তাদের হেফাজতের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকে। তাই উত্তম হবে তাঁবুর পরিবর্তে কাঠ ও বাঁশের ঘড়বাড়ি বানিয়ে নিলে।

উমর (রা) এর উদ্দেশ্য ছিলো, মুসলমানরা যদি বড় বড় দালান ও সুরম্য অট্টালিকায় থাকতে শুরু করে তাহলে সম্পদের প্রাচুর্য যেমন মানুষকে নষ্ট করে দেয় এসবও তাদেরকে নষ্ট করে দেবে।

সেখানে কাঠ ও বাঁশের কমতি ছিলো না। এলাকার মিস্ত্রীদের দিয়ে মুজাহিদরা নিজেদের ঘড়বাড়ি বানিয়ে নিলো। প্রতিটি ঘর একটা আরেকটার সঙ্গে লাগোনো ছিলো। একদিন কারো অসাবধানতায় একটি ঘরে আগুন লেগে গেলো। দেখতে দেখতে মুজাহিদ পল্লী জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে পেলো।

সাদ (রা) উমর (রা)কে পয়গাম পাঠিয়ে অনুমতি চাইলেন, ইট পাথর ও সুরকির সাহায্যে লোকেরা যেন নিজেদের ঘড়বাড়ি বানাতে পারে।

ঃ 'হ্যাঁ এখন ইট, পাথর ইত্যাদির ব্যবহারে ঘরবাড়ি নির্মাণের অনুমতি দিয়ে দাও'– উমর (রা) পয়গামের জবাবে লিখলেন-' তবে কঠিন হুকুম জারী করে দাও। কেউ যেন তিন কামরার বেশি নির্মাণ না করে। আর দেয়ালগুলোও খুব উঁচু না হয়। তোমরা যদি সুন্নতের পেছনে চলো, ধন-দৌলতও তোমার পেছনে পেছনে আসবে।'

সাদ (রা) মাদায়েন থেকে কুফায় চলে এলেন এবং নতুন বাড়ি করে সেখানে থাকতে শুরু করলেন। তিনি নিজেই এর আশেপাশে বাজার ও লোক সমাগমের স্থান বানিয়েছিলেন, যেখানে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ীদের যাতায়াত ছিলো। এতে সবসময় এত কোলাহল লেগে থাকতো যে, সাদ (রা) প্রায় হাঁপিয়ে উঠলেন। তিনি রাজমিস্ত্রীকে ডেকে বললেন, আমাকে এই চেচামেচি ও হৈহুল্লোড় থেকে বাঁচাও। আমি তো এসব বন্ধ করতে পারবো না। এক কাজ করো আমার ঘরের এদিককার দরজা বন্ধ করে দাও।

মিস্ত্রীরা তার ঘরে এমন কিছু সংযোগ ঘটালো যে, তা ছোট একটি মহলে পরিণত হলো। ঘরের সামনের অংশে একটি মজবুত ও অতি সুন্দর দরজা লাগানো হলো। যাতে বাইরের কোন আওয়াজই আর ভেতরে ঢুকতে পারতো না।

একবার মদীনায় সেখান থেকে এক লোক এসে উমর (রা)-এর সঙ্গে দেখা করলো। কুফা সম্পর্কে কথা উঠলে লোকটি কথা প্রসঙ্গে বললো, আমীরে লশকর সাদ (রা) তো মহলের মতো একটি দালান বানিয়েছেন। এখন এর সামনে প্রাসাদের মতো বিশাল এক দরজা লাগানো হয়েছে।

উমর (রা) এটা শুনে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা)কে ডাকলেন।

ঃ 'ইবনে মাসলামা!'– উমর (রা) তাকে বললেন- 'এখনি কুফায় রওয়ানা হয়ে যাও। সাদ (রা)-এর দরজায় বিনা জিজ্ঞাসায় আগুন লাগিয়ে দেবে, তারপর এই পত্রটি তাকে দিয়ে ফিরে আসবে।

মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা) তখনই কুফায় রওয়ানা হলেন। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে কুফায় পৌঁছলেন। সাদ (রা) জানতে পেরে তাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি সাদ (রা) এর ঘরের সামনে গেলেন, তবে ভেতরে যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। সাদ (রা) ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, আগে ভেতরে এসে যেন তিনি কিছু খেয়ে নেন। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা) তা প্রত্যাখ্যান করে দরজায় তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিলেন।

সাদ (রা) কিছু বললেন না। চেয়ে চেয়ে দেখলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন, এটা কোন নির্দেশ পালিত হচ্ছে নিশ্চয়। ইবনে মাসলামা (রা) সাদ (রা)কে উমর (রা) এর চিঠিটি দিলেন।

'আমি জানতে পেরেছি। তুমি নিজের জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছো এবং তাকে সুরম্য এক কেল্লার রূপ দিয়েছো। এর নাম রেখেছো 'কসরে সাদ'। আমি উপলব্ধি করেছি যারা তোমার কাছে পৌঁছতে চায় তাদের জন্য তোমার দরজা আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা তোমার প্রাসাদ নয়। এটা তোমার ও উম্মতের ধ্বংসের প্রাসাদ। এতে তুমি বায়তুল মাল নির্মাণ করে এর এক অংশকে তোমার প্রাসাদ বানিয়ে নিয়েছো। বায়তুলমালের সামনে নিয়মিত প্রহরা নিয়োজিত থাকে। এই প্রহরার কারণে কোন সাক্ষাৎপ্রার্থী তোমার মহলে ঢুকতে পারবে না। বায়তুল মালকে সেখান থেকে সরিয়ে নাও। যারা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় প্রহরার কারণে তাদের সামনে যেন কোন প্রতিবন্ধকতা তৈরী না হয়। জনগণ ও তোমার মাঝে কোন আড়াল রাখবে না।'

দরজা জ্বলছিলো, সাদ (রা) এর সামনে দাঁড়িয়ে নির্লিপ্ত মুখে উমর (রা) এর চিঠিটি পড়লেন এবং মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাকে খুলে বললেন কেন তিনি এই দরজা লাগিয়েছিলেন। তিনি আরো বললেন, খেলাফতের পক্ষ থেকে আমি এই ভূ-খণ্ডের আমীরও এবং সিপাহসালারও। কাজের সুবিধার জন্য, রাষ্ট্রের বিভিন্ন ফয়সালার জন্য এবং মানুষের কল্যাণে যেন কিছু ভাবতে পারি এজন্য আমার নিশ্চয় নির্জনতার প্রয়োজন হয়।

মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা) মদীনায় ফিরে এসে জানালেন তিনি তার নির্দেশ পালন করে এসেছেন। এর সঙ্গে আরো বললেন, সাদ (রা) এই এই কথাও বলেছেন এবং এ ধরনের দরজা নির্মাণের কারণ হলো এই।

উমর (রা) প্রতি উত্তরে একথা বলেননি, তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন তার শত ভাগ সঠিক ছিলো। তিনি মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা)কে বললেন, সাদ (রা)-এর এসব কথা তার শোনা উচিত ছিলো।

ঃ 'আরে সব সময় হাকিমের হুকুম পালন করার সময় চোখ বন্ধ রাখতে নেই' – উমর (রা) উষ্মা প্রকাশ করলেন– 'তুমি যখন তোমার চোখে ভিন্ন কিছু দেখেছিলে এবং সঠিক কারণও তোমার জানা ছিলো, তখন আমার হুকুম পালন না করার মতো তোমার চিন্তা শক্তি এতটুকু উদার ও সাহসী হওয়া উচিত ছিলো।'

উমর (রা) তখনই সাদ (রা)কে চিঠি দিয়ে জানালেন। তিনি যে কারণ দর্শিয়েছেন এবং যে পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। তিনি যেন তার বাড়িটি আগের মতো তৈরী করে নেন।

যেদিন সাদ (রা) এর সুরম্য প্রবেশদ্বারটি ধাউ ধাউ করে জ্বলছিলো সালমা সেদিন অঝোর নয়নে কাঁদছিলো। কোন অভিমানের উত্তাপ তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরায়নি। সালমা এই ভেবে আনন্দে কাঁদছিলো– সব অসম্ভবকে জয় করে যে সিপাহসালারের গলায় আজ বিজয়ের মালা উঠেছে, তারই চোখের সামনে তার ঘরের দরজা জ্বলছে আর তিনি পাহাড়সম ধৈর্যের প্রতীক হয়ে সৌম্য-শান্ত বদনে দাঁড়িয়ে আছেন শুধু এজন্য যে, এটি আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশ– হয়তো এতেই ভোরের নির্মল আলোর মতো কোন কল্যাণ নিহিত আছে। হায়! এমন পাহাড়সম হৃদয়ের প্রেমময় স্বামী ক'জন নারীর ভাগ্যে জুটে! ক'জন নারী পারে এমন বিশাল মনের স্বামীর বুকে মাথা রাখতে।

❑

সত্য-সুন্দরের অনুপম আলোকমালার দিকে যারা চিরকাল জ্বালাধরা চোখে তাকিয়েছে, যারা সত্যাশ্রিত শান্তির নির্মল ধারায় আজন্ম বিষ ঢেলে দিয়েছে তারা হলো ইহুদী জাতি।

প্রথম খলিফা আবুবকর (রা)-কে হারিয়ে মুসলিম জাতি যখন দিশেহারা তখনই নতুন রূপে ফিরে এলো সেই ইহুদীরা। এবার তাদের মিশন হলো- এই সুযোগে ইসলামকে ধ্বংসের অতীত ইতিহাসে নিয়ে যেতে হবে এবং এজন্য মুসলিম নেতৃত্বে সুকৌশলে ঢুকিয়ে দিতে হবে অনৈতিকতার বিষবাষ্প। তাই চাই মোক্ষম অস্ত্র নারী ও নারীর রূপের জাদুময়তা। যেই চাওয়া সেই কাজ। মদীনার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে দিলো তারা মুসলিম বেশী ইহুদী নারীদের মোহনীয় রূপের অব্যর্থ জাল। যে নেতৃত্বের সুরম্য সৌধতলে মুসলমানরা আজ সমবেত তা কি ধসে যাবে?

এদিকে দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হলেন উমর (রা)। নেতৃত্বের কম্পিত সৌধ সিঁড়িতে মাত্র তিনি পা রেখেছেন, ছুটে এলেন পারস্য রণাঙ্গন থেকে সেনা সাহায্যের জন্য মুসান্না ইবনে হারিসা। সেখানে হীরা শহরে পারসিকদের ঘেরাও বেষ্টনীতে মুসলমানরা প্রাণ হাতে নিয়ে ধুকছে। কিন্তু মুসলিম সেনার প্রায় পুরো বাহিনীই সিরিয়ার অভিযানে শত্রুর মুখোমুখি। অনেক কষ্টে মাত্র কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবক জোগাড় করে আবু উবাইদার নেতৃত্বে তিনি পাঠিয়ে দিলেন পারস্য অভিযানে। জিসিরের লড়াইয়ে আবু উবায়দা অর্ধেকেরও বেশি সৈন্য নিয়ে শহীদ হয়ে গেলেন। আহত মুসান্না ইবনে হারিসা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে তিন হাজার সৈন্যকে উদ্ধার করে কোনক্রমে পালিয়ে এলেন। এরপর মুসান্না ও তার প্রেরণাদাত্রী তন্বী বিদূষী স্ত্রীকে বিধবা করে একদিন শহীদ হয়ে গেলেন। সালমা হারালো তার স্বপ্নের পুরুষকে। মুসলমানরা হারালো কিংবদন্তীতুল্য এক সালারকে। আঁতকে উঠলেন উমর (রা)। এখন কি হবে? প্রিয় নবীজীর পত্র মোবারক কিসরা পারভেজের হাতে ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার যে দগদগে জ্বালা নিয়ে তিনি পারস্য অভিযানের সূচনা করেছিলেন তা তো ব্যর্থ হচ্ছেই, উল্টো বিপুল বিনাশী ঝড় হয়ে ধেয়ে আসছে পারসিকরা পুরো আরবকে গ্রাস করতে।

উমর (রা) মচকালেন, ভাঙ্গলেন না। প্রত্যাঘাতের পর্বতপ্রাণ দৃঢ়তা নিয়ে পারস্যে পাঠালেন সেনাপতি সাদ (রা)-কে। মাত্র কয়েক হাজার মুসলিম সেনা পঙ্গপালের মতো ধেয়ে আসা লক্ষাধিক পারসিকদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। লড়াই শুরুর আগেই মুসলিম সেনাপতি সাদ (রা) চরম বাতের ব্যথায় প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়লেন। ওদিকে মাদায়েনে জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ইহুদীরা সম্রাট ইয়াযদগিরদের আশ্রয়ে মুসলমানদের ধ্বংস সাধনে শুরু করল ভয়ংকর এক জাদুর প্রয়োগ। পথহারা মরু ঝড়ে আক্রান্ত এক অসহায় মুসাফিরের মতোই মুসলমানরা আক্রান্ত হয়ে পড়লো সর্বগ্রাসী ঝড়ের কবলে। আর কতক্ষণ টিকতে পারবে তারা এই মৃত্যু-ঝড়ের তাণ্ডবে?

ISBN 984-839-055-03
9 789847 020679